দুচাকায় দুনিয়া



বিমল মুখার্জি

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

দুচাকায় দুনিয়া

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

DUCHAKAY DUNIYA
A bi-cycle expedition around the world
by the first Indian Globe-trotter Bimal Mukherjee

প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৮৬
প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৮ মুদ্রণ সংখ্যা ২১০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০০৩ মুদ্রণ সংখ্যা ১২০০
তৃতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০০৬ মুদ্রণ সংখ্যা ১১০০
চতুর্থ মুদ্রণ: মে ২০০৯ মুদ্রণ সংখ্যা ১১০০
পঞ্চম মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০১২ মুদ্রণ সংখ্যা ১১০০

ISBN : 81-86891-16-1

প্রকাশক
সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯
%২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

হরফ বিন্যাস
স্বর্ণাক্ষর

সূচি

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ

ভূমিকা

বিমল মুখার্জির ‘দুচাকায় দুনিয়া’ বইটির কথা কেন আমি কখনও শুনিনি, আমার গ্রন্থকীট বন্ধুরাও কেন এ বইয়ের কথা জানেন না, বইটি পড়বার পর সেকথা ভেবে আমি ভয়ানক অবাক হয়েছি। আমাদের ছেলেবেলা থেকে ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের কথা জানি, তাঁর বইও আমাদের পড়া, অথচ প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক বিমল মুখার্জির নামই কখনও শুনলাম না, চেনা-জানাদের মধ্যে কেউ শুনেছেন বলেও জানি না, এ শুধু বিস্ময়ের নয়, দুঃখের ও ধিক্কারের কথা। এ আমরা কেমন জাতি যে তার স্বপ্নস্পর্শী স্বজনের কথা পাঁচ মুখে বলে না, এ আমাদের কেমন দেশ যে তার দিগ্বিজয়ী সন্তানকে সম্মান দেয় না!

কয়েক বছর আগের কথা, আমি তখন বিমল মুখার্জির অনেক পরবর্তীকালের আরেক ভূপর্যটক বিমল দে-র প্রায় দুষ্প্রাপ্য বইগুলি আবিষ্কার করে চিঠিতে-টেলিফোনে কলকাতা হৃষীকেশ জেনেভা ঢুঁড়ে এই অভিযাত্রীর সন্ধান পাই ও তাঁর লেখার নির্বাচিত অংশ কিছুটা সংক্ষেপিত আকারে ‘ভ্রমণ’-এ পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করি। সেই লেখা ছাপা হবার সময় ‘ভ্রমণ’-এরই একজন পাঠক আমাকে বিমল মুখার্জির ‘দুচাকায় দুনিয়া’ বইটির কথা জানান। তারপর কী করে বইটির প্রকাশকের খোঁজ পেলাম ও মাসের পর মাস প্রতিনিধি পাঠিয়েও বইটির একটি কপিও সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলাম, শেষ পর্যন্ত কার কাছে কীভাবে একটি কপি পাওয়া গেল, সে এক বিশদ আখ্যান। যেদিন পেলাম সেদিনই রাত জেগে বইটি শেষ করে পরদিনই মুগ্ধ হৃদয়ে বইয়ে মুদ্রিত লেখকের ঠিকানায় চিঠি পাঠাই, দীর্ঘদিন অবধি কোনও উত্তর না পেয়ে, একজন প্রতিনিধি মারফৎ পত্র পাঠিয়ে শেষ পর্যন্ত লেখকের পুত্র-পুত্রবধূর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তারই পরিণামে ‘ভ্রমণ’-এ ১৯৯৫-৯৬এ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ‘দুচাকায় দুনিয়া’ পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

একটা খুব দুঃখের ও ক্ষোভের কথা এই যে, ‘ভ্রমণ’-এ বইটির পুনর্মুদ্রণ শেষ হলে, আমি লেখকের পুত্র সিদ্ধার্থ দাসমুখার্জিকে বইটি অবিলম্বে আবার নতুন করে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করি। আমার আশা ও বিশ্বাস ছিল, ‘ভ্রমণ’-এ ধারাবাহিক প্রকাশের ফলে

বইটি বহু বিশিষ্ট গ্রন্থপ্রকাশকের নজরে পড়েছে ও এরকম অনেক প্রকাশকসংস্থাই নিশ্চয়ই এবিষয়ে আগ্রহী হয়ে লেখকের ঠিকানা জানতে চেয়ে 'ভ্রমণ' কার্যালয়ে যোগাযোগ করবেন । শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই ঘটেনি, শেষ পর্যন্ত তাই এই স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ । সামান্য সম্পাদিত, কিছুটা সংক্ষেপিত ।

সম্পাদিত বলতে কখনও ছাপার ভুলে কখনও লেখকের অসতর্কতায় ভুল বানান, ভুল যতিচিহ্ন সাধ্যমতো সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে । কোথাও কোথাও বর্ণনা বা বিতর্কের অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য কিছুটা হ্রাস করে মূল লেখার সম্পদ ও সংহতি সযত্নে রক্ষা করেছি । এ কাজ যে কেউ করতে পারেন । কিন্তু এক জীবনে এমন দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের দুর্লভ অভিজ্ঞতা আমরা যে কেউ অর্জন করতে পারি না, বিমল মুখার্জি পেরেছেন । তাঁর সেই অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়ে তিনি যে এই মহাগ্রন্থ লিখে রেখে গেছেন, সে আমাদের মহাভাগ্য ।

বাঙালির হাতে 'দুচাকায় দুনিয়া'র মতো একটি বই তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য ।

কলকাতা

জানুয়ারি **১৯৯৮** সম্পাদক 'ভ্রমণ'

লেখকের কথা

দেশ দেখতে কার না সাধ হয় । তবে হাতে একটা পয়সা না নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণের শখ মেটানো সময়সাপেক্ষ ও রীতিমতো কষ্টসাধ্য । আমার একযুগের ওপর সময় লেগেছিল । ১৯২৬ থেকে ১৯৩৭ । টাকা রোজগার করেছি পথে- কখনও ফটোগ্রাফার, কখনও নাবিক, কখনও পাইলট, নানা বিষয়ে স্কুল-কলেজে বক্তৃতা দিয়ে- কখনও বা মাছ ধরার ট্রলারে নানারকম কাজ করে, কখনও স্কুলে পড়িয়ে, ডেয়ারি ফার্মে গো-পালন করে । শারীরিক পরিশ্রম করে কতভাবে অর্থোপার্জন করেছি তার ইয়ত্তা নেই । মনে হয় এক জীবনেই অসংখ্যবার আমি জন্ম পরিগ্রহ করেছি ।

সব কাজের মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতা বাড়াতে চেষ্টা করেছি । কত জাতের কত স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছি । তারা আমার মনের প্রসার বাড়িয়েছে এবং অনেক সংস্কারমুক্ত হতে সাহায্য করেছে । সার্থক হয়েছে আমার ভ্রমণ ।

মা বই লিখতে আমায় খুব উৎসাহিত করেছিলেন । বারো বছর ধরে সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিয়েছি । মা লিখেছিলেন ‘তোমার জীবনের সব ঘটনা আমার কাছে ধরা আছে । ভ্রমণ শেষ করে বই লিখতেই হবে’ । তাই এই বই । ভ্রমণ শেষ করার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে লেখা ।

আমি ভারতের যুবগণকে বইটি উৎসর্গ করলাম ।

কলকাতা-১৯

১লা জানুয়ারি, ১৯৮৬ বিমল মুখার্জি

১

আজ থেকে ঠিক বাহান্ন বছর আগে মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়-বন্ধু ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে আরামহীন অনিশ্চিতের পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম অজানাকে জানার ও অচেনাকে চেনার জন্য। সারা পৃথিবী ঘোরবার স্বপ্ন যা ছেলেবেলায় ভূগোল পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নেশার মতো আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল, **১৯২৬** সালের **১২** ডিসেম্বর, তার বাস্তব রূপ নেবার পথের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হল। আমার বয়স তখন তেইশ, সঙ্গে তিন বন্ধু- অশোক মুখার্জি, আনন্দ মুখার্জি ও মণীন্দ্র ঘোষ। অশোক মুখার্জি আমাদের দলের নেতা। সাইকেল চারখানা আমাদের বাহন।

যাত্রা শুরু হল কলকাতার টাউন হল থেকে। মহা আড়ম্বরে বিরাট এক জনসভার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথম ভারতীয় দল ভূপর্যটক হয়ে পথে বেরবে, এই খবরটা বাঙালির মনে সেদিন এক বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। যে যেখানে ছিল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। ইচ্ছা ছিল বোধহয় পর্যটকদের একবার নিজের চোখে দেখা এবং সম্ভব হলে করমর্দন করে তাদের উৎসাহিত করা। বাঙালি ভীতু, কুনো এবং ঘরমুখো এই দুর্নাম ঘোচাবার জন্য চারজন যুবক প্রাণের মায়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে সাহসে ভর করে গৃহছাড়া হল, এই কথা সবার প্রাণে আশার বাণী এনেছিল। চিরকাল বিদেশিদের এইরকম সাহসের পরিচয় দিতে দেখে আমরা সবাই তারিফ করে এসেছি- ধন্য ধন্য বলেছি। কিন্তু এ যে বাঙালি তথা প্রথম ভারতীয় দল, এই চিন্তা সবাইকে সেদিন উদ্বুদ্ধ করেছিল একান্তভাবেই।

টাউন হলের বাইরে এসে দেখি সামনে বিরাট জনসমুদ্র।

এসময়টা মনের মধ্যে কয়েকটি কথা বারবার আমাকে উতলা করেছিল। মাকে ভীষণ ভালোবাসতাম। বিদায়ক্ষণে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে চলে এলাম। আমার অতি প্রিয় এবং সাধের কলকাতা ছাড়তেও খুব খারাপ লাগছিল। হাওড়ার দিকে এগোলাম। শত শত সাইকেল এবং মোটরগাড়ি আমাদের আশপাশে পথ করে চলল। গঙ্গার ওপর তখন কাঠের পুলটা পার হবার সময়ে বারবার পিছন ফিরে কলকাতা শহরের দিকে দেখছিলাম, জানি না আবার কখনও দেখা হবে কিনা। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে চলেছি। সূর্য প্রায় অস্তাচলে। অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে যেতে যেমন অসুবিধা

তেমনই সময়ও নষ্ট হচ্ছিল । কথাও ছিল বর্ধমানে প্রথম রাত্রি কাটাবার, যেমন প্রত্যেকবার উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণের সময়ে করেছি ।

বালিতে বিবেকানন্দ ব্রিজের ওপর দিয়ে একজন প্রফেসর সাইকেলে আসছিলেন দুপুরবেলায় আমাদের জি টি রোডে অভিনন্দন জানাতে । সেদিন এত বেশি গাড়ি, সাইকেল এবং মানুষের ভিড়ে পড়ে তাঁর পথেই মৃত্যু ঘটল- একটা লরি তাঁকে চাপা দিল ।

রাত ৯টার সময় পৌঁছলাম চন্দননগরে । দেহে ক্লান্ত ও মনে অবসন্ন বোধ করছিলাম । পথে বালি, উত্তরপাড়া, কোতরং ইত্যাদি জনপদের ভেতর দিয়ে আসবার সময় অনেক অভ্যর্থনা ও ভোজন এবং আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছিল মনে পড়ে । চন্দননগরে পৌঁছে আমার এক পূর্ব-পরিচিত বন্ধুর সাদর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম । পরদিন বর্ধমান যাবার কথা ঠিক হল ।

অপরিচিত জায়গায় শুয়েছিলাম বলে খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল । তখন দেখি বাড়ির চারপাশে ছেলে-মেয়েরা ঘুরছে আমাদের দেখা পাবার আশায় ।

প্রথমদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলাম যে মাল বহন করবার ক্ষমতা অতিক্রম করে আমরা সবাই ভুল করেছি । বসবার সিটের পিছনে প্রত্যেকে একটা করে মজবুত স্টিল ট্রাঙ্ক নিয়েছিলাম- সাইকেলের পিছনে সাঁটা । সেটা চাবি বন্ধ করবার ব্যবস্থা ছিল । স্টিল ট্রাঙ্কের ওপর কম্বল ও কাপড়-চোপড় বাঁধা ছিল । কাঁধের ওপর হ্যাভারস্যাকে ভর্তি অফুরন্ত মাল । তাছাড়া বন্দুক-পিস্তলের ওজন তো ছিলই । সাইকেলের ফ্রেমের মধ্যে এক মস্ত ব্যাগ ভর্তি সংসারযাত্রার সব জিনিস- ক্যামেরা, ওষুধপত্র, গুলি, কার্তুজ, জুতোর বুরুশ কী না ছিল! পথেও একদিনেই কত জিনিস উপহার পেলাম তার হিসেব দেওয়া সম্ভব নয় । মহেন্দ্রলাল দত্তর ছাতার দোকানের মালিক ভবানী দত্ত আমার বিশেষ বন্ধু । তার ধারণা হয়েছিল একটা ছাতা থাকলে মরুভূমির দারুণ গরম কম লাগবে । একটা ছাতার ওজনও তখন দুঃসহ লাগছিল ।

চা খেয়ে আমরা প্রথমেই ঠিক করলাম যেমন করে সম্ভব বোঝা কমাতে হবে । সব জিনিস একত্র করে দেখলাম জুতোর একটা বুরুশ ও একটা কালির কৌটো চারজনের পক্ষে যথেষ্ট । দাঁত মাজার বুরুশ অবিশ্যি প্রত্যেককে একটা করে রাখতে দেওয়া হল । এমনই ছাঁটাই করতে করতে স্তূপাকার জিনিস ফালতু হয়ে গেল- চারটে স্টিল ট্রাঙ্ক মাল বোঝাই করে চন্দননগরের বাড়িতে ফেলে রেখে বিদায় নিলাম আমরা ।

বারোটার সময় আবার শুরু হল জি টি রোড ধরে বর্ধমানের দিকে এগনো । আগের চেয়ে বোঝা অনেক কমলেও তখনও ভারবাহী গাধার অবস্থা । এই অবস্থা থেকে

কোনওদিন রেহাই পাইনি । স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হওয়ার যতই চেষ্টা করেছি ততই বোঝা বেড়েছে বই কমেনি ।

চন্দননগর থেকে যারা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিল, ৫০ মাইল পথ অতিক্রান্ত হলে তারা সবাই বিদায় নিল একে একে । সবার আগে একজন একটা জরুরি জিনিস আমায় উপহার দিয়েছিল । কয়েকটা ছুঁচ ও নানা রঙের সুতো । এত দরকারি জিনিস কিন্তু আমরা কেউই আগে সঙ্গে নিইনি ।

১৯২৬ সালে জি টি রোড অনেক চওড়া ছিল । মোরাম দিয়ে বাঁধানো রাস্তা । দুধারে বড় বড় গাছের ছায়া সারাদিন থাকত । গাছের নিচ দিয়ে গরুর গাড়ির সার দুদিকে চলত । ক্বচিৎ কখনও একটা মোটরগাড়ি দেখেছি । ট্রাকে মাল বহনের রীতি তখনও হয়নি ।

বর্ধমানে আমরা ডাঃ গণেশচন্দ্র সরকারের আতিথ্য স্বীকার করলাম ।

পরদিন বর্ধমান ছেড়ে কাত্রাসগড়ের দিকে এগোতে লাগলাম । একজন কয়লার খনির বাঙালি মালিক আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন । ক্লান্ত হয়ে যখন আমরা বটকৃষ্ট রায়ের বাড়ি পৌঁছলাম, মনে হল যেন সেখানে মেলা বসেছে । লোকের বিরাট ভিড় । গানবাজনার ব্যবস্থাও আমাদের আনন্দবর্ধনের জন্য । গায়িকা তরুণী কমলা ঝরিয়া । সেই সভায় গান করেছিলেন ‘মিছে মালা গাঁথিয়া আশে বসে থাকা ।’ সুরেলা গান । বেশ মিষ্টি লাগল । কিন্তু রাত জেগে গান শোনার আর উৎসাহ ছিল না । বারোটার সময় ভূরিভোজ তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল । আমরা সবার কাছে বিদায় নিয়ে রাত দেড়টার সময় শুতে গেলাম ।

এমনিভাবে সর্বত্র আদর-আপ্যায়নের ভেতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি । মোগল সাম্রাজ্য কায়েমি হবার আগে পাঠান বীর শেরশাহ কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ১৫০০ মাইল লম্বা এক চওড়া রাস্তা- গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি করেছিলেন । অফুরন্ত ফলের গাছ তার দুধারে লাগানো । প্রত্যেক দশ মাইল অন্তর একটা পাকা কুয়ো বা ইঁদারা সংলগ্ন পান্থশালা । পঞ্চাশ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের জি টি রোডের পাশে যে কুয়ো ছিল আমরা তার সুগভীর ঠান্ডা জল খেয়ে আনন্দ লাভ করেছি । এখন লোকেরা সামান্য জমির আশায় বেশিরভাগ কুয়ো বুজিয়ে তার ওপর চাষবাস করেছে । আজকাল ক্বচিৎ এক-আধটা অবহেলিত কুয়ো জীর্ণ অবস্থায় দেখা যায় । কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে (এখন পাকিস্তানে) বেশিরভাগ কুয়ো সযত্নে ব্যবহৃত হচ্ছে আজও ।

আমরা জি টি রোড ছেড়ে রাঁচির পথ ধরলাম । অশোক ও আনন্দ সম্পর্কে জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো ভাই । ওদের আত্মীয়স্বজনের কাছে বিদায় নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল । রাঁচি খুব

ফাঁকা, অল্প লোকের বাস ছিল তখনকার দিনে । আমরা হিনুতে এক ক্লাববাড়িতে উঠলাম । অশোকদের মা-বাবার সঙ্গে আলাপ হল । তাঁরা অত্যন্ত ভদ্র কিন্তু প্রিয়জনকে হারাবার ভয়ে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন । অশোকের মা জানতে চাইলেন, আমার মা-বাবা আছেন কি না- তাঁরা কেমন করে আমার এই দুরন্ত আশায় মত দিয়েছেন । আমার মা-বাবা আমাকে নিরস্ত করার কথা বারবার বলে যখন ফল পেলেন না, তখন মা মনকে প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন । এমনকী আমার শুভ কামনা করে উৎসাহ দেবার চেষ্টায় একটা কবিতাও লিখেছিলেন । সে কবিতা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, কোথাও খুঁজে পাই না ।

যখন যাত্রার ক্ষণে বিদায় নিতে গেলাম, মা আমার বন্দুক এবং বেশভূষা দেখে বুঝলেন আমি বিরাট বিশ্বে কোথায় যে হারিয়ে যাব তার ঠিকানা নেই । আমাকে জড়িয়ে কী বলবার চেষ্টা করলেন- তারপর সংজ্ঞা হারালেন । সেদিন আমি নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি । একবার ইচ্ছা হয়েছিল আমার সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার, দেশ দেখার কামনা জলাঞ্জলি দিয়ে মাকে আশ্বাস দিয়ে বলি যে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে বাড়িতে রইলাম- কিন্তু পরমুহূর্তেই আমি নেশাগ্রস্ত হয়ে যে ভূতের পিছনে ছুটেছি সে আমার হুঁশ ফিরিয়ে দিল । ফেরা কিছুতেই হবে না ।

আমার সব কথা শুনে অশোকের মা হতাশার সুরে বললেন, মায়ের কষ্ট ছেলেরা বোঝে না, আমাদের কত বড় যাতনা ।

রাঁচি ছেড়ে আমরা আবার জি টি রোডের দিকে এগোলাম, পালামৌ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে । এদিকে কম লোক চলে- গাড়ি তো নেই । খয়ের গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে । এমন কোনও ছোট-বড় জন্তু-জানোয়ার ছিল না যাদের এই জঙ্গলে দেখা যেত না । বাঘ, হরিণ, নীলগাই আশপাশেই ঘুরত । সব মিলে জঙ্গলটা অপূর্ব সুন্দর দেখাত । রাত্রে ক্লান্ত হয়ে একটা ইনস্পেকশন বাংলোতে উঠলাম । সন্ধ্যা হবার আগেই চৌকিদার তার বাড়িতে চলে গিয়েছিল । দোর খুলে ভেতরে ঢুকতে খুব বেগ পেতে হয়নি । আমাদের সঙ্গে এসেটিলিন আলো ছিল । তার সাহায্যে একটা ঘর সাফ করে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যা খাবার ছিল তা শেষ করে শুয়ে পড়লাম ।

ঘরের সামনে যে উঠোন ছিল গভীর রাত্রে সেখানে এক ব্যাঘ্র মহাশয় আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন । আমরা দরজা ও জানলা একটু মজবুত করে আটকে চারজন চারদিকে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকলাম । বাঘ বাড়িটা প্রদক্ষিণ করল, কখনও কখনও দেওয়ালের ওপারে জানোয়ার এপারে আমরা । জানলার মধ্যে কোথাও ফাঁক খুঁজছিল বোধ হয়, আঁচড়ের শব্দে তাই মনে হল । একটু জোরে ধাক্কা মারলেই জানলার খিলসুদ্ধ উড়ে যেত । সৌভাগ্যক্রমে বাঘের সেরকম মতিগতি ছিল না, তবু একবার জানলার কাছে বাঘ

আসা মাত্র অশোক ০.৪৫ পিস্তল থেকে একটা গুলি ছুড়ল, কী সাংঘাতিক আওয়াজ। বাঘের কানে তালা লাগাবার মতো শব্দ। বাকি রাতটুকু আর আমাদের জ্বালাতন না করে বাঘ উঠোন দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। চাঁদনি রাতের আলোতে দেখলাম বাঘের পুরুষ্ট দেহটা। আওয়াজে ভয় পেয়ে সেখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয় মনে করেছিল। তবু আমাদের কারও ঘুম হল না। ভোরবেলায় চৌকিদার এসে হাজির। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল বাঘটার গুলি লেগেছে কিনা। আমরা ভয় পাওয়াবার জন্য আওয়াজ করেছিলাম শুনে বলল বাঘটা নাকি রোজ রাতে বাংলোয় বেড়াতে আসে। দিনেরবেলায় যখন সে দেখেছে তার কাছে তখন সম্বল মাত্র একটা লাঠি। মানুষখেকো নয় বোধহয়। খাবারের খোঁজেই টহল দিয়ে যায়।

আমরা চা খেয়ে রওনা হলাম জঙ্গলের পথ ধরে যতক্ষণ না আবার জি টি রোডে এসে পড়লাম।

শোন নদীতে রেললাইন ধরে ব্রিজের ওপর দিয়ে পার হলাম। সামনেই সাসারাম, ছোটখাটো শহর। বাঁদিকে জি টি রোডের সৃষ্টিকর্তা এবং পাঠান সম্রাট শেরশাহের স্মৃতিসৌধ। তার মধ্যে কবর রয়েছে অত্যন্ত অনাড়ম্বরে। এই সৌধটি একেবারে খাঁটি পাঠান রীতিতে গড়া এবং সেজন্য উত্তর ভারতের অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভের থেকে স্বতন্ত্র তার স্থাপত্য। সৌন্দর্যের চেয়ে গাম্ভীর্যের দিকে নজর বেশি।

বিহারের চওড়া রাস্তার দুপাশে ধান ও গম কাটা তখন হয়ে গিয়েছে। এই সময় কী পরিমাণ ব্ল্যাক বাক ও স্পটেড ডিয়ার দলে দলে দুধারে দেখা যেত, আজকের দিনে তা গল্পকথা বলে মনে হবে। সারস পাখিরা মাঠের ওপর খাবার খুঁজে খেত। এককেটা গাছভর্তি ফ্লেমিঙ্গো- কখনও কখনও হেরন পাখিও দেখা যেত। সারাটা রাস্তা জুড়ে অগণিত ঘুঘু দেখা যেত। তার কারণ গরুর গাড়ি ভর্তি চাল-ডাল-গম নিয়ে যাবার সময় ফুটো থলে দিয়ে বাইরে কিছু পড়ত। এখন ট্রাক যায় ভীষণ জোরে, তাছাড়া ট্রাকের কী ভিড়! এইরকম পশুপাখি সারা জি টি রোডে দেখতাম। উত্তরপ্রদেশে ময়ূর দেখেছি যেখানে সেখানে। কেউ তাদের মারত না- এত সুন্দর জীব বলে। আখের খেতের আশপাশে মস্ত বড় নীলগাই ও ময়ূর, হরিণও অনেক দেখেছি।

প্রতিপত্তিশালী অনেক বাঙালি তখন উত্তর ভারতবর্ষের সর্বত্র বসবাস করতেন। তাঁরা আমাদের খুব সমাদর করতেন। অবাঙালিদেরও উৎসাহ কম ছিল না। সবাই প্রশ্ন করতেন নানা ধরনের। একটি প্রশ্নের জবাবে বেশ বেগ পেতাম, সেটা হচ্ছে ‘অ্যাডভেঞ্চার’ করে, অনিশ্চয়তার মধ্যে দীর্ঘদিন কাটিয়ে যদি বা আমরা একযুগ পরে দেশে ফিরতে পারি তাহলে কী লাভ হবে? লাভের জন্য অ্যাডভেঞ্চার খুব কম লোকেই করে। খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ বরঞ্চ বলা যেতে পারে। তাছাড়া আমাদের দুটো উদ্দেশ্য

ছিল: ১) বাঙালি ভীতু নয় প্রমাণ করা, ২) যদি আমরা সফলকাম হই, তাহলে অসংখ্য তরুণ-তরুণী বিশ্বাস করবে যে কোনও কঠিন কাজই অসাধ্য নয়, দুঃসাধ্য হলেও। আমরা পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় নেমেছি যাতে আমাদের পরবর্তীরা অ্যাডভেঞ্চারের নামে আঁতকে না ওঠে, বরং আগ্রহান্বিত হয়ে এ-পথে পা বাড়ায়।

পৃথিবী ভ্রমণে বেরবার দুবছর আগে আমি হিমালয়ান এক্সপিডিশন, যেটা ১৯২৪ সালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ব্রুশ-এর নেতৃত্বে এভারেস্ট আরোহণ করতে চেষ্টা করেছিল, তাদের দলে ভিড়বার ইচ্ছা প্রকাশ করি। জেনারেল ব্রুশের কাছে চিঠিতে মনের কথাও লিখেছিলাম- তিনিও খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন।

দুই বছর পরে ১৯২৮ সালে যখন বিলাত পৌঁছলাম জেনারেল ব্রুশ এবং রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসবান্ড আমাকে নিমন্ত্রণ জানান আমার ভ্রমণকাহিনী বলবার জন্য। সেই সভায় অনেক বিখ্যাত পর্যটক ও এক্সপ্লোরারের সঙ্গে আলাপ হয়। পরে ফ্রান্সিস আমাকে ফেলোশিপ দেবার কথা ঘোষণা করলেন। সে অবশ্য অনেক পরের কথা।

আমরা জি টি রোড ধরে বেনারস পৌঁছবার সময় দেখলাম পণ্ডিত মালব্যের চেষ্টায় কী বিরাট ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠেছে।

বেনারসের পর চুনার দুর্গ দেখলাম। শুনেছি এটিও শেরশাহর তৈরি। এলাহাবাদে অনেকবার গিয়েছি তবু গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলটি মনোরম লাগে। যেমন বহুবার কাশী গিয়েছি, হাজার হাজার বছরের পুরনো অলিগলি-সম্বলিত শহরটি আমার কাছে চিরনতুন মনে হয়। এলাহাবাদ পার হয়ে দিল্লির পথ ধরলাম। রাস্তায় খুব ধুলো। বাঁদর এবং হনুমানের উপদ্রব ভীষণ। সাইকেল ও বন্দুক গাছে ঠেস দিয়ে একটু হয়তো বিশ্রাম করতে বসেছি- হঠাৎ বন্দুক ধরে টানতে টানতে একটা বাঁদর গাছে ওঠবার চেষ্টা করল, যথাসময়ে আমাদের দৃষ্টি পড়াতে আমরা সবাই মিলে তাড়া করলাম, ভয়ে তখন বন্দুক ফেলে চম্পট। আরও ভয় পাওয়াবার জন্য বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলাম। তখন মনে হল বানরকুল সবংশে সবাই যতদূর পারে পালাল।

এর আগে যখন সাইকেলে ভ্রমণ করতে এসেছি, তখন দিল্লিতে চাঁদনি চকের ওপর কোহিনূর হোটেলে উঠতাম। হোটেলটা ছিল মস্ত বড়। সেখানে একটা বড় ঘরের ভাড়া ছিল দৈনিক মাত্র এক টাকা। যতজন লোক থাকবে তাদের প্রত্যেককে একটা দড়ির চার-পাই দিত। খাওয়া-দাওয়া তেমনই সস্তা। আটআনা পয়সা দিয়ে হাতরুটি বা পরোটার সঙ্গে মাংস পেতাম যথেষ্ট।

দিল্লি বলতে তখন বোঝাত পুরনো দিল্লিই। নতুন দিল্লিতে তখন মাত্র কয়েকটা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। চারদিকে তখন চলেছে গড়ার পর্ব। স্যার এডুইন লুটিএনের বিরাট কীর্তি তখন নির্ণায়মান। দিল্লির সঙ্গে নতুন দিল্লির যোগসূত্রের জন্য মাত্র দুটো রাস্তা দেখেছি। পাঁচ মাইল পথ- লোকজন নেই, বাড়ি নেই, সন্ধ্যার পর শিয়ালের ঐকতান এবং ঝিঁঝি পোকার ডাক। কেউ সূর্যাস্তের পর সাহস করে ওই পথে চলাফেরা করত না।

আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল আইনের বড়কর্তা এস আর দাশের বাড়ি। তাঁর বড় ছেলে ধ্রুব আমার সমবয়সী বন্ধু ছিল। দুজনেই আমাকে খুব স্নেহ করতেন। দিল্লিতে আমরা যাব এই কথা জানাতেই তাঁদের কাছে থাকবার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম।

আলিগড়ের কাছাকাছি এসেছি, জি টি রোডের ধারে প্রায় দুশো গজ দূরে ১৪-১৫টা ব্ল্যাকবাক হরিণ মাঠের ওপর দাঁড়িয়েছিল। বন্দুক পাওয়ার পর থেকে তাদের ব্যবহার করবার জন্য হাত নিশপিশ করছিল। আনন্দ মুখার্জি অল্প সময়ের মধ্যে বন্দুকে কার্তুজ ভরে একটা হরিণ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। সেই হরিণ ছাড়া অন্যরা ভীষণ শব্দের চোটে লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গেল। আমরা মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে গেলাম হরিণ ধরবার জন্য। কিন্তু আমিই প্রথমে তার সামনে উপস্থিত হয়ে যা দেখলাম সে দৃশ্য মর্মন্তুদ। বন্দুকের গুলি হরিণের দুপাশ ভেদ করে মাটিতে পড়েছে। তখনও হরিণ চার পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মাথাটা কষ্টের সঙ্গে তুলে আমার দিকে দু-তিনবার তাকাল। বড় বড় সুন্দর সেই চোখে স্পষ্টই যেন বলল, আমাকে কেন মারলে? আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। ইতিমধ্যে আমার অন্য বন্ধুরা সেখানে এসে পড়ল এবং হরিণের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগে ধরে ফেলল। আমার আর কোনও উৎসাহ রইল না হরিণ ধরবার, সেই অনর্থক হত্যার কথা ভাবলে আজও কষ্ট হয়। রাত্রে মণীন্দ্র হরিণের মাংস রাঁধল, কিন্তু খাবার প্রবৃত্তি আমার রইল না, শরীর ভালো নেই অজুহাতে সারারাত কিছু খেলাম না। ঘুমোবার জন্য চোখ বুজতেই হরিণের বড় বড় এক জোড়া কালো চোখ আমাকে যেন বলতে লাগল- তুমি অপরাধী, তুমি খুনি।

সেই একদিনের ঘটনা থেকে আমার সারাজীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল। প্রকৃতির মধ্যে পশুপাখি যে কত সুন্দর তা বুঝতে শিখলাম। অনর্থক তাদের হত্যা করে লাভ কিছুই হয় না বরং মানসিক অবনতি ঘটে। ১৯২৬ সাল থেকে দীর্ঘকাল কেটে গেছে কিন্তু আর কোনও জানোয়ার কিংবা পাখির দিকে আমার বন্দুক তুলিনি। ছেলেবেলায় শিকারের গল্প ও জন্তুজগতের কথা পড়তে এবং শুনতে খুব আগ্রহ বোধ করতাম। কল্পনা করতাম একজন বিখ্যাত শিকারি হব- যেমন শখ ছিল আর্মিতে যোগ দিয়ে ক্যাপ্টেন হব। দুটো ভূতই আমার মাথা থেকে জন্মের মতো বিদায় নিয়েছিল পরে।

পরদিন আমরা নয়াদিল্লির রাজপথ ধরে সত্যরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বাড়ি পৌঁছলাম । আমাদের অভ্যর্থনার বহর দেখে বেশ কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । এস আর দাশ মহাশয় এত বেশি উৎসাহিত বোধ করছিলেন, আমাদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলেই টেলিফোন ধরলেন এবং ঘরোয়া নামে ভাইসরয় আরউইনকে ডেকে আমাদের সাহসের অনেক গুণগান করলেন, অগত্যা ভাইসরয় আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন দেখা করবার জন্য । ভারতবর্ষের সৈনিক শ্রেষ্ঠ স্যার উইলিয়াম বার্ডউডকেও দাশসাহেব আমাদের কথা বললেন । সোজা কথা- 'বিল, তুমি এই ছেলেদের নিমন্ত্রণ করে সমাদর ও উৎসাহ দেবে' । একেবারে হুকুম করার মতো- এমনই দাশ মহাশয়ের প্রতিপত্তি । আমাদের কাছে ফলং লাভং হল বলা চলে ।

দাশ মহাশয় পরদিনই আমাদের সঙ্গে নিয়ে ফরেন সেক্রেটারি স্যার জন হেস-এর কাছে গেলেন এবং পথে যাতে আমাদের নিগ্রহ না হয় বিদেশি গভর্নমেন্টের হাতে, সেজন্য সবরকম কাগজপত্র আমাদের দিতে বললেন । কপালে নিগ্রহ থাকলে কিন্তু এড়ানো যায় না যদিও সবকিছু ছাড়পত্রই সঙ্গে ছিল । সে পরের কথা । ফরেন সেক্রেটারি আমাদের খুব সাহায্য করলেন । কনস্তান্তিনোপল পর্যন্ত সব গভর্নমেন্টের কাছে এবং ব্রিটিশ রাজদূতের কাছেও চিঠি লিখে আমাদের কথা জানালেন যাতে আমরা পথে বাধা না পাই ।

দিল্লি ছেড়ে আমরা আলোয়ারের পথ ধরলাম । আলোয়ারের রাজার খুব পশুপাখির শখ । পায়ে শিকল দিয়ে তিনি তাদের দেখতে চাননি । বন-জঙ্গলে, মাঠে-দিঘিতে এবং খোলা আকাশের নিচে তিনি তাদের বসবাস করবার সুযোগ দেন । আফ্রিকা থেকে বড় সিংহ এনে কয়েকটা নিজের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিলেন । আমাদের কেউ সাবধান করে দেয়নি । একটা নদী পার হয়ে আলোয়ার 'স্টেট'-এ ঢোকবার মুখেই হঠাৎ নজরে পড়ল অদূরে এক সিংহ ও সিংহী পাশাপাশি বসে । ভাগ্যে আমাদের উল্টোদিকে তাদের মুখ ছিল । আমরা পিস্তল খুলে একটা ভাঙা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম । অনেকক্ষণ পরে আমরা বেরতে পারলাম । সাইকেল চড়ে প্রাসাদের দিকে এগোতে আরম্ভ করলাম । মুগ্ধ হলাম পথে নানারকমের এত পাখি দেখে ।

রাত্রে বিরাট ভোজ । রাজা জানালেন যে, দিগ-এর রাজা আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন পরদিন । এইরকমভাবে আমরা কত ভারতীয় রাজন্যবর্গের সাদর নিমন্ত্রণ পেয়েছি এবং অনেক ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য দেখেছি, তার হিসাব মস্ত বড় হয়ে যাবে । অনেকে নাচ ও উচ্চ ধরনের গানের মজলিশ করে, ভোজ দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করেছেন । রাজাদের ওপর খবরদারি করবার জন্য দিল্লিতে এক অধিকর্তা সাহেব আছেন তিনি এক সার্কুলার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন রাজপুতানা এবং মধ্য ভারতের রাজাদের আমাদের আগমনবার্তা । রাজারা খুব খুশি হয়ে তাতে সাড়া দিয়েছিলেন । সবই ছিল দাশ মহাশয়ের কীর্তি ।

জয়পুর শহর খুব সুন্দর লাগল। জয়পুর অম্বর অতুলনীয়। রাজা তখন নাবালক, মাত্র চোদ্দ বছর বয়স। যোধপুরের রাজকুমারীর সঙ্গে তিনি বাগদত্ত ছিলেন। খুব সম্ভব জন্মাবার আগেই জয়পুরের রাজার বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল- স্ত্রী চোদ্দ বছরের বড়। এক বাঙালি ভদ্রলোক এস এম ব্যানার্জি আই সি এস জয়পুরের রাজার লেখাপড়া, খেলাধুলা এবং স্বাস্থ্যের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিকালে রাজার সঙ্গে পরিচয় হল। ব্যানার্জিসাহেব আমাদের নিয়ে খেলার মাঠে চললেন ক্রিকেট খেলা শেখাবার জন্য। ক্রিকেট খেলা শেষ হবার পরই দুটো বড় বড় ঘোড়াকে আসতে দেখলাম মাঠের ধারে। রাজা ও তাঁর অভিভাবক ব্যানার্জিসাহেব ঘোড়ায় উঠলেন- উদ্দেশ্য রাজাকে একজন পাকা ঘোড়সওয়ার তৈরি করা। এই সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, জয়পুরের রাজা পরে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পোলো খেলোয়াড় বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। উত্তরকালে তিনি তাঁর ঘোড়া ও খেলোয়াড়ের দল নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলায় ইংল্যান্ডে র্যানেলা মাঠে সব জাতিকে পরাস্ত করে খুব প্রশংসিত হন। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় পোলোর দল নিয়ে সবাইকে হারিয়ে দেন। তিনি আমৃত্যু ঘোড়সওয়ারশ্রেষ্ঠ নামে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। খুব স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিলেন, পুরোদস্তর স্পোর্টসম্যান। অনেক বছর পরে আমি বহুবার পোলো খেলার কৃতিত্বের জন্য জয়পুরের রাজাকে অভিনন্দন জানিয়েছি। পৃথিবীর নানা জায়গায় হঠাৎ দেখা হয়েছে কিন্তু সেই ছেলেবেলার প্রথম পরিচয় ভোলেননি। গায়ত্রী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হবার পর রাজার সঙ্গে আর দেখা করিনি যদিও প্রতিবছর শীতকালে গড়ের মাঠে তাঁর পোলো খেলা দেখবার উৎসাহ কোনওদিন কমেনি। কলকাতায় এজরা কাপ বহুবার তিনি জয় করেছেন।

আগেই বলেছি যে বাঙালি উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বলে ওই সময়ে নেটিভ স্টেট তথা সারা ভারতবর্ষে সম্মানিত ও আদৃত হত। অনেক দেওয়ান এবং মন্ত্রী বাঙালি ছিলেন। জয়পুরের রাজার অর্থমন্ত্রী ছিলেন সুবিখ্যাত পণ্ডিত এবং আমার পাড়ার সহবাসী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এক পুত্র। তিনি আমাদের খুব সমাদর করলেন এবং জয়পুরের দ্রষ্টব্যস্থানে নিয়ে গেলেন।

প্রসঙ্গত, পটলডাঙা স্ট্রীটে আমাদের বাড়ির খুব কাছে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ি ছিল। চিৎপুর থেকে হেঁটে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে আসতেন আলোচনা করতে। রবীন্দ্রনাথের মতো রূপবান একজন পুরুষ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কয়েকমাস পরেই দেখলাম কবিকে 'বিসর্জন'-এ জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতে। ভালো করে দেখার সুযোগ হল- যেমন সুপুরুষ তেমনই সু-অভিনেতা।

রাজাদের মধ্যে অনেক খামখেয়ালি লোক দেখেছি । গোয়ালিয়রের রাজাও তখন নাবালক । তিনি এবং তাঁর বোনের (বয়স ১৪) মত হল, সাইকেল চড়া শিখে আমাদের সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়া । যে কথা সেই কাজ । আমাদের দুখানা সাইকেল কতবার পড়ল আর উঠল তার ঠিক নেই, সাইকেলের দুর্দশা দেখে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল । হঠাৎ একবার সাইকেল থেকে বে-কায়দায় পড়ে গিয়ে রাজার পায়ে আঘাত লাগল । খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের কাছে এসে বলল, আমরা যদি একমাস গোয়ালিয়রের রাজঅতিথি হয়ে থাকি তবে সাইকেল চড়া রপ্ত করে আমাদের সঙ্গ নিতে পারবে । আমরা গলদঘর্ম হয়ে গেলাম বোঝাতে যে ভূপর্যটন খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার । রাজারও তেমনি জিদ । কতরকম কষ্টের সম্মুখীন আমরা হতে পারি তার একটা যথাযথ হিসেব চাই । এইরকম প্রশ্নের উত্তর কেউই দিতে পারে না । ভাগ্য ভালো, এমন সময় একজন লোক এল মনে করিয়ে দিতে যে রাজার অভিভাবক এবং দেওয়ান মিস্টার এইচ এন হাকসারের বাড়ি যেতে হবে, চায়ের নিমন্ত্রণ আছে । আমরাও রেহাই পেলাম । সাইকেলে মিস্টার হাকসারের বাড়ি গেলাম । ইনি একজন উচ্চশিক্ষিত কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ । বাড়ির মেয়েদের সবাইকে ডাকলেন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে । এঁদের মধ্যে পর্দার বালাই নেই । চায়ের পালা শেষ হলে আমাদের ভ্রমণকাহিনী শুরু হল । তারপর আলোচনা চলল এবং শেষপর্যন্ত মিস্টার হাকসার বললেন যে আমরা রাত্রের ভোজন সেরে যেন আরেকটু বেশি সময় তাঁদের সঙ্গে কাটাই । একেবারে ঘরোয়া আত্মীয়ভাবে আমাদের অনেক গল্প হল । আমরাও দেশটাকে জানবার জন্য কত জিনিস জানতে চাইলাম । মিঃ হাকসার কখনও পুত্রবধূকে কখনও মেয়েদের প্রশ্ন করে কখনও বা নিজে সব জবাব দিলেন ।

আমরা অনুরোধ জানালাম কাশ্মীরি গান শোনাবার জন্য । মেয়েরা চমৎকার গাইলেন । মিষ্টি গলায় মনে হচ্ছিল বাংলা গান শুনছি । এক মেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বাঙালিদের শোনাবার সাহস তখনও হয়নি । সর্বশেষে আমরা মিঃ হাকসারকে রাজার সাইকেল চড়া শেখা ও আমাদের সঙ্গে ভ্রমণে যাবার মতলব জানিয়ে তাঁকে নিরস্ত করবার অনুরোধ জানালাম ।

পরদিন রাজা আমাদের একটা সাইকেল নিয়ে টানাটানি করে আবার আছাড় খেলেন । উঠে দেখলেন সামনে মিঃ হাকসার দাঁড়িয়ে । ব্যস ওইখানেই বেচারির সব জিদ থমকে দাঁড়াল । রাজাকে ঘরে নিয়ে যাবার সময় আমরা জানালাম যে পরদিন ভোরে রওনা হব । অনেক সকালেই রাজা এসে হাজির- সঙ্গে অনেক ফল ও খাবার পথের জন্য দুহাতে নিয়ে আমাদের দিল । আমরা অনেক শুভেচ্ছা নিয়ে সাইকেলে ওঠবার আগে করমর্দন করতে গিয়ে দেখি রাজার মুখ ভারাক্রান্ত । রাজার বোন কমলা দেবীও সাইকেল চড়া শিখছিলেন । তিনিও আমাদের ফল খেতে দিলেন ।

প্রথমেই আমরা গোয়ালিয়র ফোর্ট দেখতে গিয়েছিলাম। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ওই দুর্গ অনেকবার সিন্ধিয়ার নাম রেখেছে।

ঝাঁসির রানির বীরত্বের জন্য আমরা তাঁর প্রতি খুবই সশ্রদ্ধ ছিলাম। ঝাঁসিতে যাওয়া ঠিক হল, যখন অত কাছেই এসে পড়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই বীর নারীর স্থান খুবই উঁচুতে। এখানেও দুর্গ দেখতে বেরোলাম। উঠেছিলাম ডাকবাংলোয়।

দুর্গ আর অন্যান্য স্থান দেখে পায়ে হেঁটে দুপুরে আমরা ডাকবাংলোয় পৌঁছলাম। প্রথমেই নজরে পড়ল এক স্বাস্থ্যবতী তরুণী আমাদের সাইকেলগুলো মুগ্ধ হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। তার নিজের হাতেও সাইকেল ছিল (পুরুষদের চড়বার উপযুক্ত)। আমাদের দেখে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিলেন। করাচি থেকে দিল্লি হয়ে আমাদের ধাওয়া করে এসেছে। শেষকালে ঝাঁসিতে দেখা হল। ভদ্রমহিলার সঙ্গে ছোট্ট একটা বাক্স ও কিছু জামাকাপড়। পরনে শর্টস ও ব্লাউজ। দেখতে সুশ্রী ও যথার্থ স্পোর্টস উওম্যান।

আমাদের সঙ্গে দেখা করবার এত আগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। স্পষ্ট জবাব পেলাম- তোমাদের সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণে যাব। পাসপোর্ট পর্যন্ত তৈরি, বীর রমণী সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা মোলায়েম অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে জানালাম যে সেটা মোটেই সম্ভব নয়। তখন মিস পিন্টোর বয়স ২১-এর বেশি নয়। আমাদের চেয়ে দুয়েক বছরের ছোট। সে বোঝাল আমাদের সে কত কষ্ট করে দিল্লি থেকে খোঁজ নিতে নিতে অবশেষে এখানে দেখা পেয়েছে। এটা তার মনের দৃঢ়তার ও শারীরিক শক্তির পরিচয় নয় কি?

অনেক খাবার ছিল সঙ্গে। দুপুরে তাকে খাবার নিমন্ত্রণ করলাম। মিস পিন্টোর আবার সেই অনুরোধ যে আমাদের সঙ্গ নেবে। সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। ভালো করে বোঝালাম কিন্তু সে কথা কে শোনে! অবশেষে বলতে বাধ্য হলাম যে একজন সুন্দরী তরুণী নিয়ে আমরা পৃথিবী ভ্রমণে নারাজ। অনেক তর্ক-বিতর্ক হল কিন্তু তাতে ফললাভ হল না। একটু কম ভালো দেখতে হলেও বা চিন্তা করা যেত। এমন দীর্ঘাঙ্গী স্বল্পবসনা সুন্দরীকে সামলাবে কে? শেষকালে আমাদের মধ্যেই বন্ধু-বিচ্ছেদের কারণ হবে, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ মিস পিন্টো তার সাইকেলটায় চড়ে বলল 'তোমাদের সঙ্গ ছাড়াই আমি একদিন পৃথিবী ভ্রমণে যাবই। তোমাদের সাহসের অভাব দেখে আমি অবাক! তবু আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গুড বাই অ্যান্ড গুড লাক।'

সারা দুপুরবেলা সাইকেল চালিয়ে সন্ধ্যারাত্রে 'দিগ'-এর রাজার এলাকায় পৌঁছলাম। একদিন এখানে থাকবার আমন্ত্রণ ছিল। দুদিন পরে ভরতপুরে যাবার কথা, ভরতপুরে খুব

ঘটা হয় শ্রীপঞ্চমীর দিনে । আমরা ছাড়া বিরাট জনসমাবেশ হলুদ রঙে ছাপানো চোগা চাপকান, চুড়িদার, শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি পরে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল । ভরতপুরের রাজা আমাদের চারজনকে দুপাশে নিয়ে সভায় উপস্থিত হলেন । স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম ছিল যদিও এই দেশে পর্দানশীন নন মেয়েরা ।

এইদিনে প্রজারা বিশেষ করে আনুগত্য স্বীকার করতে আসে এবং রাজাকে অনেক নজরানা দেয় । দুপুরে ভূরিভোজ । বিকাল চারটের সময় রাজার সঙ্গে শিকারে যাবার কথা দিয়েছি । রাত্রের ভোজন নাকি জঙ্গলের মধ্যে অদ্ভুত পরিবেশে হবে । ভরতপুর শহর ছেড়ে ছ-টা মোটরগাড়ি ভর্তি শিকারিদের সঙ্গে আমরা রওনা হলাম । জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি চলেছে । অনেক গাছ কেটে পরিষ্কার পথ তৈরি হয়েছে যাতে মোটরগাড়ি চড়ে রাজা ৩৩ মাইল দূরে শিকার করবার বাড়িতে উপস্থিত হতে পারেন । শিকারে আবার বাড়ির কী দরকার এই কথা মনে মনে ভাবছি, এমন সময় দেখি জঙ্গলের একদিক হ্যাজাকের আলোয় আলোকিত । ছোট-বড় তাঁবু দিয়ে একটা গোটা গ্রাম তৈরি । বিরাট একটা তাঁবুর ভেতরে গেলাম । শিকার উৎসবে শ্রীপঞ্চমীর দিন রাত্রে বহুলোক এই জঙ্গলের ভেতর গাড়ি কিংবা ঘোড়া কিংবা উটের ওপর চড়ে আসে । রাজা ও অমাত্যগণ এবং আমরা যথাস্থানে বসলাম । রাজা হুকুম দিলেন নাচ-গান শুরু হোক । সুরা ভরা পাত্র সভাস্থ সবাইকে বিতরণ করা হল ।

একজন সুন্দরী নৃত্যতারকা সভার মাঝখানে এসে রাজাকে অভিবাদন করে নাচ শুরু করল । তখনকার দিনে রাজাদের চিত্তবিনোদনের জন্য বাঈজী ও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুবাদক রাখা হত । গানের সঙ্গে বাঈজী ঘাগরা উড়িয়ে নাচ শুরু করলে সবাই 'আহা' 'আহা' রবে উল্লাস প্রকাশ করলেন ।

আমরা ভাবছিলাম এ আবার কীরকম শিকার!

রাত এগারোটার সময় অভাবনীয় ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল । বুনো শুয়োরের মাংস ঝলসে খাওয়া রাজপুতদের মধ্যে খুব প্রচলিত । আমাদের কাছেও তা খুব মুখরোচক মনে হল । খাওয়া শেষ হলে মধ্যরাত্রে রাজা কয়েকজন শিকারি ও আমাদের নিয়ে একটা বাড়িতে গেলেন । বাড়ির ভেতর ঢোকার পর সুড়ঙ্গপথ ধরে একটা উপত্যকার দিকে নামতে আরম্ভ করলাম । সুড়ঙ্গের শেষে একটা গুপ্তঘর । সেখান থেকে দেখলাম একটা জংলী পথের ধারে ছোট একটা কুঁড়েঘর । তার সামনে একটা মাঝারি বয়সের মোষ শক্ত করে বাঁধা একটা খোঁটার সঙ্গে । কুঁড়েঘরের সামনে জ্বলছে একটা লণ্ঠন । ঘণ্টাখানেক নিঃশব্দে অপেক্ষা করার পর, সেই স্বল্পালোকে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড বাঘ উপস্থিত হয়েছে । মোষ বুঝতে পেরেছে সামনে কালান্তক যম এসেছে । সে দড়ি ছিঁড়ে পালাবার কত চেষ্টা করল- কতবার উঠল ও পড়ল তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু দড়ি ছিঁড়ল না । বাঘ বসে মজা

দেখছিল । এমন সময় রাজা ও তাঁর মন্ত্রী দুজনেই বন্দুক উঠিয়ে গুলি করলেন । বাঘের মোক্ষম লেগেছিল, সে ১০ ফুট উঁচুতে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল । মন্ত্রীমশায় বাঙালি এবং ভালো শিকারি । গুলি ছুড়েই তিনি রাজাকে অভিনন্দন জানালেন যে তাঁর কার্তুজ অব্যর্থ-সন্ধানী ছিল । এই বাঘ রাজা শিকার করেছেন- মন্ত্রীমশায় জোর গলায় সমবেত জনগণকে জানালেন । সবাই বলল, রাজাসাহেব বীরপুরুষ । কার গুলিতে বাঘ মরল আর কে বাহাদুরি পেল, সে কথা ভালোই বুঝলাম ।

পরদিন মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে প্রাসাদে ফিরলাম । ভদ্রলোক নিজের নামটা ছোট করে ওই দেশের উপযুক্ত করে নিয়েছিলেন ‘তারাচাঁদ’ । আসলে তারকচন্দ্র চৌধুরী । বহু শিকারের গল্প বলে তিনি আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন- অদ্ভুত সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেলাম । সব দেশীয় রাজন্যবর্গ চাইতেন শিকারের সময় যেন তারাচাঁদজি পাশে থাকেন । ‘তারাচাঁদ’ রাজার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক সঙ্গে গুলি ছুড়তেন এবং তার পরই ঘোষণা করতেন ‘রাজার গুলি একেবারে অব্যর্থ-সন্ধান’ । রাজারা নিশ্চয় বুঝতেন তারাচাঁদ কত উঁচুদরের শিকারি । তিনি বাহবা দেন অন্যদের আসলে যেটা তাঁরই প্রাপ্য ।

তারপর আরও দুজন রাজার আমন্ত্রণ রাখতে দুঙ্গারগড় ও প্রতাপগড়ে গেলাম । অত আরামের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল আমাদের- আমরা তো এরকম জীবন কাটানোর জন্য পৃথিবী ভ্রমণে বেরোইনি! তাই ঠিক করলাম যে আমরা ‘থর ও পার্কার’ মরুভূমিতে বালির দেশে চলার হাতেখড়ি নেব । ইন্দোরের রাজা হোলকার একজন বড় স্পোর্টসম্যান । তিনি তাঁর কাছে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু আমরা আরও দক্ষিণে যেতে অনিচ্ছুক । ধন্যবাদ জানিয়ে তাই রওনা হলাম যোধপুরের দিকে । পথে কত ময়ূর দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই । ময়ূর মারা নিষিদ্ধ বলে এরা নির্ভয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়ায় । খুব সুন্দর পাখি, যেখানেই থাকুক সব জায়গাটা আলোকিত করে রাখে ।

আজমিরের পথে চলেছি । আজমিরে অবস্থিত এক ইংরেজ রেসিডেন্ট, কর্নেল ডসন-এর ওপর তখন এদিকের রাজপুত রাজাদের ওপর খবরদারি বা সর্দারির ভার । সবাই চায় কর্নেলকে খুশি করতে । ভূরি ভূরি উপহার ও ভেট তাঁর বাড়ি নিত্য পৌঁছয় । এহেন কর্নেলের কাছ থেকে ডাক এল চায়ের আসরে যোগ দেওয়ার । রেসিডেন্টের বাড়িটা একটা টিলার ওপর- একেবারে আনাসাগর হ্রদের গায়ে লাগোয়া । বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালেই নিচে লেকের জল বহুদূর দেখা যেত । অদূরে পাহাড় এবং সামনের দিকের পথটা পুষ্কর তীর্থের পাঁচ মাইল দূরে অদৃশ্য ।

কর্নেল ডসন আমাদের প্রতি খুব সৌজন্যপূর্ণ ভদ্র ব্যবহার করলেন । ফরেন অফিস থেকে নাকি কর্নেলের ওপর নির্দেশ এসেছে আমাদের খবরাখবর নেওয়ার এবং যাতে সর্বত্র বিনা বাধায় যেতে পারি তার ব্যবস্থা করার । আমাদের এপর্যন্ত কোনও অসুবিধা

হয়নি তাই কর্নেলকে ধন্যবাদ দিয়ে রওনা হলাম । তবু কর্নেল যোধপুরের রাজাকে টেলিফোনে নির্দেশ দিলেন যাতে তাঁর রাজ্যে আমাদের যথেষ্ট সমাদর হয় । আজমিরে দুটো সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্যস্থান- হিন্দুদের পুষ্করতীর্থ এবং মুসলমানদের চিস্তির দরগা । ভারতবর্ষে ধর্মের জন্য যেখানে যত তীর্থস্থান আছে তার বেশিরভাগ জায়গায় ভিড় ও নোংরামি দেখা যায় । তা সত্ত্বেও দূর থেকে পুষ্কর-হ্রদটি পোস্টকার্ডের ছবির মতো সুন্দর দেখায় । লেকের সমচতুষ্কোণ জলের পাড় । তার ওপরেই সারি সারি পাকাবাড়ি । জলের মাঝখানে একটা ছোট্ট মন্দির । তার ওপরে এবং আশপাশে কুমির শুয়ে আছে । লেকের পূতিগন্ধময় জলে সবাই স্নান করে অক্ষয় স্বর্গলাভের রাস্তা পরিষ্কার করে । হ্রদের জল বেরোবার কোনও পথ নেই, শুধু বৃষ্টির জল যেটুকু তাতে ধরে । সর্বত্র চারদিকের বাড়ি থেকেও ময়লা জল লেকে পড়ে । জলের রং ঘন সবুজ বিষের মতো ।

দরগায় গেলাম । এখানে বিশেষ বিশেষ দিনে হাজার হাজার লোককে খাওয়ানো হয় । রাঁধবার বন্দোবস্ত দেখলে মনে হয় এক কড়া ঘি-ভাত দিয়ে পাঁচশো লোক খাওয়ানো যায় । এইরকম কয়েকটি ৭-৮ ফুট উঁচু কড়া এবং রাঁধবার বন্দোবস্ত দরগার মধ্যেই রয়েছে ।

এখানেও দরগার বাইরে দেখলাম চারপাশে ভিখারি, দোকান, সরু-সরু রাস্তায় লোকের ভিড় ও যথেষ্ট নোংরা ।

এরপর উদয়পুর । খুব সুন্দর শহর । বড় বড় লেক, অদূরে পাহাড় একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে । উদয়পুর ঐতিহাসিক শহর । লেকের মাঝখানে একটি দ্বীপ আছে, তার ওপর একটি একতলা প্রাসাদ । বোটে চড়ে সেখানে বেড়াতে গেলাম । গরমের দিনে বেশ আরামের জায়গা- অবশ্য সাধারণের জন্য নয় । উদয়পুরের রানারা অর্থাৎ রাজারা রাজপুতদের মধ্যে আভিজাত্যে সবচেয়ে বড় ।

তারপর আমরা বহু ঈপ্সিত চিতোরগড় দুর্গ দেখতে গেলাম । এরকম দুর্গ বিস্ময়কর মনে হয়, যেমন বড় তেমনই সুদৃঢ় তার গাঁথনি । বড় বড় যুদ্ধের বেশিরভাগ নিষ্পত্তি হয়েছে এখানেই ।

পলাশীর মিরজাফর অন্যত্রও আত্মপ্রকাশ করেছিল অন্য নামে । চিতোরের দুর্গও এক বিশ্বাসঘাতকের প্ররোচনায় ধ্বংস হয়েছিল । এই দুর্গের ভেতর আজও পদ্মিনীকে আলাউদ্দিন খিলজি যেখানে দেখেছিলেন, সেই জায়গাটি সাধারণকে দেখানো হয় - সত্য-মিথ্যা কিছুই বলতে পারব না ।

চিতোরগড়ের প্রকাণ্ড উঁচু বিজয়স্তম্ভ সগৌরবে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে । কুতুবমিনারের মতো এটি একটি আদিম স্কাইস্ক্র্যাপার ।

চিতোর ছেড়ে যোধপুরের পথ ধরলাম । যোধপুরের পর থেকেই মরুভূমি রীতিমতো আরম্ভ হয়েছে । যোধপুর জয়পুরের রাজার শ্বশুরবাড়ি । অভিভাবক ও প্রধানমন্ত্রী মিঃ এস এন ব্যানার্জি আই সি এস আগে থেকেই যোধপুরের রাজাকে আমাদের কথা লিখেছিলেন । কাজেই আমরা রাজঅতিথি হয়ে থাকলাম । তখন ইংরেজ পাইলটদের তালিম দেওয়া হত । তারা রাজার ‘গেস্টহাউস’ অধিকার করেছিল । রাজা আমাদের নিয়ে পাইলটদের সঙ্গে আলাপ করাতে গেলেন । বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন যে এই চারজন ভারতীয় সাইকেলে বিলাত যাবে, এমনকী পৃথিবী ভ্রমণও করবে । পাইলটরা সবাই ভদ্র এবং রাজার প্রতি খুবই সশ্রদ্ধ । দেখলেই মনে হত যে তাঁরা ভদ্রসন্তান । খুব উৎসাহ করে আমাদের সঙ্গে আলাপ করল । অনেকে বলল যে বিলাতে তাঁদের বাড়িতে চিঠি নিয়ে যেতে । যখন শুনল যে বিলাত পৌঁছতে আমাদের কমপক্ষে দুই বছর লাগবে তখন নিরস্ত হল ।

পরদিন যোধপুর ছেড়ে আধ মাইল যাবার পর লুনির দিকে চললাম । তখন সাইকেল চড়া সম্ভব ছিল না । বালি আর বালির পাহাড় । অতি কষ্টে সেই পাহাড়ে ওঠবার ঠিক শেষ মুহূর্তে পায়ের নিচ থেকে বালি সরে যেত- আমরা যেখান থেকে চড়তে আরম্ভ করেছিলাম আবার সেখানেই নেমে যেতাম । এইরকম ভাবে বৃথা পরিশ্রমে শারীরিক ক্লেশ যেমন বাড়ত তেমনই সময়ও নষ্ট হত!

শুনেছি থর মরুভূমি পৃথিবীর আর দুটি মরুভূমির সমান কষ্টকর- সাহারা ও কালাহারি (আফ্রিকায়) । তাছাড়া আরও কত ছোট-বড় মরুভূমি আমাদের পার হতে হবে, তার জন্য স্বদেশেই অভিজ্ঞতা আহরণ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল । বালির ওপর দিয়ে হাতে সাইকেল টানতে টানতে চলতে খুবই ক্লান্তি বোধ করতাম- অথচ এগোতে পারতাম সারাদিনে বড়জোর ৭-৮ মাইল । শীতকাল বলে সেরকম জল পিপাসা বোধ করতাম না যেমন গরমের দিনে সবাই করে । এই মরুভূমির ওপর দিয়ে সিন্ধুদেশের হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন গেছে । বালিতে প্রায়ই রেললাইন ঢাকা পড়ে যায় । বালির ঝড়ের মুখে পড়লে ট্রেন পর্যন্ত বালিতে ভরে যায় । বালি সাফ করবার আলাদা ইঞ্জিন । তারা লাইন পরিষ্কার করে দিলে তবেই ট্রেন আবার চলতে পারে । যেমন বরফের জন্য পথঘাট রেললাইন পশ্চিমদেশে যখন ভরে যায় । তখন বরফকাটা ইঞ্জিন রাস্তা ও রেললাইন পরিষ্কার করে দিলে তবে যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত হয় ।

দিক ঠিক রাখার জন্য এবং জল ও খাবার সরবরাহ ঠিক রাখতে আমরা রেললাইন যতদূর সম্ভব দূর থেকে অথচ দৃষ্টির মধ্যে রেখেই এগোতাম । স্টেশনে পুরি এবং আলু-শাক পেতাম । কখনও কখনও বালির মধ্যে বুনো তরমুজ পেয়েছি । তা দিয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি করেছি । পথে বারমের এবং মিরপুরখাস পড়ল ।

যখন মনে মনে ভাবছি যে মরুভূমি কী ভীষণ কষ্টকর জায়গা; আস্তে আস্তে এগিয়েছি এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে বোধ করছি, এমন সময় দুমাস পরে একদিন দেখলাম পশ্চিম দিগন্তে দুয়েকটা গাছ দেখা গেল । এই জায়গাটার নাম 'ছোড়' অর্থাৎ বালির কবল থেকে মুক্ত । তারপর হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) শহরে পৌঁছলাম । এখানে সব বাড়ির ওপর বাতাস ধরার ব্যবস্থা আছে । এইরকমটা আর কোথাও দেখিনি । অনেকদিন পরে ভালো করে স্নান করে তৃপ্তি বোধ করলাম ।

মরুভূমির বিশেষত্ব হল যে দিনেরবেলায় যেমন গরম রাত্রে তেমনই ঠান্ডা, কম্বল জড়িয়ে বালির গরমের মধ্যে কিছুটা আরাম পেতাম রাত দশটা পর্যন্ত, তারপর গরম জামা-কাপড় পরে শুতে হত ।

২

হায়দ্রাবাদে দুদিন কাটিয়ে আমরা পথ ধরলাম করাচির । মোটামুটি চলবার রাস্তাই পেলাম । এদিকে বাবলা গাছ, ঝাউ ও ইউক্যালিপ্টাস যথেষ্ট । বাবলার কাঁটা আমাদের অস্থির করে তুলল । একটু পর পর টায়ার অর্থাৎ টিউব ফুটো হয়ে যেত এবং না সারিয়ে সাইকেল চড়া সম্ভব নয় বলে ধৈর্য ধরে টিউব সারাতে লেগে যেতাম ।

ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আমরা সিন্ধুনদ বা ইন্ডাস-এর বিস্তীর্ণ জলরাশির সামনে পড়লাম । তবে কোনও নৌকো দেখতে পেলাম না । কেমন করে বিশাল নদী পার হব ভাবছি, এমন সময় দূরে রেলওয়ে ব্রিজ দেখলাম । সেদিকে এগোতে লাগলাম নদীর পাড় ধরে । ব্রিজটা কেবলমাত্র রেলগাড়ি পারাপার করে - স্লিপারের মাঝখানে ফাঁক । মানুষের চলার পথ ছিল না । দুটো লাইন ছিল ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি নয় বলে ট্রেন এসে পড়লে রক্ষা ছিল না । এইরকম বিপদের সম্ভাবনা দেখেও কেমন করে সাহস হল জানি না, আমরা সাইকেল কাঁধে নিয়ে স্লিপারের ওপর দিয়ে এগোতে আরম্ভ করলাম । প্রায় আধ মাইল অতি কষ্টে চলার পর মনে হচ্ছিল স্লিপারের মাঝের ফাঁকে বোধহয় পা পড়বে তারপর নিচে ঘূর্ণায়মান নদীর জলে সব শেষ!

নিচের দিকে চাইতেই হচ্ছিল কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আমাদের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে । খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম সাইকেলটা দুটো স্লিপারের সংযোগস্থলে রেখে । তার ফলে সুস্থ বোধ করলাম কিছুটা । ভারের বোঝায় বোধহয় আমাদের মাথায় রক্তের চাপ সৃষ্টি করেছিল । কোনও ট্রেন ওই লাইনে এলে আমাদের অনিবার্য মৃত্যু অথচ সেই অফুরন্ত ব্রিজের শেষ নেই । অন্যপার বহুদূর । আবার বোঝা তুলে চলতে আরম্ভ করলাম । অতিকষ্টে দীর্ঘ সেতু পার হলাম, তারপর একসময় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম । ভাগ্য ভালো প্রায় দুই ঘণ্টা কোনও ট্রেন আসেনি আমাদের পথে । এলে কী করতাম! পৃথিবী ভ্রমণের ওইখানেই ইতি হয়ে যেত । আমাদের উচিত ছিল নৌকোর জন্য বসে থাকা ।

ওপারে অদূরে করাচি শহর । তখনকার করাচি পরিষ্কার চকচকে, ঝকঝকে চওড়া রাস্তা ও দোকান দিয়ে সাজানো ছিল । তবে এখনকার মতো শহর অত বড়-বড় ছিল না আর অত নোংরাও ছিল না । করাচিতে তখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ এয়ারপোর্ট ছিল । এখন তা পাকিস্তানের অন্তর্গত । আমরা নিমন্ত্রণ পেলাম মিঃ এ সি চ্যাটার্জির বাড়িতে ওঠার । সে

বাড়ি থেকে সমুদ্র দেখা যেত। আমাদের করাচি যাবার উদ্দেশ্য ছিল, যেখান থেকে জাহাজ নিয়ে ইরান বা ইরাকের বন্দরে পৌঁছনো।

চারদিন অপেক্ষা করার পর বি আই কোম্পানির জাহাজ পেলাম। ডেক প্যাসেঞ্জার হিসাবে যাব আর তার পরিবর্তে আমরা জাহাজ সাফ করব ও যাতে সবাই খাবার ঠিকমতো পায় সেদিকে সাহায্য করব। ডেকের ওপর আমরা সব শুয়ে থাকতাম। আমার বিছানা আড়াই ফুট চওড়া ও সাড়ে ৬ ফুট লম্বা। আমার ডাইনে-বাঁয়ে থাকত অন্য লোকেরা। বিছানা বলতে একটা ক্যানভাসের টুকরো মাত্র।

খাবার মধ্যে ছিল দুবেলা থালাভর্তি ভাত ও ঝাল তরকারি। জাহাজ থামল বাসরা বন্দরে। প্রথম মহাযুদ্ধে এখানে অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ায় তখন ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টের অনেক বাঙালি যুদ্ধের পর বাড়ি ফিরে না গিয়ে এদেশেই বসবাস করছিলেন। তাছাড়া অনেক বাঙালি এসেছিলেন বাসরা বন্দর থেকে ঐতিহাসিক বাগদাদ পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ নিয়ে। কয়েকজন আবার আরব দেশের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরসংসার পেতেছেন দেখলাম। এইরকম বাঙালি ও আরবি বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে খুব আদর-যত্ন পেয়েছি। অনেক আরবি স্ত্রী, বাংলা ধরনের রান্না শিখেছেন যা আমরা তারিফ করেছি খুবই। এঁদের বেশভূষা আরবি ধরনের, তবে পর্দার কোনও বালাই নেই। সবার রং খুব ফর্সা। যারা রোদে পুড়ে সবসময় কাজ করে বা খেটে খায় তারা অবশ্য মিশকালো। মধ্যবিত্ত আরব যুবক-যুবতীর রং বেশ উজ্জ্বল।

এই দেশে জলের অভাব ও তারই ফলে নোংরার জন্য মাছির উপদ্রব খুব বেশি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ মাছির সঙ্গে লড়ে উঠতে পারে না। সবসময় দেখা যেত তাদের মুখের ওপর মাছি বিড় বিড় করছে। মাছি কচি ছেলে-মেয়েদের গালে ও চোখের কোলে ঘা করে দিত। সেই ঘা জন্মের মতো গালের ওপর দাগ বা ছাপ রেখে যেত। শিক্ষার অভাব ও অযত্নের ফলে এইরকম ক্ষতিকর চিহ্ন মেয়েদের মুখে প্রায়ই দেখতাম।

কফি খাওয়ার রেওয়াজ আরবসমাজে চিরাচরিত। শহরের লোকেরা কফিখানায় বসে মেয়েদের নিয়ে পরচর্চা করত যেমন সব শহরেই হয়ে থাকে। সেই কফি যেমন আমরা খাই তেমনই, কেবল দুধ ছাড়া। উটের দুধ দিয়ে কফি করলে, কফির সুগন্ধের বদলে উটের গায়ের বোটকা দুর্গন্ধে মনে হত কাপভর্তি। কেউ কেউ দুধ দিয়েই খায়। উটের গায়ের দুর্গন্ধ আমাদের কাছে যতই অসহ্য লাগুক, এদেশের লোকেদের কাছে তা গা-সওয়া হয়ে গেছে।

এবার বেদুইনদের কথা বলি। বেদুইনরা যাযাবর, দেশময় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যেখানেই তারা বসে সেখানেই বালির ওপর একটা ছোট্ট চুলার মতো করে নেয়। তার

মধ্যে ঘুঁটের (উটের) আগুন জ্বলে সারাক্ষণ, সেই আগুনের ওপর কফির কেটলিতে সুস্বাদু কফি তৈরি করে- খুব ঘন কালো সিরাপের মতো । অনেক চিনি দিয়ে মিষ্টি করে ছোট-ছোট চুমুক দেয় । কফির স্বপক্ষে আরবরা হলফ করে বলে যে, তাদের মরুভূমির দেশে এটা নাকি তৃষ্ণা নিবারণ করে । কথাটা ঠিক । অল্প অল্প কফি খেলে তেষ্টা তেমন পায় না ।

বাসরার সমস্ত ভারতীয়রা- তার মধ্যে শতকরা নব্বইজনই বাঙালি । এক সন্ধ্যায় মস্ত ভোজের আয়োজন করেছিলেন আমাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য । অনেক আপ্যায়নের পর বাংলা শুরু হল । তখনকার দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রবাসী বাঙালির কাছে তেমন প্রিয় ছিল না যেমন ছিল দ্বিজেন্দ্রগীতি । বেশিরভাগ থিয়েটার হত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক নিয়ে । সেজন্য এখন মনে হয় গানগুলি থিয়েটারি ঢঙে সুর দেওয়া, যদিও কয়েকটি গান অতুলনীয় লাগত আমার কাছে যেমন- 'মেবার পাহাড় শিখরে যাহার......' এবং 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে....' প্রভৃতি ।

বাসরা বন্দর বলে সেখানে অনেক জাহাজ আসে-যায় । রপ্তানির মধ্যে প্রধান হচ্ছে খেজুর এবং পেট্রোল জাতীয় খনিজ পদার্থ, যা 'মোশাল' (Mosul উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত) অঞ্চল থেকে আসে । খেজুর এত চমৎকার ফল যে মানুষ এর মধ্যে যথেষ্ট পুষ্টি লাভ করতে পারে । পৃথিবীর কম দেশেই এইরকম উন্নতমানের পরিষ্কার ও সুস্বাদু খেজুর পাওয়া যায় । এদের খেজুর আমাদের দেশে ও পশ্চিমের নানা জায়গায় রপ্তানি হয় । শুধু সেই রোজগারেই অবশ্য একটা দেশ চলে না । একটা বড় সংখ্যক লোক শহরের বাইরে জীবনভর ভেড়া ও ঘোড়া পালন করে । আরবি ঘোড়া জগদ্বিখ্যাত । ভেড়া, যাকে আরবরা বলে দুম্বা, তাদের স্বাস্থ্য খুব ভালো, লোমও যথেষ্ট । আমার অবাক লাগত যে আমাদের শস্যশ্যামলা বাংলা দেশের ভেড়া যথেষ্ট ঘাস খেয়েও শীর্ণকায়, বিরল-লোম, দুধ তো তাদের প্রায় থাকেই না । আরব দেশের দুম্বা কী খায় তার একটা হিসাব দিই- মেসোপটেমিয়ার ভেতর দিয়ে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী বয়ে গেছে । নদীর ধারে খুব সামান্য চাষ-আবাদ হয় । বাকি দেশটা ধুলোর মতো বালি-ভর্তি মরুভূমি । কিন্তু বালির নিচে এককালে খুব সরস চাষোপযুক্ত জমি চাপা পড়েছে । বৃষ্টি খুব কদাচিৎ হয় । বৃষ্টির পরেই দেখা যায় সহজেই আপনি সবুজ ঘাস গজিয়েছে । তারপর আগুনের ভাঁটার মতো সূর্য সেই ঘাস পুড়িয়ে সরু কাঠির মতো করে দেয় । মরুভূমির রঙের সঙ্গে মিলে যায় ঘাসের রং ।

যাযাবর বেদুইন জাতির সম্পদ হচ্ছে ভেড়া । ভেড়াদের নিয়ে শুকনো ঘাসের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় সারাদেশ । ওই ঘাসের মধ্যে খাদ্যের সারবস্তু যথেষ্ট থাকে । কিন্তু কোথায় সে ঘাস পাওয়া যাবে তা কোনও বেদুইন জানে না । ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মিলে যায় একটা

ঘাসওয়ালা জায়গা। সেই জায়গাটা হয়তো পাঁচ বর্গমাইল জুড়ে। যদি অন্য একদিকে আরেক বেদুইন তার ভেড়ার পাল নিয়ে চরাতে আসে তো দুই দলে মারামারি, গুলি ছোড়াছুড়ি অবশ্যম্ভাবী। যে দল জিতবে সে অন্যদের ভেড়া-ঘোড়া, স্ত্রী ও তাঁবু সব দখল করে নেয়। চাষবাসের যখন সুবিধা নেই তখন ভেড়াই বেদুইনদের সম্বল। যথেষ্ট দুধ পায়- যা থেকে বাচ্চাদের খাওয়ায় এবং দই তৈরি করে। দই তৈরি করে অভিনব উপায়ে- একটা মশকের ভেতর। ভেড়া মেরে তার পায়ের চামড়া বেঁধে দেয় এবং গলার ভেতর দুধ ঢেলে দিলে তা অল্প সময়েই দই হয়ে যায়। আমরণ সেই মশকের ভেতর দুধ ঢেলে যায় ও দই পায়। সে দই রাম টক। চারদিকে এত প্রচণ্ড গরম যে দই খেতে ভালোই লাগে, সে যতই টক হোক। ১৩৫-১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গরম, ছায়াবিহীন দেশ। ভেড়ার মাংস কখনও কখনও ওরা ঝলসে খায়- খুব সুস্বাদু এবং নরম। ভেড়ার পশম বেচে অনেক টাকা পায়। এবং এই পশম থেকে নিজেদের কাপড়-জোব্বা তৈরি করে, তাঁবুও পশম থেকে বানায়। এই থেকে বোঝা যায় ভেড়া কত বড় সম্পদ বেদুইনের কাছে। এই ভেড়া রাখার তাগিদে তারা বন্দুক ঘাড়ে সবসময় ঘুরে বেড়ায়। বেদুইনদের মধ্যে অনেকে হজযাত্রীদের সঙ্গে ক্যারাভ্যানে যোগ দেয়- তারপর মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ খুন ও লুটতরাজ আরম্ভ করে দেয়।

ওখানে সকাল দশটার পর সাইকেলের লোহা এত গরম হয়ে যেত যে দস্তানা ছাড়া হ্যান্ডেল ধরা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। দুপুর রোদে বালির ওপর দিয়ে চলা বেশিরভাগ সময়েই কঠিন। বৃষ্টির কোনও নির্দিষ্ট মরসুম নেই। হঠাৎ বৃষ্টির পর রোদ উঠলে ধুলোর মতো বালি জমে শক্ত হয়ে যেত। তখন তার ওপর দিয়ে সাইকেল চড়েও যেতে পারতাম।

এককালে পৃথিবীর খুব সভ্য লোকেরা এই অঞ্চলে বাস করত। আমরা যে 'গার্ডেন অব ইডেন' এবং 'হ্যাঙ্গিং গার্ডেন অব ব্যাবিলনে'র কথা বইয়ে পড়েছি তা এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলে- জায়গাটার নাম করুণা। আজও লোকেরা একটা শুকনো গাছ দেখিয়ে বলে যে সেটা নাকি 'ট্রি অব নলেজ'। মোট কথা, ব্যাবিলন এককালে সমৃদ্ধ এবং চাষোপযুক্ত দেশ ছিল। কোনও এক ভৌগোলিক কারণে সার মাটি নিচে চলে গেছে এবং বালি ওপরে উঠেছে। রাতারাতি বৃষ্টিতে ঘাস গজিয়ে ওঠার কারণ এই।

এদেশের সবাই, ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত বিনা জিনে ঘোড়ায় চড়তে পারে, সবাই বন্দুক ব্যবহার করতেও জানে অল্প বয়স থেকেই আত্মরক্ষার তাগিদে।

বৃষ্টি যদি কদাচ হয় তখন ধুলো-বালির মরুভূমিতে এমন কাদা হয় যে একেবারে চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাদা শুকিয়ে গেলে সমতল মাটি শক্ত হয়ে ওঠে।

যখন দুপুর রোদে ভীষণ গরম তখন প্রায়ই আমাদের চলার পথে দেখেছি দূরে দিগন্তরেখার কাছে যেন জলাশয় রয়েছে। আরেকটু কষ্ট করে, আরও এগিয়ে গেলে সেই দুষ্প্রাপ্য জল অনেক পাব ভাবতে ভালো লাগে। তাই বিশ্বাস হয় জল ঠিকই দেখছি, আসলে সেটা মরীচিকা।

বাসরা ছেড়ে বাগদাদের দিকে রওনা হলাম। চলার নির্দিষ্ট কোনও পথ নেই- কম্পাস বা দিকনির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে চলা।

বাসরা শহরের বাইরে দেখলাম উটের 'ক্যারাভ্যান' দাঁড়িয়ে আছে হজযাত্রীদের নিয়ে। তারা দলে ৩০০-৪০০ হলে রওনা হবে।

আমরা উটের ও মানুষের ভিড় ঠেলে চলেছি। আমাদের টুপি ও সাজগোজ এবং সাইকেল ও বন্দুক দেখে সবাই ভাবত আমরা বুঝি সৈনিকের দল, বেদুইনদের শায়েস্তা করতে মরুভূমিতে চলেছি। শায়েস্তা করা তো দূরের কথা, বেদুইনদের কীর্তিকলাপ দেখে মনে হচ্ছিল এদের হাত থেকে কেমন করে আমরা রক্ষা পাব ও এগিয়ে যেতে পারব। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন' পড়ে যে লোভনীয় রোম্যান্টিক কল্পনা হয়েছিল তা বাষ্পের মতো উবে গেছে। তবু বেদুইনের ভয়ে পৃথিবী ভ্রমণ ছাড়লে চলবে না। এদের সঙ্গে এদের মধ্যে আমাদের বোঝাপড়া করেই চলতে হবে- কেমন করে জানি না। বোধহয় সাহসে ভর করেই।

সঙ্গে অনেক জল নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। সাংঘাতিক গরমে তেষ্টায় সেসব শেষ করে ফেলেছি। আর মাত্র সামান্য জল ছিল পরদিনের জন্য। মরুভূমির মধ্যে সারাদিন প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছি। সূর্যাস্ত হবার আর বেশি দেরি নেই। বালির পাহাড়ের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে। রাত্রে মরুভূমির মধ্যে কোথায় থাকব কোনও ধারণা ছিল না। এমন সময় হঠাৎ একদিক থেকে দিনান্তের নমাজ পড়া শুনতে পেলাম। সাবধানে দেখলাম একজন 'শেখ' মাটিতে হাঁটুর ওপর বসে নমাজ পড়ছে পশ্চিমের দিকে মুখ করে। তার পিছনে চারজন বেদুইন (সবাই সশস্ত্র ও বন্দুকধারী) নমাজ পড়ছিল একই সঙ্গে। আরও পিছনে পাঁচটা আরবি ঘোড়া ছাড়া ছিল।

আমরা বুঝতে পারলাম যে এদের এড়িয়ে মরুভূমিতে চলতে পারব না, সেজন্য আমাদের উচিত বেদুইনের সঙ্গে বোঝাপড়া, এমনকী সম্ভব হলে ভাব করে চলা। আমাদের প্রত্যেকের গলায় স্কাউটের সবুজ রঙের রুমাল ছিল। পরে বুঝেছিলাম সেগুলি আমাদের খুব সাহায্য করেছে।

যারা একবার 'হজ' অর্থাৎ মক্কা এবং মদিনায় তীর্থ করে এসেছে, কেবলমাত্র তারাই সবুজ রঙের গলবস্ত্র বা রুমাল ব্যবহার করার অধিকারী।

পাছে বেদুইনরা সন্দেহ করে আমরা তাদের ধরতে গিয়েছি, সেজন্য আমরা বন্দুকটা আনন্দর কাছে দিয়ে আমি শেখের সামনে গিয়ে অদূরে দাঁড়ালাম। নমাজ শেষ হওয়া মাত্র আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ও দেশি কায়দায় বুকের ওপর হাত রেখে বললাম 'মরহব্বা-আন্তিলি রফিক' অর্থাৎ 'তুমি আমার বন্ধু, আমি তোমাকে সখ্য জানাই'। শেখ চমকে উঠেই ফিরে দেখল তার চারজন দেহরক্ষীরা টোটাভরা বন্দুক হাতে প্রস্তুত। তখন আশ্বস্ত হয়ে নিরস্ত্র আগন্তুককে অভিবাদন করল। আমি আমার ভাঙা আরবি ভাষায় (যা অ্যান্টনিবাগান লেনের এক মৌলবির কাছে শিখেছিলাম) বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমরা কে বা কোথায় যাচ্ছি। 'পৃথিবীটা' কী সেটা বোঝানো যেমন শক্ত ছিল তার চেয়ে কম কঠিন ছিল না আমরা ভারতীয় পর্যটক একথা বোঝানো। প্রত্যেক অশিক্ষিত বেদুইনের ধারণা আরব দেশ হচ্ছে সারা পৃথিবী এবং আরবরা ছাড়া অন্য জাতির লোক আর নেই। একটু জল খেতে চাইলাম। শেখ বলল, কফি খাও, আমাদের সঙ্গে 'খবুজ' অর্থাৎ রুটি খাও। তখন আমি আর দেরি না করে বোঝালাম যে আমার তিন বন্ধু সঙ্গে আছে। অনুমতি পেলেই তাদের নিয়ে আসি, শেখ নিজেই আমার সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তিন বন্ধুর সামনে দাঁড়াল, বন্ধুরা বালির ওপর বসেছিল, সবার সঙ্গে আলাপ হলে আমরা শেখের দলের রক্ষীদের কাছে গেলাম। বালির ওপর বসে ছোট ছোট পেয়ালায় কফি খেতে খুব ভালো লাগল। দু-তিনজন আরব একত্রিত হলেই কফির কেটলি আগুনের ওপর বসিয়ে দেয় এবং কালো খুব মিষ্টি কফি একটু পর পর চুমুক দেয়।

একটু পরেই চাঁদ উঠল। যে আগুনের ভাঁটা পৃথিবীর এই দিকটায় সারাদিন আমাদের দগ্ধে মারল গরমে, তার অবসানে মরুভূমির রূপ বদলে যেতে আরম্ভ করল। চাঁদের আলো যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন চারদিকে সে এক অপরূপ দৃশ্য। ঠান্ডা পড়তে পড়তে এত বেশি মাত্রায় ঠান্ডা হল যে আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে আরাম পেলাম। বালির গরম প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত গরম বিছানার কাজ করে। মরুভূমিতে খাবার জোটে না কিন্তু যেখানে-সেখানে বালির ওপর শুয়ে পড়ায় কোনও অসুবিধা নেই। বালির ওপর কম্বলটা পাতবার সময় দেখে নিতে হয় সাপ (হর্নড ভাইপার) কাছে কোথাও আছে কিনা। তারা বিষাক্ত সন্দেহ নেই। আমাদের সঙ্গে লেক্সিন ছিল বলে বিশেষ ভয় ছিল না। মরুভূমিতে পোকামাকড়, গিরগিটি, মাছির অভাব নেই। তবে মশা একেবারে নেই।

বেদুইনদের ভেড়ার পশমের জামা পরে এই প্রচণ্ড গরমের দেশে থাকতে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একদিন আমি খালি গায়ে কাটিয়ে দেখলাম যে সেই গরম আরও বেশি কষ্টকর। গায়ের চামড়া যেন ঝলসে যায় ১৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে। এর চেয়ে অনেক ভালো আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে গা ঢেকে রাখা পশম দিয়ে, তা হলে

সামান্য একটু ঘাম হয় এবং তখন আরাম লাগে। মাথা ও ঘাড় ঢেকে না রাখলে সান-স্ট্রোক হয়, সেজন্যই বেদুইনদের বেশভূষা অদ্ভুত রকমের।

শেখের সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য গল্প আরম্ভ করলাম। তার অফুরন্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কয়েকটা কথা। কেন জানি না, সে বন্ধুর মতো অনেক উপদেশ দিল, যখন দেখল আমরা তার দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তার প্রথম উপদেশ ছিল যে রাত্রে ঠান্ডা পাবে, তাই ওই সময় চলবে না। বেদুইনের জীবন সূর্যের আসা-যাওয়ার সঙ্গে বাঁধা। সূর্য ওঠে খুব ভোরে। তখন থেকে ওরা দৈনন্দিন জীবনের কাজে লেগে যায়। সূর্যাস্তের সঙ্গে খাওয়া শেষ করে নিদ্রার ব্যবস্থা হচ্ছে রীতি। বুড়ো এবং অসুস্থ যারা তারাই অনেক রাতে ঘুমায়।

যদি রাত্রে কেউ চলাফেরা করে তবে সে বিদেশি বা বিজাতীয়, তাদের ওপর বন্দুক চালাতে ওরা দ্বিধা করে না। কাজেই চাঁদনি রাতে ঠান্ডায় ঠান্ডায় চলবার বুদ্ধি ছাড়লাম।

দ্বিতীয়ত, তেষ্টা পেলেও তাকে অগ্রাহ্য করতে শিখবে। যখন অসহ্য হবে তখন কফি খাবে। খেজুর প্রধান খাবার হবে যখন আমরা মরুভূমির গভীরে পৌঁছব। প্রাতরাশ থেকে ডিনার পর্যন্ত খেজুরই পুষ্টি জোগাবে। আমাদের হাত থেকে বন্দুক নিয়ে দেখল খুব মন দিয়ে। তার প্রধান জিজ্ঞাসা ছিল যে, কতদূর পাল্লায় কার্তুজ সক্রিয় থাকে। বেদুইনদের বন্দুক আরবদের তৈরি- দামাস্কাস থেকে আসে। বেশিরভাগ হাতে তৈরি এবং খুব লম্বা নলওয়ালা। কার্তুজ তৈরি করতে অনেকেই জানে।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেখ বলল যে, একজন বেদুইন অকাতরে তার স্ত্রী কিংবা ছেলের প্রাণ দিতে পারে যদি পরিবর্তে একটা ভালো জাতের রাইফেল পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের বন্দুকগুলি বিপদের কারণ হতে পারে।

শেখের অনুচরদের ওপর হুকুম হল আমাদের জন্য খাবার তৈরি করতে। রুটি ও ভালো চালের ভাত এবং ভেড়ার দুধের দই দিয়ে আমরা ডিনার সারলাম। খাবার আরম্ভ করার পূর্বে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। শেখ একটা রুটি নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়াল। রুটির একাংশ তার হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা। আমি একটু ছিঁড়ে নিলে শেখ বলল যে আমরা আমরণ বন্ধু। অর্থাৎ আরব যার সঙ্গে রুটি ছিঁড়ে খায় তাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে- কখনও তার প্রাণহানি করে না। আমরা শুনে আশ্বস্ত হলাম।

একটু পরেই শোবার পালা। আমি শেখের পাশেই শুলাম। একটু দূরে শেখের অনুচররা বিশ্রাম করবার জন্য বালির ওপর কম্বল বিছাল। গভীর নিদ্রায় শেখের নাসিকা গর্জন আরম্ভ হল। আমি তখনও ভাবছি সেটা বুঝি একটা ছল। সারারাত একচোখ খুলে ও আরেক চোখে ঘুমের প্রলেপ লাগিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে থাকবার চেষ্টা

করলাম । বন্ধুদের বলেছিলাম অন্তত রিভলভারগুলো তাদের যেন প্রস্তুত থাকে । এমনিভাবে না ঘুমিয়ে না জেগে শীতের রাত কাটালাম । পরদিন ক্লান্তিবোধ করলেও মনে মনে বেশ স্ফূর্তি লাগছিল এই কথা ভেবে যে বেদুইনের পাশে শুয়ে রাত কাটিয়েছি এবং আমাদের গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি । এই ঘটনার পর আমাদের সাহস খুব বেড়ে গেল । যতই যমদূতের মতো চেহারা হোক আমরা বেদুইনের আতিথ্য স্বীকার করতে আর দ্বিধা করিনি ।

বেদুইনরা কেন যে খুনে ও লুটবাজ হল, সেকথা ভাবলে এদের প্রতি সহানুভূতি হয় । দেশে কোনও শিল্প নেই, বালির দেশে চাষবাসও নেই । একমাত্র মেষপালন করে জীবিকা নির্বাহ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই ।

শেখ তার জীবনের অনেক কথা আমাদের শোনাল । চারজন বন্দুকধারী অনুচরদের দেখিয়ে বলল যে প্রথম জীবনে সেও অনুচরদের মতো একজন ছিল । তারপর নিজের দল তৈরি করে একটা যাত্রীর দলকে লুঠ করে এত টাকা পেয়েছিল যে সে সর্দার বা শেখ বনে গেল । চারজন রক্ষী তার সঙ্গে সবসময় থাকে । আরও বলল যে, কোনও একজন রক্ষী তাকে খতম করে দিয়ে শেখ হতে পারে । পুরোপুরি ওদের বিশ্বাস করা যায় না । জীবনটা এমনই অনিশ্চিত । এইসব শোনা সত্ত্বেও কেমন করে জানি না আমাদের বেদুইন-ভীতি একেবারে কেটে গেল । অনেক খুন ও লুঠের গল্প শুনেও আমরা দিনের পর দিন বেদুইনের তাঁবুতে রাত কাটাবার জন্য আশ্রয় নিয়েছি । দিনের আলোয় সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করতাম । দিনে মরুভূমিতে ১০-১২ মাইল এগোতে পারতাম ।

বাসরা থেকে বাগদাদের পথে চলেছি । তিনদিন পরে আমরা তিনটে নদীর সঙ্গমস্থলে পৌঁছলাম । নদীর নাম ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস ও সাত-এল-আরব । তার মানে আমরা 'গার্ডেন অব ইডেন'-এ পৌঁছে গেছি । এই জায়গার কাছেই কোথাও একদিন ব্যাবিলন ও তার 'হ্যাঙ্গিং গার্ডেন' ছিল । ব্যাবিলনের সভ্যতা ঐতিহাসিক । সেজন্য এটা সুনিশ্চিত যে একদিন এখানে দেশটা শস্যশ্যামল ছিল এবং বাগান করাও সম্ভব হয়েছিল । তারপর কোনও এক অনিশ্চিত কারণে হয়তো ভূমিকম্পে মরুভূমি সব গ্রাস করল । এখন যেখানে 'গার্ডেন অব ইডেন' বলে সেটার সঙ্গে সৌন্দর্যমণ্ডিত বাগানের কিছু মিল নেই । বরং হাসি পায় কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মতো ।

হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা এবং তারপরই আমাদের চলাফেরা একদিন বন্ধ রাখতে হল এমনই কাদা জমে গেল । রোদ উঠতে পরদিন সব শুকিয়ে সাইকেল চালানোর উপযুক্ত হল ।

হারুন-অল-রশিদের জগদ্বিখ্যাত বাগদাদ শহর দেখে আমরা খুব হতাশ হয়ে গেলাম। মাটির বাড়ি ও কাঁচা ইটের গাঁথনি দিয়ে দোতলা বাড়ি বড় রাস্তার দুধারে দেখলাম। রাস্তা কখনও জল দিয়ে ধোওয়া হয় না বলে মাটি মাটি দেখায়। শহরে পৌঁছেই প্রথমে আমরা ক্যাপ্টেন ডি এন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন ইংরেজদের বিমানঘাঁটির একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। আমাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যে ইংরেজ সৈনিক ও পাইলটরা যেতে আসতে ক্যাপ্টেনসাহেবকে সেলাম করে চলছে। আমাদের জন্য গার্ড অব অনারের ব্যবস্থা হল।

পরদিন তিনি আমাদের হাসপাতাল (আর্মির) দেখাবার কথা বললেন। আমরা সেখানে গিয়ে দেখলাম চারজন লোক বেদুইনের হাতে ঘায়েল হয়েছে। তারা সেকালের একটা ফোর্ড গাড়িতে চড়ে বাগদাদে আসছিল। বেদুইনরা টিপ করে একটা টায়ার-এ গুলি মারল, তারপর গাড়ি অচল হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদুইনরা বন্দুক চালিয়ে গাড়ির যাত্রীদের প্রথমে জখম করল, তারপর সব লুঠপাট করে যাত্রীদের বন্দুকগুলি নিয়ে মরুভূমির গভীরে ঘোড়া চালিয়ে অন্তর্হিত হল। ভাগ্যে বাগদাদ শহরের প্রান্তে এই ঘটনা হয়েছিল, তাই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীর চেষ্টায় শুশ্রূষা সম্ভব হয়েছিল।

বাগদাদ একটা মস্ত ঘাঁটি হজযাত্রীদের। শত শত যাত্রী ও তাদের উট শহরের প্রান্তে জোট বেঁধে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না তারা দলে ভারি হয়, যাতে বেদুইনরা আক্রমণ করতে সাহস না পায়।

ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী উত্তরকালে অনেক উঁচু পদে উন্নীত হন সাহস ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য। দেশ স্বাধীন হবার পর তিনি 'ডিরেক্টর জেনারেল হেলথ সার্ভিসেস (ওয়েস্ট বেঙ্গল)' পদ গ্রহণ করেন ডাঃ বিধান রায়ের আমন্ত্রণে।

বাসরার মতো বাগদাদেও অনেক বাঙালির বসবাস ছিল। অনেকে রেললাইন পাততে গিয়েছিলেন, আরও অনেকে তুর্কি-সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। জার্মানদের দলে চলে গেলে দেশ স্বাধীন হবে, এই বিশ্বাসে বাঙালিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ শেষ হলে এঁরা কেউ দেশে ফিরে যাননি তাঁদের ভেতর কেউ কেউ আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রী ও ছেলেপুলের সঙ্গে আলাপ করালেন। কোনও কোনও আরব-বাঙালি স্ত্রী বোরখা ছেড়ে বেশ সপ্রতিভভাবে বাংলায় গল্পগুজব করলেন।

মরুভূমিতে ক্যারাভ্যান দীর্ঘদিন চলার পর বিশ্রামঘরে দুয়েকদিন কাটায়- এদেশের লোকেরা বলে হান, সেখানে আমরাও থেকেছি। মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা বড় জায়গার মধ্যে অনেকগুলি পাশাপাশি ছোট্ট ঘর আছে। জানলা নেই, কেবলমাত্র একটি দরজা যাতায়াতের পথ। সেই ঘরে প্রচণ্ড রোদের প্রকোপ থেকে বাঁচা যায় কিন্তু সেখানে

মাছির অত্যাচার পাগল করে দেয়। আমি মাছির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সর্বাঙ্গে মাথায় ও মুখে কেরোসিন তেল ঢালতাম। কেরোসিন তেল যথেষ্ট সস্তায় পাওয়া যায়। এই হানগুলি নোংরার ডিপো। উট ঘোড়া ও মানুষ যত রাজ্যের ময়লা ফেলে ঘরের সামনে। শত শত বছর ধরে লোকেরা এই নোংরামি বাড়িয়েই চলেছে। সেখানে প্রয়োজনীয় জিনিস কয়েকটা পাওয়া যায়, যেমন খেজুর, খেজুরের ময়দা, দেশলাই, লুঙ্গি, বাতি ইত্যাদি।

একদিন একটা হানের দোকানে এক টিন সার্ডিন দেখে কিনে ফেললাম। সার্ডিনের টিন বিগত মহাযুদ্ধে (প্রথম) ইংরেজরা এনেছিল আট-দশ বছর আগে। পথে এই সার্ডিন প্রায় আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

খেজুর খেতে খেতে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, এমন সময় মণীন্দ্র বলল যে আমাদের মতলবটা কী? সার্ডিন টিন গলায় ঝুলিয়ে আমরা কি কলকাতায় ফিরব? সেইদিনই যেটুকু চাল ছিল তা দিয়ে ভাত রান্না হল কোনওমতে। আমরা খুব উৎসাহের সঙ্গে সার্ডিন মাছ ও তার তেল দিয়ে খুব তৃপ্তি করে ভাত খেলাম। ফলে ফুড পয়জনিং হয়। বালির ওপর ঘুমিয়ে পড়লাম। অন্যান্য দিন সাধারণত সকাল চারটে-পাঁচটায় উঠতাম কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেদিন আমাদের কারও বেলা দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুম ভাঙল না। প্রচণ্ড রোদে ৬ ঘণ্টা পোড়ার ফলে হয়তো আমাদের মধ্যে বিষ কেটে যাচ্ছিল। ভীষণ মাথাধরা নিয়ে উঠলাম। নড়বার চড়বার ক্ষমতা ছিল না, সবার একই অবস্থা দেখে আমরা পরামর্শ করলাম কেমন করে অমন হল। অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করলাম যে প্রথম মহাযুদ্ধের টিনে সার্ডিন আট-দশ বছর পরে নিশ্চয় বিষিয়ে উঠেছিল। আমাদের স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল বলে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে বিষ কাটাতে পেরেছিলাম।

মরুভূমিতে দিনের পর দিন চলেছি। সে গরমের কথা ভাবলে আজও মনে হয় উট কিংবা ঘোড়া ছাড়া এদেশে চলা উচিত নয়। সবসময় সাইকেল চড়তে পারি না। অনেকদিন ধরে বোঝা টানতে টানতে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আরও কতরকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি তার ঠিক নেই, সবচেয়ে বড় একটা অসুবিধার কথা ভাবলে আজও গা শির শির করে। গরমে ঘাম হত। স্নান নেই, মুখ ধোয়া নেই, দাঁত মাজব এমন জল পাই কোথা। আমাদের গায়ে পোকা হল। চোখে স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু জামার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তারা হাজার হাজার ডিম পাড়ল। সেই ডিম ফুটে আমাদের অস্বস্তি বাড়িয়ে চলল। একদণ্ডও পোকার কামড় ও সুড়সুড়ি থেকে বিরাম নেই। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। পোকাগুলো অনেকটা চালের পোকার মতো কিন্তু রক্ত শুষে খায়।

একসময় পোকার কামড় খেয়ে স্থির থাকতে না পেরে আমাদের পথচলা বন্ধ রেখে, কাপড়চোপড় খুলে পোকা মারার কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতে হত। এই উকুন মেরে শেষ করা

যায় না। এমনকী সাবান দিয়ে ধুয়ে কিংবা গরম জলে সেদ্ধ করে ওদের উচ্ছেদ করা যায় না। এদের হাত এড়ানোর একমাত্র উপায় জামাকাপড় পুড়িয়ে ফেলা। আমরা তা পারতাম না বলে অনেকদিন পর্যন্ত গায়ে পোকার অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়েছি, এমনকী ইউরোপে পৌঁছবার পরেও, বুলগেরিয়া পর্যন্ত।

চলতে চলতে আমরা যখন নদীর ধারে গিয়ে পড়েছি তখন দেখেছি যে দলে দলে আরবরা কাপড় ছেড়ে উকুন মারতে ব্যস্ত। যথেষ্ট মারা হলে, তারপর জলে নামে, কিন্তু পোকার হাত থেকে নিস্তার নেই। স্নান করতে পারে না বলে, বেশিরভাগ আরবের গায়ে পোকা। এবং একজন আরেকজনকে মনের আনন্দে (নিজের অজ্ঞাতসারে) পোকা বিতরণ করে। হয়তো অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকার জন্য পোকা আপনি জন্মায়।

নদীর ধারে পৌঁছলে আরব মেয়েরা বোরখা খুলে ফেলে দেয় এবং তখন লজ্জার বালাই থাকে না। টাইগ্রিস নদীর জল কলকাতার গঙ্গার মতো ঘোলা ব্রাউন রং। ইউফ্রেটিস নদীর জল পরিষ্কার, বাগদাদ শহরে যার বাড়িতে গিয়েছি সেখানেই দেখেছি বড় বড় মাটির কলসি একটার পর একটা সাজানো। নিচে মাটি থিতিয়ে যাবার পর জল অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন সেই জল দ্বিতীয় কলসে রাখা হয়। তৃতীয় বা চতুর্থ কলসির জল যখন স্বচ্ছ কাকচক্ষুর মতো হয় তখন পানের উপযুক্ত বলা যায়।

নদীর কিনারে পথ ছেড়ে আমরা যখন মরুভূমির পশ্চিমদিকে যাত্রা শুরু করলাম তখন সেখানে দিকনির্ণয়-যন্ত্রই ভরসা। বিকালের দিকে সূর্যের পানে মুখ রেখে চললে, বিপথে যাবার অবকাশ থাকে না।

মেসোপটেমিয়া ছেড়ে আরবদেশের উত্তর দিয়ে আমরা সিরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করলাম। সিরিয়া ফরাসিদের দখলে, যেমন মেসোপটেমিয়া ছিল ইংরেজদের আয়ত্তে- দুটো দেশই এককালে তুর্কির অধীনে ছিল। যুদ্ধের সময় ইংরেজ ও ফরাসিরা আরবদের বলেছিল যে তাদের হয়ে তুর্কির বিরুদ্ধে লড়লে যুদ্ধের পরে দেশ স্বাধীন করে দেবে- যদি জয় হয়।

যুদ্ধে তুর্কি হারল এবং তার আয়তন এশিয়া মাইনরেই সীমাবদ্ধ রইল। ইউরোপে তাদের সাম্রাজ্য যতদূর বিস্তার করেছিল তার মধ্যে সামান্য একটুকরো অনুর্বর জমি ও একটি শহরের (এড্রিয়ানোপলের) মালিকানা নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। যুদ্ধের শর্ত অনুসারে এশিয়া ও আফ্রিকায় তুর্কির অধীনস্থ দেশগুলি ইংরেজ ও ফরাসিরা ভাগ করে নিল।

পথে একদিন আনন্দ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার জ্বর হয়। আমরা এক বেদুইন পরিবারের বড় তাঁবুতে আশ্রয় নিলাম। তাঁবুর একদিকে বেদুইন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, মাঝখানে ভেড়ার পাল

ও আরেক প্রান্তে আমরা । সব বেদুইন যে ডাকাত ও খুনে নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম বেদুইন পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার সুযোগ পেয়ে ।

সাতদিন একাদিক্রমে জ্বরভোগ করল আনন্দ । বেদুইন পরিবার তখন আমাদের শুধু তাঁবুতে থাকতে দেয়নি, চেষ্টা করেছে সহানুভূতি দিয়ে সাহায্য করতে ।

মরুভূমিতে নানারকম পোকামাকড় দেখা যায়- মাছির কথা আগেই বলেছি । এক রাত্তিরে বালির ওপর শুয়ে রাত কাটাবার পর হঠাৎ লক্ষ করলাম পা দিয়ে রক্ত পড়ছে । একটা পোকা আমাকে ব্যথা না দিয়ে চামড়া ফুটো করেছিল, তারপর সামনে হাড় পেয়ে মোড় ঘুরে পা থেকে বেরিয়ে গেছে । এত কাণ্ড ঘটেছে অথচ আমি টের পাইনি । গর্ত করবার আগে পোকাটা লালা দিয়ে স্থানটা অসাড় করে দেয় ।

দেখতে দেখতে আমার পা ফুলতে আরম্ভ করল । কাছেই একটা ছোট্ট আরবি শহর ছিল । কোনওমতে সেখানে পৌঁছে এক হাকিমের বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আশ্রয় নিলাম । চিকিৎসার ব্যবস্থা খুব অভিনব । সমস্ত পায়ে হাঁটু পর্যন্ত পুরনো ভেড়ার চর্বি মাখিয়ে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে আমাকে একরকম ঝুলিয়ে রাখল- ট্র্যাকশনে রাখলে যেমন হয় । এখানে আমার একটা পা উঁচুতে এবং শরীরের ওপরদিকটা মাটিতে ঠেকে রইল । আশ্চর্যের বিষয় যে তিনদিন পরেই আমার পা সাধারণ রূপ ধারণ করল- ফোলা ও ব্যথাও নেই । হাকিম কিন্তু কোনও টাকা-পয়সা নেননি আমাদের কাছ থেকে ।

একদিন হঠাৎ অবাক হয়ে সামনে দেখলাম এক বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ । একটা প্রকাণ্ড আর্চ, প্রায় আশি ফুট উঁচু দুটি দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে । এর নাম 'স্টেশিফোন'-আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ পর্যন্ত সব দেশ জয় করার স্বাক্ষর হিসাবে দুহাজার দুশো বছর আগে এটা তৈরি হয়েছিল । এই অট্টালিকা তৈরি করবার মালমশলা কোথা থেকে এসেছিল কে জানে! এখন চারদিকে বালি আর বালি ।

বালির ওপর যত না সাইকেল চালাচ্ছি তার বেশি ঠেলছি আমাদের বাহনদের । বালির পাহাড়ে বোঝা নিয়ে ওঠানামা যে কী কষ্টকর তা মর্মে মর্মে বুঝেছিলাম । হঠাৎ কী যেন একটা জন্তু আমাদের দেখে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে গেল । হরিণের মতো দেখতে অথচ মাপে অনেক ছোট্ট । মনে হল ভুল দেখেছি, হয়তো কুকুর, হয়তো খরগোশ । তখনই সাইকেল ফেলে পিছু নিলাম দেখবার জন্য, কেমন জীব বালির দেশে থাকে । দুটো বালির পাহাড় পার হতে এবার স্পষ্ট দেখলাম সুন্দর দেখতে একটা গ্যাজেল আমার সামনে । ধরবার জন্য লোভে পড়ে অনেক উঁচু-নিচু বালির ওপর দিয়ে গ্যাজেলের পিছু নিলাম । সোনার হরিণের মতো যেন ধরা দিচ্ছে, এমন ভান করে হঠাৎ ছুট দিয়ে আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল । অবশেষে আমি হাল ছেড়ে আমার বন্ধুরা যেখানে ছিল সেখানে ফিরে গেলাম

। অবাক হয়ে ভাবলাম কেমন করে মরুভূমিতে বেঁচে আছে । উত্তর সহজেই পেলাম- যেমন করে ভেড়ারা থাকে, রোদে-পোড়া শুকনো ঘাস খেয়ে ।

বালির ওপর ঘুরপাক খেতে খেতে কখন মেসোপটেমিয়ার (এখনকার ইরাক) সীমানা পার হয়ে সিরিয়াতে ঢুকে পড়েছি তা টের পাইনি । একদিন দুপুরে পুব আকাশে প্রচণ্ড বালির ঘূর্ণিঝড় আসছে দেখে আমরা তাড়াতাড়ি কম্বল খুলে মুড়ি দেবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় মাথার ওপর দিয়ে কাছেই একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল । মনে হল, কাছেই কোথাও ঘাঁটি আছে, সেখানেই নামল । ঝড়ের পূর্বাভাস ততক্ষণে এসে পড়েছে । বালির কী রুদ্রমূর্তি! প্রায় আধঘণ্টা পরে ঝড়ের প্রকোপ থামল । তারপর দেখি দুজন ফরাসি ঘোড়ায় চড়ে আমাদের দিকে আসছে । তারা বিমানচালক । ওপর থেকে আমাদের স্কাউট টুপি পরা দেখে ভেবেছিল, আমরা হয়তো কোনও ইউরোপীয় ভ্রমণ পার্টি ঝড়ের মধ্যে বিপদে পড়েছি । আমাদের যখন দেখল প্রাচ্যের লোক তখন তাদের খুব স্ফূর্তি । ফরাসিভাষা জানতাম না তখন, তবু ওদের নিমন্ত্রণ বুঝতে দেরি হল না । আধঘণ্টা পরে বিমানঘাঁটিতে পৌঁছলাম । এখানে 'ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজিয়নে'র লোকেরা মরুভূমিতে বেদুইনদের ওপর খবরদারি করে । বেদুইনরা সহজে ধরা দেয় না । ঘোড়া ছুটিয়ে মরুভূমির মধ্যে দূরে, আরও দূরে চলে যাবার সহজ ক্ষমতা রাখে । অন্য লোক যদি তাড়া করে যায় তবে জলের অভাবের কথা ভেবে অচিরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয় । ততক্ষণে বেদুইন সবার নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে । মরুভূমির মধ্যে অনেক গুপ্তস্থান আছে যেখানে জল পাওয়া যায় । এইরকম দু-তিনটি জলাধারের সন্ধান পেয়েছিলাম । ক্যানভাসের বালতিতে অনেক লম্বা দড়ি দিয়ে গর্তের মুখ থেকে ঝুলিয়ে জল তুলতে হয় । পাহাড়ি জায়গাতে বিশেষ করে দেখেছি যে বহু নিচে স্বচ্ছ, সুমিষ্ট জল পাওয়া যায় । মাত্র একটি সংকীর্ণ সুড়ঙ্গপথে সেই জলে পৌঁছনো যায় ।

ফরাসিরা মরুভূমির মধ্যে বিমানঘাঁটি তৈরি করে বেদুইনদের বিপদে ফেলেছিল । বিমানের হাত থেকে নিস্তার ছিল না । তাছাড়া ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজিয়নের সৈনিকরা ভীষণ ভালো যোদ্ধা । প্রাণের মায়া করে না, বেদুইনদের মতো ঘোড়া চড়ে মরুভূমিতে শত্রুদের তাড়া করে যায় এবং প্রাণ হারাবার ভয় করে না বলেই জয়ী হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি । বেদুইন স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা, ছোট-বড় সবাই ভালো ঘোড়া চড়তে পারে- জিন লাগাম ছাড়াই । ঘোড়ার মুখে বরং বলা উচিত থুতনিতে একটা ছোট দড়ি বাঁধা থাকে সেটা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় কোনদিকে মালিক যেতে চায় । আরেকটা জিনিস, বন্দুক ব্যবহার করতে বেদুইন আবালবৃদ্ধবনিতা সবার অসাধারণ পারদর্শিতা । বিপদে পড়লে সবাই বন্দুক নিয়ে লড়ে যেতে পারে । বন্দুকগুলো সাধারণত বেশি লম্বা নলের হয় । তাদের টিপ অসাধারণ ।

ফরাসিদের বিমানঘাঁটিটা একটা নিচু উপত্যকায় অবস্থিত। আমাদের নিয়ে গেল কমান্ড্যান্টের কাছে। ভদ্রলোক একটু-একটু ইংরিজি বলতে পারেন। আমাদের কাগজপত্র পড়ে এবং কথা বলে একেবারে মুগ্ধ। খুব খাতির করে চার মগ কফি খেতে দিলেন এবং হুকুম হল সবচেয়ে ভালো গেস্টরুমে আমাদের চারজনের বিছানা পাতার। কমান্ড্যান্টের ঘরের বাইরে বেশ ভিড় জমে গেল লিজিয়নারদের। তারা জানতে চাইছিল আমরা কে এবং কোথা থেকে সেখানে এলাম। কমান্ড্যান্টকে সবাই এরা কাপিতেন বলে ডাকে- আরবি কায়দায়। সবাইকে ডেকে ক্যাপ্টেনসাহেব আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সবাইকে বললেন আমাদের যোগ্য সম্মান দেখাতে। তারা একসঙ্গে চিৎকার করল- লং লিভ ইন্ডিয়া, লং লিভ দ্য ইন্ডিয়ানস। তারপর একসঙ্গে হাততালি। একজন ইংরেজ যুবক সৈনিক আমাদের দোভাষীর কাজ করতে এগিয়ে এল। আমি ছোট্ট একটা বক্তৃতা করে জানালাম আমাদের ভ্রমণ করার উদ্দেশ্য- সারা পৃথিবী ভ্রমণ করব সাইকেলে। থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার হর্ষধ্বনি। সবাই একসঙ্গে চাইছিল আমরা তাদের ঘরে যাই এবং পানভোজন করি। এইরকম মরুভূমির মাঝখানেও সৈনিকরা ভালো ভালো খাবার ও মদ পায় যা প্যারিস থেকে পাঠানো হয় নিয়মিতভাবে। প্লেনে করে আনা খাবার ও মদের পিপে বালির ওপর গড়িয়ে দেয়।

ঘাঁটিটা বেশ বড়, দেড়শো লোকের বাস, এরোপ্লেন চালু ছিল চারখানা- অকেজো অনেকগুলি এমনভাবে সাজানো যে মনে হয় ওড়বার জন্য তৈরি। বড় বড় কাঠের বাক্সের মধ্যে সব এরোপ্লেন আনা হয়েছিল। সৈনিকরা বাক্সের কাঠ দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঘর, এমনকী শাওয়ার দেওয়া বাথরুম পর্যন্ত বানিয়েছিল। এরা অনেকেই ভদ্রসন্তান, উচ্চশিক্ষিত। কোনও বিশেষ কারণে সংসারে বীতরাগ হয়ে তারা লিজিয়নে যোগ দেয় এবং দূর দূর দেশে চলে যায়। একজন সৈনিকের ঘর দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম- এমন সুন্দর সব ছবি আঁকা রয়েছে। সেগুলি সব ওর নিজের আঁকা।

আমাদের যেহেতু অফিসাররা আবিষ্কার করেছিল, সেজন্য আমরা তাদের সঙ্গেই বেশিক্ষণ কাটাতে বাধ্য হলাম। সন্ধ্যাবেলায় আটটার সময় কাপিতেন-এর টেবিলে ডিনার খেতে গেলাম- অনেকদিন পর মুখ-হাত ধুয়ে। ডের-এর-জোরে ঘাঁটি করার উদ্দেশ্য এই যে এখানে জল পাওয়া যায়। শাওয়ারে নিজে জল ঢেলে নিজেই উপভোগ করলাম।

অফিসাররা যেখানে বসে তার অল্প দূরে সাধারণ সৈনিকের টেবিল। দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল। খাবারের আগে এক বোতল লাল ফরাসি 'বোজোলে' মদ সবার সামনে রেখে গেল। সৈনিকরা মগে কিছু ঢেলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল এবং আমাদের স্বাস্থ্য শুভকামনা করল। অফিসাররা তাতে যোগ দিল। মদ খেতাম না, তাই আমাদের মগে একটু ঢেলে তুলে ধরলাম এবং দুই দিকে আমাদের (টোস্ট) অভিবাদন জানালাম।

তারপর সবাই মিলে গান ধরলাম সমস্বরে । বেশ স্ফূর্তি দেখলাম চারদিকে, খুব ভালো ডিনার খেলাম- যা মরুভূমিতে ভাবা যায় না হ্যাম ও বীনস, টম্যাটোর রসে রাঁধা । চমৎকার রুটি -ফরাসিদের বিশেষত্ব । তারপর 'সুফ্লে' দেখে আমাদের তাক লেগে গেল । সব আমদানি প্যারিস থেকে এরোপ্লেনে, কিছু কিছু কাঁচা বাজার প্লেনে আসে 'হালেব' বাজার থেকে ।

সৈনিকরা সবাই অনুরোধ করল দুদিন তাদের সঙ্গে কাটাবার জন্য । কমান্ড্যান্টকে জানালাম আমাদের আপত্তি নেই এবং আমরা আনন্দিত ।

কয়েকজন সৈনিক বলল যে আমাদের জন্য ঘোড়া তৈরি আছে যদি তাদের সঙ্গে আমরা আরেকটা ঘাঁটি দেখতে যাই । না বুঝে রাজি হলাম এবং তিন মাইল যাবার পর দেখলাম কয়েকটা 'হ্যাজাক' এক জায়গায় জ্বলছে । সৈনিকরা আসছে জেনে কয়েকটি যুবতী এগিয়ে এল এবং ফরাসি প্রথায়- লিজিয়নারদের শুভেচ্ছা জানাল । এরা হচ্ছে 'ক্যাম্প ফলোয়ার' । সৈনিকরা যেখানে ক্যাম্প উঠিয়ে নিয়ে যাবে- সেই মহিলারাও তাদের নতুন ক্যাম্পের কাছে থাকবে । এতে ফরাসি গভর্নমেন্টের অনুমোদন তো আছেই, বরং মেয়েদের দেখাশোনা করা ও ওষুধপথ্য দেওয়া এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সক্রিয়ভাবে তারা সাহায্য করে ।

মেয়েদের সবাইকে ওরা 'ফতেমা' বলে ডাকে, এবং আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য সৈনিকদের ভীষণ উৎসাহ দেখলাম । একঘণ্টাকাল অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'ফতেমা' দেখে বেড়ালাম । তারপর ক্যাম্পে ফিরে দেখলাম আমাদের জন্য সাদা ধবধবে চাদর ও বালিশ দিয়ে বিছানা তৈরি । আরামে ঘুমোলাম । পরদিন ভোরে দুজন সৈনিক ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা মারল । 'আন্ত্রে' বলে চেঁচালাম । আমরা তখনও বিছানায় শুয়ে । সৈনিক দুজন চার মগ কফি নিয়ে এল, আমাদের জন্য 'বেড-টি'র পরিবর্তে টেবিলের ওপর কফি রেখেই দুজনে প্রচণ্ড 'স্যালুট' দিল এবং পিছন ফিরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে । এইসব ব্যাপারে সবার ঘুম ভেঙে গেল । আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ভাবলাম আমরা বুঝি বাগদাদের হারুন-অল-রশিদ বনে গেছি- এত খাতির! সাহেব কফি হাতে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, ভাবতেই পারা যায় না!

আমরা এরকম আরাম করে শুয়ে এবং খেয়ে যেন পুনর্জীবন লাভ করলাম । আমাদের সাইকেলগুলিও ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে পড়ে একেবারে নতুন রূপ ধারণ করল । ওরা সব সাইকেল খুলে, তেল দিয়ে ঠিকঠাক করল, আমাদের মত না নিয়েই ।

প্রাতরাশ খাবার সময় আবার কফি এবং সুন্দর রুটির সঙ্গে (ক্রোয়াসাঁ) পরিচয় হল । দেখা গেল ঘাঁটিতে খাবার সুখ খুব আছে । সব ঘাঁটিতেই ভোজনবিলাসী ফরাসিরা

নানারকম খাবারের জোগাড় রাখে।

বেলা দশটার সময় ক্যাপ্টেনের অনুরোধ এল আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বলবার। মিটিংয়ে একজন আমেরিকান সৈনিক পাশেই দাঁড়াল এবং যা গল্প করলাম তা তর্জমা করে দিল। যেই বলেছি, যে প্যারিসে যাব, অমনি সবাই একসঙ্গে চিৎকার করল 'লং লিভ প্যারিস'। আমার বলা শেষ হওয়ামাত্র একজন ফরাসি সৈনিক 'মাউথ অরগ্যান' দিয়ে বাজাল 'মঁ পেয়ি পারি' অর্থাৎ প্যারিস আমাদের দেশ।

দুপুরবেলায় খেতে বসে বারবার সৈনিকদের হর্ষধ্বনি ও টোস্ট শুনলাম। বুঝতে পারলাম আমরা ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজিয়নারদের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছি। ভাষা না জানার জন্য যদিও আমরা বিনয় করেছিলাম খুব। এই অভিজ্ঞতার পর মনে মনে ঠিক করলাম ফরাসি ভাষা শিখতেই হবে। আমেরিকান সৈনিক তৎক্ষণাৎ একটা ইংরিজি-ফরাসি বই উপহার দিল। প্রথম 'লেসন' তার কাছেই নিলাম। কয়েকটি কথা শিখলাম তখনই ব্যবহার করবার মতো। 'ধন্যবাদ' কথায় কথায় কাজে লাগবে যখন বিদায় নেব। বই পেয়ে এবং প্রথমদিনে শিক্ষার পর আমি খুব উৎসাহ বোধ করলাম। বিদেশে বেড়ানোর কোনও অর্থ হয় না, যদি বিদেশি ভাষা না বলতে পারি বা তাদের সংস্কৃতি বোঝবার চেষ্টা না করি। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে লাগালাম ভাষা শিখবার কাজে।

ফরাসিরা দুদিনের মধ্যে আমাদের সমস্ত কাপড় ভালো করে ধুয়ে ইস্ত্রি করে দিল। আমাদের মনে হচ্ছে নতুন জীবন আরম্ভ করেছি। কেবল গায়ের পোকাগুলো আমাদের সুখে বাদ সাধছিল।

যা হোক অনেকদিন পর সুখে থাকার আস্বাদ নিয়ে ফরাসিদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিলাম এবং 'ও রেভোয়ার' শুনতে শুনতে আমরা মরুভূমির মধ্যে বালির পাহাড়ে মিলিয়ে গেলাম। দুপুর রোদে মরুভূমি সবসময়েই অসহ্য মনে হত। প্রায়ই মিরাজ দেখতাম, মরু-মরীচিকা যাকে বলে। স্পষ্ট দেখেছি সামনে জলাশয়, দূরে খেজুর গাছ। সবই কল্পনার চোখে দেখা। যখন প্রচণ্ড রোদের তাপ বাড়ে তখন খুব ছোট-ছোট বালুকণা মরুর ওপর ভেসে বেড়ায়, যা দূর থেকে জলাশয় বলে ভুল হয়।

গন্তব্যপথ ছেড়ে পিছনে ছুটলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মরুদেশের সবই খারাপ নয়। দুটো ভালো জিনিসের নাম করতে পারি : ১) ক্বচিৎ কখনও ওয়েসিস বা মরূদ্যান পেয়েছি, আরবদের সঙ্গে পরামর্শের ফলে। ২) খেজুর মহা পুষ্টিকর খাদ্য। খেজুরকে রোদে শুকিয়ে এবং তা পিষে ওরা ময়দা বা আটা তৈরি করে, তার নাম 'খবুজ'। আটার রুটি মিষ্টি লাগে, একটু 'চিজ' দিয়ে খেতে খারাপ লাগত না, তবে একঘেয়ে। 'উঠিতে খেজুর, বসিতে খেজুর, খেজুর করেছি সার' মাঝে-মাঝে কীর্তনের সুরে গাইতে ইচ্ছা করত।

একদিন একটা মরূদ্যানের খোঁজ পেলাম। সব ক্যারাভ্যান, উটের সার সেইদিকে চলছে। আমরা সবার শেষে চলেছি। তখন সূর্য প্রায় অস্তাচলের পথে। হঠাৎ লক্ষ করলাম বালির ওপর ওদেশি রুপোর সিকি। কাছেই আরও সিকি পড়েছিল। মহানন্দে কুড়োতে-কুড়োতে পকেট ভর্তি করলাম, মরূদ্যানের দিকে যতই এগোতে লাগলাম। তারপর অন্ধকার হয়ে এল। 'হরির লুট' কুড়োবার আর সময় ছিল না। তখন কিন্তু আমাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। তখন অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক টাকা মরুর বালির থেকে পেলাম। কেমন করে সিকি সেখানে এল ভাবতে ভাবতে মনে হল, কোনও উটের ক্যারাভ্যান থলে-ভর্তি টাকা নিয়ে মরুভূমি পার হচ্ছিল, উটের পিঠে থলে ঘষে ঘষে নিশ্চয়ই ফুটো হয়ে যাওয়াতে সিকি পড়ে গিয়েছে। হয়তো আমাদের ওইখানে পৌঁছবার ঠিক আগেই ফুটো থলি খালি করতে করতে উট এগিয়ে গিয়েছে। বালির ওপরে সিকি যা পেলাম তাই তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নিলাম। কত সিকি বালির মধ্যে ঢুকে জন্মের মতো রয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই। তাদের পেতে হলে মরুভূমির বালি ছাঁকবার ব্যবস্থা করতে হয়। যা পাইনি তার জন্য দুঃখ না করে, যা পেয়েছি সেজন্য মনে মনে স্ফূর্তি লাগছিল।

দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি একটা পয়সা সঙ্গে না নিয়ে। পয়সা না থাকার কষ্ট মর্মে মর্মে টের পাচ্ছিলাম। আশা ছিল বাগদাদে পৌঁছে দেশের কমিটির পাঠানো টাকা ও চিঠি পাব। কিছু না পেয়ে পুরোপুরি হতাশ হইনি। তখনও আশা যে কনস্তান্তিনোপলে গেলে টাকা পাব।

মরূদ্যানের কাছে যখন পৌঁছলাম, সেখানে একশো-সোয়াশো উট বিশ্রাম করছিল মালপত্র নামিয়ে। পরদিন সকালে জল খেয়ে, জলের পাত্র ভরে নিয়ে ক্যারাভ্যান রওনা হবে। অল্প চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা শীর্ণ জলের রেখা। ধারে ধারে খেজুর গাছ। আমরা খুব কষে জল খেলাম এবং উটের ভিড়ের মাঝখানে গিয়ে শুলাম। মরুভূমির পর মরুভূমি পার হয়ে চলেছি অথচ 'শিপ অব দ্য ডেজার্ট' অর্থাৎ উট সম্বন্ধে কোনও কথা বলিনি। চেহারার কথা বলতে হলে প্রথমেই মনে হয় ভগবানের সৃষ্ট সব জীবের মধ্যে উট বোধহয় সবচেয়ে খারাপ দেখতে। মুখটা আরও বিকট। যখন চলে তখন মনে হয় উটের হাড়গুলো সব খুলে যাবে এবং দেহটা বালির ওপর পড়ে যাবে। এমনই ত্রিভঙ্গ-মুরারীর মতো চলে যে দেখলে হাসি পায়, গায়ে তেমনই বোটকা গন্ধ। জন্ম থেকে আমরণ তার জলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। উটের দুধ হয় অনেক। আরবরা সেই দুধ খায়। আমাদের কফিতে যদি দুধ দিত তো বমি আসত। পরে তাতেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

উটের বিশ্রী দিকটাই বললাম এবার গুণের কথা লিখি। পৃথিবীতে যত জীব আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু উট। বালির ওপর দিনের পর দিন চলতে পারে, জল না

খেয়ে। খাবার মধ্যে বুনো ছোট গাছ, তা কাঁটাসুদ্ধ হলেও ভালোবেসে খায়। শহরে গাছ পায় না তাই সে অল্প ভুসি খেয়ে সন্তুষ্ট। উটের লোম অনেক হয় এবং বেশি দামে বিক্রি হয়। বড়লোক ছেলেমেয়েরা ইউরোপ ও আমেরিকায় শীতের দেশে দেখেছি উটের পশমের নরম ওভারকোট ব্যবহার করে। উটের মোটা চামড়ায় জুতো ও বড় ব্যাগ তৈরি হয়। উটের মাংস সর্বত্র খায় ও উট দিয়েই 'কোরবানি' সারে। উটের মতো মানুষের উপকারী জীব পৃথিবীতে কম আছে। ভারবাহী যেমন তেমনই গরমে কষ্ট সহ্য করতে পারে। যুদ্ধের সময় আবার উটবাহিনী নিয়ে আরবরা লড়তে নামে।

মরুভূমিতে নদীর ধারে যদিও একটু-আধটু চাষবাস করবার চেষ্টা হয় তাকে লোকাস্ট বা পঙ্গপাল অল্পক্ষণে নিঃশেষ করে দেয়। পঙ্গপাল কবে কখন কোন পথে যাবে সেকথা কেউ জানে না কিন্তু তাকে সবাই ভয় পায়। একদিন আমরা পঙ্গপালের ভীষণ আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম আমাদের টুপি ও মুখের ওপর জাল ছিল বলে। সর্বাঙ্গ ভালোভাবে ঢাকা ছিল তাই সে যাত্রা বাঁচলাম। পঙ্গপাল লক্ষ লক্ষ (বড় ফড়িংয়ের মতো দেখতে) আমরা যেদিকে যাব সেইদিক থেকে ভীষণ জোরে আসছিল। এত জোরে লাগছিল যে, যেখানে লাগছিল মনে হচ্ছিল যেন বুলেট বা বন্দুকের গুলির মতো কষ্টকর। আমরা যদি চলাফেরা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম, পঙ্গপাল আমাদের ওপর দিয়ে চলে যাবে এই আশায়, তা হলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। দেখতে দেখতে মানুষের ওপর পঙ্গপাল বসে এত তাড়াতাড়ি কাটতে আরম্ভ করবে যে হাড় কখানা পড়ে থাকবে। চলতে হবে যতই অসুবিধা হোক। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। একটা গাছের পাতা মুড়িয়ে খেয়ে যেতে পঙ্গপালের দলের একঘণ্টার বেশি লাগে না। একটা উটের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে অল্প সময়ে কাবু করে ফেলে। তারপর মাটিতে শুয়ে পড়লে পঙ্গপালের পাহাড় তার ওপর জমে খেতে আরম্ভ করবে। দুঘণ্টা পরে কয়েকটা হাড় ফেলে পঙ্গপাল তার গন্তব্যপথে চলে যাবে। শোনা যায়, পঙ্গপালরা মরুভূমি পার হয়ে, সমুদ্র পার হয়ে ভীষণ জোরে যেতে পারে। শুনেছি তারা ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকা থেকে এশিয়া ও দক্ষিণ ইউরোপে যাতায়াত করে। যেখানেই যায় তাদের আসতে দেখলেই লোকেরা খুব ভয় পায়। সব সবজি, গাছপালা নির্মূল করে খেয়ে পঙ্গপালরা ঝড়ের গতিতে উধাও হয়ে যায়। ভাগ্যে পঙ্গপালরা ক্বচিৎ দেখা দেয়। আমাদের দেশে দিল্লি ও রাজপুতানায় কখনও কখনও পঙ্গপালের উপদ্রব হয়।

আমরা চলতে চলতে হঠাৎ পশ্চিমমুখো ক্যারাভ্যান চলার পথে এসে পড়েছিলাম। হজযাত্রীরা যাতে বিনা অত্যাচারে যাতায়াত করতে পারে সেজন্য ১৫ মাইল পর পর একটা মাটির বাড়ি ফরাসি গভর্নমেন্ট থেকে তৈরি করেছে। প্রত্যেকদিন ফরাসি সশস্ত্র রক্ষীবাহিনীর আরবরা ঘোড়ায় চড়ে সাত মাইল মরুভূমির মধ্যে টহল দেয়, যখন অন্য

ঘাঁটির পুলিশের সঙ্গে দেখা হয় তখন পাঞ্জা বিনিময় হয়, তারপর দুই দলই নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে যায় । দিনের মধ্যে অন্তত এইরকম একটা ঘাঁটি রোজই পেতাম । ছোট্ট মাটির ঘর । মাথার ওপর একটু ছায়া দেয় বলে ঘাঁটিগুলি দেখলেও আনন্দ হত । সিরীয় বেদুইনরা অপেক্ষাকৃত শায়েস্তা হয়েছে বলে মনে হয় । আমরা বিনা দ্বিধায় তাদের সঙ্গে দিনরাত কাটিয়েছি । একদিন সন্ধ্যায় এক বড়লোক বেদুইন ('শেখ' যাকে বলে)-এর তাঁবু লক্ষ্য করে আমরা চারজন উপস্থিত হলাম সেখানে । শেখ খুব ভদ্রভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল এবং তার সঙ্গে আরবি ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ জানাল । সাধারণ আরবরা অতিথি সৎকার করতে ভালোবাসে । খুব সামান্য অবস্থা হলেও খাবার ভাগ করে খায় ।

শেখের তাঁবুর কাছেই আরও দুটো তাঁবু ছিল । প্রথমটা জানানা মহল বা স্ত্রী-পুত্রদের জন্য । দ্বিতীয়টা বন্দুকধারী অনুচরদের জন্য । প্রত্যেক শেখের জীবনে একটা অতীতের রহস্যময় কাহিনী প্রায়ই লেগে থাকে । মোটামুটি বুঝতাম যে শেখরা যেমন অসীম সাহসী তেমনই তাদের উদার মন ।

এই নিমন্ত্রণের খবর লেখবার মতো । বহুদিন পর ডিম (মুরগির) খেলাম মরুভূমির মাঝখানে । সেদ্ধ ডিম । রং হলদে এবং কুসুমটা কালো । একটি বিশেষ প্রথায় সেদ্ধ ডিম অনেকদিন খাবার উপযুক্ত থাকে । ডিম সেদ্ধ করেই খোলাসুদ্ধ একরকম তেলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয় । ডিমের খোলার ওপর যে ছিদ্র (Pores) আছে সেগুলি বন্ধ করে তেল । তারপর উষ্ট্রবরের অর্থাৎ গোবরের তালের মধ্যে একটা ডিম রেখে বাকি সবটা ঢেকে দেয় । গোলাকার বলকে বালির ওপর কয়েক ঘণ্টা রাখলেই বলটা শক্ত হয় । ডিম ঘুঁটের বলের মধ্যে থাকে বলে তার খোলা ভাঙে না বা নষ্ট হয়ে যায় না । তখন ঘোড়ার পিঠে করে ডিমসুদ্ধ ঘুঁটের বল যেখানে খুশি নিয়ে যেতে সক্ষম হয় । ওপরের ঘুঁটের খোলস ছাড়িয়ে, তারপর ডিমের খোলা খুলে ফেলে ডিম স্বচ্ছন্দে খাওয়া যায় । কতদিনের পুরনো ডিম বিশেষ করে তার হলদে রং যখন কালো হয়েছে, খাবার উপযুক্ত কিনা সন্দেহ জাগল মনে । শেখ দেখলাম একটা ডিম নিজে খেয়ে আমাকে একটা দিল । যা থাকে বরাতে বলে খেলাম । মুখে নিয়ে কিন্তু ভালোই লাগল । আরও একটা খেলাম ।

শেখ তার ঝুলির ভেতর থেকে একটা আরকের বোতল বের করে আমাকে একটু ঢেলে দিল এবং নিজেও একটা ছোট গ্লাসে নিল । (ওষুধের মিক্সচার খাওয়ার গ্লাস বলা যেতে পারে) কিছুটা আরক ঢেলে ইঙ্গিত করল খাবার জন্য । একটুখানি গলা পর্যন্ত পৌঁছতেই আমার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । আমার অবস্থা দেখে শেখ তাড়াতাড়ি ঝুলির ভেতর থেকে আদ্যিকালের একটুকরো 'চিজ' বা শক্ত 'পনির' বের করে আমাকে খেতে দিল । আমি তৎক্ষণাৎ এক কামড় দিলাম কিন্তু কী বিকট গন্ধ । না পারি গিলতে, না পারি ফেলতে । বন্ধুদের দিকে আরকের গ্লাসটা এগিয়ে দিলাম । তারা জিভে সামান্য ঠেকিয়ে

অন্যের হাতে ফেরৎ দিল। আরক মানে বুঝলাম রাশিয়ানদের ভদকা যেমন, তেমনই কড়া এবং প্রিয় মদ আরবদের কাছে।

আমাদের সম্মানার্থে শেখ একটা দুম্বা (ভেড়া) কাটার হুকুম দিয়েছিল। আমরা 'হালাল' করা দেখলাম এবং আরও দেখলাম কী অভিনব উপায়ে সামান্য চামড়া কেটে পায়ের দিকে সমস্ত চামড়াটা গা থেকে খুলে নিতে সক্ষম হল। কেবল জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে। ভিস্তিরা যে মশকে জল নিয়ে যায়, তা এমন ভাবেই তৈরি, চারটে পা বাঁধা, গলা দিয়ে জল ভরে পিঠে জল বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর গলার মুখ খুলে জল যেখানে দেবার সেখানে উজাড় করে দেয়।

অনেক রাত পর্যন্ত শেখ আরক খেল। তারপর এসে গেল প্রকাণ্ড এক তামার থালা। প্রথমেই একটা পানের ডাবা ধরনের পাত্রে এল সুরুয়া। শেখ এক চুমুক খেয়ে আমার দিকে পাত্রটা এগিয়ে দিল। আমিও এক চুমুক দিলাম এবং বন্ধুদের দিকে সুরুয়া এগিয়ে দিলাম। সুরুয়া মুখে নিয়েই বুঝেছিলাম যে অনেক ভেড়ার লোম সুরুয়ার ওপরে ভাসছিল। অল্প আলোতে বোঝা যায় না, কোনওরকমে দাঁত দিয়ে লোম ছাঁকলাম এবং একটু একটু করে গলাধঃকরণ করলাম। দ্বিতীয়বার খাবার আগে শেখের দেখাদেখি একটা আঙুল পাত্রের ধারে রেখে চুমুক দিলাম। বন্ধুদেরও বলে দিলাম সুরুয়া খাবার ছোট্ট কায়দাটা। গরম সুপ ভালোই লাগছিল। তারপর রুটি ছেঁড়ার পালা এবং তারপরই দুম্বার নরম ঝলসানো মাংস খেলাম। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মতো অনেকটা মাংস খেলাম। ভেজিটেবল বা তরকারি শাক-সবজির বালাই নেই। শেষকালে দইয়ের (রাম টক) পাত্র থেকে শেখ খেয়েই আমার দিকে পাত্রটি ধরল। একটা বড় থালার চারপাশে বালির ওপর গোল হয়ে বসে খাওয়ার নিয়ম। প্রত্যেকটি খাবার শেখ প্রথমেই একটু চেখে প্রমাণ দেয় যে খাবারে বিষ মেশানো নেই। অলিখিত নিয়ম অনুসারে অতিথি খাবে পাত্রের সেখান দিয়ে যেখানে শেখ খেয়েছে। মনে মনে জানি যে শেখ মুখ ধোয় না, তাই ঘেন্না লাগত প্রথম প্রথম, তারপর সব সয়ে গেল যখন ভাবলাম যে আমাদেরও তো আরবি বনতে বাকি নেই। কতদিন আগে স্নান করেছি তার ঠিক নেই। মুখ ধোয়ার বালাই ছিল না জলের অভাবে। তাছাড়া গায়ের পোকা তো গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল।

শেখের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা পরদিন সূর্য ওঠার পর রওনা হলাম।

তারপর একদিন আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে সিরিয়ার গভর্নমেন্ট অর্থাৎ ফরাসিরা মরুভূমির মধ্যে একটা পাকা রাস্তা করবার চেষ্টা করছিল। বালিতে ঢাকা পড়লেও আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পেয়েছিলাম যেটা প্রায় তিনশো মাইল লম্বা।

রাস্তাটা কিছু মাইল যাবার পর বালিমুক্ত দেখলাম। মনের আনন্দে অনুকূল বাতাসে ভর করে জোরে সাইকেল চালাতে আরম্ভ করলাম। প্রায় ৬০ মাইল পর রাস্তার ধারে পাহাড়ের গায়ে গুহায় দেখলাম একদল আরব আশ্রয় নিয়েছে। এরা গুহাবাসী। তার অনতিদূরে একদিন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। একটা কবরের ওপর মাথা রেখে এক তরুণী কাঁদছে। আমাদের কাছে আসতে দেখে কান্না থামাল। তার স্বামী অল্পদিন আগে মারা গিয়েছে। চারদিক ফিরে তাকালাম কিন্তু কোথাও মানুষের বসবাস তাঁবু বা বাড়ি চোখে পড়ল না। কোথা থেকে সেখানে এল এই রমণী এবং কোথায় যে সে যাবে বুঝতে পারলাম না। এইরকম আমার মনে হত শান্তিনিকেতন যাবার সময় যখন ট্রেনটা 'বনপাশ' বা 'তালিত' স্টেশনে থামত। কয়েকজন যাত্রী ট্রেনে উঠত, কয়েকজন বা নামত। কোথাও ঘরবাড়ি চোখে পড়ত না। যে যাত্রীরা স্টেশনে নামল তারা কোথায় যাবে কে জানে? তেমনই নিশ্চয়ই কোথাও আরবদের বসবাস আছে, মেয়েটির কান্না ফুরোলে সেখানে সে চলে যাবে।

কবরের কথায় মনে পড়ল যে আমরা একদিন হারুন-অল-রশিদের স্ত্রী জুবেদার কবরখানা হঠাৎ খুঁজে পেয়েছিলাম বাগদাদের থেকে অনেক দূরে মরুভূমিতে। যে বৃদ্ধ সেই কবর দেখাশোনা করত সে মনে করত জায়গাটা পীঠস্থান। তার যতদিন সাধ্যে কুলাবে ততদিন কবরে সন্ধ্যায় বাতি দেবে।

কয়েকদিন পরেই আমরা হালেব শহরে পৌঁছলাম। করাচি ছাড়বার পর এই প্রথম বড় শহর দেখলাম। পাকা বাড়ি, পাথরে বাঁধানো রাস্তা এবং দুপাশে দোকান, কফিখানা ইত্যাদি পর পর বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে।

আমরা একটা সিরীয় আরবি হোটেলে আশ্রয় নিলাম। মোটামুটি পরিষ্কার। আমাদের ঘরটা রাস্তার ওপরেই। একটা বিশেষত্ব দেখলাম এই যে, ঘরের এক ধারে দড়ি ঝুলছে, সেটা টানলে কুয়ো থেকে বালতি ভর্তি জল উঠে আসে। ঘরটার ভাড়া ১৫ টাকা। চারটে খাট ছিল। বিছানা চাইলে পাওয়া যায়, কিন্তু তারজন্য আলাদা দাম দিতে হয়। কফি ছাড়া কোনও খাবার পাওয়া যায় না। আমরা শহর ঘুরে যেখানে ভালো লাগত সেখানেই খেতাম। গ্রিস থেকে আরম্ভ করে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব ও পূর্ব-উত্তর কোণে খাওয়ার পদ্ধতি একই ধরনের: বেগুন কিংবা টম্যাটোর ভেতর কিমা মাংসের পুর- দিয়ে ভাজা প্রায় সব জায়গায় রাঁধতে দেখেছি এবং খেয়েছি। বেশ সুস্বাদু। মশলা খুব কম ব্যবহার করে। দইয়ের চলন খুব।

রাত্রে একটা কার্নিভ্যাল দেখতে গেলাম। সিরিয়ার ফরাসি শাসক ও তাঁর স্ত্রী এলেন একটু পরেই। সবাই উঠে দাঁড়াল। ভাইসরয় ও তাঁর স্ত্রী জনসাধারণের অভিবাদন গ্রহণ করে তাদের দিকে দুহাত তুললেন। একটা একটু উঁচু জায়গায় দুটো বড় বড় চেয়ার

সাজানো ছিল, সেখানে বসলেন । ভারতবর্ষ থেকে সাদা-কালোর পার্থক্য দেখার পর এরকম অবাধ মেলামেশা দেখে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । ব্যান্ডপার্টি নাচের একটা সুর ধরতেই ভাইসরয় একজন সিরীয় আধুনিকা মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গে নাচবার ইঙ্গিত করলেন । নাচ শুরু হল । ইতিমধ্যে একজন যুবক, আরব আর্মি অফিসার ভাইসীরিনের সামনে এগিয়ে এল এবং 'স্যালুট' করে নাচবার আমন্ত্রণ জানাল । বিনা দ্বিধায় ভদ্রমহিলা নেমে এসে আর্মি অফিসারের এক হাত ধরলেন এবং অন্য হাত তাঁর কাঁধের ওপর রেখে অবাধে নাচতে আরম্ভ করলেন । আমার কাছে এদৃশ্য এত অদ্ভুত মানবতাপূর্ণ ও স্বাভাবিক মনে হল যে তাতে ফরাসি জাতির ওপর আমার শ্রদ্ধা আরও বাড়ল । যখন 'হাঁ' করে সব কীর্তিকলাপ দেখছি, তখন একটি রুশ ভদ্রমহিলা, আমাদেরই বয়সী, কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং নাচবার নিমন্ত্রণ জানালেন । আমি তৎক্ষণাৎ বললাম : মাফ করবেন, আমি নাচতে জানি না । আমার কথায় কান না দিয়ে একরকম জোর করে হাত ধরে টানলেন । কখনও বলরুম ড্যান্সিং করিনি । দেখতে অবশ্য খুব ভালো লাগছিল । রুশ ভদ্রমহিলা নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন যে আমরা একই হোটেলে থাকি এবং আমাদের কথা তিনি জানেন । খেয়াল করিনি কখন আমার হাত ধরে টানতে টানতে আসরের মাঝখানে নিয়ে ফরাসি ভাষায় আমায় নাচতে বললেন । আমি টপ বুট পরে, রুশ মহিলাটিও লাল চামড়ার টপ বুট পরে । কাজেই পা মাড়াবার ভয় ছিল না । তবু নাচ বিশেষ এগোচ্ছিল না । না বুঝি গানের ভাষা, না তার সুর ও ছন্দ । তালটা একটু-একটু মাথায় ঢুকছিল এবং তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার চেষ্টা করতে লাগলাম । মনে হল বোধহয় শিখতে পারব । নাচের বাজনা থামল, নাচও থামল । সবাই হাততালি দিল এবং তখনই বাজনা আবার বাজতে শুরু করল । আগের তাল থেকে অন্য ধরনের । একে 'ওয়াল্টস' বলে । আমার মনে মনে যে ভরসা হয়েছিল এই কথা ভেবে যে আমি নাচ শিখতে পারব, তা নিমেষে উবে গেল । কিন্তু ভদ্রমহিলার উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না । বরং আরও উৎসাহের সঙ্গে আমাকে টানতে এবং ঠেলতে ঠেলতে বলতে লাগলেন ফরাসি ভাষায় 'এক দুই তিন, এক দুই' ইত্যাদি । এই তাল বোঝা খুব সোজা । তাই একটু সাহসে ভর করে নাচতে আরম্ভ করলাম, তখনই দেখি লাল বুটের ওপর দু-চারবার মাড়িয়ে দিয়েছি । নাচ শেষ হবার পর আমি ধন্যবাদ দিয়ে ভদ্রমহিলার টেবিলে পৌঁছে দিতে গেলাম । সেখানে এক রুশ যুবক, আমাদের থেকে দু-চার বছর বড় হবে, দাঁড়িয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরল এবং পরিষ্কার ইংরিজিতে বলল- এস, তোমরা আমাদের টেবিলে যোগ দাও । আজ ১৪ জুলাই- ফরাসিদের সবচেয়ে বড় পরব । বুঝলাম, রুশ দম্পতি আমাদের হোটেলে লক্ষ করেছে । আমি বন্ধুদের ডেকে তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম । বেশ গল্প জমে উঠল । জানলাম রুশ যুবকের নাম মিখায়েল ও তরুণীর নাম রেনে । এই নামেই তারা পরিচয় দেয় বিখ্যাত নাচিয়ে হিসাবে । এদের অবস্থা এককালে

ভালো ছিল, ইংরেজ গভর্নেসের কাছে তাদের ইংরিজি ভাষা শিক্ষা। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর দেশ ছেড়ে বিদেশে বিদেশে কসাক নাচ দেখিয়ে জীবিকার্জন করত। নাচ দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ পেলাম আমরা। মিখায়েল বলল যে তাকে সারাদিন এত নাচ অভ্যাস করতে হয় যে তারপর বলড্যান্স না করে বরং একটুক্ষণ বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করে। ওদের দুজনের বাড়ি ছিল লেনিনগ্রাদ শহরের কাছেই একটা শহরতলিতে। মনে মনে ভাবলাম যে যতদিন রেনের রূপ ও যৌবন আছে ততদিনই নেচে বেড়ানো সম্ভব, তারপর ইস্তফা। মিখায়েল স্থপতিবিদ্যায় ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে বেরিয়েছে, এমন সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯১৭ সালে রুশ দেশে বিপ্লব এবং লেনিন জয়ী হলে কমিউনিজমের ধাঁচে গভর্নমেন্ট গড়বার তোড়জোড় যখন পূর্ণোদ্যমে চলছে, তখন অনেক অবস্থাপন্ন লোকেরা দেশ ছেড়ে চারদিকে পালায়। মিখায়েল পরিবারও দক্ষিণ তুর্কি দেশে আশ্রয় নিয়েছিল! ওইরকমভাবে নাচ দেখিয়ে তারা ইরান পর্যন্ত যাবে, তারপর কী করবে ওরা জানে না। হয়তো তুর্কি কিংবা সিরিয়াতে বাড়িঘর তৈরি করবার কাজ নেবে।

পরদিন সকালে বারান্দায় বসে কফি ও রুটি খেতে খেতে এক আশ্চর্য ঘটনা দেখলাম। রাস্তার ওপারে ফুটপাথে বসে দুজন ফরাসি ও দুজন সিরীয় আরব সৈনিক তাসে জুয়া খেলছিল। আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসা ফরাসি সৈনিকটি তাসের মধ্যে চালাকি করে অন্য তাস গুঁজে দিচ্ছিল এবং যখন ধরা পড়ল, তখন আরব সৈনিকটি দাঁড়িয়ে উঠে লাথি মারতে লাগল ফরাসি সৈনিককে। লোকের ভিড় জমে গেল। একজন ফরাসি অফিসার সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, সে সব কথা শুনে আবার একটা লাথি মেরে চলে গেল।

আমাদের কল্পনার বাইরে কালাধলার কতটা সমান অধিকার ফরাসি উপনিবেশে। ফরাসিদের মধ্যে বর্ণবৈষম্যবোধ সত্যিই খুব কম দেখলাম। ফরাসি ভাষা শেখবার ইচ্ছা হল। রেনের সঙ্গে দেখা হতে বললাম আমার ইচ্ছার কথা। কী উৎসাহ তার! তখনই একটা বই কিনতে বেরল এবং বিকালের মধ্যে দশটা অতি আবশ্যকীয় চলতি কথা শিখে ফেললাম।

এলেপ্পো শহরের আরবি নাম হচ্ছে হালেব। বহু পুরনো ঐতিহাসিক শহর। বাইবেলের যুগ থেকে এই শহরের নাম পাওয়া যায়। অনতিদূরে দামাস্কাস আরেকটি বড় শহর। সেখানে বাজারে বিশেষ করে চামড়া, পেতলের জিনিস এবং সুতির কাপড় খুব বিক্রি হয়। হালেব শহরের বাজারও বিখ্যাত, যদিও দামাস্কাসের সঙ্গে তুলনা হয় না। বায়রুত আরেকটা নামি শহর, সমুদ্রের ওপরই ৩০ মাইল দূরে। সেখানে বালবেক নামে একটি গ্রিক মন্দিরের (জুপিটারের) ধ্বংসাবশেষ পুরনো দিনের বৃহত্তম গ্রিক ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দেয়। একেকটি পাথরের থাম এত বিরাট যে বলা যায় না। ৭৫০ টন ওজন হবে প্রত্যেকটির। সেই আদি যুগে যখন ক্রেন, গাড়ি, লোহার যন্ত্রাদি কিছুই ছিল না তখন কেমন করে খনি

থেকে পাথর উঠিয়ে তার ওপর নানাবিধ কাজ করে উঁচুতে যথাস্থানে তাদের তুলেছিল এবং জুপিটারের মন্দির করেছিল, তা অতি বিস্ময়কর জিনিস । এই শহরে আমেরিকানরা একটা ইউনিভার্সিটি করেছে । বেশিরভাগ প্রফেসর আমেরিকান । আধুনিক টেকনোলজি এবং কারিগরিবিদ্যা শেখানোর জন্য এই ইউনিভার্সিটি সর্বত্র সুবিদিত ।

কয়েকদিন হালেবে থেকে কলকাতার সদ্য প্রকাশিত 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রে আমাদের ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধে লিখে ছবি সমেত পাঠালাম । আমার সাহিত্যসেবী ভগ্নীপতি জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে । আমার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মীয়তা ছিল । তার ভাগলপুরের বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছি । একবার মাত্র অল্পক্ষণের জন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও দেখেছিলাম সেই বাড়িতে ।

'বিচিত্রা' তখন সাহিত্য আসরে খুব সুনাম অর্জন করেছিল রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' প্রথম প্রকাশ করে ও প্রায় সেইসঙ্গে উপেন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পথের পাঁচালি'ও নিয়মিত বার করে । উপেন্দ্রনাথ পৃথিবী ভ্রমণের কাহিনী প্রথম প্রকাশ করে আমাদের সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল খুব বাড়িয়েছিলেন ১৯২৭ সালে ।

যতটুকু অবসর সময় পেতাম আমি 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'তে শনিবারের দুপুরবেলায় যাযাবরের ভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিকভাবে বলবার জন্য লিখতাম । বীরেন রায় সেটা পড়তেন কলকাতায় ।

সেই সময় একটি সিরীয় যুবকের সঙ্গে আলাপ হল । ভারতবর্ষ থেকে এসেছি জেনে খুব অবাক হয়ে গেল । একটি স্কুলের সঙ্গে সে জড়িত ইংরিজি শিক্ষক হিসাবে । সে আমাকে নিমন্ত্রণ জানাল তার স্কুলে আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বলতে । আমি রাজি হলাম এই শর্তে যে, দুআনা প্রবেশমূল্য লাগবে যদি কেউ শুনতে চায় । পরদিন বিকালে স্কুলে গেলাম । অনেক ছাত্রের ভিড় হয়েছে দেখে মনটা আশ্বস্ত হল । অশোক ও আমি দুজন বললাম । শিক্ষক কথাগুলি আরবিতে তর্জমা করে ছেলেদের সামনে ধরলেন । সবার খুব উৎসাহ দেখলাম । আমাদের যথেষ্ট লাভ হল, প্রায় পঁচিশ টাকা রোজগার করে ভীষণ স্ফূর্তি লাগল, অনেকদিন 'পকেট গড়ের মাঠ' ছিল । প্রথম আয় হয়েছিল যখন মরূদ্যানের কাছে রুপোর সিকি বালি থেকে কুড়িয়ে চারজনে পেয়েছিলাম । সেটা টাকায় হিসাব করলে প্রায় ১৭৫ টাকা হবে । তারপর এই ২৫ টাকা ।

ফরাসি ভাষা শেখা আরম্ভ করলাম আমরা চার বন্ধু । দুঃখের বিষয় যে বন্ধুরা দুদিন পরেই হাল ছেড়ে দিল । তখন আমার আরও জিদ চাপল যে নানা বিদেশি ভাষা শিখতেই হবে । সহজে শেখবার ক্ষমতা আমার আছে, তা আমি জানতাম না । অন্যদের সঙ্গে একটু-একটু করে কথাবার্তা বলতে পারছি এবং তারা তা বুঝতে পারছে দেখে ভীষণ

উৎসাহিত বোধ করলাম । সময়ের অভাবে রেনের কাছে যতটুকু শিখতে পারলাম তা সযত্নে সঞ্চিত করে রাখলাম, ভবিষ্যতে আরও ভালো করে শেখবার ও ব্যবহার করবার জন্য ।

সিরীয় দেশের শেষ ঘাঁটি উত্তর-পশ্চিমদিকে ঠিক তুর্কির নিচেই 'ইস্কাদ্রুন' বা আলেকজান্দ্রেটা শহর অভিমুখে চলেছি । আরেকটি বড় শহর আছে প্রায় একই নামে, আরেকজান্দ্রিয়া, মিশর দেশে । লোকেদের বলতে শুনেছি যে, গ্রিক যোদ্ধা আলেকজান্ডার দুই হাজার বছর আগে এইসব জায়গা জয় করেছিলেন ভারতবর্ষ অভিযানের পূর্বে । আমরা মোটামুটি আলেকজান্ডারের সৈনিকরা যে পথে যাওয়া-আসা করেছিল সেই পথে- 'বিপথে' বললেই ভালো হয়- চলেছি ।

ফরাসি সীমান্তবাহিনীর একটি দলের মধ্যে আমরা গিয়ে পড়লাম । মাঝখানে ২-৩ মাইল 'নো-ম্যানসল্যান্ড', ওপারে তুর্কি । ফরাসিরা এমন আমোদপ্রিয় যে সহজেই আনন্দ প্রকাশ করে, বিশেষ করে এমন দূর দেশ থেকে যদি কোনও লোক তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ে । দু-চারটি ফরাসি কথা বলতেই ঘাঁটির ক্যাপ্টেন ও অন্যান্যদের মুখে দেখলাম এক গাল হাসি । আসলে 'ডের-এর-জোর' থেকে ফরাসিরা বেতারে আমাদের খবর আগেই এদের জানিয়ে দিয়েছিল । তার ফলে আমাদের জিনিসপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মেরে বলল 'সব ঠিক হ্যায়', কিন্তু একটা শর্ত ছিল, ফরাসিদের সঙ্গে এক সপ্তাহ থেকে তাদের আতিথ্য স্বীকার করতে হবে । এক সপ্তাহ খুব বেশি হবে বলে অনেক তোষামোদ করে তিনদিন থাকবার কথা দিলাম ।

এই সীমান্ত-ঘাঁটির নাম ছিল 'ডের তিয়ল' । সেখানে প্রচুর মজুদ খাবার রাখা ছিল । জেনারেটর দিয়ে ইলেক্ট্রিক আলোর বন্দোবস্ত ছিল । সেটা তাদের মস্ত গর্বের বিষয় । সীমান্তের ওপারে তুর্কির ঘাঁটি যখন রাতের অন্ধকারে, এপারে ফরাসিরা তখন আলো দিয়ে আর নাচ, মিউজিক দিয়ে সরগরম রাখত । আমাদের ফরাসিরা বোঝাল যে কখনও ট্যুরিস্ট বা ব্যবসাদার এই ঘাঁটিতে আসেনি পূর্বদিক থেকে । যে কজন লোক এসেছে তারা পশ্চিম থেকে পুবদিকে যাত্রা করেছে । তুর্কির লোকেরা আমাদের বেগ দেবে সে কথা জানাল । আমাদের তখন 'নান্যপন্থা'র অবস্থা । ফরাসিদের সঙ্গে খুব হই হই করে ভালো ভালো খেয়ে তিনদিন পরে সকালবেলায় রওনা হলাম তুর্কির দিকে । আমাদের পিছনে ফরাসি ব্যারাকের সব সৈনিকরা দাঁড়িয়ে রইল ও শুভেচ্ছা জানাল । কেউ কেউ বলল অসুবিধা হলে 'চলে এস', অর্থাৎ পৃথিবী ভ্রমণ জলাঞ্জলি দিয়ে সিরিয়ার সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে বাকি জীবন কাটাই, এই যেন তাদের ইচ্ছা ।

তুর্কি সীমান্তের দিকে যতই এগোতে লাগলাম ততই স্পষ্ট হয়ে উঠল তুর্কিরা আমাদের কীরকম অভ্যর্থনা দেবে । ঘাঁটির সব সৈনিক রাইফেল উঁচিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে

দাঁড়িয়ে ছিল, আমরা যেন ঘাঁটি দখল করতে যাচ্ছি । যেহেতু আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকের দুটো করে বন্দুক ছিল । আমাদের বন্দুক খাপের ভেতরেই ছিল, তবু এমনই কড়া মেজাজে তুর্কি সৈনিকরা আমাদের গ্রহণ করল । আসল ব্যাপারটা মনস্তাত্বিক । সিরিয়া তুর্কির অধীনে একটা প্রদেশ ছিল । বিগত মহাযুদ্ধে (প্রথম) তুর্কি হেরে গেল, তার অধীনস্থ সব দেশ যেমন মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া (এখন ইরাক), মিত্রদলের মধ্যে ইংরেজ, ফরাসিরা সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল । বিরাট তুর্কিকে কেটে-ছেঁটে ছোট করাই উদ্দেশ্য ছিল । সেইজন্যই তুর্কি এই দুই জাতিকেই বিশ্বাস করে না । তাদের ভয়, ইংরেজ বা ফরাসি যে কোনও অছিলা করে তুর্কি গ্রাস করবে । তারপর চালাবে ভারতবর্ষ পর্যন্ত একচ্ছত্র রাজত্ব ।

আমাদের ওপর তুর্কি সেনানীদের রাগ হবার একটা কারণ আমরা পরে আবিষ্কার করি । আমাদের নিয়ে ফরাসিরা আমোদ-আহ্লাদ করেছে । তারা লক্ষ করেছে এবং আমাদের মনে করেছে তাদেরই একটা ছোট দল ।

আমরা এক হাতে সাইকেল ধরে অন্য হাত উঠিয়ে এগোতে লাগলাম, আমাদের মনোভাব অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি এই ভাব জানালাম । ওরা বন্দুক নামাল না-আমাদের দিকে লক্ষ্য করে একটা হুঙ্কার ছাড়ল । আমরা বুঝলাম আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে । একটু থেমে হাতে সাদা রুমাল ওড়াতে ওড়াতে আমরা তুর্কি ঘাঁটিতে পৌঁছলাম । তুর্কি ও ফরাসি ভাষায় ওরা নানারকম প্রশ্নবাণ ছাড়ল । আমরা ফরাসি বুঝি না, জানালাম, তবে শেখবার ইচ্ছা রাখি । একটা বই সঙ্গে আছে, সেটা ফরাসি প্রাইমার । পরিচয় দিলাম যে আমরা ভারতবর্ষ থেকে আসছি, সমস্ত পৃথিবী সাইকেল ঘুরব । কিছু বুঝল না, ইন্ডিয়া বলে একটি দেশ আছে নাকি কোথায়, কে জানে । আমরা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক বাংলা, হিন্দি ও ইংরিজিতে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ফল হল না । পাসপোর্ট দেখালাম, উল্টো করে ধরেই পড়তে আরম্ভ করল । যখন ছবিটা উল্টো দেখল তখন বুঝল হরফগুলো সব উল্টো পড়ে ফেলেছে । ফলে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য হাসাহাসি হল । এমন সময় ওদের নজরে পড়ল তুর্কি ভাষায় লেখা ছাড়পত্র সম্বলিত স্ট্যাম্পের ওপর । ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন, যে বন্দুক সাইকেল ও সমস্ত মালপত্র তাঁদের দিতে যাতে ভালো করে পরীক্ষা করতে পারে আমরা কে, কী উদ্দেশ্য আমাদের ইত্যাদি । ব্যস, শুরু হল সব তন্নতন্ন করে খোঁজার পালা, একজন বন্দুক খুলে দেখল টোটা ভরা আছে কিনা, ক্যামেরার ভেতর কী আছে দেখবার জন্য সেটা খুলতে বলল অর্থাৎ নেগেটিভের বারোটা বেজে গেল । জিনিসপত্র খুলে সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখল । আমাদের জামাকাপড় ভালো করে পরীক্ষা করল । আমরা জানতাম অশেষ ধৈর্য সহকারে সব সইতে হবে, ওদের সন্দেহ তো আছেই, তার কোনও বাস্তব কারণ দেখলে তো আর রক্ষা নেই, কাছেই গাছের কাছে নিয়ে

বলবে ‘হাত তুলে পিছন ফিরে দাঁড়াও’ । তারপর একটা বুলেট জানিয়ে দেবে পৃথিবী ভ্রমণ কোথায় এবং কতদূর!

ওরা যতই কঠিন ব্যবহার করুন না কেন, আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা সারাক্ষণ হাসিমুখে সব প্রশ্নের জবাব দেব । বললাম, কামাল পাশাকে আমার দেশের লোকেরা কত শ্রদ্ধা করে । আরেকটু হলে নজরুল থেকে কবিতা আওড়াচ্ছিলাম ‘কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই’ ।

সৈনিকরা আমাদের মুখে কামালের নাম শুনে আরও সন্দিগ্ধভাব প্রকাশ করল । সারাদিনব্যাপী পরীক্ষা যখন শেষ হল ভাবছি, ক্যাপ্টেন বলল যে আমাদের আলাদা ইন্টারনাল পাসপোর্ট লাগবে । সেটা আদানা শহর (৩০০ মাইল দূরে) থেকে আনতে হবে । আগামীদিনের প্রথমেই একজন লোক বা সৈনিক সেখানে যাবে এবং ছাড়পত্র নিয়ে আসবে । ১০-১৫ দিন দেরি হবে । এতদিন আমরা কোথায় থাকব জিজ্ঞাসা করাতে গাছতলা দেখিয়ে দিল ।

Internal Passport আসার অপেক্ষায় আমাদের এরপর গাছতলায় বসবাস শুরু হল । আমাদের কাছ থেকে ক্যামেরা আপাতত কেড়ে নিল । কোথায় তিন মাইল দূরে ফরাসিদের নৃত্য আমাদের নিয়ে, আর সীমান্তের এপারে শুরু হল নিগ্রহ । জল কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করাতে ঝরনা দেখিয়ে দিল । আমি হুকুম চাইলাম অদূরে গ্রামের বাজার থেকে কিছু খাবার আনবার । সৈনিকরা আবেদন মঞ্জুর করল এবং সঙ্গে একজন তুর্কি যুবক আমার সঙ্গে চলল । গ্রামে সিরীয় টাকা বদলে কিছু তুর্কির টাকা নিলাম । হাতরুটি ও কিছু ঝলসানো মাংস ও এপ্রিকট নিয়ে ফিরলাম । যুবকটি আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করল, যদিও অন্যরা সবাই আমাদের দেখছিল সন্দেহের চোখে ।

কাছেই উত্তরদিকে উঁচু পাহাড় বেশিরভাগ আকাশ জুড়ে ছিল । আমাদের গন্তব্যপথ ছিল টরাস পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে । অল্প দূরে পাহাড়ের ওপর কোনও এক গ্রামের ভেতর দিয়ে জল নিচে নেমে যাচ্ছিল । তারপর ঝরনায় পরিণত হচ্ছিল । বলা বাহুল্য, সে জলের প্রাচুর্য দেখে খুব তৃপ্তি করে স্নান করলাম ও খেলাম । ফলে আমাদের চারজনের অল্পবিস্তর শরীর খারাপ হল । তুর্কি ঘাঁটির এক ডাক্তার এসে ওষুধ দিলেন এবং ঝরনার জল খেতে বারণ করলেন । ডাক্তার অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত লোক । ফরাসি ভাষা জানেন । সে ভাষা ছিল শিক্ষিতদের জন্য, যেমন আমাদের কাছে ইংরিজি । তখনকার দিনে ইউরোপের অনেক দেশে ফরাসি ভাষা ব্যবহার হত । অনেক দেশের কোর্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বা রাজদরবারের ভাষা ফরাসি ছিল, এমনকী জার্মানি ও রাশিয়ায় । সবাই জানে যে বিখ্যাত ফরাসি লেখক ভলটেয়ার, জার্মানিতে গিয়ে অনেকদিন তাঁর বন্ধু, সম্রাট ফেডরিক দ্য গ্রেটের কাছে ছিলেন ।

তুর্কি ডাক্তার আমাদের ভ্রমণের সব কথা শুনে বললেন যে 'হিন্ডলি' নামেই তাঁরা ভারতবাসীকে জানেন । অনেক হিন্ডলি গত যুদ্ধে তুর্কির হয়ে লড়েছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে । ব্যস, ওই পর্যন্ত । ডাক্তারের আর কোনও জ্ঞান ছিল না আমাদের দেশের কোনও বিষয়ে ।

সাতদিন কেটে গেল, আমরা সীমান্ত ঘাঁটিতে যেতাম ও আমাদের ইন্টারনাল পাসপোর্ট বা পারমিট-এর খোঁজখবর নিতাম । আদানা থেকে লোক তখনও ফেরেনি । দশদিন পর আমরা গাছতলায় জিপ্সিদের মতো দিন কাটাচ্ছি দেখে ক্যাপ্টেন বলল যে আমরা আদানা যেতে পারি । সেখানে পুলিশ অফিসে হাজিরা দিতে হবে । বন্দুক ছাড়বে যে দিন আমরা তুর্কি ছেড়ে যাব । ক্যামেরার বেলায়ও একই অবস্থা ।

অবশেষে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা সৈনিকদের ধন্যবাদ দিয়ে তুর্কির গভীরে প্রবেশ করতে শুরু করলাম । পাহাড়ি পথ যদিও তবু বেশ চওড়া । যুদ্ধের সময় বড় বড় গাড়ি ও কামান চলেছিল এই পথে । তারপর সারানো হয়নি । যেখানে-সেখানে বড় বড় পাথর পড়েছিল । আমরা দেখতে দেখতে অনেক উঁচুতে উঠেছি । সীমান্ত ঘাঁটি ডের তিয়ল অস্পষ্ট দেখা গেল । পথে আলেকজান্দ্রেটা শহরে গিয়েছিলাম যখন সমুদ্রের ধারে ধারে যাচ্ছিলাম । সামনে ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্ত । কাপড়চোপড় ফেলে আমরা সমুদ্রের নীল জলে লাফ দিলাম । কিন্তু বহুদূর জলের ওপর হাঁটার পর গভীরতা বাড়ল না দেখে ভয় হল । সৈকত অনেক চওড়া । জনমানব নেই । অগভীর জল কোমর পর্যন্ত তাইতে স্নান করে উঠলাম । ভূমধ্যসাগর দেখে বিশ্বাস হল যে ইউরোপ আর বেশি দূর নয় ।

সারাদিন পাহাড়ি পথ ধরে একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম । গ্রামের লোকেরা ভালো । থাকবার জন্য ব্যবহারের উপযুক্ত একটা ঘর পেলাম । কাঠের ওপর কম্বল বিছিয়ে শুলাম । খাবার জন্য হাতরুটি ও বেগুনের তরকারি আমরা জোগাড় করে নিলাম ।

পরদিন সকালে উঠে ঝরনার জলে মুখ-হাত ধুয়ে কফির চেষ্টায় বেরোলাম । এক বৃদ্ধ রোদ পোয়াচ্ছিল, তার নাতনি এক কেটলি কফি ও চারটে কাপ এনে আমাদের দিল । অনেকদিন পর আবার কফি খেয়ে আমরা তৃপ্ত হলাম ।

আমি লক্ষ করলাম যে তুর্কি ভাষা শেখা খুব সহজ, বিশেষ করে ওরা আরবি অক্ষর ফেলে রোমান লেটার ব্যবহার করছে বলে । খুব মন দিলাম তুর্কি শেখবার জন্য ।

বহুযুগ ধরে তুর্কিরা নিশ্চিন্ত ছিল যে পুবদিক থেকে তাদের কেউ আক্রমণ করতে পারবে না । বলে রাখা ভালো যে, তুর্কিদের ভালো যোদ্ধা বলে সুনাম আছে । টরাস পাহাড়কে তুর্কিরা পবিত্র বলে মনে করে । ফরাসি ইঞ্জিনিয়াররা এই কঠিন পাহাড়ে একটা

রেলপথ তৈরি করেছে। সেটা সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকছে ও বেরোচ্ছে। এই পথ তৈরি করায় খুবই বাহাদুরি আছে। বেনারসে পৌঁছবার সময় যখন ট্রেন গঙ্গার ওপর দিয়ে যায় যাত্রীরা একসঙ্গে বলে 'গঙ্গামায়ী কি জয়', 'কাশী বিশ্বনাথ কি জয়'। তেমনই টরাস-এর যাত্রীরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়েই পাহাড়ের মাহাত্ম্য স্বীকার করে তার জয়গান করে। আমরা আমাদের সাইকেল সহ সেই টরাস পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলেছি। যার উচ্চতা কয়েক হাজার ফুট তো বটেই। আজ টরাস পর্বতমালা লোকবিরল বটে কিন্তু ৪,০০০ বছর আগে নিশ্চয় বহু লোকের বাস ছিল ওখানে যখন দ্বিতীয় ফেরো আমেন এসহেটের সৈন্যরা হারান থেকে নিনেভা পর্যন্ত যত ভ্রাম্যমাণ ইহুদি জাতি ছিল সবাইকে বশ্যতা স্বীকার করিয়ে পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সবটাই জয় করেছিল। তারপর অনেক রাজত্বের উত্থান-পতন হয়েছে এইখানে। গ্রিক, রোমান, ইহুদি, এসিরিয়ান, ইজিপ্সিয়ানরা পর পর এসেছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

এককালে ইহুদি ও ইজিপ্সিয়ানরা বেশ সদ্ভাবের সঙ্গে এই অঞ্চলে সহাবস্থান করেছে বহু শতাব্দীর পর শতাব্দী। একজন আরেকজনের বিপদে সৈন্য অস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে রক্ষা করেছে। ৭২৪-৭২১ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে এই অঞ্চলে ইহুদিদের বিখ্যাত রাজা ডেভিড ও পরে সোলেমান রাজত্ব করেন। বাইবেলে লিখিত আছে যে, সোলেমান তাঁর বংশানুক্রমিক রাজত্ব রক্ষা করবার জন্য ইজিপ্টের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

ইজিপ্সিয়ানদের সঙ্গে ইহুদিদের চিরকাল মারামারি কাটাকাটি ছিল না। একবার ইহুদিরা, চতুর্থ আমেনোফিস ইজিপ্টের রাজার কাছে সামরিক সাহায্য চাইতে কয়েকজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোককে পাঠিয়েছিলেন। রাজা আমেনোফিস আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হন। কেবলমাত্র সামরিক সাহায্য দিয়ে ক্ষান্ত না হয়ে, রাজা নিজের ধর্মমত পর্যন্ত বদলে একেশ্বরবাদী হয়ে গেলেন।

রোমানরা দেশ জয় করে দুহাজার বছর আগে ইহুদিদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে। প্রায় শতাধিক বছর পরে কালিগুলার রাজত্বে আবার ভীষণ অত্যাচার হয়।

অনেক ভাগ্য বিপর্যয়ের পর ইহুদিরা শান্তিতে বাস করতে পায় যখন ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কিরা রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হল। অটোমানদের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিদের অবস্থা আবার খারাপ হয় কিন্তু তারা সর্বত্র অর্থকরী বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। আজও যে কোনও অবস্থার লোকই হোক না কেন, ইহুদি সহজেই ভাগ্যোন্নতি করে এবং অর্থবান হয়। সবাই এই জন্য অন্যায়ভাবে এদের প্রতি ঈর্ষা করে। সবার ধারণা, ইহুদি মাত্রেই কৃপণ এবং স্বার্থপর। এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে ইহুদিদের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষী অনেক জন্মেছেন। সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ও সঙ্গীতে এঁদের বিরাট অবদান আছে।

আমি পরে অনেক ইহুদিদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছি এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো বাস করেছি । তারা আমাকে ভাষা শিখিয়েছে, খাইয়েছে, সাদরে পরিবারের সবার মধ্যে আপনার করে নিয়েছে । এজন্য আমি কৃতজ্ঞ ।

কামাল পাশার হুকুমে একদিনে সমস্ত তুর্কি মেয়েরা বোরখা বর্জন করে সাধারণভাবে বাঁচবার ও পুরুষের সমতুল্য কাজের অধিকারী হল! মুসলমান জগতে এর চেয়ে বড় বিপ্লব হয়েছে বলে জানি না ।

পরদিন সকালে মণীন্দ্র একটা খুব সুখবর দিল । বড় বড় গাছের ওপর দিয়ে বিস্তৃত জালের মতো বিছিয়ে ছিল আঙুরের লতাগাছ । অজস্র পাকা আঙুর (ছোট সাইজের) ভর্তি ছিল গাছে । এই আঙুর থেকে কিসমিস হয় । সম্পূর্ণ বুনো কিন্তু মিষ্টি ফল আমরা পাড়তে ও খেতে আরম্ভ করলাম । আঙুর দিয়ে পেট ভরালাম, আরও অনেক সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলাম ।

যেখানে উতরাই সেখানে সাইকেলে চড়ে মাইলের পর মাইল পার হয়েছি । তারপর হেঁটে, সাইকেল টানতে টানতে ও শরীরের ওপর বোঝা বইতে বইতে কত মাইল চড়াই উঠেছি তার ইয়ত্তা নেই ।

দুদিন পর জঙ্গলের মধ্যে আনন্দ আরেকটি জিনিস আবিষ্কার করল । গাছভরা আখরোট । এবং অনতিবিলম্বে আমরা পাকা এপ্রিকট গাছভর্তি পেলাম । হাতে সামান্য টাকা সম্বল, সেটা খরচ না করে ঠিক করলাম যে ফল খেয়েই যতদিন পারি চলব । আদানা তিনশো মাইল দূরে, পৌঁছতে অনেকদিন লাগবে ।

সেই নির্বান্ধব স্থানে যেখানে জঙ্গল ও পাহাড়ের মধ্যে কোনও লোক দেখিনি, সেখানে একদিন ঘোড়ায় টানা একটা মালগাড়ি দেখলাম । এই গাড়িতে পোস্ট অর্থাৎ চিঠিপত্র বহন করা হয় বলে চালকের ডানদিকে একটা তুর্কির পতাকা উড়ছিল । মালের মধ্যে ছিল গম ও চিনি ইত্যাদি, আলেকজান্দ্রেটা থেকে আদানা নিয়ে যাচ্ছে ।

কয়েকটি এইরকম মালটানা পোস্টাল ঘোড়ার গাড়ি দেখলাম । শরৎকাল, পাহাড়ি জায়গায় ঠান্ডা জলের কোনও অভাব ছিল না । প্রচুর ঝরনা দেখেছি এবং উৎকৃষ্ট জল খেয়েছি এবং স্নান করেছি । মরুভূমিতে স্নান শিকেয় উঠে গিয়েছিল । ফলে গায়ে পোকা হয়েছিল, এখনও তাদের আমরা দেহেই বহন করে চলেছি ।

পাহাড়টা মনোরম কিন্তু লোকজনের দেখা নেই । কত উপত্যকা পার হলাম, চড়াই ও উতরাই সারাদিন ধরে যাচ্ছি । মাঝে-মাঝে দুয়েকটা গ্রাম দেখেছি । নাগাজাতির লোকেরা যেমন পাহাড়ের চূড়ায় বাড়ি করে যাতে শত্রু কোনদিক থেকে আসছে তা ওপর থেকে

দেখতে পারে, এও ঠিক তেমনই। তিনশো মাইলের বেশিরভাগ এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি রাস্তা অতিকষ্টে পার হলাম।

আদানা বেশ বড় শহর, নদীর ওপর সার সার পাকা বাড়ি। ব্রিজ পার হয়ে শহরে ঢুকবার মুখে একজন সৈনিক আমাদের থামাল। ইন্টারনাল পারমিট দেখাতে পারলাম না বলে আমাদের পুলিশ হেড কোয়ার্টারে নিয়ে গেল। অফিসার-ইন-চার্জ তখন ছিল না। তাঁর অধীনস্থ একজন পুলিশ অফিসার বলল যে তার ওপরওয়ালা না আসা পর্যন্ত আমাদের হাজতে বাস করতে হবে। ব্যস, লোহার দরজা দিয়ে আমাদের আটকে রাখল। সারাদিন খাটুনির পর কোথায় থাকব এবং কী খাবার জোগাড় করতে পারব না ভেবে চুপচাপ খাঁচায় বসে রইলাম। শহরের বহু লোক আমাদের পিছন পিছন আসছিল। তারা ভিড় করে সামনে দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমে তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এদিকে খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছিল। অফিসার বিকালে অফিসে এলেন। আমাদের দেশের পুলিশের মতো নিয়মিত হাজিরা বোধহয় দিতে হয় না।

প্রথম প্রশ্ন, আমরা গ্রিক কি না। দ্বিতীয় প্রশ্ন, পারমিট কোথায়, পাসপোর্ট কোথায়। আমরা কোনও মতে বোঝালাম যে ডের তিয়ল সীমান্ত ঘাঁটিতে আমরা পাসপোর্ট দিয়েছি। আদানায় পারমিট দেওয়া হবে শুনেছি।

ওরা বলল, আগামীকাল সিকিউরিটি অফিসে গিয়ে খোঁজ করতে হবে কে আমাদের পারমিট দেবে এবং কে পাসপোর্টগুলি ফেরৎ দেবে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। হাজতে রাত্রিবাস করতে হবে হুকুম এল। খাবার জোগাড় করবার জন্য একজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে শহরে খাবার কিনতে গেলাম। হাতরুটি ও কিমার তরকারি নিয়ে ফিরলাম, মনে মনে খুবই বিরক্তি। আমাদের কোনও অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও আসামীদের মতো হাজতে বাস করতে হল। যা হোক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। অফিসার তাঁর কর্তব্য করছেন। আমাদের প্রতি অভদ্রতা বা খারাপ ব্যবহার করেননি।

পরদিন আমাদের চারজনের সঙ্গে ছয়জন পুলিশ দিয়ে- কী ভাগ্যি হাতকড়া কিংবা দড়ি বেঁধে নিয়ে যায়নি- সিকিউরিটি অফিসে পাঠাল। বেলা এগারোটার সময় আমরা খুঁজে পেলাম আমাদের পাসপোর্ট ও পারমিট। ক্যামেরা ফেরৎ পেলাম, কিন্তু বন্দুক নয়। সেগুলি পাব ইউরোপে, এড্রিয়ানোপল শহরে।

পারমিট পাবার পর হাজতবাস বন্ধ হল। সর্বত্র লোকেরা ভদ্র ব্যবহার করত। এই অঞ্চলে ফলের প্রাচুর্য বেশ, সেজন্য লোকেরা আমাদের এপ্রিকট ও আখরোট খেতে দিত।

আদানায় একদিন থেকে আমরা পশ্চিম-উত্তরদিকের রাস্তা ধরলাম । রাস্তার ওপর বড় বড় পাথর সর্বত্র । খুব সাবধানে চলতাম, পাছে পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে সাইকেল চুরমার হয় ।

দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো দেখলাম না । কামাল পাশা গ্রিকদের যুদ্ধে হারিয়ে তুর্কির স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছেন এবং সেইসঙ্গে আর্মির লোকেদের নানারকম রসদভরা জাহাজ ধরতে পেরে তুর্কির লোকেদের অশেষ উপকার করেছেন । যত ভালো ইউনিফর্ম পরা লোক দেখলাম তারা গ্রিকদের কাপড়চোপড় পরে রয়েছে । তুর্কির ইউনিফর্ম বেশিরভাগ শতচ্ছিন্ন এবং তাপ্পি দেওয়া ও পুরনো ।

টরাস রেঞ্জ পার হলেও তুর্কির বেশিরভাগ পাহাড় আমাদের পথ যেন রোধ করে দাঁড়িয়েছিল । আনাতোলিয়া পাহাড়ি দেশ । অনেকগুলির বর্ধিষ্ণু গ্রাম দেখলাম, কিন্তু এখন খালি পড়ে রয়েছে । কিছুদিন আগে এখানে আর্মেনিয়ান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ওপর হামলা করে সব বাড়িতে তুর্কিরা আগুন লাগিয়ে দেয় । সব লোক প্রাণের দায়ে এ দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে । বাড়িগুলো ও আসবাবপত্র দেখে মনে হল অল্পদিন আগে পুড়েছে- নাড়াচাড়া করলে তখনই আগুন ও ধোঁয়া বেরোবে । গ্রিস যখন তুর্কি আক্রমণ করে কয়েক বছর আগে তখন দেশের অভ্যন্তরে লোকেরা খ্রিস্টান বসবাসকারীদের ওপর অনর্থক অত্যাচার করে । ইহুদিরা খ্রিস্টানপাড়ায় মিলেমিশে থাকত । তাদের ওপরও তাল গিয়ে পড়ল অকারণে ।

একদিন সকালে আমরা একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছেছি । সবসময় আমাদের ঘিরে লোকেরা হাঁ করে দেখত এবং নানারকম জল্পনাকল্পনা করত । আমি তুর্কিদের কথা স্পষ্ট না হলেও খানিকটা বুঝতে পারতাম । একটা কালো মেয়ে, বড় বড় চোখ, ফ্রক পরা বারো বছর বয়স হবে, কী যেন বলতে চাইছিল আমাদের । বুঝলাম, আমাদের বলছে, তার বাড়িতে যাবার জন্য । কেমন করে জানি না, মেয়েটি আমাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুনে চিনেছিল আমরা ভারতীয় এবং বাঙালি । বাড়ি যেতে খুব খুশির ভাব দেখিয়ে বলল, যে তার বাবা বাঙালি । প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কির হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন । নাম বিনয় বোস । বীরত্ব দেখিয়েছিলেন বলে সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত । একজন তুর্কি রমণীকে বিয়ে করে সংসার পেতেছিলেন । একটি কন্যারত্ন হয় । স্ত্রীকে বাংলা শিখিয়েছিলেন এবং শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন । সম্প্রতি মারা গিয়েছেন । মিসেস বোস বুদ্ধিমতী রমণী । আদানার একটা কাগজে আমাদের ছবি ও ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে মেয়েকে (নাম রীনা) বলেছিলেন যে আমার বাড়ির কাছ দিয়েই পশ্চিমে যাবে । যদি সম্ভব হয় আমাদের ধরে বাড়িতে নিয়ে আসতে ।

মিসেস বোসের ছোট্ট কাঠের বাড়ি, তিনখানা ঘর । সামান্য আসবাব দিয়ে সাজানো । বসবার ঘরে মিস্টার বোসের আর্মি ইউনিফর্ম পরা একটা ছবি । গৃহিণী সলজ্জভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন তাঁর আতিথ্য স্বীকার করতে অন্তত একদিনের জন্য । আর্মি পেনসনের ওপর নির্ভর করে এবং তাতে নিজের শিক্ষকতা করার সামান্য আয় যোগ দিয়ে কোনওমতে সংসার চলে । অনুরোধ এড়াতে না পেরে রাজি হলাম যে বিকালে রওনা হব । মিসেস বোস পরিষ্কার বাংলায় বললেন, অনেক ধন্যবাদ ।

আমরা প্রথমটা বাংলা শুনে চমকে উঠেছিলাম । উচ্চারণ ও অর্থ পরিষ্কার । দেখলাম বাংলা যা শিখেছিলেন তা ভুলতে বসেছেন ব্যবহার নেই বলে । মেয়েকে শেখাবার ইচ্ছা খুব কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনও বই পাওয়া যায় না । মনে মনে ভাবলাম বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ ও ‘দ্বিতীয় ভাগ’ কোথায় পাব এখানে ।

দুপুরে পোলাও ও মাংস এবং শেউই ও দুধ দিয়ে পায়েস খুব তৃপ্তি করে খেলাম । মাংসের কোর্মা, ভারতীয় ধরনে রাঁধা । মিঃ বোস ভোজনবিলাসী ছিলেন । দু-চাররকম প্রায়ই রাঁধতেন । যুদ্ধে একটা মোক্ষম চোট খেয়েছিলাম আর সেজন্য তুর্কিদের কাছে খুব বাহবাও পেয়েছিলেন । একটা স্র্যাপনেল শরীরের মধ্যে ঢুকেছিল । বহু বছর পরে সেটাই মৃত্যুর কারণ হয় । রীনাকে আমাদের একটা পোস্টকার্ডের ছবি দিয়ে, মিসেস বোসকে ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা হলাম ।

ক্রমে ক্রমে আনাতোলিয়ার শস্যশ্যামল দিকে আমরা এগোতে শুরু করলাম । এদিকে আগে যেসব ফলের কথা লিখেছি তা তো পেতামই, তার ওপর অপর্যাপ্ত তরমুজ পেয়েছি বেশ বড় কুমড়োর মাপের । খেতে খুব সুস্বাদু এবং সস্তা, দু-চার আনা দিলেই পাওয়া যেত ।

এই অঞ্চলের রাস্তা বিশেষ ভালো নয় । মনে হয় অর্থাভাবে কেউ কখনও রাস্তার বড় বড় পাথর সরায় না বা গর্ত বোজায় না । অনেক লোকের বাস আনাতোলিয়াতে । একটু পর পর বর্ধিষ্ণু গ্রাম পেতাম । আগেকার মতো তেমন জনবিরল নয় ।

একদিন একটা মজার কাণ্ড হল । আমরা একটা পান্থনিবাসে উঠেছি । কাঠের দোতলা বাড়ি । ঘর বলতে কিছু নেই, কেবল ওপরে একটা বড় খোলা জায়গা । কাঠের মেঝে । আমরা পরিষ্কার করে কম্বল বিছিয়ে সব গুছিয়ে ফেলেছি রাত কাটাবার মতলবে; এমন সময় একজন জার্মান যুবক, নাম হেরম্যান কোলব আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল । পথে শুনেছে যে একদল ভারতীয় পর্যটক পান্থশালায় উঠেছে । কখনও ভারতীয় কাউকে দেখেনি, তাই আমাদের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা । কম্বলে বসতে দিলাম ।

মহা মুশকিল হল। হেরম্যান ইংরিজি জানত না। আমি জার্মান জানতাম না তখনও। অবশেষে তুর্কি ভাষায় আমাদের দুজনের কথাবার্তা আরম্ভ হল। হেরম্যানের হাতে এক ঠোঙা আঙুর ছিল। আমাদের দিকে বাড়িয়ে ধরল। বুঝলাম আঙুর ওর ভীষণ প্রিয়। সেই রাত্রে শোবার আগে দুটো আঙুর মাথার কাছে নিয়ে রাখল। আমি জিজ্ঞেস করাতে ঠাট্টা করে বলল, সোংরা ঢোক গুজাল ওলসুং অর্থাৎ রাত্রে এই দুটো অনেক বাচ্চা দেবে!

রুটির সঙ্গে খাবার জন্য মুসুর ডাল ও আলু পেঁয়াজের তরকারি মণীন্দ্র রেঁধেছিল। হেরম্যানকে সামনে রেখে খাওয়া যাবে না বলে তাকেও আমাদের খাবারের ভাগ নিতে বললাম। বাঙালি রান্না খেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল হেরম্যান।

হেরম্যান আমাদের মতো নেটিভ ধরনে মাটিতে না শুয়ে দড়ির হ্যামক টাঙিয়ে তিন ফুট উঁচুতে ঝুলে ঘুমল।

রাত তখন তিনটে হবে, বজ্রপাতের শব্দ হল কাঠের তক্তার মেঝের ওপর। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম আমরা। বাতি জ্বেলে দেখি হ্যামক ছিঁড়েছে। আসলে ইঁদুর দড়ি কেটে দিয়েছিল, ফলে হেরম্যান ধরাশায়ী। শরীরে বেশ লেগেছিল। আওয়াজে মনে হল যেন সব হাড়গোড় ভেঙে গিয়েছে। ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় হঠাৎ আছাড় খেলে মানুষ যেমন হতভম্ব হয়, হেরম্যানের তেমনই অবস্থা। আমাদের কিন্তু তখন ভীষণ হাসি পেয়েছিল। কোনওমতে হাসি চেপে তাকে ওঠালাম। পড়ার কারণ কী জানবার জন্য হ্যামকটা নিয়ে দেখি কে একদিকের দড়ি কেটে দিয়েছে। নিশ্চয় ইঁদুর ভেবে হেরম্যান আর হ্যামক টাঙাল না। সুড়সুড় করে মেঝেয় পাতা আমার কম্বলের একপাশে এসে শুল। আমরা মুখে সহানুভূতি জানালাম, সে নিজের হাত-পা যখন টিপতে আরম্ভ করল। বেশি ভাব থাকলে হয়তো আমরাই টিপে দিতাম। ওর মেদহীন দেহ। তখনও ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের আচারগত পার্থক্যের কথা ভেবে আমরা একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলছিলাম। একবারও ভাবিনি যে অনতিবিলম্বে হেরম্যান আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে যাবে ঘটনাচক্রে। রীতিমতো ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে।

পরদিন ভোরবেলায় হেরম্যান যাত্রা শুরু করল। পায়ে হেঁটে সমস্ত আনাতোলিয়া (যেটা তুর্কির মেরুদণ্ড) ভ্রমণ করে কনস্তান্তিনোপলে ফিরে যাচ্ছ।

আমরা একটু পরে প্রাতরাশ সেরে কম্বল ও লোটা গুটিয়ে দেখি রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ, একে পাহাড় তার ওপর সারাটা রাস্তায় পাথর ও নুড়িভর্তি। দুঘণ্টা পরে বেরিয়োম। সাইকেল জোরে চালিয়ে অনেক দূর চলে যাব ভেবেছিলাম কিন্তু তা আর হল না। একটু সাইকেল চড়ি তো অনেক হাঁটতে হচ্ছিল। সারাদিন প্রাণপণ খেটে পনেরো মাইল দূরে একটা পান্থশালায় আশ্রয় নিলাম। পরের পান্থশালা পনেরো-ষোল মাইল দূরে। সেখানে

পরদিন যাওয়া ঠিক করে পান্থশালার ভেতর ঢুকলাম। প্রথমেই দেখি হেরম্যান দাঁড়িয়ে সামনে, খুব হাসছে। আমাদের সেই কচ্ছপ ও খরগোশের কথা মনে হল। দিনের শেষে আমাদের দুজনের ফল লাভ হয় একই।

হেরম্যানের স্ফূর্তির প্রধান কারণ ছিল আবার ইন্ডিয়ান কারি খাবার লোভ। মণীন্দ্রর রান্না তার দারুণ ভালো লেগেছিল।

হেরম্যানের ঘরে আমরা আস্তানা নিলাম। একটিমাত্র পরিষ্কার ঘর ছিল। গ্রামটি ছোট হলেও রাস্তার দুপাশে তরমুজের স্তূপ রয়েছে দেখলাম। হেরম্যান যথারীতি আঙুর কিনেছে। সন্ধ্যার সময় চায়ের বদলে তরমুজ খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলাম।

হঠাৎ লক্ষ করলাম যে হেরম্যান একমুঠো মুসুর ডাল নিয়ে মাটির ওপর ছক কেটে কি একটা বাঘবন্দি খেলছিল, এত তন্ময় হয়ে যে আমাদের আসা টের পায়নি। পরে বুঝেছিলাম যে ওটা মানুষবন্দি খেলা। জার্মানরা জানতাম সৈনিক সৈনিক খেলতে ভালোবাসে। ইংরিজিতে এইরকম একটা কথাও আছে। আবার যদি যুদ্ধ হয় তো আনাতোলিয়া রক্ষা করতে কত কামান, ট্যাঙ্ক ও মানুষ লাগবে হেরম্যান সেই খেলা মুসুর ডাল সাজিয়ে খেলছিল।

পরে একদিন আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে সে বলেছিল জার্মানি কোনও মতে ইংল্যান্ডের চেয়ে কম নয়, অথচ আজ পৃথিবীর সব জায়গায় ব্রিটিশ পতাকাকে সেলাম করে জার্মান জাহাজ চলাফেরা করে। যেমন জিব্রাল্টার, মাল্টা, পোর্ট সৈয়দ, এডেন, সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই আর ওদিকে কেপহর্ন তো আছেই। হেরম্যানের দুঃখ বুঝলাম এবং আমরা পরাধীন জাতি- ইংরেজের অধীনে আছি বলে, সহজেই তাকে সহানুভূতি দেখাতে পারলাম। হেরম্যান ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করত এবং আমাদের পুরনো সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি সম্মান জানাত।

দুদিন পরপর দেখলাম যে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে যতদূর এগোতে পারছি, হেরম্যান ঠিক ততখানিই পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে। খারাপ রাস্তার জন্য সাইকেল আমাদের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অগত্যা স্থির হল দিনের শেষে আমরা কোনও এক নির্দিষ্ট পান্থশালায় সবাই মিলব।

কয়েকদিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম যে হেরম্যানের টাকাকড়ি সব ফুরিয়ে গিয়েছে। আমাদের ওপর নির্ভর করে সে চলছিল। সারাদিন কিছু খেত না একটু চিজ ও রুটি ছাড়া, তাও কয়েকদিনের, কি সপ্তাহের পুরনো। যখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেল তখন আমাদের সাহায্য চাইল একসঙ্গে থাকার ও খাবার। পান্থশালায়ও দু-চার টাকা ঘরভাড়া দিতে হল। আমরা রাজি হলাম এই শর্তে যে সে কনস্তান্তিনোপলে গিয়ে সব ঋণ শোধ

করে দেবে, কারণ আমাদের সম্বল ছিল কয়েকটা টাকা । তবে আমরা আশা করেছিলাম কনস্তান্তিনোপল শহরে পৌঁছলে দেশ থেকে কমিটির পাঠানো টাকা ও চিঠি পাব । হেরম্যান বলল যে তার দেশবাসীর একজন টাকা ধার নিয়েছে, দেবার নাম নেই । সে এম্ব্যাসিতে কাজ করে সেজন্য টাকা মার যাবে না, আপাতত তাকে কষ্টভোগ করতে হচ্ছে ।

পথে আদা, বে-বাজার হয়ে আঙ্কারার কাছে পৌঁছলাম । কামাল পাশা নির্দেশ দিয়েছেন আঙ্কারায় নতুন রাজধানী করতে । কনস্তান্তিনোপল ইউরোপের ভীষণ কাছে এবং জলপথে যে কোনও বড় শক্তির পক্ষে তাকে হস্তগত করা সহজ । আঙ্কারা চারদিকে পাহাড়ে সুরক্ষিত । আমরা যখন নতুন রাজধানীতে পৌঁছলাম, শহর বলতে তখন দুয়েকটা বাড়ি । চারদিকে পাথর ও মাটির পাহাড় । রাস্তা ছিল না । ইলেক্ট্রিক আলো নেই । একটা ফুড স্টোর তৈরি হয়েছে । হ্যাজাকের আলোয় দেখলাম সেখানে গম, আটা, চিনি, তেল ইত্যাদি পাওয়া যায় ।

তারপর সমস্ত আনাতোলিয়া পার হয়ে আমরা কনস্তান্তিনোপলের সোজা পথ ধরতেই সৈনিকরা বাধা দিল- বলল, অন্যপথে ওই শহরে যেতে, যেহেতু একটা নৌবাহিনীর ঘাঁটি সেখানে তৈরি হচ্ছিল ।

ইতিহাসে চার্চিলের নাম অমর হয়ে থাকবে, কিন্তু দুটি অপকর্মের জন্য, তুর্কি ও রাশিয়া তাকে কখনও ক্ষমা করবে না:

১) মুস্তাফা কামাল পাশাকে হত্যা করে তুর্কিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করার মতলবে একজন তুর্কিবাসী ভারতীয়কে- নাম মুস্তাফা জিগির, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করা হয় । সৌভাগ্যক্রমে সে ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয় তুর্কি পার্লামেন্ট ভবনের সামনে । এই কারণে এদেশের লোকেরা ভারতীয়দের ওপর খাপ্পা, ইংরেজদের ওপরও রাগ কম নয় । তুর্কির শাসনকর্তারা আমাদের প্রতি যতই দুর্ব্যবহার করেছিল তার কারণ একমাত্র এই । আর চার্চিলই দায়ী এজন্য ।

২) ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে যখন রেভোলিউশন আরম্ভ হয়েছে চারদিকে তখন অরাজকতা । এই সুযোগে চার্চিল উত্তর রাশিয়ার মারমানস্ক জলপথে নেভি ও আর্মি পাঠায় । তারা সুবিধা করতে পারেনি । চার্চিল রাশিয়ার মতো বিরাট অজগরকে গ্রাস করতে চেয়েছিল । বিফলমনোরথ হয়ে ব্রিটিশ নেভি ফিরে যায় । ইংরেজরা এই ঘটনাটাকে ধামাচাপা দেয় । চার্চিল একদিন এই ঘটনা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল ।

অন্য রাস্তায় অনেক ঘুরে সী অব মারমারা হয়ে জাহাজে যেতে হবে । জাহাজে উঠলাম । আমাদের সামান্য পুঁজির অনেকটা হেরম্যানের পিছনে খরচ হয়েছিল । জাহাজ ভাড়া

দেড় টাকা মাথাপিছু দেবার সঙ্গতি ছিল না। জাহাজে ক্যাপ্টেনের কাছে হেরম্যান বলল যে কনস্তান্তিনোপল পৌঁছে সে টাকা পাবে এবং ভাড়া দিতে পারবে। ক্যাপ্টেন জার্মানির হয়ে লড়েছিল বিগত মহাযুদ্ধে। তার জার্মানদের প্রতি একটা প্রীতি সম্পর্ক ছিল। হেরম্যানের কথায় সে রাজি হল।

কনস্তান্তিনোপল শহরটার একটু বর্ণনা দেওয়া ভালো। আসলে একটা জলপথের দুধারে দুটো বড় বড় শহর। একটার নাম স্তাম্বুল, অন্যটির নাম পেরা। বেশিরভাগ ইউরোপীয় থাকে পেরাতে। খুব সুন্দর শহর। কলকাতার পর এত বড় শহর আমরা পথে পাইনি। গোল্ডেন হর্ন নামে জলপথটা দুটো শহরের মাঝখানে। নীল জল, দূরে পাহাড়ের কোলে যেন মিলিয়ে গেছে। পেরা ও স্তাম্বুলের মাঝখানে একটা সেতু।

আমাদের জাহাজ পৌঁছল স্তাম্বুলে, তখন সব যাত্রীরা নেমে গেল। হেরম্যানও গেল। আমরা জিম্মায় থাকলাম ভাড়ার জন্য। সবে সন্ধ্যা হয়েছে দূর শহরের লক্ষ বাতির ছায়া জলে পড়েছে। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। একটু পরে জাহাজের মাঝিমাল্লা, ক্যাপ্টেন সবাই নেমে গেল। জাহাজ থেকে নামা-ওঠার কাঠের সিঁড়িও নিচের বন্দরে রাখল। জাহাজটা খুব মোটা একটা লোহার শেকল দিয়ে বাঁধা। জাহাজে দু-তিনজন লোক ফিরে এল।

বিকাল ও সন্ধ্যা থেকে হেরম্যানের অপেক্ষায় আমরা বসে আছি। জার্মান যুবকের দেখা নেই, ওদিকে খিদেয় প্রায় অস্থির। তিনঘণ্টা পরে অতিষ্ঠ হয়ে পায়চারি করছি, এমন সময় পাগলামি বুদ্ধি এল, আমি শহরে গিয়ে হেরম্যানকে খুঁজে নিয়ে আসব।

লোহার শেকল ধরে বন্দরে নামলাম তারপর উঁচু পাঁচিল টপকে বন্দরের সামনের চত্বরে পৌঁছলাম। কতরকম খাবার বিক্রি হচ্ছিল এবং লোকেরা কিনে খাচ্ছিল। লোভীর মতো রান্না চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি সাজানো হয়েছে আড়চোখে দেখলাম।

বন্দর থেকে বেরিয়েই সেতুর ওপর পৌঁছলাম। আমি স্তাম্বুলের দিকে সেতুতে আছি। আমাকে যেতে হবে ইউরোপীয় পাড়ায়, পেরাতে। দুঃখের বিষয়, নতুন সেতুতে তখনও মানুষের মাথাপিছু এক পয়সা কর আদায় করছিল। আমি তো প্রমাদ গুনলাম। পকেটে এক পয়সাও ছিল না।

সামনে একটা ঘোড়াটানা মালগাড়ি আসছিল আমি তার পিছনদিকে উঠে লুকিয়ে বসলাম। পেরাতে পৌঁছে নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। বিরাট শহরের মধ্য থেকে হেরম্যানকে খুঁজে বের করব, কিছুই জানি না। জার্মান এম্ব্যাসিতে প্রথমে গেলাম। অত রাতেও ভদ্রতা করে খবর দিল যে হেরম্যান কোলব সন্ধ্যায় এসেছিল এবং এক বন্ধুর খোঁজে ঘুরছে, বোধহয় যে পাড়ায় রেস্তোরাঁগুলি আছে সেখানে তাকে পাব। ঘুরতে ঘুরতে প্রায় রাত দশটার সময় একটা ফুটপাথের ধারে একটা আয়নায় হঠাৎ দেখলাম এক

টেবিল খাবার ও টেবিলের দুপাশে দুজন ইউরোপীয় বসে আছে, তার মধ্যে একজন হেরম্যান । আমার ভীষণ রাগ হল যে হেরম্যান আমাদের কথা ভুলে গেছে এবং নিজে ভূরিভোজ করছে । রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকলাম এবং সোজা হেরম্যানের সামনে উপস্থিত হলাম । ও আমাকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল । এবং আমি ওর শুকনো বুভুক্ষু মুখ দেখে বুঝলাম যে সামনের ভোজনরত লোকটি আসলে ওকে বসিয়ে রেখেছে টাকা ফেরৎ দেবে এই আশ্বাস দিয়ে । যা হোক আমার উপস্থিতি হেরম্যানের কথার সত্যতা প্রমাণ দিল অন্য জার্মানির কাছে । শীঘ্র টাকা দেবার তাগাদা এবার হেরম্যান করলে বন্ধু নেশায় আচ্ছন্ন হলেও কথাটা ঠিক বুঝল এবং বেশ কিছু টাকা পকেট থেকে বের করে হেরম্যানকে দিল । আমরা দুজনে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে খাবার কিনতে বেরোলাম । রুটি, কাব এবং চিজ কিনে সেতুর ওপর দিয়ে (এবার কর দিয়ে) ইস্তাম্বুলে পৌঁছলাম । তখন রাত এগারোটা । বন্দরে পাঁচিল পার হয়ে আমরা দুজন শেকল বাঁধা জাহাজের সামনে উপস্থিত হলাম । অনন্যোপায় হয়ে সেই চেন ধরে ঝুলতে ঝুলতে কোনওমতে জাহাজে উঠলাম । বন্ধুরা আমার আশা ছেড়ে দিয়েছিল । অকাতরে ঘুমোচ্ছে তিনজন । অনেক কষ্টে ওদের তুলে আমরা পাঁচজনে মাঝরাতে জাহাজের ওপর খবরের কাগজ পেতে ফিস্ট শুরু করলাম । পেরাতে কোথায় যাব ঠিক করতে না পেরে এবং জাহাজ থেকে নামবার উপায় ছিল না বলে পরদিন সকালে ভাড়া মিটিয়ে আমরা কনস্তান্তিনোপলে অর্থাৎ ইস্তাম্বুলে উপস্থিত হলাম ।

এবার হেরম্যান আমাদের কাছে বিদায় চাইল । সে খুবই আমুদে লোক ছিল, তাছাড়া আমাকে জার্মান শিখতে খুব সাহায্য করেছিল । সে গোড়াপত্তনটা এত ভালোভাবে করেছিল যে পঞ্চাশ বছর পরে আজও আমি সেই ভাষা ভুলিনি ।

আমরা ওয়াই এম সি এ হস্টেলে উঠলাম এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর চিঠি নিয়ে সকালেই ব্রিটিশ অ্যাম্বাস্যাডরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম । তিনি ভদ্রতা করে বিকালে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন । একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে চা খেতে গেলাম । অ্যাম্বাসাডার ও তাঁর স্ত্রী গল্প শুনতে চাইলেন । ম্যাপ ইত্যাদি সামনেই রেখেছিলেন রুট বুঝবার জন্য । ভ্রমণকাহিনী শোনাতে আমার চা খাওয়া ও টা খাওয়া একরকম হলই না । মোটামুটি অ্যাম্বাস্যাডর খুশি হয়েই বললেন যে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়াকে তিনি আমাদের পৌঁছনোর খবর দেবেন । আর পথে কাজে লাগতে পারে এমন লোকের কাছে কয়েকটা চিঠি দিলেন ।

পরদিন এখানের বিশেষ দ্রষ্টব্য শান্ত শেফিয়া ও আয়া শেফিয়া মসজিদ দেখতে গেলাম । রাস্তার ধারে জেলখানা দেখলাম । পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নয় । অনেক মহিলা জেলখানা পরিষ্কার রাখতে ও বিছানা গুছিয়ে দিতে সাহায্য করছে । আমরা শুনলাম যে মহিলারা

দুষ্কৃতকারীদের স্ত্রী । যার শাস্তি হবে জেলে যাওয়া, তার স্ত্রী সমস্ত খাবার জোগাড় দেবে এবং ইচ্ছা করলে কখনও কখনও রাত্রিবাসও করতে পারে । এ মন্দ ব্যবস্থা নয় । একজনের জেলবাস হুকুম হলে তার পরিবারের ওপর খাওয়া-পরার দায়িত্ব । দেশে টাকার অভাব সেজন্য বসে লোক খাওয়ানোর নিয়ম নেই । কেন যে কয়েদিদের অর্থকরী কাজে নিয়োগ করে টাকা রোজগারের পথ করে না, তা বুঝলাম না ।

কনস্তান্তিনোপলের মতো সুন্দর জলের ধারে পাহাড়ের গায়ে শহর কম দেখা যায় । এককালে দ্বিতীয় রোমান রাজত্বে সম্রাট কনস্তানতাইন রোম থেকে সরে দূরে এই সুন্দর শহর স্থাপন করেন এবং বহুকাল এটাই রাজধানী ছিল । পরে রোম, গথ ও ভ্যান্ডালদের ঘন ঘন আক্রমণে বিব্রত হয়ে পড়েছিল । কনস্তান্তিনোপল শহরের দুটি বিশেষত্ব । প্রথমটি হচ্ছে এটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এবং তার চারদিকেও পাহাড় । দ্বিতীয়ত, সঙ্কীর্ণ জলপথে নৌবাহিনী বিপদে শহর রক্ষা করতে পারে । এই শহর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ । প্রায় দুহাজার বছর পুরনো ।

জেনারেল পোস্ট অফিসে পোস্ট রেস্তান্তে খোঁজ করলাম আমাদের নামে কোনও টাকা বা চিঠি আছে কিনা । যখন উত্তর এল না, তখন খুবই মর্মাহত হলাম । দেশের থেকে কতদূরে চলে এসেছি । কেউ আমাদের কোনও খোঁজখবর পর্যন্ত নেয় না । কমিটিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল টাকা পাঠাবে । কিন্তু কোথায় । ভ্রমণ সম্পূর্ণ হবে কিনা এই প্রথম আমাদের মনে সন্দেহের রেখাপাত ঘটল । বাড়ির চিঠি মা-বাবা এবং ভাইদের লেখা পেলাম । তাতে হতাশা অনেকটা কেটে গেল । বন্ধুদের বললাম যে ভিয়েনা কিংবা বার্লিন পৌঁছে নিশ্চয় কমিটির চিঠি ও টাকা পাব, কিন্তু সে তো বহুদূর । তাছাড়া সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কিনা সন্দেহ । সামনে হাড়ভাঙা শীত, ঝড় ও বরফের দিন আসছে । শেষপর্যন্ত ঠিক হল এগোতেই হবে বার্লিন পর্যন্ত । কমিটিকে বিশেষ করে সেক্রেটারি শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়কে আমাদের দুর্দশার কথা জানালাম । বার্লিনে রসদ না পেলে শীতে গরম জামাকাপড়ের অভাবে এবং খেতে না পেয়ে মারা যাব । ওয়াই এম সি এ-র সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করলাম আর অনুরোধ করলাম একটা মিটিং ডাকবার যেখানে প্রবেশমূল্য দিয়ে আমার কাছে লোকে ভ্রমণকাহিনী শুনবে । তিনি রাজি হলেন এবং পরদিন খবরের কাগজে মিটিংয়ের কথা জানিয়ে মেম্বারদের আহ্বান করলেন ।

এই প্রথম সাধারণের সামনে সরাসরি আমি বলবার নেমন্তন্ন পেলাম । মরুভূমির ভেতর দিয়ে চলার কথা এবং আমরা কোন পথে পৃথিবীর কত দেশে যাব সেসব বললাম । আর কী বলব ভাবছি এমন সময় একজন জিজ্ঞাসা করল কতদিন পরে আমাদের ভ্রমণ শেষ হবে । তার উত্তর দিয়ে, আমি বললাম যে আরও প্রশ্ন পেলে আমি খুশি হয়ে জবাব দেব । এমনিভাবে মিটিং জমে উঠল । আমরা সেদিন প্রায় দুশো টাকা রোজগার করলাম ।

আমরা ইউরোপের একপ্রান্তে পৌঁছেছি । যুদ্ধে হারার পর তুর্কির রাজত্ব অনেক খর্ব হয়ে গিয়েছে । ইউরোপে কেবল নামমাত্র জমি তুর্কির অধীনে রয়েছে । সেখানে বড় শহর একমাত্র এড্রিয়ানোপল আছে । আমরা সেখানে আমাদের বন্দুক ফিরে পাব ।

বিকালে সুলতানদের প্যালেস দেখতে গেলাম । নাম দোলমাবাগজি । এখানে মুস্তাফা কামাল পাশা থাকেন । যুদ্ধের সময় তুর্কির রাজা বা খলিফ ছিলেন দ্বিতীয় সুলতান আহমেদ, হেরে যাবার পর তিনি মাল্টায় থাকতে গেলেন । তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছিল ভারতবর্ষের নিজামের বড় ছেলে প্রিন্স অব বেরারের সঙ্গে । খলিফ বলা হয় মুসলমান জগতের ধর্মগুরুকে । ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একজোট করবার জন্য গান্ধীজি খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করেছিলেন ।

এরপর ইউরোপের পথ ধরলাম । রাস্তা এখনও ব্যবহারের উপযুক্ত নয় । লোকেদের বেশভূষা ইউরোপীয় হয়েছে পুরোপুরি । স্ত্রী-পুরুষ হ্যাট ব্যবহার করে । অবাধে মেলামেশা । চারদিন পরে আদ্রিয়ানোপলে পৌঁছলাম । ঘরবাড়ি দেখে মনে হয় একটু অন্য ছাঁচে তৈরি । শহরের নামটাও বিদেশি, রোমান মনে হয় ।

সীমান্তে এসে বন্দুক ফেরৎ পেলাম । আমাদের অন্নসংস্থান নেই অথচ প্রত্যেকে দুটো করে ভারি বন্দুক বইছি । সেগুলি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে । সমস্ত ইউরোপে তারা কোনও কাজে লাগবে না বরং পদে পদে বাধা সৃষ্টি করবে, করছে বলে স্বীকার করাই শ্রেয় ।

৩

পুবদিকে ইউরোপ দেখে মনে হল প্রগতির হাওয়া এখানে পৌঁছয়নি । পথঘাট কাঁচা, বেশিরভাগ বাড়ি মাটি কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি, একতলা । সব বাড়ির সামনে ঝুলছিল আঁটি করা ভুট্টা, পেঁয়াজ এবং খাটের নিচে সব জায়গায় দেখেছি সারা বছরের মজুত আলু এবং লাউ । মাঠে গম কাটা হয়ে গিয়েছে । সব মজুত করতে ব্যস্ত ।

বুলগেরিয়া প্রবেশের ছাড়পত্র দেখিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম । এদেশে লক্ষ করলাম ব্যাপকভাবে সর্বত্র আঙুরের চাষ হয়েছে । ঝুড়ি ঝুড়ি আঙুর তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং একেকটা পিপের (ব্যারেল) মধ্যে ঢালছে । সাধারণত কোনও তরুণকে ভার দেওয়া হয় পিপের ভেতর ঢুকে আঙুর মাড়াতে । পিপের একদিক কাটা অন্যদিকে মেঝেয় একটা ফুটো আছে- সেখান দিয়ে আঙুরের রস বেরিয়ে পাত্রে পড়ছে ।

সর্বত্র আমাদের ডেকে খুব খুশি হয়ে বুলগার দেশের লোকেরা আঙুরের রস খেতে দিত । আঙুর থেকে মদ তৈরি করে এবং সারা বছরের নিজেদের ব্যবহারের জন্য ছোট ছোট পিপে ভরে মজুত রাখে । তারপর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা বিক্রি করে অনেক টাকা পায় এবং সেই টাকায় সারা বছর সংসার চলে, কাপড়চোপড় কেনে ইত্যাদি ।

পূর্ব ইউরোপের প্রায় সব দেশ ড্যানিয়ুব নদীর জল পায় । নদীর দুধার ঢালু হয়ে জলের ধার থেকে ৪৯০-৫০০ ফুট উঁচু হয়ে উঠে গেছে । মোট এক ফার্লং চওড়া হবে । এই জমি আঙুর চাষের পক্ষে খুব উপযুক্ত । মাইলের পর মাইল বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, অস্ট্রিয়াতে লক্ষ লক্ষ একর জমি জুড়ে আঙুরের চাষ হয় ।

আমাদের অর্থাভাবে খাবার জোগাড় করার সঙ্কট খানিকটা মিটত পাকা বড় বড় আঙুর খেয়ে । রাস্তার দুধারে যত ইচ্ছা খাও কেউ কিছু বলবে না । অল্পদিনের মধ্যে টপাটপ আঙুর খাবার স্পৃহা চলে গেল । বেশি আঙুর খেলে নেশার মতো হয়, তাতে খিদে আরও বেড়ে যেত । তখন একটা রুটি একটু চিজ পাবার জন্য ব্যাকুল হতাম । কৃপণের মতো একটা এক পাউন্ড রুটি কিনে চারভাগ করতাম এবং গরম জলে কোকো দিয়ে বেশিরভাগ দিন রাতের ডিনার সারতাম । ভীষণ খাটুনি হত সারাদিন সাইকেল চালিয়ে, খিদে পেত খুব । গরম জলে কোকো গুলে খেয়ে দেখেছি আমাদের খিতে মেটাতে না পারলেও

কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করত। পরে এমন দিন এল যে রোজ খাবার মতো রুটি বা কোকো পর্যন্ত জোগাড় করতে পারতাম না।

বুলগেরিয়ার মেয়েরা মাথায় সিল্ক কিংবা পশমের স্কার্ফ বেঁধে বাইরে বের হত। যুগোস্লাভিয়া ও হাঙ্গেরির মেয়েরাও মাথায় টুপি না পরে স্কার্ফ বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। সেই বছর ফসল ভালো হয়েছে বলে সবার মনে খুব স্ফূর্তি। প্রায়ই বেহালা হাতে একজন এগিয়ে যেত, অন্যরা তার সুরে সমস্বরে গান ধরত। এমনিভাবে গ্রামের সব পাড়ায় ঘুরত এবং গানের লোকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ত।

দুটো জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। প্রথমটা হচ্ছে যে, ছেলেরা অনেকে হলুদ-বাটা কপালে (সামান্য) মাখত- তিলক কাটার মতো। মনে হয় হলুদ মাঙ্গলিক চিহ্ন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে, ছেলেরা অনেকে স্যুটের ওপর ভাঁজকরা বড় চাদর ঝুলিয়ে যেত। দুটোই আমাদের দেশে চিরাচরিত প্রথা। বুলগেরিয়া নামে ইউরোপে ইউরোপিয়ানত্ব বিশেষ কিছু দেখিনি। চাষবাস করে লোকেরা দিন কাটায়। চামচের ব্যবহার খুব কম। খাটা পায়খানা তো আছেই। ঠান্ডার দেশ বলে জলের পরিবর্তে কাগজ ব্যবহার হয়। বছরের ছয় মাস শীতের কবলে থাকে। আমাদের দেশের চাষীরা যেমন ছন্নছাড়া এদের অবস্থা তেমন নয়।

শোবার ঘরের বিছানাপত্র খুব মোটা পশম ও পালক দিয়ে তৈরি। সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গোছানো। বেশিরভাগ লোকের একটা বড়, ভালো পর্দা লাগানো শোবার ঘর। তার পাশেই রান্নার ও বসবার ঘর একসঙ্গে। উনুনে রান্না হয় এবং বসবার ঘর গরমও রাখে। বসবার ঘরের জন্য আলাদা আগুন জ্বালাতে হয় না। সংসার বড় হলে, যদি অবিবাহিতা কন্যা থাকে তো তার জন্য বসবার ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয়। সব পরিবারই ছোট, একটি-দুটি সন্তান। তারা বড় হলেই আলাদা হয়ে যায়।

ক্বচিৎ কখনও বড়লোক চাষীর বাড়িতে পিয়ানো ও রেডিও দেখেছি। একটু অবস্থাপন্ন যারা তাদের বাড়িতে আমাদের খাবার নেমন্তন্ন হত। সীমের বিচি, ট্মাটো দিয়ে মাংস রান্না প্রায়ই খেতে পেতাম, কোনও মশলার বালাই নেই। তাই খাবার সহজেই হজম হয়ে যায়। টকদই খাওয়ার রেওয়াজ সর্বত্র। দইকে ইয়োগুর্ত বলে।

গত প্রথম মহাযুদ্ধে বুলগেরিয়া শত্রু পক্ষে অর্থাৎ জার্মানির হয়ে লড়েছিল। হেরে যাবার পর তার দেশের বেশ বড় একটা অংশ নিয়েছিল গ্রিস ও যুগোস্লাভিয়া। রাজা ফার্দিনান্দের ছেলে এখন রাজত্ব চালান। তিনি সাধাসিধে লোক, ট্রেন চালকের কাজ করতে খুব শখ।

রাজধানী সোফিয়া শহরে পৌঁছলাম। ছোট্ট শহর, রাজার বাড়ি ও ছোট অপেরা হাউস দ্রষ্টব্য। কোনও শিল্প নেই। জার্মানরা মনে করত বলকান দেশের বাজারে তার মাল

একচেটিয়া রপ্তানি করার অধিকার আছে।

আমাদের কাছে একটা বিশেষ পরিচয়পত্র ছিল সোফিয়ার এক ভদ্রমহিলার নামে। তাঁর বাড়িতে থাকবার জন্য। আমাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট স্ত্রী ও পুরুষকে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। ভদ্রমহিলার পুরো পরিচয় আগে পাইনি। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ অপেরা-সঙ্গীতজ্ঞ যাকে 'প্রিমা ডনা' বলে। দেশ জোড়া নাম, সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

আমরা শহর দেখে বেড়ালাম, তারপর দুপুরে একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁতে রুটি চিজ ও কফি দিয়ে লাঞ্চ সারলাম।

আমাদের টপবুট ব্রীচেস ছাড়া অন্য সাজপোশাক ছিল না। সন্ধ্যায় সেই অবস্থাতে বড় বসবার ঘরে উপস্থিত হলাম। ঘরভর্তি নিমন্ত্রিত লোক। আমাদের গৃহকর্ত্রী আলাপ করিয়ে দিলেন। গ্রামোফোনে মিউজিক বাজছিল। সবাই নাচ শুরু করে দিল। আমার হস্টেস প্রথমে আমার কাছে এসে নাচবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি তো প্রমাদ গুনলাম। জীবনে একদিন আলেপ্পো শহরে এক কার্নিভালে নেচেছিলাম- রুশ ভদ্রমহিলার পাল্লায় পড়ে। তাঁর টপবুট ছিল। আর এখানে ভদ্রমহিলার পায়ের সব আঙুল দেখতে পাচ্ছিলাম, মাড়িয়ে ফেলবার ভয়ে ইতস্তত করছি। এমন সময় তিনি আমার হাত ধরে টানলেন ও উৎসাহ দেখালেন। কী আর করা যায় মাঝখানে দুহাত ব্যবধান রেখে নাচ শুরু করলাম- সন্তর্পণে। ভদ্রমহিলা কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'বলরুম ড্যান্সিং দেশে করোনি বুঝি?' আমি তৎক্ষণাৎ 'না' বললাম এই আশায় যদি নাচ থেকে রেহাই পাই। কিন্তু ফল উল্টো হল। গৃহস্বামিনী বললেন যে, 'ঠিক আছে আমি শিখিয়ে দেব'। পাশ্চাত্যজগতে আমোদ-আহ্লাদ সামাজিক সংস্কৃতির অঙ্গ। তা না গ্রহণ করলে জীবন দুর্বিষহ বোধ হবে।

আমি ভাবলাম যে হস্টেস স্বনামধন্যা, সেই মারিয়ার সান্নিধ্য পাবার জন্য, তাঁর সঙ্গে নাচবার সুযোগ পাবার জন্য দেশসুদ্ধ লোক উদগ্রীব- আমি তাকে প্রত্যাখ্যান কেমন করে করি। ভাববার বেশি সময় পেলাম না। অল্পক্ষণের মধ্যে দেখি নাচ শুরু করে দিয়েছি। সাহসের জোরে অনেক কিছু করা যায় কিন্তু নাচের তাল খুব পরিষ্কার বুঝতে পারছি না।

নাচ শেষে ধন্যবাদ জানালাম। তখন হস্টেস বললেন যে সবাই চলে গেলে তিনি আমাকে ভালো করে নাচ শেখাবেন। দেশের গণ্যমান্য অনেক স্ত্রী-পুরুষ এসেছিলেন। আমাদের সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আরও দুই বাড়িতে খাবার নেমন্তন্ন পেলাম পর পর দুই দিন।

সব বাড়িতেই এক সমস্যা উঠবে আমরা নাচতে জানি না বলে। ঠিক করলাম আজই ভালো করে গোড়াপত্তন করব। ফল বোধহয় ভালোই হয়েছিল, আড়ষ্ট ভাব কেটে গেল,

এমনকী তালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার মধ্যে আনন্দ উপভোগ করা যায় এই সত্য বুঝলাম ।

পরে এটা আমার নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল । অন্যান্য দেশে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পার্টিতে কখনও সারারাত নেচেছি কিন্তু ক্লান্তিবোধ করিনি । বন্ধুদের বললাম নাচ শিখতে, তারা হেসেই অস্থির, শেখা তো দূরের কথা ।

দুদিন পর রওনা হলাম । সামনে শীত আসছে । বরফে ও ঠান্ডায় আমরা বিপদে পড়তে পারি । চলাফেরা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে । নেমন্তন্ন খেয়ে নেচে গেয়ে পৃথিবী ভ্রমণ একটুও এগোবে না ।

রাস্তা কাঁচা বলে আরামে সাইকেল চালাতে পারছিলাম না । পাহাড়ের গায়ে গ্রামগুলি পরিপাটি । লোকেরা সর্বত্র খুব উৎসাহ দিত আমাদের । এদেশের লোকেদের ধারণা যে, বুলগেরিয়া থেকে দইয়ের উৎপত্তি । এজন্য 'বুলগেরিকুশ ল্যাক্টিকুশ' বলা হয় এর বীজাণুর নামকে । দইয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে এরা নিঃসন্দেহ । প্রায়ই শুনতাম দই ও চিজ খায় বলে এদেশের লোকেরা দীর্ঘায়ু ।

বুলগেরিয়ার সীমানা পার হয়ে যুগোস্লাভিয়া দেশে ঢুকে পড়েছি । কোনও ঝামেলা হয়নি । মহাযুদ্ধের আগে যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি ও চেকোস্লাভাকিয়া প্রভৃতি দেশের স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না । প্রথমে দুটি দেশ- অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর তৃতীয় দেশটি ছিল জার্মানির অংশবিশেষ । স্বাধীন হবার পর এইসব দেশের লোকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে তাদের পুরনো অভাব-অভিযোগ দূর করবার, শিক্ষার প্রসার এবং ডাক্তারখানা, হসপিটাল ইত্যাদি বাড়াতে । রাস্তার উন্নতি এখনও হয়নি এইজন্য যে আরও অনেক বড় বড় জরুরি কাজ হাতে নিয়েছে । যুগোস্লাভিয়া ও বুলগেরিয়ার লোকেরা স্লাভনিক জাতি । এদের ভাষার পার্থক্য খুব সামান্যই । ইতালির কিছু অংশ যুগোস্লাভিয়া পেয়েছে যেটা আড্রিয়াটিক সমুদ্রের ধারে । ট্রিয়েস্ট বড় বন্দর, এখন যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত । এই অঞ্চলে অনেক নতুন শিল্প গড়বার খুব তোড়জোড় হচ্ছে । বিশেষ করে জাহাজ তৈরি করতে যুগোস্লাভিয়া খুবই দক্ষতা দেখাচ্ছে । স্লাভদের কর্মকুশলতা এত বেশি যে আশা করা যায় একদিন এরা শিল্প ও চাষবাসে সমান সাফল্য লাভ করবে ।

যুগোস্লাভিয়ায় এখন রাজতন্ত্র । নভেম্বর মাস এসে গেল । হাঙ্গেরিতে মোটামুটি রাস্তা খারাপ । বরফ পড়লে না জানি কেমন হবে । সমস্ত হাঙ্গেরি একটা সমতল জমির ওপর বলে খুব ভালো গমের চাষ হয় । এই দেশের রুটি স্বাদের জন্য বিখ্যাত । এখানে মদ 'টোকাই' বিশেষ আদৃত সকলের কাছে ।

পথের ধারে প্রায়ই ঘোড়ায় টানা বড় বড় গাড়ি দেখতাম, তার মধ্যে জিপসি পরিবার বাস করত। তারা ম্যাজিক দেখিয়ে, গান গেয়ে ও বাজনা, বিশেষ করে বেহালা বাজিয়ে রোজগার করে। এক জায়গায় থাকে না। চিরদিন এদের যাযাবরের জীবন। গাড়ির ভেতর রান্নাঘর, বাথরুম, শোবার ঘর ইত্যাদি সব আছে। ঠান্ডা দেশে এরকম জীবন মোটেই কষ্টকর নয় বরং আরামের। যেখানে ভালো লাগে সেখানেই কয়েকদিন থেকে যায়। জিপসিরা সব নাকি ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে এসেছে। এদের ছেলেমেয়েদের চুল মিশকালো ও চোখের মণিও কালো। গায়ের রং ফর্সা যদিও রোদে পোড়া। খানিকটা কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকে বলে আমার ধারণা হয়েছিল জিপসিরা কিছুটা নোংরা। হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি দেশে কত শত গল্প-গান এদের নিয়ে লেখা হয়েছে তার ঠিক নেই। বড় বড় রেস্তোরাঁয় জিপসি মিউজিক আমোদ আহ্লাদের একটা বিশেষ অঙ্গ। যুদ্ধের সময় জিপসিদের একত্র করে রাখে- তারা কোনও দেশবাসী নয় বলে, একরকম 'ইন্টার্ন' করার মতো।

জিপসিদের মেয়েরা খুব সুন্দর, বাচালতার জন্যও এরা বিখ্যাত। সাধারণত এদের বিয়ে হয় নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ অন্য জিপসির সঙ্গেই।

জাতিতত্ত্ববিদরা বলেন, ইউরোপে দুটি জাত এরিয়ান নয়, পীত বংশধর। হয়তো একদিন ফিনল্যান্ড ও হাঙ্গেরির লোকেরা এশিয়া থেকে গিয়ে ইউরোপে বসবাস আরম্ভ করেছিল। সেটা এতদিন আগে যে সংমিশ্রণের ফলে আজ তা খুঁজে বের করা যায় না- যদিও পিতৃপুরুষের ধমনীতে একদা পীত জাতির রক্ত বইত। আজ এদেশের লোকেদের রং জার্মান কিংবা ফরাসিদের মতোই। মাথার চুলেও সোনালি খড়ের রং দেখা যায়। 'নর্ডিক ফিচারই' বরং বলা যায়।

হাঙ্গেরির লোকেরা মনে করে তাদের এশিয়াতে একদিন দেশ ছিল এবং সেই কারণে আমাদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল। মেয়েরা রূপের জন্য বিখ্যাত। একদিন রাত্রে দেখলাম খুব বরফ পড়েছে। আমরা এতদিন প্রায়ই খড়ের গাদায় শুয়ে রাত কাটিয়েছি। এবার গ্রামের মধ্যে কোথাও রাত্রিবাস করতে হবে। একদিন রাতের অন্ধকারে একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম। রাস্তায় লোকজন নেই। কোথায় রাত কাটাব ভাবছি, হঠাৎ একটা ঘোড়ার আস্তাবল দেখলাম। চারটি ঘোড়ার থাকার জায়গা ছিল কিন্তু ঘোড়া ছিল তিনটি। আমাদের দেশে যেমন গরু লাঙল টানে, ইউরোপে তেমনই ঘোড়া লাঙল দেয়। ঘোড়াদের মালিক-চাষীর কাছে হুকুম নিয়ে আমরা অনুপস্থিত চতুর্থ ঘোড়ার খাটাল অধিকার করলাম। আস্তাবল খুব পরিষ্কার। অনেক খড় নিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লাম। শীতের দেশে আস্তাবল পুরোপুরি বন্ধ করা হয় রাত্রে, তা না হলে গরু, ঘোড়া, শুয়োর ও মুরগি শীতে জমে যাবে।

ঘুম ভাঙতেই দরজা খুলে সকালবেলায় এক নতুন জিনিস দেখলাম যার অভিজ্ঞতা আগে আমাদের একেবারেই ছিল না । পেঁজা তুলোর মতো ঝিরঝির করে সমানে বরফ পড়ে যাচ্ছে । রাস্তার ওপারে বাড়ির জানলার কোলে চার্চের ছাদ, সব সুন্দর সাদা হয়ে গিয়েছে । দেশে থাকতে আমরা বরফ কুলফি, আইসক্রিমে কিংবা সরবতের গ্লাসে দেখেছি । তাই প্রথমটা মজা লাগল বরফের মধ্য দিয়ে যেতে হবে ভেবে ।

বাস্তবিক যখন বরফের মধ্যে চলতে আরম্ভ করলাম তখন সাইকেল নিয়ে চরম দুর্দশা শুরু হল । সাইকেলসুদ্ধ কেবলই আছাড় খেলাম, রাস্তা যেহেতু খুব পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছে । অবশেষে আমরা হেঁটে চলতে লাগলাম । ক্রমে ক্রমে হাঁটাও অসম্ভব হয়ে উঠল । যতই পাহাড়ের উঁচু জায়গায় চড়লাম ততই বরফ পড়া বাড়তে লাগল । পেঁজা তুলোর মতো নয়, একেবারে দো-বারা চিনির মতো ।

ভারতবর্ষ ছাড়ার পর থেকে আমরা যত দেশের ভেতর দিয়ে গিয়েছি সর্বত্র লোকেরা কফি পান করে, চা খাওয়ার অভ্যাস নেই । সেই কনস্তান্তিনোপলে বহুদিন পর ইংরেজ অ্যাম্বাস্যাডর আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করে চা খাইয়েছিলেন, ব্যস ওই পর্যন্ত । দিনেরবেলায় কফি ও রাত্রে মদ সব বাড়িতে ও রেস্তোরাঁয় ব্যবহার হয় । মদের নামে আমাদের সাধারণত মনে যে ছবি জাগে আসলে তা নয়, ইউরোপীয়দের কাছে মদ হচ্ছে স্বাস্থ্যকর পানীয় ।

অনেক উগ্র ধরনের মদ আছে যা বাড়িতে তৈরি হয় না, বিশেষ দিনে বা রাত্রে একটু হইহল্লা করার জন্য । বাড়িতে ব্যবহার হয় বাড়ির তৈরি মদ এবং তা দেওয়া হয় পরিমিতভাবে, খাবারের সঙ্গে পানীয় হিসাবে, পারতপক্ষে কেউই জল খায় না!

একদিন হঠাৎ সব বরফ গলে গেল একটু গরম হাওয়া বইল বলে । তখন মাঠেঘাটে কী ভীষণ বরফের কাদা ।

আমরা তখন চাষীদের সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কাটাই । চাষীরা সর্বত্র লোক ভালো, সবসময়ই আমাদের সাহায্য করার জন্য উৎসুক । রাত্রের শোবার জায়গা কেউ দিতে পারে না । এইসব ঠান্ডার দেশে জীবনপ্রণালী ভিন্ন রকমের, শুতে দিতে হলে আলাদা একটা ঘর দরকার । শীতকে যথেষ্ট তাড়াবার জন্য অনেক পালকের লেপ কম্বল ও বিছানা এবং খাটের প্রয়োজন । গরিব চাষীদের পক্ষে সম্ভব নয় এইসব জোগাড় করা । বিশেষ করে চারজনের জন্য । এই কারণে আমরা কোনও বাড়িতে শীতের রাত্রে আশ্রয় পাবার আশা করিনি । তবু লোকেদের মন খুব ভালো, তাই চিন্তা করত দারুণ শীতের রাত্রে ভারতবর্ষের মতো গরম দেশের লোকেদের কোথায় রাখা যায় । গ্রামে হোটেল নেই, তাছাড়া আমাদের পকেট প্রায় খালি । হোটেলের খরচ দেবার সঙ্গতিও ছিল না ।

একদিন দিনের শেষে একটা রুটির দোকানে গেলাম। সেখানে গ্রামের বুড়োরা 'বিয়ার' খাচ্ছিল এবং খোশগল্প হচ্ছিল। রুটি কেনবার সময় একজনকে জিজ্ঞেস করলাম রাত কাটাবার মতো কোনও জায়গা যদি জানা থাকে। বার্ন হাউস বন্ধ জায়গা। সেখানে খড়ের গাদায় শীত কাটে না তবে কম্বল মুড়ি দিয়ে কোনওমতে রাত কাটালাম। যে জুতো-মোজা জামা-কাপড় পরে থাকতাম দিনেরবেলায় তারা নিত্যসঙ্গী হয়ে রাত্রেও শরীরের ওপর রয়ে যেত।

দারুণ শীতের মধ্যে আমাদের গায়ের পোকা সব মরে গেল। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। সেই মেসোপটেমিয়া থেকে তাদের 'অন্তরতম'-র মতো বহন করে এতদূর এনেছিলাম।

রুটিওয়ালার দোকানে- অবশ্য গ্রামে একটিই দোকান- সবই পাওয়া যেত বিয়ার থেকে কেরোসিন তেল, কাপড়, জামা কিছু বাদ নেই, এমনকী লাঙলের ফাল পর্যন্ত। এক আধাবয়সী চাষী আমাদের বলল, 'চলো আমার বাড়িতে থাকবে তোমরা, একটা কিছু ব্যবস্থা করব'। তখনও দিনের আলো ছিল। দিনটা অপেক্ষাকৃত গরম ছিল বলে লোকজন চলাফেরা করছিল।

একটা বাড়ির সামনে উপস্থিত হলাম। চাষীভাই স্ত্রীকে ডেকে বললেন 'দ্যাখো, আমি কাদের এনেছি, এদের কোথাও থাকতে দেবে তুমি? এই চারজন যুবক পৃথিবী ভ্রমণ করছে'। এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলল। এক ভদ্রমহিলা বা চাষী-বৌ বাইরে বেরিয়ে আমাদের রোদে পোড়া ভূত-ভূত চারটে চেহারা দেখে স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'এই চারটে ভূতকে কোথা থেকে জোগাড় করলে?' আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে দেখলাম চাষী-বৌয়ের হাতে সম্মার্জনী। তৎক্ষণাৎ আমরা মুখ ফিরিয়ে চললাম বলে রওনা দিলাম। যাবার সময় চাষীভাইয়ের কানে কানে বললাম অনেক ধন্যবাদ।

আমরা রাস্তা দিয়ে চলেছি। উল্টোদিক থেকে পাড়ার বৃদ্ধরা যারা রুটির দোকানে বিয়ার খাচ্ছিল তারা বাড়ি ফিরছিল। আমাদের দেখে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এল এবং সহজেই বুঝে ফেলল আমাদের অবস্থাটা। আরেকজন বলল, আমি তাই ভাবছিলাম যে, জানের কি মনে ছিল না ওর স্ত্রী ভালো মনে নেবে না ভূপর্যটকদের? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলল, আমাদের বাড়িতে অসুবিধা হবে, তবু খুব খারাপ নয়। সবাই তারিফ করে মন্তব্য করল, 'তোমার বাড়ি থেকে এদের ফিরতে হবে না এটা সুনিশ্চিত।'

আমরা বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দুরুদুরু বক্ষে কম্পিত চরণে চলছি আর ভাবছি যে, বৃদ্ধের কপালেও হয়তো নিগ্রহ আছে। সে আশঙ্কা অল্পক্ষণে দূর হয়ে গেল। একটি মেয়ে বয়স কুড়ি-বাইশ হবে ও তার মা আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন যখন শুনলেন যে আমরা সেখানেই রাত্রিবাস করব।

সেদিন ঠিক করেছিলাম পাঁউরুটির সঙ্গে আলু-পেঁয়াজের তরকারি তৈরি করে নিয়ে ডিনার সারব । মণীন্দ্র স্টোভ চড়াল । এই পরিবারের নাম ডেনিশ । কর্তার নাম বাটা, মেয়েটির নাম আনা মারিয়া, মিসেস ডেনিশ হাসিখুশি । ডেনিশদের বাড়িতে একটা বুরুশের কারখানা আছে । কারখানার কাজ মেয়ে দেখে । দু-চারজন কর্মী তখন বাড়ি চলে গিয়েছিল । সামনের বড় ঘরটায় কারখানা । আমাদের সেখানে বসবার ব্যবস্থা হল । আমাদের সঙ্গে যে পঙ্গপাল ছেলেমেয়েদের দল এসেছিল তারাও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল ।

গৃহিণী বললেন যে আগন্তুকরা যখন ভারতবর্ষের লোক তখন পাদ্রীকে ডাকা যাক । তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা তর্জমা করে শোনাবেন । যথাসময়ে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী এলেন হাতে একখানা চটি বই । আমাদের নমস্কার জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন যে গ্রামের গির্জার পরিচালক তিনি । আমরা ভারতবর্ষের লোক শুনে পাদ্রী খুব খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি বাঙালি? উত্তর পেয়ে গর্বের সঙ্গে আবার বললেন যে আর কোন দেশের লোক ‘তাগোর’কে কবিতায় তর্জমা করেছে হাঙ্গেরি ছাড়া, তা তিনি জানেন না । সেই কবিতা তিনি ‘মাজার’ ভাষায় পড়বেন । হাঙ্গেরিকে ‘মাজার’ দেশ বলা হয় ।

ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লেখা বলে আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম কোন বাংলা কবিতার তর্জমা পড়লেন । তিনি শেষ করলেন, আমি আমার ঝুলির ভেতর থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেওয়া বই ‘চয়নিকা’ বের করে একই ছন্দে পড়লাম ‘হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে’ । ঘরে ভীষণ সাড়া পড়ে গেল । আরও কবিতা পড়লাম । পাদ্রীও ছন্দোবদ্ধভাবে তাদের তর্জমা কবিতায় পড়লেন ।

দেখতে দেখতে অনেক রাত হয়ে গেল, তখন আনা মারিয়াকে ‘মাজার’ গান গাইতে বললেন । কোনও বাহুল্য না করে গাইল, সরু মিষ্টি গলা । বাংলা গানের মতো শোনাচ্ছিল ।

বাটা ডেনিশ সবাইকে বাড়ি যেতে বললেন । আমরা মুখ-হাত ধুয়ে রুটি আর তরকারি খাব মনস্থ করছি, এমন সময় মিসেস ডেনিশ আমাদের চার কাপ গরম সুপ এনে দিলেন । তখন আমরা আমাদের তরকারি অর্ধেক ভাগ ওঁদের দিলাম অনেক অনুনয় করে । মণীন্দ্রর রান্না খুব স্বাদের হয় । ওঁরা স্বামী, স্ত্রী ও মেয়ে, পেঁয়াজ-আলুর গরম তরকারি খেয়ে বেশ তারিফ করলেন ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে খেয়াল করিনি বাড়িটা কত বড় বা তাতে কটা ঘর আছে । শীতের রাতে মস্ত খাটে পালকের তৈরি গরম বিছানায় আরামে রাত্রিযাপন করলাম । পরদিন ভোরে রওনা হব ঠিক করে ঘর থেকে বেরিয়েছি । খাবার, বসবার এবং রান্নাঘরের সামনে এসে পড়লাম । যা দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল । উনুনের

আগুন রাতভর জ্বলছে। স্বামী-স্ত্রী দুটো বেঞ্চ জোড়া দিয়ে কম্বল মুড়ির মধ্যে শুয়েছিলেন। সেই ঘরের একাংশে মেয়ের খাট ও বিছানা ছিল। এরকম ত্যাগ স্বীকার আমার ভবঘুরে জীবনে আমি কম দেখেছি। নিজের বিছানা অজানা-অচেনা পরিব্রাজককে ছেড়ে দিয়ে বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটালেন ওঁরা!

তাড়াতাড়ি বন্ধুদের ডেকে ঘটনাটা সব বললাম। সবাই অবাক। তখন ঠিক করলাম বাড়িসুদ্ধ সবাইকে ভোররাতে না ঘুম ভাঙিয়ে আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে যাব।

পাশের ঘরে কথাবার্তা শুনে আমরা উঠে পড়লাম এবং বুটজুতো পরে তৈরি হলাম যাবার জন্য কিন্তু তা হবার নয়। কফি ও গরম রুটি খাইয়ে ছাড়লেন। এরকম আতিথেয়তা খুব বিরল।

সারাদিন পথে চলতে চলতে আনা মরিয়ার মিষ্টি মুখটা ও তার গান মনে পড়ছিল। একজনের বাড়িতে ঝাঁটার সম্বর্ধনা, আরেকজনের বাড়িতে আদর-যত্ন ও আন্তরিকতা, দুনিয়ার নিয়মই এই।

হাঙ্গেরির ভীষণ দুঃখ যে তার পূর্বের আয়তন ছোট করে তার অংশবিশেষ যুগোস্লাভিয়াকে ও চেকোস্লোভাকিয়াকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধের পর দান করে। নোভিসাদ, সেগেড শহর আসলে হাঙ্গেরির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল, ওই অঞ্চলের লোকেরা পুরোপুরি মাজার ভাষাভাষী।

হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট অতি সুন্দর। ডানিয়ুব নদী মাঝখানে বয়ে যাচ্ছে। দুপারে দুটো বড় বড় শহর। 'বুদা' এবং 'পেস্ট', চমৎকার সেতু মাঝখানে। ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার লেসেপ্সের তৈরি। আইফেল টাওয়ার এবং সুয়েজ ক্যানাল করে তিনি অমর হয়ে গেছেন।

আমরা ওয়াই এম সি এ-তে উঠলাম এবং একটা লেকচারের ব্যবস্থা হল।

পৌঁছবার দুদিন পরেই হাঙ্গেরির মুক্তি যোদ্ধা এবং কবি কোসুথের বিরাট প্রস্তরমূর্তি উন্মোচন করা হবে। আমাদের নিমন্ত্রণ হল। প্রথম সারিতে বসে খুব ঘটা করে মর্মরমূর্তির অভিষেক দেখলাম।

হাঙ্গেরি চাষবাসের দেশ। চারদিকেই তার সাজ-সরঞ্জাম। দেশের লোকেরা তখন চেষ্টা করছে বড় বড় খেতখামারগুলি যন্ত্রচালিত করবার, তাহলে আরও বেশি ফসল পাবার সম্ভাবনা।

রাত্রে ওয়াই এম সি এ-তে ছোটখাটো জনসমাগম হয়েছিল আমাদের অভিজ্ঞতা শোনবার জন্য। পয়সা রোজগার হল সামান্য- ১৫০ টাকা। সেই টাকার মূল্য এই দুর্দিনে অনেক। সামান্য টাকার ওপর ভরসা করে অনেকদূর বহু কষ্টকর পাহাড়ি পথে অস্ট্রিয়া পার হয়ে জার্মানিতে বার্লিন শহরে পৌঁছতে হবে। তখনও আমাদের খুব আশা যে বার্লিনে

গিয়ে কমিটির চিঠি ও টাকা পাব । ইতিমধ্যে জাতীয় চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারি দেখতে গেলাম ।

সামনে কঠিন শীত আসছে, তা সে যে কত কঠিন হতে পারে আমাদের তা ধারণার বাইরে । কাপড়চোপড় এত কম যে কী করে শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করে এগোব তার হদিশ জানা নেই ।

আমাদের কাপড়চোপড়ের মোট হিসাব দিলে এখানে মন্দ হবে না । জুট ফ্লানেলের শার্টের নিচে হাতকাটা গেঞ্জি । পাতলা কাপড়ের ব্রীচেসের নিচে আন্ডারওয়ার (ব্রিফ টাইপের) সেগুলি পাতলা সুতির বরং মরুভূমিতে পরবার উপযুক্ত । ভীষণ শীতের দেশে তাদের পরা না পরা সমান । গরম মোজা বা শীতে ব্যবহারের একটা জিনিসও আমাদের ছিল না । গলা ঢাকবার জন্য স্কাউটের স্কার্ফ (সুতির) ব্যবহার করতাম । পরে পশমের স্কার্ফ একটা উপহার পেয়েছিলাম ।

ডানিয়ুব নদী পার হয়ে আমরা অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করলাম । এখানে সীমান্তে কোনও বিশেষ ঘাঁটি ছিল না যাত্রীদের জিনিসপত্র বিশদভাবে পরীক্ষার জন্য । একদিন বিকালে সীমান্তের কাছে প্রায় এসেছি এমন সময় ঘন কুয়াশায় রাস্তা ঢাকা পড়ে গেল । সবই অস্পষ্ট । একঘণ্টা প্রাণপণ জোরে সাইকেল চালাবার পরও সীমান্ত ঘাঁটির কোনও খোঁজ পেলাম না । অন্ধকার হয়ে এল চারদিক । কোনও বাড়ির আলো দেখছিলাম না যে কাউকে জিজ্ঞেস করব আমরা কোথায় আছি । আরও আধঘণ্টা চলবার পর রাস্তার অদূরে একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখলাম । চাষীর বাড়ি । কাছে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখি চাষীরা জার্মান ভাষায় উত্তর দিল এবং বলল যে আমরা ১১ মাইল দূরে সীমান্ত পার হয়েছি । খিদে-তেষ্টায় এবং ক্লান্তিতে তখন দেহ অবসন্ন, তবু সীমান্তে ফিরে যেতে হল । ছাড়পত্র চাই পাসপোর্টের ওপর তা না হলে দেশ ছাড়বার সময় বহু বিপদ হবে । শুল্ক বিভাগের লোকেরা আমাদের সাইকেল, ক্যামেরা ও বন্দুকের ছাড়পত্র দিলে তবে অন্যদিকের সীমান্তে আমাদের এগোতে দেবে ।

শীতের রাত, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে রাস্তায় জনমানব নেই । কোনও গাড়িও নেই । দশটার সময় সীমান্তে পৌঁছলাম । ঘাঁটিতে দুই দলে পাসপোর্ট এবং আবগারি বিভাগের মোট চারজন লোক ছিল । তারা ঝাঁপ বন্ধ করে সেই রাতের মতো বাড়িতে শুতে যাচ্ছিল । আরেকটু দেরি হলেই সারারাত রাস্তায় কাটাতে হত ।

আমাদের কাগজপত্র সব ছাপ মেরে ছেড়ে দিল । কিন্তু এত রাতে যাব কোথায় ভেবেই পেলাম না । একটা বুদ্ধি এল মাথায় । সীমান্তরক্ষীদের অনুরোধ করলাম তাদের ছোট্ট অফিসঘরে আমাদের থাকতে দেবার । তারা রাজি হল ।

হাঙ্গেরি পার হয়ে অস্ট্রিয়ায় পৌঁছেছি। অস্ট্রিয়ার ভাষা জার্মানদের ভাষা এক, ভালো উচ্চারণ ও ভদ্রভাষা বলে অস্ট্রিয়ানরা গর্ববোধ করে। লোক হিসাবে অস্ট্রিয়ানরা অনেক অমায়িক ও মিশুকে। মেয়েরা জার্মানদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুশ্রী এবং অতিথিপরায়ণ।

যুগোস্লাভিয়াতে থাকতে প্রথম লক্ষ করেছিলাম যে তাদের রাজধানীর নাম, 'বেওগ্রাড' যাকে আমরা অর্থাৎ যারা ইংরিজির মাধ্যমে নাম শুনেছি, সবাই বেলগ্রাড বলে অভিহিত করি। তেমনই ইউরোপের প্রায় সব দেশের ও শহরের যা আসল নাম তা ইংরেজরা বদলে অন্য নামে ডাকে। যেমন অস্ট্রিয়ার নাম জানলাম 'ওয়েস্তারাইখ'। ভিয়েনার নাম 'ভীন'। যথাস্থানে তাদের কথা লিখব।

রক্ষীরা আমাদের বিশ্বাস করে ঘাঁটি ছেড়ে কাছেই বাড়িতে গেল। আমরা চেয়ার-টেবিল জোড়া দিয়ে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলাম। এরকম প্রায়ই হত যে খাটুনির জন্য পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমের হাতে নিজেদের সমর্পণ করতাম, খাওয়া জুটুক আর নাই জুটুক।

ভোররাত ৪টের সময় কে বা কারা দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করল। কম্বল ছেড়ে দরজা খুললাম। দেখি দুজন ভদ্রলোক, পিছনে মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির নম্বর প্লেটে জি বি লেখা, দুই ইংরেজ ভদ্রলোককে জানালাম যে অফিস খুলবে না।

সকাল সাতটার সময় চারজনের জন্য একপাত্র কফি নিয়ে রক্ষীরা এল। আমরা গরম কফির জন্য অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি, এমন সময় সেই দুই ভদ্রলোক গাড়ি থেকে বেরিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। কফি আরও দুভাগ করে দিলাম।

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে রওনা হলাম। গতরাত্রের বৃষ্টিতে রাস্তা ভিজে। রাস্তার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। দুঃখের বিষয় অচিরে বরফ পড়তে আরম্ভ হল। সাইকেল চালানো এক বিভীষিকার সামিল হল।

রাস্তা ক্রমে উঁচুর দিকে উঠতে আরম্ভ করল। তখন হাঁটা ছাড়া অন্য কোনও গতি রইল না। বেলা বারোটার সময় একটা ঝরনার সামনে পৌঁছলাম। খিদে পেয়েছে। মণীন্দ্র পরামর্শ দিল খিচুড়ি খাওয়া যাক। একটা ভালো জায়গা দেখে আমরা বসে পড়লাম। শীতের রাতে ধড়াচূড়া পরে চেয়ার সাজিয়ে শুয়ে ভালো ঘুম হয়নি। খিচুড়ি তৈরি হবার আগেই একটু ঘুমিয়ে নিলাম পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে। বেশি করে বরফ পড়তে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে ছয় ইঞ্চি পুরু বরফ জমে গেল রাস্তার ওপর।

যে দুজন ইংরেজ গাড়ি নিয়ে সীমান্তে এসেছিল তারা এতক্ষণে খুব সাবধানে গাড়ি চালিয়ে আমাদের কাছে এল। গাড়ির সব চাকায় লোহার চেন বাঁধা যাতে রাস্তা থেকে ছিটকে চলে না যায়। এবার পরিচিতের মতো আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করল। তারপর কী ভেবে জিজ্ঞাসা করল, 'কী খাচ্ছ তোমরা?' আমরা বুঝিয়ে বললাম খিচুড়ি। কী বুঝল জানি

না । গাড়িতে গিয়ে একটা সালামি রোল নিয়ে এল এবং আমাদের দিল । ধন্যবাদ জানালাম । সেদিনটা ভালোই কাটল ভোজনের দিক দিয়ে । অগ্রগতির দিক থেকে কিন্তু ফল সন্তোষজনক নয় । আল্পস পাহাড়ে ও রাস্তায় বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে সাইকেল নিয়ে উঠতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল ।

বিকাল চারটের পরই অন্ধকার নেমে এল । একটা পোড়া কাঠের বাড়িতে উঠলাম রাত কাটাবার মতলবে, দরজা-জানলা কিছুই নেই । সারারাত বরফ পড়ে গেল । সসেজটা শেষ করে কম্বল মুড়ি দিলাম । মেঝেতে মনে হল ভেড়া বা গাধাজাতীয় জীবের ময়লা পড়ে আছে । কম্বলের একাংশ নাকের ওপর টেনে দিয়েও গন্ধ এড়াতে পারলাম না । নেহাৎ ক্লান্তি ছিল । বাইরে ঠান্ডা ঝোড়ো বাতাস, তার চেয়ে এই দুর্গন্ধও শ্রেয় ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম ।

তার পরদিন আমরা গ্রাৎস শহরে পৌঁছলাম । এখানে বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি আছে । ছাত্রাবাসে উঠলাম রাত কাটাবার জন্য । ছাত্ররা আমাদের দেখে এবং কথা বলে আশ্চর্য ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল । আমাদের নিমন্ত্রণ জানাল তাদের সঙ্গে খাবার জন্য ।

মধ্য ইউরোপের ছাত্ররা খুব বিয়ারের ভক্ত । কোনও একটি নির্দিষ্ট হোটেলের হলে ছাত্ররা মিলিত হয় এবং গান ও ফুর্তি করতে করতে বিয়ার খায় । বাড়ি যাবার সময় একটা লম্বা শেলফ-এ কলেজের বিশেষ কারুকার্য করা টুপি রেখে যায় ।

আমাদের বিয়ার, সসেজ ও রোল খাওয়াল । সেখানে আমাদের কিছু বলতে বলল, আমরা কোন পথে ভারতবর্ষ থেকে অস্ট্রিয়া পৌঁছেছি সবিস্তারে বললাম । কী কষ্ট স্বীকার করে আমরা চলেছি তাদের দেশের মধ্য দিয়ে সে তো তারা দেখতেই পাচ্ছিল নিজেদের চোখে ।

সকালে দেখলাম রাস্তার ওপর আঠেরো ইঞ্চি বরফ । সব বাড়ির ছাদ ও জানলার কোল সাদা বরফ ঢেকে দিয়েছিল । হাঁটতে হাঁটতে সাইকেল টেনে নিয়ে ক্রমশই আরও উঁচু পাহাড়ে উঠতে লাগলাম । প্রায় ৫,০০০ ফুট উঠলাম । বরফ পড়তে পড়তে রাস্তার ওপর ৭ ফুট বরফ জমে গেছে । রাস্তার দুপাশে দিনে দুবার করে বরফ ঠেলে ফেলার ব্যবস্থা আছে । রাস্তার ধারে টেলিফোন পোস্ট আছে । বরফ টেলিফোনের তারে পর্যন্ত জমে উঠেছে । এ এক অদ্ভুত দৃশ্য । চারদিকে সাদা বরফ ছাড়া কিছু দেখা যায় না । তার ওপর দিয়ে চলা বিপজ্জনক । প্রতি মুহূর্তে মনে হয় পা পিছলে কোথায় নেমে যাব তার ঠিক নেই । একজন অস্ট্রিয়ান পরামর্শ দিল জুতোর ওপর মোজা পরতে, তাহলে উল্টেপাল্টে আছাড় খাওয়া কমবে । আমাদের কাপড়চোপড় ও মোজা ইত্যাদির খুব অভাব, কী করা

যায় মোজা খুলে জুতোর ওপর পরলাম, তাতে পড়া অনেক কমে গেল । কিন্তু পা শীতে অসাড় ।

বরফঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে যখন একটু গরম হাওয়া বয়ে যায়, তখন বরফ গলে যায় । রাস্তা শক্ত হয়ে যায় ঠান্ডা হাওয়া লেগে । তারপর পিছল উঁচু-নিচু রাস্তায় চলা যে কী কষ্টসাধ্য তা বর্ণনায় কুলোয় না । তখন কি আর জানতাম এর চেয়ে কত বড় কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, দুদিন পরে যখন বরফের ঝড় আরম্ভ হয়ে! ঝোড়ো বাতাস মাইনাস ৩০ ডিগ্রি ঠান্ডা । চোখ চেয়ে সে ঠান্ডা সহ্য করা যায় না । কনকনে হাওয়া লাগলেই চোখ দিয়ে জল পড়ে । নিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের সবার নাক সাফ করলে পরমুহূর্তে রুমাল খড়মড়ে কাগজের মতো শক্ত হয়ে যেত । সর্দি জমে নাকে ও দুই চোখে আই সিকল-এর মতো ঝুলত । নাক ও চোখের পাতার সাড় নেই কিন্তু বরফের ছোট ছোট কাঠি চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারতাম না ।

অস্ট্রিয়ানরা বলত যে, সেরকম তাণ্ডব বরফের ঝড়ে তারা বাড়ির বাইরে বার হয় না । আমরা নিশ্চয় মরে যাব যেহেতু আমাদের যথেষ্ট গরম জামাকাপড় নেই । আরেকটা জিনিস যা তারা জানত না সেটা হচ্ছে যে পুষ্টিকর খাবার আমাদের অনেকদিন জোটেনি । পুঁজি কয়েকটা টাকা মাত্র । সেইজন্য আমাদের কোথাও বরফের ঝড়ে বসে থাকার অবস্থা ছিল না । যেমন করে হোক চলতেই হবে বার্লিন পর্যন্ত । নিশ্চয় চিঠির জবাব ও টাকা পাব সেখানে ।

হায়েলিগেন ব্লুট-এর কাছাকাছি একদিন সকালে আমরা বরফের ঝড়ে এগোতে পারছিলাম না । সাইকেল টেনে নিয়ে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল । পাঁচ মিনিট পর পর একহাত পকেটে ঢুকিয়ে গরম করে নিতে হচ্ছিল । হাতের আঙুলের মাথা রক্তশূন্য নীল রং হয়ে গেছে । একবার এ-হাত একবার ও-হাত পকেটে পুরে খুব কমই এগোতে পারছিলাম । এই অবস্থায় আমাদের সবার শরীর অবসন্ন ও চলচ্ছক্তি-রহিত হয়ে পড়েছিল । তার ওপর খাওয়া তো জোটেনি ।

বন্ধু আনন্দ বরফের ঝড় আর সহ্য করতে না পেরে বসে পড়ল । তার কাছে এগিয়ে দেখলাম সঙ্গীন অবস্থা । কী করব বা কোথায় আশ্রয় নেব ভাবছি, এমন সময় পুলিশ ঘোড়ায় টানা চাকাহীন স্লেজ গাড়ি নিয়ে এসে থামল । রাস্তায় লোকেরা বিপদে পড়লে স্লেজে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং পুলিশ বিপদগ্রস্ত লোকেদের বা ছোট ছেলেমেয়েদের শুশ্রূষা করে বাঁচায় ।

আনন্দর দেহটা ক্রমে অনড় হয়ে আসছিল । স্লেজের ওপর তাকে উঠিয়ে রওনা করে দিলাম । ঘোড়ার গলায় ছোট ছোট ঘন্টা টিংটিং করে বাজতে আরম্ভ করল যখন থপথপ

করে ঘোড়া স্লেজটাকে বরফের ওপর টানতে টানতে চলে গেল । পুলিশ ভদ্রভাবে বলল যে তার বাড়ি খুব কাছেই । যদিও এখন সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা, তবু সেখানেই যেতে ।

আমরা পুলিশের বাড়ি গিয়ে যা দেখলাম তাতে চক্ষু চড়কগাছ । আনন্দর জামাকাপড় খুলে স্বামী-স্ত্রী দুজনে তার দেহের ওপর বরফ ঘষছে । আমাদের ঘরে বসতে বলল, আরও বলল সেখানে আগুনের খুব কাছে যেন না বসি ।

আমাদের পা অসাড় । মনে হচ্ছিল বোধহয় ফ্রস্ট বাইট হয়েছে পায়ের আঙুলে । ঘরের ভেতর না গিয়ে আমরা দেখলাম কী অসীম যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে পুলিশ ও তার স্ত্রী আনন্দকে চাঙ্গা করে তুলল । তারপর আমাদের সবাইকে ঘরে নিয়ে গেল এবং একটু ব্র্যান্ডি খেতে দিল । একটু পরে চিজ-এর টুকরো আমাদের সবাইকে দিল । এবং দুজনেই বলল যে এমন দিনে বাইরে না বেরোতে । তাদের আশ্বস্ত করে চারজনে রাস্তায় বরফের স্তূপের ওপর চলতে আরম্ভ করলাম । সারাদিন এমনিভাবে কাটল বরফের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে । খাবার জুটল না । বিকেল সাড়ে তিনটের সময় অন্ধকার নেমে এল । দীর্ঘ রাত্রি কেমন করে কোথায় কাটবে ভাবতে ভাবতে চলেছি । একটা বরফ ঢাকা ছোট গ্রামে পৌঁছলাম । এতদিন আমরা বাইরে যেখানে-সেখানে শুয়ে রাত কাটিয়েছি কিন্তু আর তা সম্ভব নয় । একটা পাব হাউস অর্থাৎ সাধারণের মদ খাবার জায়গায় আমরা উপস্থিত হলাম । এইরকম পাব হাউসে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক রাত কাটাতে হয়েছে । পাব-এর মালিককে অনুরোধ করলাম যে ঘরের অনুমতি দিতে । অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই দেখে সে রাজি হল । আমরা চার কাপ গরম জল করে কোকো রুটি দিয়ে রাত্রের ডিনার সারলাম ।

এদেশে যত বরফ পড়ে নেশাখোরদের ততই উৎসাহ বাড়ে মদ খাবার । অনেকে ভদ্রতা দেখাবার জন্য আমাদের মদ খেতে দিত । তার বদলে খাবার জল চাইলে সবাই হাসত এবং বলত যে জল খাওয়ার অভ্যাস নেই । তার বদলে আমাদের বিয়ার খেতে দিত । আমরা স্টোভ-এর ওপর একতাল বরফ একটা পাত্রে বসিয়ে খাবার জল করে নিতাম ।

সকলেই আমাদের বিষয়ে জানতে চাইত । ঘুম ও ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসত কিন্তু বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকত না । যখন সকলে মদ খেয়ে গভীর রাত্রে বাড়ি যেত তখন আমরা কাঠের মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে স্টোভ-এর কোল ঘেঁসে শুয়ে পড়তাম । কয়লার অভাবে আগুন নিভে যেত, বাকি রাত্রি কম্বল মুড়ি দিয়ে টেনে ঘুম দিতাম । পরদিন খুব সকালে পরিচারিকা সিগারেটের টুকরো ও করাতের গুঁড়ো (যাতে সবাই জুতোর বরফ মুছতো) সাফ করতে করতে হঠাৎ আমাদের সামনে এসে দেখত তখন অবাক হয়ে নিজের মনে বলত, 'আহা গরিব বেচারা, এদের শোবার জায়গা পর্যন্ত জোটেনি ।' আমরা পাশ ফিরে আরেকটু শুয়ে নিয়ে উঠে পড়তাম । এই হয়ে দাঁড়াল আমাদের দৈনিক জীবন

। অশেষ কষ্ট সহ্য করে সামান্য এগোতে পারতাম । সারাদিন চেষ্টা ও বরফের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এইভাবে ভিয়েনায় পৌঁছলাম । প্রকাণ্ড শহর সবটা বরফে ঢাকা, সবাই স্কি ঘাড়ে নিয়ে কাছেই গ্রিনসিং পাহাড়ের অসমতল জায়গার দিকে চলেছে । অনেকে শহরের রাস্তায় স্কেট পরে বেড়াচ্ছে । মোটরগাড়ি চলাচল বন্ধ ।

ওয়াই এম সি এ-তে গিয়ে খোঁজ করলাম কোথায় দু-চারদিন বিশ্রাম করতে পারি । এক ভদ্রলোক- নাম ব্যোমগার্টনার । আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল । যেতে যেতে প্রথমেই মনে হল কমিটির কাছ থেকে হয়তো টাকা এসেছে । পোস্ট অফিসে খোঁজ করতে যেতে হবে সব কাজের আগে । আমাদের ঢাল-তলোয়ার অর্থাৎ জিনিসপত্র বন্দুক ইত্যাদি ব্যোমগার্টনারের দেওয়া একটা ঘরে রেখে বেরিয়ে পড়লাম । অনেক উৎসাহ এবং আশা নিয়ে গেলাম জেনারেল পোস্ট অফিসে । সেখানে যথারীতি হতাশ হয়ে ফিরলাম । কেবল আমার মা-র একটা চিঠি পেলাম ।

পোস্ট অফিস থেকে ফেরবার সময় ভাবছিলাম কমিটি কেন কথা রাখল না । আমরা তো শীত-গ্রীষ্ম ও সবরকম কষ্টের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি । মরুভূমির ১৫০ ডিগ্রি উত্তাপ আর এখন মাইনাস ৩০ ডিগ্রি শীতে নাস্তানাবুদ হচ্ছি । কেন এমন হল । আমাদের শেষপর্যন্ত কি পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে না খেয়ে মৃত্যু হবে! দেশভ্রমণের ইচ্ছা পুরো থাকলেও সন্দেহ জাগছে পরিণতির কথা ভেবে । আমি নিজে ভাবলাম ঘরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুনিশ্চিত জীবন ছেড়ে আমরা কোথায় চলেছি জানি না । নেহাৎ অদম্য উৎসাহ ও অটুট ভালো স্বাস্থ্য, তাই এত কষ্টেও টিকে আছি এখনও । হিসেব করলাম কয়দিন দিবারাত্রি আমরা বুটজুতো খুলিনি । জুতো পরেই ঘুমনো অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ।

ভিয়েনায় বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি ইহুদি সন্তান ব্যোমগার্টনার অনেকগুলি হ্যাম স্যান্ডউইচ ও একপাত্র কফি নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে । অনেক ধন্যবাদ দিয়ে গোগ্রাসে খেলাম । বিকালে সেন্ট স্টিফেন গির্জা দেখতে গেলাম । তারপর দ্রষ্টব্যের মধ্যে ছিল আর্ট গ্যালারি ও বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা বিঠোভেনের বাড়ি ।

অনেকদিন পর গরম জলে স্নান করে নিজেদের ঘসে মেজে পরিতৃপ্ত হলাম । আবার কবে স্নান করতে পারব জানি না । আমাদের জীবন তখন অনেকটাই উটের মতো হয়ে উঠছিল । যখন খাবার পাচ্ছি বেশি করে খেয়ে নিই- কবে আবার পেট ভরে খেতে পাব কে জানে । ইতিমধ্যে আমাদের কয়েকদিন উপবাসে কেটেছে যদিও চলা এবং পরিশ্রম কিছু কম হয়নি ।

ব্যোমগার্টনারকে বললাম ওয়াই এম সি এ-তে পরদিনই আমাদের ভ্রমণকাহিনী শোনাবার ব্যবস্থা করতে, সে খুব খুশি হয়ে ব্যবস্থা করল ।

মিটিং-এ আমাদের সাজ-সরঞ্জাম ও দারুণ শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সব হাতিয়ার দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। সবাই বলল যে এত সামান্য জামা-কাপড় নিয়ে আর আমরা বেশিদূর এগোতে পারব না। মৃত্যু সুনিশ্চিত। ভয় পাইনি এই কথায়। এটা বোঝাবার জন্য আমরা বললাম যে ভারতবর্ষ থেকে অনেক সূর্যরশ্মি আমাদের দেহে নিয়ে এসেছি। আমরা সব সহ্য করতে পারি। কেউ বিশ্বাস করতে চাইছিল না। আমরা পর্বতপ্রমাণ বরফ ঠেলতে ঠেলতে ভিয়েনা পর্যন্ত পৌঁছেছি এটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি।

হাতে তখন আমাদের একটা পয়সা ছিল না। একটুকরো রুটি আর দু চামচ কোকো খাবার মতো পয়সাও ছিল না। চিনি খাওয়া অভাবের তাড়নায় অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছিলাম, যদিও শীতে এইরকম পরিশ্রমের জন্য মিষ্টি খাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

শীত সহজেই অসহ্য হয়ে পড়ে যদি মাঝে মাঝে শরীরটাকে বিশ্রাম দিয়ে গরমে নিজেদের পুনরুজ্জীবিত করতে না পারি। পেট খালি থাকলে শীতও বেশি লাগে।

তিনদিন ভিয়েনায় কাটিয়ে রওনা হলাম- আবার বরফের ঝড়ের মধ্যে।

ব্যোমগার্টনার-এর সহৃদয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ইহুদিদের বিরুদ্ধে সবাই যে বদনাম দেয় তা বেশিরভাগ মিথ্যা এবং হিংসাপ্রণোদিত। ব্যোমগার্টনার বার্লিনে তার এক আত্মীয় মিসেস আর্নহাইম-এর সঙ্গে দেখা করবার জন্য একটা চিঠি দিল। ভবিষ্যতে সেই পরিচয়পত্র আমার অশেষ উপকার করেছিল।

ডানিয়ুব নদী যখন পার হলাম তখন নদীর জলের ওপরে বরফ জমে গিয়েছে। তার ওপর দিয়ে সবাই যাতায়াত করছে এমনকী গাড়ি পর্যন্ত। ব্রিজের ওপর উঠতে কেউ চায় না। যার যেখানে দরকার সেইখানে নদী পার হচ্ছে। কত অসংখ্য ছেলেমেয়ে এমনকী বয়স্করাও বুটের ওপর স্কেটিং শ্যু পরে মনের আনন্দে নাচছে, দৌড়চ্ছে এবং খেলছে। ছোটদের খুব প্রিয় খেলা বরফ দিয়ে মানুষ তৈরি করা তারপর দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করে বরফ ছোড়া।

এরপর আমাদের লক্ষ্যস্থান হল স্টেয়ার শহর। শিল্পের জন্য বিখ্যাত বিশেষ করে ওই নামেই সেখানে ভালো মোটরগাড়ি তৈরি হয়। আগে অস্ট্রিয়া এত ছোট দেশ ছিল না।

স্টেয়ারে কারখানার গেস্টহাউসে আশ্রয় পেলাম। গেস্টহাউসে কোনও গেস্ট বহুকাল থাকেনি- থাকবার উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেই। যাহোক ঘরটায় আসবাবপত্র না থাকলেও আমাদের একান্ত নিজেদের ব্যবহারের জন্য সেটা একরাত্রির জন্য পেলাম বলে খুব ভালো লাগল। বহুদিন পরে বেলা চারটে থেকে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত বসে থাকার হাত থেকে রেহাই পেলাম।

শীতের রাত এত দীর্ঘ যে মনে হয় সাত ঘণ্টার বেশি দিনের আলো দেখতে পেতাম না । বাকি সতেরো ঘণ্টা আলো জ্বেলে থাকলে ভালো হয় ।

পরের বড় শহর লিনস-এ পৌঁছলাম । এককালে এখানেও অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল । লোকেরা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন মনে হল । লিনস শহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক বরফ ঢাকা উঁচু পাহাড় আছে । এই পাহাড়ের নাম বোহেমিয়ান মাউন্টেনস (আল্পসের অন্তর্গত) । আমাদের গন্তব্যপথ ওই পাহাড়ের গা দিয়ে উঠে গিয়েছে । এর পরেই আমরা জার্মানি পৌঁছব, যদি বরফ ঢাকা পাহাড় পার হতে পারি ।

ডানিয়ুব নদী পাহাড়ের মধ্যে সরু উপত্যকা ধরে চলেছে- এখানেও বেশ চওড়া যদিও দুধারে উঁচু পাহাড় ।

সীমান্তের বড় শহর পাশাউ-এ পৌঁছলাম । পাহাড়ের ওপর শীতের দিনে চারদিকে ধোঁয়াটে কুয়াশা, তারই মধ্যে ডানিয়ুব নদীকে অস্পষ্ট আলোয় গলিত রুপোর স্রোতের মতো দেখাচ্ছিল ।

৪

জার্মানি এক মহান দেশ। এই জাতিও দুর্ধর্ষ এবং সত্যই বহুগুণসম্পন্ন। এদের জাতিগত গুণ উচ্চশিক্ষা লাভ করা এবং প্রাণপণ পরিশ্রম করে নিজের তথা দেশের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট থাকা। আমার ধারণা নিয়মানুবর্তিতায় কোনও জাত এদের হারাতে পারবে না। যদিও কোথাও লেখা থাকে যে ঘাসের ওপর চলা নিষিদ্ধ তা হলে একজন লোকও ঘাসের ওপর পা ফেলবে না। সেজন্য 'ফেরবোটেন' (Forbidden বা নিষিদ্ধ) কথাটার তাৎপর্য জার্মানদের কাছে একেবারে মন্ত্রের মতো কাজ করে।

হেরম্যান কোলবের কৃপায় এবং অস্ট্রিয়ায় ঘোরার ফলে জার্মান ভাষা আমার কাছে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। নতুন একটা দেশ ভ্রমণ করবার কথা ভাবলেই ভাষাতঙ্ক জাগে, জার্মানিতে তার ব্যতিক্রম হল।

হঠাৎ বরফ গলে যাওয়ার ফলে ভীষণ কাদা হয়েছিল রাস্তায়। এ এক নতুন বিপত্তি। তবু জলকাদার ভেতর দিয়ে সাইকেল চালানো অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর। পাহাড় থেকে নামতে নামতে নদীর দুধারে পাশাউ শহর দেখলাম। মনে হল চারদিকে কয়লার খনি, যেজন্য ধোঁয়ায় অন্ধকার ও অস্পষ্ট। হয়তো অনেক শিল্পও আছে, তার সঙ্গে চিমনির ধোঁয়া আরও কষ্টকর ঠেকছিল।

ইউরোপে এসে দেখছি যেখানে কয়লার খনি সেখানেই কাছাকাছি শিল্প গড়ে উঠেছে। পরে জিনিসটা প্রত্যক্ষ করেছি অনেক বিশদভাবে। যত কয়লার খনি থাকে, তত লোহার কারখানা।

শহরে একরাত ছোট হোটেলে কাটালাম। পরদিন আমরা যখন রুটি-কোকো নিয়ে প্রাতরাশ খেতে বসেছি, জার্মান যুবকরা দলে দলে ঘরে উপস্থিত হল। তারা শুনতে চায় আমরা কেমন করে ভিয়েনা থেকে এই শীতে ও বরফের ঝড়ের মধ্য দিয়ে পাশাউ পৌঁছেছি। সবাই খুব আশ্চর্য যে ভারতবর্ষ অর্থাৎ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক হয়েও আমরা বরফের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগোচ্ছি।

কলেজের ছেলেরা খুব জিদ করল তাদের মধ্যে দু-চারদিন কাটাতে কিন্তু আমাদের তাড়া ছিল বার্লিন পৌঁছবার। বার্লিন অনেক দূরে এবং সামনে বোহেমিয়ান পাহাড় ও

জঙ্গল পার হতে হবে। আপাতত এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা আমাদের সামনে। ছাত্রদের অনুরোধ রাখতে পারব না বললাম, এমন সময় হোটেলের মালিক আমাদের জন্য চার কাপ কফি করে নিয়ে এলেন এবং খাবার জন্য অনুরোধ করে বললেন যে কফির দাম দিতে হবে না। অধিকন্তু ঘরের ভাড়াও দিতে হবে না। আমাদের কফি খাবার কোনও অন্তরায় রইল না, কোকোর পরই কফি খেলাম। লোকে কথায় বলে বিনামূল্যে বিষও খাওয়া যায়- এ তো ভালো জিনিস, কফি।

রওনা হতে দশটা বাজল- ছেলেদের 'অটোগ্রাফ' নেবার উৎসাহ খুব। পাশাউ ছেড়েই পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। পাশাউ যেন গর্তের ভেতর নিচে। চারটের সময় একটা নাম না-জানা গ্রামে বিয়ার হলে বা পাব-এ আশ্রয় নিলাম। পাহাড়ে হেঁটে সাইকেল ঠেলে উঠতে খুবই পরিশ্রম হয়েছিল। তাছাড়া দুপুরে কোথাও থামিনি খাবারের জন্য।

যথারীতি বসে বসে ঢুলতে ঢুলতে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাটালাম। যে পাব-এ আসে সেই আমাদের বিয়ার খেতে দেয়। আমরা বিয়ার খাই না বললে জার্মানরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। নিশ্চয় ভাবত এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে ভারতবাসীর মতো সুসভ্য লোকেরা বিয়ারের মর্ম বোঝে না। অনেকে গর্ব করে বলত যে তারা জীবনে কখনও জল খায়নি। পানীয় জলের পরিবর্তে বিয়ার অনেকেই খায়। বিয়ার খুব সস্তা এবং পুষ্টিকর খাদ্য। ছেলেমেয়েরা সমান তালে বিয়ার খায়। আমার কেবলই মনে হত যে বিয়ার খাবার টাকায় রুটি ও চিজ কিনলে আমরা অধিকতর লাভবান হব। পেটে যখন খাবার পড়বার সম্ভাবনা কম ও অনিশ্চিত তখন বিয়ার খাবার প্রশ্ন ওঠে না। অনেক সময় স্বাদ পাবার জন্য লোভ ও ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু ব্যস ওই পর্যন্ত।

আইসার নদীর ধারে রেগেনসবুর্গ শহরের দিকে যাচ্ছি। ছেলেবেলায় হোহেনলিন্ডেন কবিতায় পড়েছি, 'আইসার রোলিং র‍্যাপিডলি' সেই নদীর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হল।

এই শহরটা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নদীর ধারে দুই চূড়াওয়ালা একটি সুন্দর গির্জা। জার্মানির সব গ্রাম ও শহরই পরিচ্ছন্ন। রাস্তায় ময়লা ফেলা তো দূরের কথা একটুকরো কাগজ এমনকী দেশলাইয়ের কাঠি পর্যন্ত কেউ ফেলে না। রাত্রের আলোয় রাস্তা চিকচিক করে। আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত শহরের রাস্তা সাফ করতে হয়। জার্মানিতে তার প্রয়োজন হয় না। ক্বচিৎ কখনও ময়লা ঝাঁট দেবার গাড়ি গভীর রাত্রে, রাস্তা নীরবে সাফসুফ করে চলে যায়। ঘোড়ারগাড়ি ও মোটরগাড়ি ছাড়া অন্য কোনও যানবাহন নেই। রিকশা, ঠেলাগাড়ি, হাতগাড়িতে আমাদের দেশের শহরগুলি ভর্তি। এখানে সেসব কিছুরই বালাই নেই।

রেগেনসবুর্গ-এর এক গির্জায় দেখলাম কীরকম তোড়জোড় হচ্ছে খ্রিস্টমাসের জন্য। মাত্র তিন সপ্তাহ পরে বড়দিন। এখন থেকে রাস্তায় আলোর মালা, গাছে আলো ও দোকানে-দোকানে, আলোর মধ্যে সাজানো সব জিনিস দেখতে ভালো লাগছিল।

বাভেরিয়ার দক্ষিণ-এর দিকটায় অনেক রোমান ক্যাথলিক জার্মান আছে। মার্টিন লুথারের প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলি 'প্রটেস্ট্যান্ট' হয়ে যায়। বাকি সব দেশ রোমান ক্যাথলিক। 'রুশিয়ান অর্থোডক্স' নামে আরেকটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় আছে। তারা বলকান ও গ্রিস দেশে আধিপত্য বিস্তার করে।

আমাদের পরের গন্তব্যস্থান হচ্ছে মিউনিখ, জার্মানির অন্যতম বড় শহর। তিনদিন বরফের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগোতে লাগলাম। একটু একটু করে। যতই ওপরে উঠি ততই বরফঢাকা সব। জঙ্গলের মধ্যে এক-আধটা গ্রাম পেতাম-অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হত। সাদা বরফে সব আচ্ছন্ন হয়েছে। আমাদের মতো ভারতবাসীর কাছে সে এক অভিনব দৃশ্য। ঠিক যেন খ্রিস্টমাস কার্ডে (বরফের) আঁকা ছবি।

মিউনিখ শহরে পৌঁছে আমরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস-এর দিকে গেলাম। একটা ঘর পেলাম থাকবার জন্য। আর্ট গ্যালারি দেখলাম। মধ্য যুগের জার্মান আর্টিস্ট ডিউরার (Durer)-এর তিনখানি অরিজিন্যাল পেন্টিং দেখলাম অন্যান্য বিখ্যাত পেন্টিং-এর সঙ্গে।

একটি মস্ত দ্রষ্টব্য আছে এই শহরে যার সমান জগতে বিরল। সেটি হচ্ছে সায়েন্স মিউজিয়াম। কয়লার খনি, জাহাজের আধখানা, এরোপ্লেন ইত্যাদি বড় বড় জিনিস দিয়ে ঠাসা বিরাট মিউজিয়াম। প্রত্যেক তরুণ-তরুণীদের এটা দেখা উচিত। শত-শত বই পড়ে যতখানি হৃদয়ঙ্গম করা যায় তার চেয়ে বেশি শেখা যায় এসব চাক্ষুষ দেখে।

মিউনিখ-এ আমাদের দুদিন থাকবার কথা। আমাদের ঘরটায় 'সেন্ট্রাল হিটিং' ছিল। অর্থাৎ গরম ফুটন্ত জলের অনেক পাইপ ঘরের ভেতর দিয়ে ঘুরে চলে গিয়েছে। যেখানে এইরকম জলের পাইপ আছে সেইখানেই ঘর গরম। হাঙ্গেরি ছাড়ার পর থেকে শীত ও বরফের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই ঠিক করলাম এখানে দু-তিন দিন বিশ্রাম করে সুদীর্ঘ পাহাড়ে বরফঢাকা পথ পার হয়ে নুরেনবার্গ শহর দেখে লাইপজিগ যাব। বরফ পড়া দুদিন কম আছে। শরীরের দিক থেকে বিশেষ প্রয়োজন নিজেদের কর্মক্ষম করে তোলা। আমাদের কাছে মোট একশো টাকা আছে। তা নিয়ে কোনও মতে বার্লিন শহরে পৌঁছব। আমাদের এখনও আশা সেখানে কমিটির চিঠি ও টাকা নিশ্চয় পাব। আগে যেরকম হতাশ হয়েছি সেজন্য একবার ভাবলাম যে বার্লিনে টাকা না পেলে কী করব। কিছু করবার অন্য পন্থা বের করতে হবে। অশোক, আনন্দ ও

মণীন্দ্র একসঙ্গে বলল যে, তা বলে পৃথিবী ভ্রমণ ছাড়ব না। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে এই প্রথম প্রচেষ্টা কিছুতেই পরিত্যাগ করব না। শেষপর্যন্ত ঠিক হল যে আমাদের মধ্যে একজনও যদি কোনওপ্রকারে সক্ষম থাকে তো সে আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাবে- যতদূর পারে। সম্ভব হলে সে একাই ভ্রমণ সম্পূর্ণ করবে।

মণীন্দ্র একটু বেসুরো গাইল; 'ধর যদি বার্লিনে টাকা না আসে তখন পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করব বলে জিদ ধরে চললে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।' আমাদের মনে হল ওকথা ভেবে এখন লাভ নেই। দেশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যখন ভরসা দিয়েছেন তখন কিছুটা নির্ভর করা উচিত।

আমরা চারজনে একটা মস্ত বড় চিঠি লিখে আমাদের দুরবস্থার কথা কুমারকৃষ্ণ মিত্রকে জানালাম এবং অনুরোধ করলাম বার্লিনে প্রতিশ্রুতিমতো টাকা পাঠাতে। আমরা নিজেদের যোগ্যতার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় পার হয়েছি। আমরা যে অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে পারি- অল্প কাপড়ে এবং 'স্টারভেশন ডায়েটের' ওপর নির্ভর করে তা প্রমাণ দিয়েছি। একটি বছর পথে পথে কেটেছে। সবরকম বাধা-বিপত্তি পার হয়ে এগিয়ে চলেছি, কারও কাছে আর্থিক সাহায্য চাইনি বা নিইনি।

জার্মানিতে পৌঁছে শীতের সময় যেমন কষ্ট হচ্ছিল তেমনই আপসোস হচ্ছিল যে অনেক জিনিস দেখবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এই শীতপ্রধান দেশের লোকেরা খুবই কর্মক্ষম। অদ্ভুত পরিশ্রমী, শীতের দিনে ফুটপাথের ধারে সাজিয়ে-গুছিয়ে খাওয়া বসা, গল্প করা বন্ধ হয়ে যায়। তখন সব কারখানায় ভীষণ কাজ। দরজা-জানলা বন্ধ করে বাড়ির ভেতর নানান কাজে দেশসুদ্ধ লোক ব্যাপৃত। শীতকে তাড়াবার ওষুধ হচ্ছে পরিশ্রম করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সচল রাখা।

আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করি এবং দেহকে খাটাই, তবে কেন এত কষ্ট? দুটো কারণ: পুষ্টিকর খাবার থেকে বহুদিন আমরা বঞ্চিত। দ্বিতীয় কারণ, শীতের উপযুক্ত গরম কাপড় আমাদের কিছুই ছিল না। তৃতীয়ত, আরেকটা দারুণ অসুবিধা আমাদের ছিল। সেটা হচ্ছে দিনে-রাতে গরম জায়গায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে দেহটাকে চাঙ্গা করতে পারিনি। দেহ পুনরুজ্জীবিত করবার সোজা পথ হচ্ছে মাঝে মাঝে গরমে সময় কাটানো।

আমাদের বিশ্রাম নেবার সময় ছিল না। মূলমন্ত্র ছিল 'চরৈবেতি' অর্থাৎ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

জার্মান ভাষায় বলবার, পড়বার এবং লেখবার মোটামুটি ক্ষমতা আমার হয়েছে। নানা লোকের সঙ্গে কথা বলে, বই পড়ে ভাষায় দখল বাড়াতে আরম্ভ করেছিলাম বলে আমার খুব সুবিধা হল। যেখানে ইচ্ছা যাদের সঙ্গে ইচ্ছা মিশতে ও চলাফেরা একাই করতাম।

আমার বন্ধুরা ভাষা শেখার চেষ্টায় 'ইতি' করে দিয়েছিল । শিখে লাভ হবে না বলে ওরা হাল ছেড়ে দিল । আমার উৎসাহ ততোধিক বেড়ে গেল । ভবিষ্যতে কী হবে সে কথা না ভেবে আমি বর্তমানে অর্থাৎ জার্মানিতে যতদিন থাকব অন্তত ততদিন মহা সুবিধায় দিন কাটাব ।

কলেজের একটি ছাত্র এসে খুব উৎসাহ নিয়ে জানাল যে সে তার বাবাকে আমাদের কথা বলেছে । তিনি রেডিওর এক কর্তাব্যক্তি- আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু রেডিওতে বলবার আমন্ত্রণ জানালেন । আমি দ্বিধার সঙ্গে রাজি হলাম । পরদিন সকালে রেডিও অফিসে গেলাম, সন্ধ্যায় কী বলব ঠিক করতে । তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানাল সব ঠিক আছে- আমি রেডিওতে বলতে পারব ।

সন্ধ্যা সাতটার একটু আগে রেডিও অফিসে উপস্থিত হলাম এবং যথাসময়ে একটা ছোট বক্তৃতা করলাম এবং ভারতবর্ষ থেকে কোন পথে কত কষ্ট করে ডিসেম্বর মাসে মিউনিখ (জার্মানদের কাছে) পৌঁছেছি তার একটা ইতিবৃত্ত দিলাম । তারপর প্রশ্নোত্তর হল অল্পক্ষণ । হঠাৎ আমাকে অনুরোধ করল ট্যাগোর-এর ভাষা যদি জানি তো একটা গান গাইতে । আমি বললাম যে তার পরিবর্তে একটা জার্মান গান শোনাব যেটা সবেমাত্র শিখেছি । তথাস্তু । গানটা খুব সোজা একটা 'লালাবাই' অর্থাৎ ছোট ছেলে-মেয়ের ঘুম পাড়ানির গান । পরের গানটা 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী' গাইলাম । যদিও সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় । পরে শুনেছিলাম যে গান নাকি ভালো হয়েছিল, যা গেয়েছিলাম তা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল । যদিও আমি জানি যে আমার গান খানিকটা বেসুরো হয়েছিল ।

পারিশ্রমিক হিসাবে পঞ্চাশ মার্ক অর্থাৎ জার্মান টাকা রোজগার করলাম । দেশি টাকার তুলনায় তার মূল্য হবে ৪৫ টাকা ।

বন্ধুদের ক্যাম্পাসে ফিরে গিয়ে ৫০ ডয়েস মার্ক অশোককে দিলাম । সবাই খুব খুশি, ঠিক হল 'সেলিব্রেট' করব । আমরা সেই রাত্রেই একটা সস্তার রেস্তোরাঁতে গিয়ে পেট ভরে খাব । মুসুর ডালের স্যুপের সঙ্গে রুটি এবং এক টুকরো পর্ক বা শুয়োরের মাংসের সঙ্গে আলুসেদ্ধ ও বাঁধাকপি দিয়ে মহানন্দে ডিনার সারলাম । মোট খরচ হল সাড়ে সাত মার্ক বা ছয় টাকা । মনে হল মাঝে মাঝে এইরকম পেটভরে ইচ্ছামতো খেলে আবার পূর্ণোদ্যমে চলতে পারব ।

শীতের সময় এইসব দেশে গাছে একটাও পাতা থাকে না- সবুজ বলতে কেবলমাত্র পাইন গাছ যেমন সেডার অব লেবানন, স্প্রুশ ইত্যাদি । শাক-সব্জি বাজার থেকে তথা দেশ থেকে উধাও । এরা বাঁধাকপি কুচি কুচি করে কেটে ভিনিগারে ডুবিয়ে রাখে এবং সমস্ত শীতে তা খায় । অনেক জার্মান ভিনিগারে জরানো বাঁধাকপি, যাকে সাওয়ার ক্রউট

বলে, সেটা সারা বছর খায় । গরিব লোকেরা ভিনিগারে ডোবানো হেরিং মাছ ও রুটি খেয়েই জীবন কাটিয়ে দেয় ।

মিউনিখে একটা বিখ্যাত ফুলের বাজার আছে । দুঃখের বিষয় শীতের দিনে সেটা খালি পড়ে ছিল । ফুলের অস্তিত্ব সেখানে দেখতে পেলাম না ।

আরও দ্রষ্টব্য সব দেখবার জন্য পরদিন বেরিয়ে পড়লাম প্রাতরাশ সেরেই । বন্ধুরা অনিচ্ছা প্রকাশ করল আমার সঙ্গে টহল দিতে বেরোতে ।

আমি ঘুরতে ঘুরতে একটা মস্ত বিয়ার হাউসের সামনে পৌঁছেছি, একদল লোক আমার পিছু পিছু আসছিল । আমাকে একরকম ভিড়ের ঠেলায় বিয়ার গার্ডেনের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল । সেখানে একজন অস্ট্রিয়াবাসী লেকচার দিচ্ছিল । শুনলাম তার নাম হিটলার । বক্তব্য হচ্ছে যুদ্ধের পর 'মিত্রপক্ষ জার্মানি ও অস্ট্রিয়াকে কেটেছেঁটে ছোট্ট করে দিয়েছে । 'ভেরসাই সন্ধিপত্র' ছিঁড়ে ফেলে দাও । জার্মান ভাষাভাষীদের একত্র হয়ে এই অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে ... ইত্যাদি' । হিটলার একজন 'ইন্টিরিয়র ডেকোরেটর' ও রংয়ের মিস্ত্রি । যুদ্ধের সময় জার্মানির হয়ে লড়েছিল । একজন নেতা হবার ইচ্ছায় জার্মানির ও জার্মানদের গুণগান গাইছে । কথা বলবার সময় মনে হল হিটলার সম্মোহন বাণ ছাড়ছে । আরও শুনলাম যে যুদ্ধে হারার জন্য নাকি ইহুদিরা দায়ী । তারা শত্রুতা করে মিত্রপক্ষের হাতে জার্মানির হার ঘটিয়েছে । তাদের উৎখাত করতে হবে । সবাই খুব তারিফ করছে সেই বক্তৃতার । মিটিং শেষ হবার পর আমাকে হাজির করল হিটলারের সামনে । দাম্ভিকতাপূর্ণ চেহারা দেখে ও বক্তৃতা শুনে আমার একটুও ভালো লাগেনি । আমি ভারতবাসী জেনে প্রথম প্রশ্ন হল আমাদের দেশে কত ইংরেজ আছে । আমি বললাম, কত শত জানি না তবু এক লক্ষ নাগাদ হবে । তখনই দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, 'এই মুষ্টিমেয় ইংরেজকে কেন আমরা অর্থাৎ ৩৫০ মিলিয়ন (১৯২৭) ভারতবাসী ফুঁ দিয়ে বে অব বেঙ্গল-এ ঠেলে পাঠাই না' । তৃতীয় প্রশ্ন হল, আমাদের নেতা কে? গান্ধীজির নাম শুনে বলল সে একজন ভীতু লোক তাই নন-ভায়োলেন্স পন্থায় স্বাধীনতা আনতে চায় । আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স অভ্যাস করতে হলে বরং অতিমাত্রায় সাহসের প্রয়োজন । হিটলার তখন খেদের সুরে বলল যে ভারতবর্ষ যদি জার্মানির হাতে থাকত তাহলে জার্মানরা হিমালয়ে আলুর চাষ করত । এই কথার সঠিক মানে বুঝলাম না তবে ইঙ্গিতটা খুব সুস্পষ্ট । গান্ধীজিকে অপমানের সুরে 'ভীতু' বলেছিল বলে আমার গা জ্বলছিল । আর কথা না বলে আমি সেখান থেকে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম এবং মনে মনে ভাবলাম যে কী ভাগ্যিস, ভারতবর্ষ জার্মানির অধীন নয় । আমরা নিশ্চয়ই কারও অধীনে থাকতে চাই না । তবু একথা আমি স্বীকার করি যে কিছু ইংরেজ ভারতবাসীর মঙ্গল কামনা করছে এবং অশেষ উপকার করছে আমার দেশের । তাঁরা চিরস্মরণীয় ।

জার্মানদের ‘ওয়েস্ট আফ্রিকায় শাসনে’র কথা একটা বইয়ে পড়েছিলাম, তাতে জার্মানদের অত্যাচারী বলা হয়েছে । ফরাসিদের রাজত্ব পদ্ধতির কিছু নমুনা সিরিয়াতে দেখেছি । আপাতদৃষ্টিতে তা শোভন হলেও কোনও সিরিয়ান চাইবে না ফরাসিরা তাদের দেশ শাসন করে । ফরাসিদের সবচেয়ে বড় গুণ হল যে তারা বর্ণবৈষম্য মনেপ্রাণে মানে না । কালাধলার একই মাপকাঠি । ফলে সিরিয়ান ও ফরাসি স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা । একজন সিরিয়ান আমাকে বলেছিল যে ফরাসিরা সবাইকে সস্তায় ভালো মদ খাইয়ে সন্তুষ্ট রাখতে ও রাজত্ব চালাতে চায় ।

মনভর্তি বিরক্তি নিয়ে বন্ধুদের কাছে ফিরে গেলাম । তারা জিজ্ঞেস করল, ব্যাপারটা কী? সমস্ত ঘটনাটা বললাম । প্রথমেই আরম্ভ করলাম যে আমি এক পাগলের পাল্লায় পড়েছিলাম । তার ভীষণ আপসোস যে ভারতবর্ষে জার্মানদের বদলে কেন ইংরেজরা রাজত্ব করছে । একটা সামান্য নগণ্য দ্বীপবাসীর অধীন বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য, একি কম পীড়া দিচ্ছিল সেই পাগলকে! অবশেষে নিষ্ফল আক্রোশে জানাল, গান্ধীজিকে ‘কাওয়ার্ড’ বলে । আমি নিজেকে খুব সামলে সেখান থেকে চলে এসেছি । মারামারি করলে হয়তো হাজতবাস করতে হত ।

হিটলারের অনুগামী তখনও বেশি দেশে ছিল না, কিন্তু ওর কথাগুলো জার্মানদের মনে রঙের তুলি বুলিয়ে দিচ্ছিল । যুদ্ধের রশদ যারা জোগাড় দেয় তারাই হিটলারকে ঠেলে ওপরে তোলবার চেষ্টা শুরু করছিল ।

বন্ধুদের মত হল যে, আমার উচিত নয় ট্যাঙশ ট্যাঙশ করে বিদেশে শহরময় ঘুরে বেড়ানো । আমি একমত নই । বিদেশে বেড়ানোর উদ্দেশ্য হল ভাবের আদান-প্রদান করা বিভিন্ন জাতির লোকদের সঙ্গে মিশে ।

পরদিন মিউনিখ ছেড়ে নুরেনবার্গের পথ ধরলাম । কঠিন পথ সামনে । শীতের প্রকোপ বাড়ছে দিনের পর দিন । বরফ আবার পড়তে শুরু করেছে ।

আবার সেই বরফ ও শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগোচ্ছি । দিনে কতবার হাত নীল হয়ে যেত তার আর হিসাব রাখিনি । জামাকাপড় যা আমাদের ছিল সব প্রায় ছিঁড়ে গিয়েছে । তালি দিতে হবে, তবে কবে, কোথায় দেব- তা ঠিক করতে পারলাম না । শহরে কোথাও বেশিদিন থাকতে হলে ব্যবহার করবার একটা আলাদা ট্রাউজার ও একটা শার্ট ছিল । ভাবছি, সেইগুলো ব্রীচেস-এর নিচে পরে একটু গরম থাকবার চেষ্টা করব । দুদিন পরে তাই করতে হল কিন্তু শীতের প্রকোপ কিছুতেই কমছে না বরং শীত আমাদের কুঁকড়ে বেঁকিয়ে দিচ্ছিল ।

বরফের ঝড়ের মধ্যে কোনওমতে নিজেদের টানতে টানতে শ্রান্ত ও অবসন্ন অবস্থায় নুরেনবার্গ শহরে পৌঁছলাম । একদিন থাকবার কথা । পথে এক খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার আমাদের ছবি তুলেছিল এবং পরদিন তা প্রকাশিত হল । রিপোর্টাররা আমাদের ইতিবৃত্ত নিয়ে গিয়েছিল ।

নুরেনবার্গে থাকার জায়গা পাচ্ছিলাম না । একজন সন্ধান দিল যে একটা 'পান্সিয়ন' আছে আমরা সেখানে কম খরচায় থাকতে ও খেতে পারি । ইউরোপের সর্বত্র বোর্ডিং হাউসকে পান্সিয়ন বলে । তাছাড়া ডর্মিটরি আছে- সেখানে সারি সারি খাট পাতা থাকে, একটা পছন্দ করে নিলেই হল । ভাড়া খুব কম, মাত্র তিন টাকায় একরাত কাটানো যায় । খাওয়া মাত্র দুই টাকা । স্যুপ, রুটি ও সামান্য শুয়োরের মাংস আর আলুসেদ্ধ হচ্ছে মামুলি খানা । কখনও কখনও চিজ দেয় 'সসেজের' বদলে । স্নানের ব্যবস্থা আছে । সেজন্য ছয় আনা পয়সা দিতে হয় গরম জলের জন্য । বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব বন্দোবস্ত । আমরা পান্সিয়নে উঠলাম ।

পরে অন্য অনেক দেশে দেখেছি, স্যালভেশন আর্মির লোকেরা এইরকম ব্যবস্থা করে গরিব লোকেদের রাত কাটাবার সুবিধা করেছে । পরে সে কথা লিখব । পান্সিয়নে থাকে ছাত্ররা বা নিম্ন বেতনের চাকরিজীবীরা । স্যালভেশন আর্মি হচ্ছে বেকার এবং গরিব লোকেদের জন্য । দুইয়ের পার্থক্য অনেক- দুই স্তরের বললে ভালো হয় । পরে এর চেয়ে উন্নতমানের অনেক বোর্ডিং হাউসে থেকেছি, সেখানে ব্যবস্থা অনেক ভালো ।

আমি যথারীতি নুরেনবার্গ শহরে টহল দিতে বেরোলাম । আমরা সম্পূর্ণ 'অসময়ের ট্যুরিস্ট' বলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত, কোথাকার অর্বাচীন আমরা, তা নিশ্চয় ভাবত! শীতের দিনে বরফের মধ্যে কেউ কি দেশ ভ্রমণে বেরোয়?

কাগজে পড়েছিলাম যে ইংরিজি পদ্ধতিতে তৈরি একটা খুব সুন্দর ফুলের বাগান আছে- দেখবার মতো । চারদিকের সমতল জমি থেকে এক হাত-দেড় হাত নিচে বাগান অবস্থিত বলে ইংলিশ গার্ডেন বলা হয় । চারদিক বরফে আচ্ছন্ন বলে কিছু দেখতে পেলাম না । খ্রিস্টমাস আগতপ্রায় সেজন্য দোকান সব খুব সাজানো এবং কেনা-বেচা হচ্ছে জোরসে ।

আমার মনে হচ্ছিল কোনও ভাবনা নেই যেন; দুপুরের নির্দিষ্ট জায়গায় গরম খাবার পাব পেট পুরে, বেলা তিনটের সময় আবার বেরিয়ে পড়লাম । ভাগ্যে বেরিয়েছিলাম তাই পথে হীরালাল রায় (পরে যাদবপুর কলেজের বিখ্যাত প্রফেসর) মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হল । তিনি মিউনিখ শহরে ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা করছিলেন । কাজ নিয়ে একদিনের জন্য নুরেনবার্গে এসেছেন ।

যখন পৃথিবী ভ্রমণে বেরোই একবছর আগে তখন যাদবপুর কলেজে আমাদের জন্য এক সম্বর্ধনা সভা হয় । জাতীয়তাবাদী হীরালালবাবু সেখানে উদ্যোক্তা ছিলেন । সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ । হীরালালবাবুকে টানতে টানতে আমাদের আস্তানায় নিয়ে এলাম । তিনিও খুব খুশি হলেন আমাদের দেখে । বন্ধুদের দেখে অনেক আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং উৎসাহ দিলেন । আমাদের আসল অবস্থা যে কত সঙ্গীন হয়ে পড়েছে সে কথা জানানো হল না । কেবল বলেছিলাম দেশ ছাড়ার পর থেকে কমিটির কাছ থেকে কোনও খবর বা চিঠি পাইনি ।

আমরা আমাদের অতিথিকে কফি খাওয়ালাম । তিনি বললেন যে, বিচিত্রা মাসিক পত্রিকায় আমার লেখা ভ্রমণকাহিনী পড়েছেন । তিনিও দৈনিক কাগজে আমাদের কথা লিখবেন । বিদেশে দেশের পরিচিত লোক দেখলে খুব ভালো লাগে ।

আবার পাহাড়ে পিছল পথে উঁচুতে উঠছি, নিচে নামছি, এবং মাঝে মাঝে আছাড় খাচ্ছি । তবু চলেছি লাইপজিগ শহরের পথে । কড়া ঠান্ডা বাতাস যদি একটু কম হত তো বাঁচতাম । বরফের ঘূর্ণিঝড় থেকে একটু আড়ালে দাঁড়ালে শীতের কষ্ট অনেক কম টের পেতাম । খোলা মাঠে ও পাহাড়ে আড়াল কোথায়?

সেই একঘেয়ে বরফ, পাহাড়, অনশন, জামাকাপড়ের অভাবের কথা আর কত বলা যায়! জীবন সত্যিই দুঃসহ এবং কষ্টকর হয়ে উঠেছিল ।

নাকে এবং চোখের পাতায় আইসিকল নিয়ে লাইপজিগ পৌঁছলাম কয়েকদিন পরে । লোকেরা আমাদের মতো বরফঢাকা কালা আদমি দেখে কৌতূহলী হল বেশ । সবাই জানতে চায় আমরা কে, কোথায় যাচ্ছি । সেখানে তখন একটা বিরাট প্রদর্শনী আরম্ভ হয়েছিল । তার নাম বিখ্যাত লাইপজিগ ফেয়ার- ভারতবর্ষের কিছু মামুলি জিনিস যেমন পাট এবং পাটজাত দ্রব্যাদি, রুপোর সূক্ষ্ম কাজ, শাঁখের ও আইভরির কাজের নানারকম মূর্তি দেখলাম । ভারতীয় রান্নার মশলার খুব চাহিদা বুঝলাম । গরম মশলা, আদা, এলাচ ও তেজপাতা ইত্যাদি দেখে কল্পনা করেছিলাম আমাদের দেশি খাবার তৈরি করার কত হাঙ্গামা, যদিও সেগুলি খুব মুখরোচক । এদেশের লোকেরা 'পিলাফ' অর্থাৎ পোলাওয়ের এবং কারির কথা পড়েছে বা শুনেছে । -আমাদের প্রায়ই জার্মানরা জিজ্ঞেস করত তার স্বাদ কীরকম । মুখে বলে আর কি স্বাদ বোঝানো যায় । তাই আমরা জবাবটা এড়িয়ে যেতাম ।

পরদিন আমরা একটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বিরাট কারখানা দেখতে গেলাম । শুনলাম তারা বহু ওষুধ ভারতবর্ষময় রপ্তানি করে ।

লাইপজিগ ছেড়ে আমরা আবার পথে বেরোলাম । বার্লিন পৌঁছতেই হবে । সেখানে আমাদের ভাগ্যে কী লেখা আছে কে জানে!

মণীন্দ্র বলল, হেস্তনেস্ত একটা সেখানে হবেই । ধর যদি টাকা না আসে তখন বা তারপর ভ্রমণ আর সম্ভব নয় । শীতের মধ্যে যে কষ্ট করে এতদূর এসেছি, আর বেশিদিন সে অবস্থায় পড়লে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী । এবিষয়ে আমিও একমত । যেভাবে এতদিন চলেছি সেভাবে চলা অসম্ভব । তবু কেন জানি না আমি আশাবাদী বলে অনেকটা মনে মনে শান্ত । উপায় বের করতেই হবে যদি টাকা না আসে ।

তহবিলে অর্থাৎ হাতে তখন আছে ১১৫ টাকা । এই আমাদের মোট সম্বল । অশোক বলল যাই হোক, বার্লিনে পৌঁছে এক-এক জোড়া গরম মোজা সবার জন্য কিনতে হবে ।

পথে ছোট শহরে বা বড় গ্রামে এক নতুন থাকবার ব্যবস্থা দেখলাম- যেখানে খুব কম টাকায় পরিষ্কার খাবার, থাকবার জায়গা পাওয়া যায় । এর নাম 'ইউগেন্ড হেরবের্গে' অথবা ইউথ হস্টেল । এই হস্টেল যেখানে পেতাম সেখানেই উঠতাম । কিছু খরচ হত কিন্তু গরম ঘরে খাটে শুতে পেতাম । ইউথ হস্টেল মুভমেন্ট তখন সবে শুরু হয়েছে এবং সবাই এদের বন্দোবস্তর প্রশংসা করত শুনতাম ।

আনাহাল্ট নামে ছোট একটা শহরের দিকে এগোচ্ছি । বিকালের মধ্যে পৌঁছতে পারব ভরসা ছিল । কিন্তু আবার হঠাৎ বরফের ঝড় ওঠার ফলে আমরা দু-চার মাইলের বেশি এগোতে পারলাম না । একটা রাস্তার ধারে গ্রামে পৌঁছেই ঠিক করলাম যে সেখানে কোথাও রাত কাটাতে হবে । সবাই আমাদের একটা ভেগ্রান্টস রেফিউজে নিয়ে গেল । একটা কয়লার আগুনের চিমনি ও তার তিনদিকে তিনটে ঘরে কাঠের তিন সার শোবার জায়গা- আমরা তথাস্তু বলে একটা ঘরে ঢুকলাম । আগুনটায় বাইরে থেকে কয়লা দেওয়া যেত । একজন বেশ খুঁচিয়ে আগুনটা গনগনে করে দিয়ে চলে গেল । সন্ধ্যা সাতটার সময় একজন লোক এল মিউনিসিপ্যালিটি থেকে । আমাদের ও অন্য দুটি বেকার যাযাবর যারা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের ডাকল । আমাদের পরিচয় এবং পাসপোর্ট ইত্যাদি দেখে অপেক্ষা করতে বলল । অন্য দুটি জার্মান যুবকদের জামা-কাপড় খুলিয়ে ভালো করে আলোয় দেখল যে তাদের গায়ে পোকা আছে কিনা । তারপর আমাদের পালা । তদনুরূপ পরীক্ষা করে ছেড়ে দিল বুঝলাম, এটা বিনামূল্যে থাকবার জায়গা বলে খুব বুঝেসুজে লোককে অনুমতি দেয় ।

বাঙ্কে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলাম, ঘর ছোট্ট । তার মধ্যে চারটে সাইকেল রেখে আরও স্থানাভাব । আমরা আরামে ঘুমিয়ে পড়লাম । চিমনির গায়ের গরম আমাদের ঘরে ভালোই পাচ্ছিলাম । চিমনিটা ফাটা ছিল দু-চার জায়গায় সেজন্য বেশি গরম হাওয়া ঘরে ঢুকছিল ।

সেটা একরকম আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছিল। পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত ঘরের দরজা খুলিনি দেখে মিউনিসিপ্যালিটির লোক দরজা বাইরে থেকে খুলে ফেলল এবং দেখল আমরা চারজনে বেহুঁশ ও অচৈতন্য। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে ঘরে ঢুকেই বললেন যে 'কোল গ্যাস' চিমনির ফাঁক দিয়ে ঘরে পৌঁছেছে এবং আদেশ দিলেন যাতে আমাদের শীঘ্র টেনে বাইরে ফাঁকা জায়গায় বের করা হয়।

আমি নিচের বাঙ্ক-এ শুয়েছিলাম বলে আমার একটু কম বিষাক্ত গ্যাস লেগেছিল। অন্য লোকের টানাটানিতে আমার আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। আমিও বন্ধুদের টানতে আরম্ভ করলাম। বাইরে বরফের ওপর খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবার পরেই সব ঠিক হয়ে গেল। ডাক্তার বলে গেলেন যে চিমনি না সারিয়ে যেন কোনও লোককে ভেগ্রান্টস রেফিউজে থাকতে দেওয়া না হয়। আমাদের কাছে অনেক মাফ চেয়ে ডাক্তার বিদায় নিলেন। হোম-এর কাছাকাছি এলব নদী। ইচ্ছা করছিল নদীর ঠান্ডা জলে মুখ-হাত ধুয়ে চাঙ্গা হতে কিন্তু নদী জমে গিয়েছে। ছোট ছেলেমেয়েরা নদীর জমা বরফের ওপর মনের আনন্দে স্কেটিং করছে।

আর মাত্র একশো মাইল বাকি আছে বার্লিন পৌঁছতে। পাহাড় থেকে নামছি ব্রান্ডেনবুর্গ-এ, সমতল জমির ওপর খুব ভালো রাস্তা কিন্তু বরফে ঢাকা। সকালবেলায় মোটরগাড়িতে 'কাটার' লাগিয়ে রাস্তা একবার সাফ করে দিয়েছে। আরও দুয়েকবার সাফ করবে যদি আবার বরফ জমে। কিন্তু রাস্তা ভীষণ পিছল, সাবধানে চলেছি।

তিনদিন পরে বিশে ডিসেম্বর ১৯২৭ সালে বিকাল ৪টেয় বার্লিন পৌঁছলাম। সেদিন শনিবার ছিল। পরদিন রবিবার পোস্ট অফিস বন্ধ। আমরা অধীর আগ্রহে সোমবারের অপেক্ষায় রইলাম। প্রথমেই গেলাম নয়-কোলন পাড়ার ওয়াই এম সি এ-তে। শুনেছিলাম যেখানে সস্তায় থাকতে, খেতে পারব। আমরা থাকবার জায়গা পেয়ে গেলাম। একজন ভদ্রমহিলা ওয়াই এম সি এ দেখাশোনা করেন, তিনি হলেন ডিরেক্টর। ওয়াই এম সি এ-তে স্ত্রী ও পুরুষ দুইই থাকতে পারে।

ওয়াই এম সি এ বাড়ির অতিথিদের জন্য প্রত্যেকের পৃথক ঘর আছে। কম খরচায় থাকার জন্য বেসমেন্ট-এর বন্দোবস্ত আছে জেনে আমরা সেখানে গেলাম। বাড়ির নিচে ডর্মিটরি। প্রথম মহাযুদ্ধের ফেরৎ অনেক লোহার খাট ছিল। টু-টায়ার বা দুই সারি খাট তাতে কাঠের পাটাতন লাগানো ছিল। আমরা সেই খাটে শোব ঠিক করলাম। ডিরেক্টরের নাম ফ্রাউ স্টেলা- আমাদের প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার দেখালেন। তিনি বললেন যে, ডাইনিংরুমে আমরা যা খাব তার দাম দেব। শোবার খরচ লাগবে না। যখন দলে দলে ছাত্ররা গ্রাম থেকে বার্লিন শহর দেখতে আসে তারা গ্রীষ্মকালে লোহার খাটগুলি ব্যবহার করে। মাত্র আধ মার্ক ভাড়া ছয় আনা- তাও আমাদের দিতে হবে না।

শহর ভীষণ রকম আলোকসজ্জায় মণ্ডিত। চারদিন পরেই খ্রিস্টমাস। বিকালে পরিষ্কার হয়ে বেরলাম শহর দেখতে। প্রথমেই আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন দেখতে গেলাম। মাটির নিচে সুড়ঙ্গ পথে ট্রেন যাতায়াত করছে। টিকিট কেটে লিফট-এ চড়ে নিচে নামলাম, নিমেষে ট্রেন ছেড়ে দিল। সামনেই স্টোন, শহরের ম্যাপে লেখা ছিল শহরের পশ্চিম প্রান্তে কুরফুরস্টেনডাম পাড়া, সেখানে গেলাম, চওড়া রাস্তা ও বড়লোকেদের বাস। আলোয় আলোকিত সেই পাড়া। কাছেই টিয়ার গার্টেন অর্থাৎ চিড়িয়াখানা। ভিয়েনা শহরে একজন অস্ট্রিয়ান বন্ধু তার আত্মীয়ের নামে একটি চিঠি দিয়েছিল। খুঁজে খুঁজে জার্মান পরিবার, আর্নহাইমদের বের করলাম। ব্যোমগার্টনার-এর বন্ধু এবং ভারতীয় বলে সবাই খুব খাতির করল ও আত্মীয়তা দেখাল। কর্তা গিন্নি তিন মেয়ে ও একছেলে সবাই খুব ভদ্র। বড় মেয়ে প্রায় সমবয়সী। ভাব হয়ে গেল। তার নাম গারট্রুড- ডাক নাম, গের্ডা। বলাবাহুল্য এটি ইহুদি পরিবার। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় টেবিল টেনিস ও ডিনারের নেমন্তন্ন পেলাম।

আবার ইউ বার্ন অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ড রেল চড়ে ওয়াই এম সি এ-তে ফিরলাম। ট্রেন খুব পরিষ্কার। বার্লিন শহর মস্ত বড় কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সে অদ্বিতীয়। রাস্তা পর্যন্ত চকচক ঝকমক।

আন্ডারগ্রাউন্ড রেল আমাকে এক নতুন অভিজ্ঞতা দিল। রাস্তায় অনেক লোক চটপট গাড়িতে চলাফেরা করতে পারে না ভিড়ের জন্য। মাটির নিচে ভীষণ জোরে নির্ভয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন চলে। সেজন্য অল্প সময়ের মধ্যে শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাওয়া যায়। ট্রেন একটার পর একটা ছুটছে। দূরত্ব বা দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান সামান্য। এমন ব্যবস্থা আছে যে দুটো ট্রেন খুব কাছাকাছি এলে আপনি পিছনেরটা বন্ধ হয়ে যায়। ইলেকট্রিক কাট অফ সিস্টেম, একেবারে সুনিশ্চিত।

ডিনার খাবার আগে আমাকে ফিরতে দেখে বন্ধুরা নিশ্চিন্ত হল। ভেবেছিল আমি বুঝি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমার কাছে সব শুনে বন্ধুদের ভরসা হল শহর দেখতে যাবার। পরদিন সকালে টিয়ার গার্টেনে জু দেখতে যাব, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলপথে এবং বাসের দু'তলায় বসে শহর দেখতে দেখতে ওয়াই এম সি-এ ফিরব এই ঠিক হল। বন্ধুদের বলেছিলাম আর্নহাইম পরিবারের সঙ্গে আলাপ করবার। তারা অনিচ্ছুক বলে আমি বেশি অনুরোধ করলাম না। বুঝতে পারছিলাম যে বন্ধুরা ভারতবর্ষ থেকে কমিটির চিঠি ও টাকা পাবে কিনা সেই উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। আমারও উৎকণ্ঠা কিছু কম নয় কিন্তু যে সুযোগ ও অভিজ্ঞতা আমার সামনে উপস্থিত তাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিই কেমন করে। কিছু নাই হক, বার্লিন পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি বরফের ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং বার্লিন শহর দেখেছি এইটুকুই লাভ। কেন জানি না, আমার মনে সন্দেহ জেগেছে কমিটি কোনও টাকা বা চিঠি পাঠায়নি। হয়তো কমিটির অস্তিত্ব আমরা কলকাতা ছাড়ার পরই লোপ পেয়েছে।

আমি সাধারণত আশাবাদী, তবে আশা করবার কোনও কারণ দেখছিলাম না। না হলে এক বছরের মধ্যে আমাদের খোঁজ-খবর পর্যন্ত কেউ নিল না। অর্থ সাহায্য না পেলে চার বন্ধুতে মিলে দল বেঁধে পৃথিবী ভ্রমণ করা সম্ভব নয়। একজন অথবা বড় জোর দুই বন্ধুতে মিলে কোনও নতুন উপায়ে ভ্রমণ চালানো যেতে পারে। সে উপায়টা কী, সঠিক বা স্পষ্ট জ্ঞান কিছু ছিল না। মনে হচ্ছিল কোনও উপায়ে রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারলে হয়তো এগনো যাবে। কতদিনে তাহলে ভ্রমণ শেষ হবে তা কে বলতে পারে।

প্রথমেই ঠিক করলাম যে ফটোগ্রাফি ভালো করে শিখতে হবে।

পাতাল রেল চড়ে বন্ধুদের খুব ভালো লাগল। জু গার্ডেনে কলকাতা জু-র তুলনায় এমন কিছু দ্রষ্টব্য নেই- সাদা ভালুক ও শীল ছাড়া। বাগানটাও তুলনায় অনেক ছোট কলকাতার চেয়ে।

রাস্তার ধারে এক বৃদ্ধা গনগনে আঁচের উনুনে চেস্টনাট ভাজছিল। চিনাবাদামের চেয়ে অনেক বড়, অনেকটা কাঁঠালবিচির মতো। লোকেরা খুব খায়। আমরাও ২০-২৫টা কিনলাম এবং খেতে খেতে শহর দেখতে বেরোলাম। বিকালে বন্ধুরা ক্লান্ত হয়ে ওয়াই এম সি এ-তে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। একটা বাসের টিকিট কেটে বন্ধুদের তুলে দিলাম। সোজা নয়-কোলন যাওয়া যায়।

সন্ধ্যাবেলায় গের্ডার সঙ্গে তাদের বাড়ি গেলাম। গৃহকর্ত্রীর বয়স হয়েছে প্রায় ৫২। আমাকে বললেন যে আমি তাঁর ছেলেমেয়েদের বয়সী, সেজন্য আমিও যেন তাকে মুত্রী বা মা বলে ডাকি। এরপর থেকে আর্নহাইম পরিবারে আমার নিত্য নিমন্ত্রণ ও অবাধ গতিবিধি হয়েছিল। মহিলাটির কাছে আমি মায়ের মতো ভালোবাসা পেয়েছি।

মিঃ আর্নহাইম ব্যবসায়ী, একটু গম্ভীর প্রকৃতির। বাড়িতে এসে মুখ হাত ধুয়ে মাথায় ভেলভেটের টুপি পরে খাবার টেবিল বাতি দিয়ে সাজালেন। 'মুত্রী' একটা বড় রুটি, দামি কাপড় ঢাকা দেওয়া, কর্তার সামনে টেবিলে রাখলেন। কর্তা, ইহুদি ভাষায় মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করলেন। ছেলেমেয়েরা ও আমি এবং গৃহিণী চুপ করে শুনলাম। তারপর সেই রুটি সবার ছিঁড়ে নেবার পালা। ইহুদিরা হাজার হাজার বছর ধরে আরবদের সঙ্গে পাশাপাশি থেকেছে। সেজন্য অনেক আচার ব্যবহার দুই জাতের মধ্যে একই। যেমন রুটি ছিঁড়ে খাওয়া এবং তাই দিয়ে সবার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন করা। এইরকম অনুষ্ঠান প্রতি রবিবার হয়। একে 'সাবাথ' পালন করা বলে। সাবাথ এদের কাছে পবিত্র দিন।

ডিনারের পর আর্নহাইম পরিবার আমাকে ঘিরে বসল, ভ্রমণকাহিনী শোনাবার জন্য। সিরিয়ার মরুভূমিতে আমরা এজরার সমাধি দেখেছি শুনে কর্তার আমার ওপর ভক্তি অনেক বেড়ে গেল। স্যামসন ও ডেলায়লা সেখানে কিছু কাল বাস করেছিল। সেজন্য

আজও ইহুদি যুবক-যুবতী সেখানে যায় বিয়ে করতে। আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় মিল আছে। দেখলাম বিয়ের পর বাসর জাগার ব্যবস্থা ওদেরও আছে। মেয়েরা বিশেষ করে বর-কনেকে ঘিরে হাততালি দেয় ও গান করে রাত কাটায়।

আমার জন্য মুত্রী অনেক মুখরোচক খাবার রেঁধেছিলেন। খুব তারিফ করে খেলাম। আমি সকাল সকাল বাস ধরে ওয়াই এম সি এ-তে ফিরলাম। পরদিন জানা যাবে আমাদের চারজনের ভাগ্যে কী আছে, যখন বড় পোস্ট অফিস খুলবে। একটা রাত আরও অপেক্ষা করতে হবে। লোহার খাটিয়ায় বাঙ্কে শুয়ে পড়লাম, বন্ধুরা তখন নিদ্রামগ্ন।

দল বেঁধে দশটার পর আমরা বড় পোস্ট অফিসে হাজির হলাম। সেখানে যথারীতি জানাল যে আমাদের কোনও চিঠি বা মানি অর্ডার নেই, কেবলমাত্র ভারতীয় গ্লোব ট্রটার, বিমল মুখার্জির নামে, একটা চিঠি আছে। সেটা আমার মা ও অনুজ, বিখ্যাত হকি খেলোয়াড় নির্মল মুখার্জির লেখা।

আমাদের মাথায় বজ্রপাত। সমস্ত আশা ও পৃথিবী ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে হবে। তারপর কী করব অথবা কোথায় যাব জানি না। আমি ইত্যবসরে নির্মলের চিঠি বন্ধুদের পড়ে শোনালাম। সে লিখেছে যে কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে আহিরীটোলার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল। কুমারবাবু আমাদের চিঠি পেয়েছেন বললেন কিন্তু কোথা থেকেও কোনও সাহায্য পাননি বলে তিনি একা আমাদের খরচ বহন করবার ভার নিতে অনিচ্ছুক। এই চিঠি পড়ার পর আমাদের অবস্থাটা স্পষ্ট বোঝা গেল। নিজেদের গতি নিজেদেরই করতে হবে। সবাই বিমর্ষ হয়ে ওয়াই এম সি এ-র বেসমেন্টে ফিরলাম।

এখন ঠিক হল প্রথম কাজ হচ্ছে টাকা রোজগার করা- যাতে শীতটা বার্লিনে কাটাতে পারি। বরফের সঙ্গে লড়াই করতে হবে অথচ গরম জামাকাপড় নেই। এমন সময় গের্ডার কাছ থেকে টেলিফোন এল। সে জানাল যে হামবোল্ড হাউসে একটা বড় সভা ডেকেছে, সেখানে আমাদের চারজনের উপস্থিতি প্রয়োজন। ভ্রমণ সম্বন্ধে বলবার অনুরোধ এল। গের্ডা বন্দোবস্ত করেছে, চারদিন পরে হবে। আমি বললাম যে আমাদের অর্থের প্রয়োজন, সেজন্য এক টাকার প্রবেশমূল্যে আমাদের অভিজ্ঞতা শোনাব। তথাস্তু বলে গের্ডা টেলিফোন রাখল। আমি বন্ধুদের কিছু না বলে ঠিক করলাম মিটিংয়ের পর বার্লিন ব্রড কাস্টিং অফিসে যাব একটা লেকচারের ব্যবস্থা করতে।

আমাদের নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা হল, কিন্তু স্থির হল না কিছুই। আমরা কী করতে পারি ভেবেই পেলাম না। আমি বললাম যে কোনওরকমের কাজ দেখবার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে কী খাব শীতের মাসগুলিতে?

কিছু স্থির না হলেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের ভ্রমণে ছেদ পড়ল বার্লিনে। অশোক ও আনন্দ বলল ইংল্যান্ড পর্যন্ত শীতের পর কোনওরকমে যেতে হবে। তারপর কে কোথায় যাবে এবং কী করবে ঠিক হবে। ইতিমধ্যে আরও দুটো চিঠি লিখে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও মিঃ জে এন বাসুকে সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়ে দিলাম এবং লিখলাম যে আমরা গর্তের মধ্যে পড়েছি যদি ওঠবার কোনও পথ তাঁদের জানা থাকে তো বার্লিনে জানাতে- অন্তত তিনমাস আমাদের এখানে কাটাতে হবে। আমার বিশেষ নিজস্ব মত হল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপার্জনক্ষম হওয়া।

বেতারবার্তা কেন্দ্রতে বিকালে গেলাম। তারা আমাকে বলল যে বিলম্ব না করে সেইদিনই রাত্রে প্রোগ্রাম দেবে। আমি টাকার লোভে একটু বেশি লম্বা প্রোগ্রাম চাইলাম। তখন ভদ্রলোক জানালেন যে ১৫০ মার্ক পাবে ৩০ মিনিটে। খুশি হয়ে audition ঘরে চলে গেলাম। একজন ভদ্রলোক প্রশ্নোত্তর করবার সময় বললেন যে তিনি মিউনিখ-এ আমার ছোট্ট বক্তৃতা শুনেছেন। সেই ভরসায় ৩০ মিনিটের ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি বেতারে বলবার পর ১৫০ মার্ক বা দেশি টাকায় ১৪০ টাকা নিয়ে ওয়াই এম সি এতে ফিরলাম। একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ডাইনিং হলে আমি একাই ডিনার সেরে তাড়াতাড়ি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বললাম কেমন করে টাকা লাভ হয়েছে। অশোককে টাকা দিলাম, নিজের বাস ও পাতাল রেল ভ্রমণের জন্য ৫ টাকা রেখে দিলাম।

হামবোল্ড হাউস-এ মিটিংয়ে গেলাম দুদিন পর। ভীষণ ভিড়, লোকেদের খুব উৎসাহ। ভারতবর্ষের নানা জায়গার ছাত্ররা এসেছিল। ইংরিজি ভাষায় বলার তাগিদ এল। বেশ কিছু বিদেশিও সেখানে হাজির। তারা সবাই জার্মান নাও হতে পারে।

'নশা' সেন অগ্রণী হয়ে আমাকে মিটিংয়ে উপস্থাপিত করল, প্রথমে জার্মান ভাষায় তারপর ইংরিজিতে আমার পরিচয় দিল। আমার আগেই লেখা উচিত ছিল যে 'নশা' সেনের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য থাকা সত্বেও গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'র সম্পর্কে নেমেছি আমরা দুজনে। সেন আমাকে স্বোয়েন হেডিন, ন্যানসেন ও আমুন্দসেন ইত্যাদি বিখ্যাত পর্যটকদের সঙ্গে তুলনা করে বলল যে আমি সেই ধাতু দিয়ে তৈরি একজন ভারতীয়। ভারতবর্ষ থেকে দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে মরুভূমি পার হয়েছি এবং অসম্ভব শীতের মধ্যে ব্যাভেরিয়ান আল্পস-এর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। সবাই খুব হাততালি দিল।

আমি কম্পিত বক্ষে উঠলাম আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত বলতে। তার বিবরণ দিলাম- যদিও মনের মধ্যে এই বিষয়ে তখন কোনও সাড়া পাচ্ছিলাম না এবং ভাবতেও পারছিলাম না কী করে আমরা এগোতে পারব।

মিটিং শেষ হবার পর অসংখ্য লোকের নেমন্তন্ন পেলাম। 'নশা' সুবন্ধুর মতো তাদের নাম ঠিকানা লিখল।

৪১৫ টাকা হাতে এল, খরচ কিছুই ছিল না। কর্তৃপক্ষদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম।

বন্ধুদের কাছে যখন মিটিংয়ের উৎসাহী লোকেদের কথা বললাম এবং অনেক টাকা রোজগার হয়েছে শুনে সবাই আনন্দ প্রকাশ করল। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে শীতের দিনগুলো আমরা বার্লিনে কাটাতে পারব। বন্ধুরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল এবং পরামর্শ করে স্থির করেছিল ভ্রমণ এইখানেই শেষ।

মিটিংয়ে যাঁদের সঙ্গে আলাপ হল তারা হলেন, শ্রী বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মিসেস সরোজিনী নাইডুর ভাই তাদের মধ্যে অন্যতম। এত উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র ও নিরহঙ্কার লোক আমি দেখিনি। সৌম্য ঠাকুর আমার স্কুল, মিত্র ইনস্টিটিউশনে এক ক্লাস ওপরে পড়ত, সেও উপস্থিত। আরেকজন ভারতীয় ডাক্তার ননীগোপাল মৈত্রর সঙ্গেও আলাপ হল এবং পরে হৃদ্যতাও জন্মেছিল।

আমি বন্ধুদের জানালাম যে ফটোগ্রাফি শিখব টেকনিসে হোকসুলে, যতদিন বার্লিনে থাকব। বন্ধুদের মত হল যে অনর্থক অর্থব্যয় হবে একজনের জন্য। শেষপর্যন্ত সবার মত হল এবং ৫০ টাকা ফি দেবার জন্য নিলাম ৪১৫ টাকা থেকে।

রবিবার বার্লিনের একধারে 'ভেয়ান সে' নামে লেকে পিকনিক করতে গেলাম আমরা।

গের্ডাদের বাড়ি প্রায়ই যাই। সে একদিন আমাকে নিয়ে শহরের বাইরে নয়স্টাড নামে একটা জায়গায় বিখ্যাত 'সাঁ-সুশি' প্রাসাদ দেখাতে নিয়ে গেল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট শহর থেকে দূরে একটা শান্তিময় পরিবেশে পাহাড়ের ওপর ওই প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন। ফরাসি লেখক ভলটেয়ারের সঙ্গে সম্রাটের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি অনেকদিন সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন।

অনেক শখ করে সম্রাট প্রাসাদের নাম রাখলেন 'সাঁ-সুশি' অর্থাৎ ফরাসিতে 'দুঃখহীন'। কিন্তু প্রাসাদ তৈরি করবার সময় কেউ খেয়াল করেননি যে পাহাড়ের চূড়ায় একটা উইন্ডমিল রয়েছে সেটা শোবার ঘরের পাশে বললেই ভালো হয়। প্রথমদিন গৃহপ্রবেশের ঘটা যখন শেষ, তখন সম্রাট শুতে গেলেন। সারারাত উইন্ডমিল-এর ক্যাঁচ কোঁচ শব্দে ঘুম হল না।

সকালেই চেম্বারলেনকে ডেকে বললেন তাঁর বিনিদ্র রজনী কেটেছে। যেমন করে হোক সেই বিকট শব্দ যেন বন্ধ করা হয়। চেম্বারলেন প্রাসাদে একরাত্তির কাটিয়ে ঠিক এই কথাই ভাবছিল যে উইন্ডমিল তো সরানো যাবে না তবে ভেঙে ফেলা যাবে সম্রাটের হুকুমে

। এটা আর এমন কী বড় কথা, দরকার হয় তো উইন্ডমিলের মালিককে খেসারত দেওয়া যাবে । চেম্বারলেন কয়েকজন সৈন্য নিয়ে উইন্ডমিল-এর দরজায় উপস্থিত হয়ে মালিককে ডেকে বলল, 'আমি সম্রাটের নামে তোমাকে এখনি শব্দ বন্ধ করতে বলছি ।' ম্যুলর জবাব দিল যে যতক্ষণ বাতাস বইবে ততক্ষণ তার উইন্ডমিলও চলবে । সম্রাট রেগেমেগে হুকুম দিলেন ভেঙে ফেলবার । ম্যুলর ছুটে গেল বার্লিনে এবং হাইকোর্টে সম্রাটের নামে নালিশ রুজু করল । হাইকোর্ট চিরদিনের মতো সম্রাটের হস্তক্ষেপ বন্ধ করবার হুকুম দিল । তাই আজও প্রাসাদের পাশে সেই উইন্ডমিল সমানে জাঁতায় গম ভাঙছে । এরপর সেই ম্যুলর এক ঐতিহাসিক পুরুষ হয়ে যায় । সম্রাট ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট হাইকোর্টের রায় মেনে নিয়েছিলেন । ভেবেছিলেন নামটা বদলে প্রাসাদের অন্য নাম রাখবেন । ভলটেয়ার বলেন যে সম্রাটের মহত্ব বাড়বে যদি তিনি প্রাসাদের নাম না বদলে ম্যুলরের সঙ্গে আপসে একসঙ্গে বাস করেন । তাই হয়েছিল ।

একটা জার্মান কাগজ কিনে সারা সকালটা পড়বার চেষ্টা করলাম একটা ডিক্সনারির সাহায্যে । আজ খ্রিস্টমাসের পূর্বদিন । আমাদের ওয়াই এম সি এ-তে তার ছোঁয়াচ লেগেছে । গাছে গাছে আলো এবং একটি বিশেষ টবের গাছে, নাম- আরোকেরিয়া, খুব সাজানো হয়েছে ।

দুপুরবেলা আমরা চার বন্ধু একটা টেবিলে খাচ্ছি, এমন সময় ফ্রাউ স্টেলার-এর সঙ্গে একটি জার্মান তরুণী এসে ডাইনিং হলে একটা টেবিল অধিকার করল । তখন একবারও ভাবিনি এই ভদ্রমহিলা আমাদের একজনের জীবনে ধ্রুবতারার মতো অর্ধ শতাব্দীরও বেশি একসঙ্গে কাটাবে । তরুণীর সোনালি রঙের চুল । ভালো স্বাস্থ্য । কিন্তু অতিকষ্টে খুঁড়িয়ে চলছিল । শারীরিক কষ্টের মধ্যে মেয়েটির চোখে-মুখে হাসি । মনে হল খুব সহজ সরল স্বভাব । খাওয়া শেষ হলে আমাদের টেবিলের সামনে দিয়ে যাবার সময় তরুণী খুব সাবধানে আমাদের উদ্দেশ করে গ্রুশ করল । পরে আমাদের ফস্টার-মাদার ফ্রাউ স্টেলারের কাছে শুনলাম নাম মিস আনালিসে বোল্ডট । হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি যাবার পথে ওয়াই এম সি এ-তে কিছুদিন থেকে শরীর সুস্থ করে যাবে ।

তার সঙ্গে সবার ভাব হয়ে গেল । আনালিসে সামান্য ইংরিজি জানত, তা এত কম যে কথাবার্তা চালানো যায় না । বাধ্য হয়ে আমার জার্মান ভাষায় যতটুকু জ্ঞান হয়েছে তার ওপর নির্ভর করতে হল । আনালিসে ও বন্ধুদের মধ্যে আমি দোভাষীর কাজ করতে শুরু করলাম । আমরা ফ্রাউ স্টেলার ও আনালিসেকে কফি খাবার ও গল্প শোনার নেমন্তন্ন জানালাম ।

ওই অল্প সময়েই আনালিসে আমার এক বন্ধুর মনে রঙের ছোপ লাগিয়েছিল বিশেষভাবে । সে হল অশোক ।

বিকালে আর্নহাইমদের বাড়ি গেলাম। খ্রিস্টমাসের নেমন্তন্ন ছিল। মুত্রী আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে বললেন যে সেদিন মিঃ ভাদুড়ি আসবেন। তাঁর সঙ্গে গের্ডার বিবাহ ঠিক হয়েছে। পরে ইনি দেশে ফিরে 'বেঙ্গল ব্রুয়ারি' প্রতিষ্ঠা করেন। ভাদুড়ির সঙ্গেও আমার ভাব হল।

বাড়ি অর্থাৎ ওয়াই এম সি এ-তে ফ্রাউ স্টেলারের জন্য একটা স্কার্ফ উপহার নিয়ে ফিরলাম। সামান্য জিনিস, সামান্য দাম, উপহারে দামের খবর কে রাখে। এত দয়াপরবশ হয়ে এই ভদ্রমহিলা আমাদের যত্ন করতেন যে আমি খুব কৃতজ্ঞতা বোধ করতাম তাঁর আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহারে।

ডিরেক্টর স্টেলার আমাকে তাঁর ঘরে কফি ও কেক খাবার নেমন্তন্ন করেছিলেন। আমি গেলে খুব খুশি হয়ে বললেন যে আমাকে অর্থাৎ একজন ভারতীয়কে দেখে তাঁর জার্মান মেয়েদের দুর্ভাগ্যের কথা মনে হচ্ছে। আমরা কীরকম শান্তিকামী অথচ জার্মানদের উচ্চাশার শেষ নেই, যুদ্ধ বাধাবার জন্য যেন পা বাড়িয়েই আছে। তাঁর মতে, জার্মান মেয়েদের তিন অবস্থা: প্রথমটা হচ্ছে তাদের আত্মপ্রসাদ, যখন দেশসুদ্ধ লোক তাদের বাহবা দিয়ে গুণ গায়, বীর প্রসবিনী জার্মান মা, বীরের স্ত্রী হবার সৌভাগ্য ইত্যাদি বলে।

তারপর রাজনীতিবিদ জার্মানরা যুদ্ধ বাধিয়ে বসে। কিছুদিন জয়গান চলে। দ্বিতীয় অবস্থা ক্ষণিকের যখন জার্মানিদের কাছে সবাই হার স্বীকার করে। জয়ের নেশায় সবাই তখন আনন্দে আত্মহারা। তারপর বিপরীত হাওয়া বয়, যুদ্ধে শেষপর্যন্ত জার্মানিকে মিত্রপক্ষ হার স্বীকার করতে বাধ্য করে। তখন দুঃখ-কষ্ট হাহাকার ছাড়া আর কিছু থাকে না। সবচেয়ে পীড়াদায়ক যে স্বামী, পুত্র, ভাই, প্রিয়জন সব যখন একে একে মরণের মুখে তখন কে বীরজায়া, কে বীরতনয়া, তার হিসাব কে রাখে। তৃতীয় অবস্থার সূচনা হয় যখন সব হারিয়ে মেয়েদের মনে দয়া, স্নেহ, কোমল বৃত্তিগুলি আবার জেগে ওঠে। যে শান্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে তাকেই ভালো লাগে। স্টেলারের মনে হয় এখন তৃতীয় দশা। এখন সর্ব জীবে দয়া, সব মানুষকে ভালোবাসার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর স্বামী, একমাত্র পুত্র সন্তান ও দুই ভাই যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

দুই যুগ বা তিন যুগের মধ্যে যখন যুদ্ধের ক্ষত সব মিলিয়ে যায়, যখন এই কর্মনিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত জার্মান জাত আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যবসা প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলতে পারে, আবার যখন শিল্পের চাকা পুরোদমে চলতে থাকে তখন জার্মানদের মাথায় আবার পোকা নড়ে ওঠে। আবার প্রমাণ করবার চেষ্টা জাগে যে জার্মানি সবার ঊর্ধ্বে, যেমন তাদের জাতীয় সঙ্গীতে আছে 'জার্মানি, জার্মানি সবার সেরা।'

বৈজ্ঞানিকরা তখন নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । শিল্পপতিরা অজস্র অর্থ ব্যয় করে যুদ্ধের মাল-মশলা তৈরি করবার জন্য । যারা গত যুদ্ধের সময় নাবালক ছিল তারা এখন নতুন যৌবনের দল । তারা এগিয়ে আসে আগেকার কালের বিখ্যাত যোদ্ধাদের মতো দেশের কাজে প্রাণ দিয়ে অমর হবার জন্য ।

যুদ্ধ বাধবার আগে দেখা গিয়েছে যে জার্মানরা সমৃদ্ধির চরমে উঠেছে । সবাই কর্মরত । পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাল রপ্তানি করছে জার্মানরা । তবু তার ক্ষোভ যে ইংরেজদের মতো তাদের বিরাট সাম্রাজ্য নেই । তাদের ইংরেজ পতাকাকে সম্মান দেখিয়ে সব জায়গায় ঘোরাফেরা করতে হয় । এ কি কম পরিতাপের কথা! তুর্কিতে আনাতোলিয়ায় ভ্রমণ করবার সময় যে জার্মান যুবক বহুদিন আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল তার মনের কথাও এইরকমই ছিল । বলা চলে, দেশসুদ্ধ লোকের এই একই মনোভাব । দেখা যাচ্ছে জার্মানি যুদ্ধ করে কোনও অভাবের জন্য নয়, বরং স্বভাবের জন্য ।

আমরা দেশকে জননী রূপে কল্পনা করি । জার্মানরা দেশকে 'ফাদারল্যান্ড' বলে । প্রায় সব দেশের জাতীয় সঙ্গীতে মাতৃভূমিকে সকল দেশের সেরা ইত্যাদি অলঙ্কারে বিভূষিত করে । যদিও আমরা সেটা ধ্রুব সত্য মনে করে পাশের দেশের সঙ্গে যুদ্ধ লড়তে যাই না, যেমন জার্মানরা করে ।

হোকসুলে ভর্তি হয়েছি ফটোগ্রাফি শেখবার জন্য । আরেকজন বঙ্গসন্তান চারু গুহ আমার ক্লাসে যোগদান করলেন । শ্রীগুহ একজন কৃতীছাত্র, পরে কলকাতায় হ্যারিসন রোডে ও এলবার্ট বিল্ডিংয়ে স্টুডিও খুলে খ্যাতির উচ্চ শিখরে ওঠেন ।

কিছুদিন পরে উফা স্টুডিও থেকে আরেকজন বাঙালি, বিভুভূষণ ঘোষ এল স্টিল ফটোগ্রাফি ও সিনেমোটোগ্রাফি শেখবার জন্য । সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, পরে সে একজন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার হয়েছিল চলচ্চিত্র জগতে ।

ডাঃ বিমল গুহ যাঁর কথা আগেই লিখেছি, তিনি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়েছেন । একদিন বললেন যে তাঁর এক বিশেষ পরিচিতা ভদ্রমহিলা, মাননীয়া 'বুইলো'- অর্থাৎ বিখ্যাত জার্মান জেনেরাল ফন বুইলোর বিধবা স্ত্রী- আমাকে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার খাবার নেমন্তন্ন করেছেন । বেশ জমজমাট ব্যাপার, গিয়ে দেখলাম । তবু লেডি বুইলোর আগেকার মতো সঙ্গতি নেই । বড়জোর বার্লিন শহরে অবস্থাপন্নদের পাড়ায় একটা ভালো বাড়ি ও সামান্য টাকা, আর ছিল সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র, কার্পেট, কাটগ্লাসের ও ড্রেসডেন-এর বিখ্যাত চিনামাটির বাসন, সব বড়লোকের বাড়িতে যেমন দেখেছি ।

লেডি বুইলো খেদ করে বললেন যে তাঁর সর্বস্ব খুইয়েছেন কয়েক বছর আগে, যখন সাংঘাতিক মুদ্রাস্ফীতি হয় । সে রকমটা ইতিহাসে বিরল । একটা রুটির দাম জার্মান টাকায় ৫,০০০ মার্ক পর্যন্ত হয়েছিল । একটা ডিমের দাম ৭,০০০ মার্ক । সব জিনিসের দাম এই অনুপাতে বেড়ে গেল । বাড়তে বাড়তে একটা রুটির দাম পৌঁছল পঞ্চাশ হাজার টাকায় । বাজার করতে গেলে থলে ভর্তি লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে যেতে হত । যা জিনিস কেনা হবে তা দিয়ে বড়জোর একদিন সংসার চলবে । অচিরে এক লক্ষ পৌঁছল দশ লক্ষে এবং দশ লক্ষ পৌঁছল দশ মিলিয়নে । লোকদের ঘরে যার যা ছিল ফুটপাথে বের করে দিল বিক্রি করবার জন্য । জলের দরে সব কেনাবেচা চলল । কত ভালো ভালো বাড়ি হাত বদল হল তার ঠিক নেই রুটির জোগাড় দিতে ।

লেডি বুইলো আমাকে একটা ঘর দেখালেন তার নাম মিলিয়ন রুম । আরেকটা ঘর, তার নাম বিলিয়ান রুম অর্থাৎ ঘরের সমস্ত দেওয়ালে নোটগুলি সাঁটা হয়েছে এমনভাবে যে দেখলে মনে হয় বুঝি Wall paper । শীতের দেশে নিয়ম হচ্ছে সুন্দর কাগজ দেওয়ালে লাগিয়ে ঘর সাজানো এবং সেইসঙ্গে ঘর গরম রাখার চেষ্টা । 'ওয়াল পেপার' কিনতে যত নোট লাগবে সেই কাগজের নোট দিয়ে লোকেরা ওয়াল পেপারের কাজ সারত ।

এমনিভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের তিন বছর পরে জার্মানরা সর্বস্বান্ত হয়ে যায় । বেশি লোকের ধারণা যে মুদ্রাস্ফীতি ও দেশসুদ্ধ বিপর্যয়ের কারণ হচ্ছে ইহুদিদের কারসাজি । কত ইহুদি যুবক যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে সে কথা সবাই ভুলে গেল । নিজেদের দুঃখের জন্য অন্যকে দায়ী করা মানুষের স্বভাব । তাই যুদ্ধে হারার পর সব কষ্ট দুঃখ অসুবিধার জন্য ফ্যাসিস্ট জার্মানরা ইহুদিদের দায়ী করল, যুদ্ধে হার হল ইহুদিদের ষড়যন্ত্রে, অপমানজনক সন্ধি 'ট্রিটি অব ভেরসাই' হল ইহুদিদের জন্য! লোকে, বিশেষ করে হিটলারের মতো ফ্যাসিস্টরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে এ ধরনের বদনাম দিল । প্রোপাগান্ডা করা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে উঠেছিল । ক্রমে ক্রমে লোকেরা ইহুদিদের প্রতি বিরক্তি ও অবজ্ঞা প্রকাশ করতে আরম্ভ করল । তখন অনেক ইহুদি মনীষী, যেমন বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ও অন্যরা জার্মানি ছেড়ে আমেরিকায় বসবাস করতে গেলেন । আমার জানা একজন ইহুদি ডাক্তার, ডেমিড মিনেহান যিনি গত যুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে দেশ সেবার জন্য আইরন ক্রুস (যুদ্ধকালীন সবচেয়ে বড় সম্মান) পেয়েছিলেন, তিনি যখন দেখলেন লোকেরা তাঁকে অসম্মান করছে তখন তিনি সব বেচে দিয়ে মিশর দেশে চলে গেলেন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, একটা হাসপাতালে ডাক্তারি করবার জন্য ।

ইহুদিদের অবদান জার্মানিকে নানাদিকে সমৃদ্ধ করেছিল । সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ডাক্তার, প্রফেসর, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও দার্শনিক, অনেকে ইহুদি ছিলেন ।

লেডি বুইলোর ভূরিভোজ অনেক ঘটা করে হল- তারপর আমার পালা। আমার পরিচয় দেবার পর আমি আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বললাম। মানচিত্র এল, গ্লোব এল এবং সবাই উৎসাহ দেখিয়ে নানারকম প্রশ্ন করল। দু-চারজন ভদ্রমহিলা ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলেন আমার বিবাহের কী হবে? কবে, কোথায় কোন দেশে এবং কার সঙ্গে বিবাহ হবে জানবার ঔৎসুক্য দেখালেন।

ডাইনিং টেবিলের ওপর যে টেবিলক্লথ পাতা ছিল, সেটার বয়স পঞ্চাশের বেশি। সেটি বিবাহের যৌতুক। আমি যে প্লেটে খাচ্ছিলাম সেটিও ওই সময়ের।

ডিনার শেষ করে সবাই আগুনের ধারে বসলাম কফি খাবার ও খোস গল্প করবার জন্য। ডাঃ গুহ খুব আমুদে লোক ছিলেন। তিনি অনেক মজার মজার গল্প করলেন। সবাই মিলে আমাকে ঘিরে ধরে তাদের হাত দেখতে বলল। আমি যতই বলি পামিস্ট্রি জানি না, তাদের উৎসাহ ততই বাড়তে আরম্ভ করল। এক মহিলার হাত দেখার ভঙ্গি করে বললাম, 'একজন লম্বা, তামাটে রং, সুন্দর দেখতে ইয়ংম্যান তোমার জীবনে আসছে।' সবাই খুব হাসতে শুরু করল এবং আমার হাত দেখার পালা শেষ হল।

অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি রওনা হলাম। বেশ রাত্রি হয়েছিল। রাস্তায় মানুষ ও গাড়ি কম। পাতাল রেলে কয়েকটি যাত্রী। ওয়াই এম সি এ পৌঁছে দেখি বন্ধুরা নিদ্রামগ্ন।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খেতে ডাইনিং হলে যাচ্ছি এমন সময় আনালিসে এসে আমার হাতে জার্মান ভাষায় লেখা অশোকের নামে একটা চিঠি দিয়ে বলল তর্জমা করে দিতে। চিঠির মূলকথা কী জানবার জন্য অশোক ব্যস্ত। খাবার পর আমি তর্জমা করে অশোককে শোনালাম যে আনালিসে আমাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে অশোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হতে চায়। আমি সেইদিন বিকালে আনালিসে ও অশোককে নিয়ে কাছেই একটা রেস্তোরাঁতে কফি খেতে ও গল্প করতে গেলাম। দুজনের মাঝখানে আমি বসে পরস্পরের কথা তর্জমা করে দিলাম। ভদ্রমহিলা খুব কষ্টে হাঁটেন, তাই বেশি দূর যেতে পারিনি। ডাক্তার নাকি রোজ হাঁটতে বলেছেন, তাই কষ্ট হলেও আস্তে আস্তে চলাফেরা করেন।

অশোক গল্প করে আশ্বস্ত ও খুব খুশি হল। যদিও আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না এদের ভবিষ্যৎ আছে কিনা এবং তা কেমন রূপ নেবে।

আমি লক্ষ করেছি ভারতীয়দের প্রতি জার্মানরা শ্রদ্ধাবান, প্রধানত দুটি কারণে: প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের একবছর আগে জার্মানিতে উপস্থিত হওয়া এবং সর্বত্র তাঁর বিরাট সম্বর্ধনা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে পুরনো হিন্দু শিক্ষা, দর্শন, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। জার্মানরা অবাক হয়ে যায় যখন মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা শহরের ৪,০০০ বছর বয়স শোনে। তাছাড়া বেশিরভাগ

জার্মান স্ত্রী-পুরুষ বিশ্বাস করে আমরা শান্তিকামী। যুদ্ধে হারার পর তাদের বেশি করে মনে হয় যে মারামারি লোকক্ষয় ইত্যাদির চেয়ে শান্তি অনেক বেশি কাম্য।

বার্লিন শহরে খুব বরফ পড়েছে কদিন, যানবাহন ও লোক চলাচল একরকম বন্ধ। পাতাল রেলের পথে চলাফেরা করায় বিপদের সম্ভাবনা কম।

একদিন দেখলাম যে লোক নেওয়া হচ্ছে রাস্তা থেকে ঠেলবার যন্ত্র দিয়ে বরফ ঠেলে একপাশে রাখবার জন্য। আমিও নাম লেখালাম। তারপর পাঁচঘণ্টা বরফ ঠেলে রাস্তার মাঝখানটা গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত করা আমার কাজ ছিল। আমার সঙ্গে আরও ১৫ জন সাফ করার কাজে লেগেছিল।

কাজের নির্দিষ্ট সময় পার হবার সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক আমাদের প্রত্যেককে ১৫৬ মার্ক দিল। আমি সবরকম কাজ করবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। যা জানি না তা শিখে নেব, এই ছিল আমার সংকল্প। ফলে কালকে ছিলাম চিফ গেস্ট বা প্রধান অতিথি জার্মান জেনারেল বুইলোর বাড়িতে, আজ জমাদার, রাস্তা সাফ করছি।

একজন ব্যবসাদার আমাকে আরেকটা কাজ দিলেন। তাঁর যত ইংরিজি চিঠি আসে সেগুলো সকালবেলায় আমাকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিতে হবে। যা পারতাম না তা ডিক্সনারির সাহায্যে পরিষ্কার করা যেত। মাসে ৩০০ মার্ক রোজগারের পথ হল।

নশা সেনের আগ্রহে আমার জন্য একজোড়া আইস স্কেটিং শ্যু জোগাড় হল। আমার পা এতবড় ও চওড়া যে সহজে মাপসই জুতো পাওয়া যায় না। তারপর আমরা তিনজন স্কেটিং রিংয়ে কুরফুরস্টেনডামে গেলাম। অনেক কসরৎ করে আস্তে আস্তে পড়াটা থামাতে পারলাম আর আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম আড়ষ্টভাবে চলতে পারলাম।

সেনের উৎসাহের সীমা নেই। আমাকে এর পরে নিয়ে গেল স্কি শেখাবার জন্য। এটা খুব শক্ত নয় যতক্ষণ না পাহাড়ে ভীষণ উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছি। বরফের দিনে দেশসুদ্ধ লোক স্কি পরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায় বরফের ওপর দিয়ে। যারা খুব এক্সপার্ট তারা পাহাড়ের উঁচু-নিচু পথে জোরে স্পাইড করে ঘুরে বেড়ায়। কেউ কেউ লাফিয়ে চলবার চেষ্টা করে। লাফাবার রেস হয় কে কত উঁচু দিয়ে ডিঙিয়ে যেতে পারে।

জার্মানিতে আরও তিন মাস কাটাতে বাধ্য হলাম বরফের জন্য। বন্ধুরা দেশে ফেরা ঠিক করেছে- যদি অন্য কোনও দেশে বসবাস করতে সক্ষম না হয়। মণীন্দ্র বলল যে সে জার্মানিতেই থাকবে। আমার ইচ্ছা এগিয়ে চলার, অন্তত লন্ডন পর্যন্ত। তারপর দেখা যাবে।

ফটোগ্রাফি শেখা ও ভাষা শেখা পূর্ণোদ্যমে চলছে। ঠিক করলাম যত শীঘ্র পারি একটা ছবির প্রদর্শনী করব- আমাদের ভ্রমণকে কেন্দ্র করে। বার্লিনে ছয় মাসের মধ্যে সেটা

সম্ভব হবে না তার কারণ সব আর্ট গ্যালারি বা 'এগজিবিশন হল' সারা বছর খালি পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মের সময় সবাই রোদ পোয়াতে এবং খেলাধুলাতে ব্যস্ত, আর্ট-এর ধার ধারে না। ইতিমধ্যে লন্ডনে রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সেক্রেটারিকে চিঠি লিখলাম এগজিবিশনের জন্য। তিনি রাজি হলেন। লিখলেন, লন্ডনে গিয়ে এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে।

অশোক ও অ্যানালিসে আমাকে নিয়ে প্রায় রোজই বেড়াতে যেত। কাছেই একটা পার্কের বেঞ্চে বসে গল্প করতাম। অশোক ভালো জার্মান শেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার অনেক আগে আনালিসে ইংরিজিতে ধীরে ধীরে মনের কথা ব্যক্ত করতে পারল।

মণীন্দ্রকে বাদ দিয়ে আমাদের তিনজনের মধ্যে ঠিক হল যে পশ্চিম জার্মানি পার হয়ে হল্যান্ডে যাব এবং সেখান থেকে কোনও জাহাজে কাজ নিয়ে লন্ডনে যাব। মণীন্দ্র দল ছাড়ল যদিও, আপাতত, অর্থাৎ যতদিন আমরা না রওনা হচ্ছি ততদিন সে একসঙ্গে থাকবে এবং কাজের চেষ্টা দেখবে।

পশ্চিম জার্মানিতে আমরা যখন যাচ্ছিই তখন আনালিসের বাড়িতে আমরা দুয়েকদিন থাকতে পারি লিয়ার শহরে। আনালিসে তার মা-বাবাকে দেখাতে চায় তার মনের মানুষকে এবং সময়ে সম্ভব হলে অশোককে বিয়ে করবে, এইরকম মনোভাব ব্যক্ত করে চিঠি লিখল।

একদিন শ্রীমতী হাথি সিং আমাকে ও ননীগোপাল মৈত্রকে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর সঙ্গে চা খাবার জন্য। আমরা হয়তো সময়ের কিছু আগেই পৌঁছেছিলাম। শ্রীমতী টেনিস র্যাকেট হাতে ফিরলেন। ফ্ল্যাটটি পরিপাটিভাবে সাজানো। শ্রীমতী একটি বিখ্যাত ভারতীয় পরিবারের মেয়ে। তিনি চায়ের সঙ্গে 'টা' ইত্যাদি খাওয়ালেন। তারপর গল্প চলল। ঘরে কয়েকটা নাচের ভঙ্গির ছবি ছিল তাই দেখে আমি শ্রীমতীকে অনুরোধ করলাম নাচ দেখাবার জন্য। তিনি রাজি হলেন। তাঁর নাচ সত্যি দেখবার মতো। পরে ইনি সৌম্য ঠাকুরকে বিবাহ করেন।

নশা সেন ইতিমধ্যে ভিয়েনা শহরে এক 'বলরুম ডাইনিং'-এর প্রতিযোগিতায় গিয়েছিলেন। একটা কাপ ও প্রথম হওয়ার জন্য ৫,০০০ শিলিং পুরস্কার নিয়ে এল। সেনের নাকি টাকার বিশেষ দরকার ছিল।

বার্লিনে চার মাস থাকার পর আমরা তিনজন: অশোক মুখার্জি, আনন্দ মুখার্জি ও আমি রওনা হলাম 'ব্রেমেন' শহরের দিকে। মণীন্দ্র ঘোষ বলল যে যদি লন্ডনে গিয়ে আমরা সুবিধা করতে পারি আরও দেশ ঘোরার তবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, না হলে

বার্লিনেই সে ইতি টানল । রওনা হবার সময় ফ্রাউ স্টেলার অত্যন্ত কাতর হয়ে আমাকে সেদিন বলেছিলেন তাঁর ছেলে নাকি আমার বয়সী ছিল ।

বার্লিন ছাড়তে কষ্ট হল একমাত্র নশা সেনের কথা ভেবে । আর তার সঙ্গ পাব না, হয়তো কখনও আর দেখাও হবে না ।

মার্চ মাসের শেষ, কিন্তু এখনও ভীষণ ঠান্ডা ও শীত । বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে । সুন্দর পিচের রাস্তায় সাইকেল জোরে চালাতে অসুবিধে হল না । কিছুদিন বিশ্রাম করে দুবেলা পেট ভরে খেয়ে এবং গরম ঘরে রাত কাটিয়ে মনে হচ্ছিল আমরা আরামপ্রিয় হয়ে পড়েছি । আমাদের যা টাকা জমেছিল তার একাংশ মণীন্দ্রকে দিয়ে গেলাম ।

প্রথমে এমডেন শহরে পৌঁছলাম । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান যুদ্ধজাহাজ এমডেন সিঙ্গাপুরে আটকে পড়েছিল । সেখান থেকেই ওই জাহাজ অনেকগুলি ব্রিটিশ জাহাজ ধ্বংস করে । তারপর সমুদ্র থেকে মাদ্রাজ শহরের ওপর Shell ফেলে । পরে অনেকগুলি ব্রিটিশ জাহাজ চারদিক থেকে ঘিরে এমডেনকে ধ্বংস করে । দুঃসাহসিকতার জন্য নৌবহরের ইতিহাসে এমডেন অমর হয়ে থাকবে । এমডেন শহরের লোকেরা যুদ্ধজাহাজ এমডেন-এর কীর্তি-কলাপের জন্য খুব গর্ববোধ করে ।

তারপর ব্রেমেন শহর । এটা নৌবহরের ঘাঁটি । প্রতি দশজন লোকের মধ্যে ছয়-সাতজনই নাবিক কিংবা জাহাজের কাজে যুক্ত । দেখলাম ছেলে ক্যাডেটরা সাদা ও নীল জামাকাপড় পরে ড্রিল করছে । জার্মানরা কুচকাওয়াজে সিদ্ধহস্ত । ড্রিল করতে পারলে আর কিছু চায় না ।

একটা ছোট্ট শহর লিয়ারের দিকে আমরা চলেছি । কখন পৌঁছে গেছি টের পাইনি । হঠাৎ শুনলাম রাস্তার ধারে আনালিসে আমাদের নাম ধরে ডাকছে । আমরা ঠিক করেছিলাম রেলওয়ে স্টেশন হোটেলে থাকব । কিন্তু আনালিসের মাথায় অন্য বুদ্ধি খেলছিল । সে বলল যে তার বাড়ি খুব কাছেই এবং বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে । কোনও ওজর আপত্তি শুনল না । ওর স্বভাব ছিল এত মিষ্টি যে বেশিক্ষণ তর্ক করা চলে না । বরং তাতে রাস্তায় আরও ভিড় জমে যাবার সম্ভাবনা ।

আনালিসেদের বাড়ি গেলাম । তার বাবার বেশ বয়স হয়েছে, মাথায় টাক । করুণাময়ী মা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন । সেইসময় কার্ল নামে ভাই ও এলশা নামে বোনের সঙ্গেও আলাপ হল । ভাই-বোন খুব কাছাকাছি ২০ থেকে ২৪-এর মধ্যে বয়স ।

সেদিনই স্থানীয় খবরের কাগজের তরফ থেকে একজন রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার এসে উপস্থিত । একটা ইন্টারভিউ হল আর সেইসঙ্গে ছবি তোলা । পরদিন সকালে সেই সব প্রকাশিত হল ।

মিঃ বোল্ট বললেন যে আমরা তিনদিন যখন লিয়ার-এ থাকব তখন তাঁর বাড়িতেই আমরা অতিথি হব । অন্য কোথাও থাকা চলবে না । মিঃ বোল্ট অনেক বছর ব্রাজিলে কফি চাষ করেছিলেন । সেজন্য বহির্জগতের খবর রাখেন । স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পর্তুগিজ ভাষা জানেন । আনালিসের মা অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে গল্প করলেন । বেশিরভাগ, জানবার জন্য আমার মা বাবা ভাই বোন আছেন কিনা । সবার কথা বললাম ।

কার্ল আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেল, দেখলাম ড্রেসিং টেবিলের একপাশে আমাদের ছবি । প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করল আমি নাচতে জানি কিনা । সেন আমাকে বার্লিনে তৈরি করে দিয়েছেন এই বিষয়ে । কার্ল তখনই ঠিক করল যে সেইদিন চায়ের নাচে আমাকে এলশাকে ও তার বান্ধবীকে নিয়ে একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁতে যাবে ।

এলশা সাধারণ জার্মানদের মতো মোটা নয় । গড়ন লম্বা ও স্বাস্থ্য ভালো । খুব ইচ্ছা আমার সঙ্গে ভাব জমাবার । কার্লের মনটা খুব পরিষ্কার, সে আমাকে নিজের ভাইয়ের মতো গ্রহণ করেছিল ।

এলশা আমাকে নিয়ে লিয়ার শহর দেখতে বেরোল । রাস্তার লোকেরা কেউ কেউ ভাবল আমি রেড ইন্ডিয়ান, আর নয়তো ইতালিয়ান বা ব্রাজিলিয়ান ইত্যাদি । ইউরোপ ও আমেরিকায় কেউ ইন্ডিয়ান বলে পরিচয় দিলে দেশসুদ্ধ লোক মনে করে যে রেড ইন্ডিয়ান । আমেরিকায় বিশেষ করে হিন্দু ইন্ডিয়ান কিম্বা গান্ধীর ইন্ডিয়া অথবা টাগোরের ইন্ডিয়ার লোক বললে ভারতীয়দের ঠিক চিনতে পারে ।

আমরা ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে একটা রেস্তোরাঁতে গেলাম । বিকালে কার্লের নেমন্তন্ন ছিল সেজন্য আর সময় নষ্ট না করে এলশাকে নিয়ে তাদের বাড়িতে ফিরলাম ।

অশোককে নিয়ে আনালিসে বেরিয়েছে । কোথায় গেছে বলে যায়নি । আনন্দর শরীর ভালো ছিল না । বাভেরিয়ান আল্পস-এ বরফের মধ্যে খুব নাস্তানাবুদ হবার পর আনন্দ আমাকে কয়েকবার বলেছে যে তার ফুসফুসে কষ্ট হয়, সেজন্য সে চলাফেরা কম করে । মিসেস বোল্টের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিল কী মাধ্যমে তা বলতে পারব না ।

বিকালে কার্ল, তার বান্ধবী, এলশা ও আমি বেরোলাম সেজেগুজে । সাজবার মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের একটা লাউঞ্জ স্যুট ছিল । সেটি সযত্নে কম্বলের মধ্যে মুড়ে রাখতাম ।

নাচের হলে অনেক তরুণ-তরুণী উপস্থিত হয়েছিল । চলতি নাচ ছিল চার্লস্টন রুম্বা । ফকসট্রট, ওয়ালটজ ও ট্যাঙ্গো । এলশা ও কার্লের বান্ধবীর সঙ্গে অনেক নাচলাম । এরইমধ্যে কার্ল জিদ ধরেছে আমাদের আরও দু-চারদিন থাকবার জন্য তাদের বাড়িতে ।

একদিন পরেই বুঝতে পারলাম বোল্ট পরিবার অশোককে ভালো চোখে দেখে এবং একদিন সে এ বাড়ির জামাই হবে । মিঃ বোল্টের ব্রাজিল খুব পছন্দ । তিনি সেখানে

বহুদিন কাটিয়েছেন । বিরাট দেশ অথচ অল্প লোকের বাস । কোনও লোক ব্রাজিলে থাকতে চাইলে কর্তৃপক্ষের আপত্তি নেই একটুও । এই ব্রাজিলের মুক্তিযুদ্ধে একটি বড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন একজন বাঙালি- কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস । তাঁর জীবনী পড়েছি । খুব ভালো লেগেছিল । ব্রাজিলের লোকেরা তাঁকে আজও শ্রদ্ধায় স্মরণ করে ।

মিঃ বোল্ট একটা চিঠি দিলেন অশোককে পর্তুগিজ ভাষায় লেখা, লন্ডনের অ্যাম্বাস্যাডারের নামে । তাঁর মতে, ব্রাজিলে আমাদের তিনজনেরই স্থান হবে । অথচ ব্রাজিলে যাবার ব্যাপারে আমার একটুও উৎসাহ ছিল না । আমাদের চিরদিনের ইচ্ছা যদি কোথাও কোনও দেশে বাকি জীবন কাটাই তবে সে দেশ হবে ভারতবর্ষ । অশোক, আনন্দ ও মণীন্দ্রর দেশে না ফেরার একটা যুক্তিপূর্ণ কারণ ছিল । দেশের গণ্যমান্য লোকেরা আমাদের বিদেশ ভ্রমণে ও অ্যাডভেঞ্চার করতে পাঠালেন, মাসে মাসে টাকা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে । তারপর টাকা তো দূরের কথা, কেউ চিঠি লিখে আমাদের খোঁজখবরও নিলেন না । ওরা বোকা বনে দেশে ফিরতে রাজি নয় ।

কেন জানি না প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল যে এইরকম পরিস্থিতি হতে পারে । মনুষ্যচরিত্র, বিশেষ করে বাঙালির- বোধহয় আমি চারজনের মধ্যে বেশি চিনতাম । সেজন্য আমার ক্ষোভ কম । মনে মনে ভাবতাম বরং দেখা যাবে ভ্রমণ সম্পূর্ণ করবার কী বা কত রকম পন্থা বের করতে পারি ভবিষ্যতে । হয়তো আমাকে একাই সারা পৃথিবী পাড়ি দিতে হবে, যদি অশোক ও আনন্দ ব্রাজিল রওনা হয় লন্ডন থেকে ।

ভারতবর্ষ থেকে লিয়ার পর্যন্ত আসতে বুঝেছি পৃথিবীটা কত বড় । আমরা অনেক ঘুরলেও তার সামান্য অংশই দেখতে সক্ষম হব ।

কার্ল এবং তার দুই বোনের আগ্রহে আমরা আরও একদিন বোল্ট পরিবারের কাছে রয়ে গেলাম ।

বিদায়ের দিন এল । সবার মুখ গম্ভীর চিন্তাকুল । আমরা বোল্ট পরিবারের সঙ্গে হেসে খেলে কদিন কাটালাম । এলশা দুটো মজার কাণ্ড করেছিল যা আমার চোখে পড়ল: প্রথমটা হচ্ছে যে সে অকারণে মাস্টার্ড শিশি থেকে বের করে খাচ্ছিল । মাস্টার্ডে ঝাঁঝ, সেজন্য তার দুই চোখে জল । এমন শুধু শুধু ঝাল খেয়ে উঃ আঃ বাপরে মারে, করার অর্থ কী? তখন সে বলল যে একটা বইয়ে পড়েছে ভারতীয়রা খুব লঙ্কার ঝাল খায় তাই সে লঙ্কার বদলে মাস্টার্ড খেয়ে সহ্য করার অভ্যাস করছিল । খালি পায়ে থাকারও ওই একই কারণ । তাছাড়া সে ঘন ঘন আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল তার ভারতবর্ষ যাবার বাসনা । আমার মনে পৃথিবী ভ্রমণের নেশা তখন এত প্রবল যে তার কোনও কথায় আমার কান দেবার সময় ছিল না ।

বোল্ট পরিবারের সবার মুখ বিষাদপূর্ণ করে যখন আমরা রওনা হলাম তখন পাড়ার বহু লোক এসেছিল আমাদের বিদায়ের শুভেচ্ছা জানাতে ।

হামবুর্গ-এর দিকে রওনা হলাম । চমৎকার রাস্তা । খটখটে সুন্দর রোদমাখা দিন । সন্ধ্যায় আমার পরিচিত এক ভারতীয়ের নিমন্ত্রণে (ডাঃ জ্যোতিষ রায়) তাঁর বাড়িতে উঠলাম । ডাঃ রায় ল্যান্ডলেডিকে বলে আমাদের জন্য খুব সুন্দর থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন ।

অশোক ও আনন্দর মন খারাপ আনালিসে ও তার পরিবারের সবাইকে ছেড়ে এসে । হামবুর্গে তারা কোথাও বেরোবে না ঠিক করেছিল । ডাঃ রায় ও আমি শহর দেখতে বেরলাম । হামবুর্গ জার্মানির দ্বিতীয় বড় শহর এবং তিনটে ছোট শহর একত্র হওয়ার ফলে হামবুর্গের লোকেরা নানা কাজে, শিল্পে, জাহাজের কারবারে বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল । হামবুর্গ, আলটোনা ও হারবুর্গ মিলে একটা বেশ বড় শহরে পরিণত হয়েছিল । প্রথমেই গেলাম জার্মানির সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর- ভেরথাইর্ম দেখতে । তিনজোড়া গরম মোজা কিনলাম ।

ডাঃ রায় Tropical disease নিয়ে গবেষণা করেছিলেন । হামবুর্গের স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন দেখতে গেলাম । সেখানের কর্ণধার বিখ্যাত ডাক্তার ম্যুলরের সঙ্গে আলাপ হল । তিনি অনেক ভারতীয় গবেষককে চেনেন যারা তাঁর কাছে কাজ শিখেছে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে আপনার কি মত? বৃদ্ধ ম্যুলর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভারতীয় ছেলেরা জার্মানদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান । তারা সহজেই বিষয়বস্তু বুঝতে সক্ষম হয় । সব সময় লক্ষ করেছি যে তারাই ক্লাসে বা পরীক্ষায় প্রথম স্তরের ছাত্র । অথচ বেশিরভাগ ভারতীয়রা পরীক্ষায় পাশ করার পরই লেখাপড়ায় বা গবেষণায় ইস্তফা দেয় । আর আমাদের ভোঁদা জার্মান ছেলেরা কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করার পর সত্যিকারের পড়া ও গবেষণা আরম্ভ করে । তখনই তারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং তার গবেষণার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করে থাকে আর সেসব পড়েই ভারতীয় ছেলেরা পরীক্ষায় পাশ করে ।

ডাঃ ম্যুলর মারা যাবার অল্পদিন পরে তাঁর প্রিয় ছাত্র জ্যোতিষ রায় গবেষণা ক্ষেত্রে অনেকগুলি অবদান প্রকাশ করলেন এবং পরে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে উঠলেন । তখন ভারত সরকার তাঁকে ডিরেক্টর জেনারেল অব বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মেডিসিন পদে উন্নীত করল । বেঁচে থাকলে ডাঃ ম্যুলর অন্তত জ্যোতিষ রায়ের ক্ষেত্রে তাঁর ভুল স্বীকার করতেন ।

ডাঃ ম্যুলর তাঁর স্ত্রীকে টেলিফোন করে বললেন যে সঙ্গে দুজন ভারতীয়কে নিয়ে তিনি শীঘ্রই বাড়ি যাচ্ছেন লাঞ্চ খেতে ।

হামবুর্গ ছেড়ে অস্ট-ফ্রিজল্যান্ড-এর দিকে এগোলাম । এখানকার গরু দুধের জন্য বিখ্যাত । ফ্রিজল্যান্ড ডেয়ারি ফার্মিং-এর জগৎপ্রসিদ্ধ গরুগুলি মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে বা ঘাস খাচ্ছে । দেখলে মনে হয়, তাদের স্তন দুগ্ধভারাবনত-জোরে চলতে তাদের কষ্ট হয়, ছুটে যাওয়া তো দূরের কথা । দুধে মাখনের অংশ শতকরা সাতের কম নয় । পরে এমনটি ডেনমার্কেও দেখেছি । আমাদের দেশে একমাত্র মোষের দুধই এই পরিমাণ মাখনবহুল ।

এই দেশের লোকেরা ফ্লেমিশ ভাষায় কথা বলে । বোঝা যায় জার্মানের থেকে অন্যরকম ।

৫

হল্যান্ডে প্রবেশ করলাম Zolle Meppel-এর পথ ধরে। এই দেশকে নেদারল্যান্ড বলে কেননা এটা সমুদ্রের নিচে সমতল জমি। বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের জল পশ্চিমে আটকানো হয়েছে। চারদিকে অসংখ্য জলপথ (খাল), মাল নিয়ে যাতায়াতের সুবিধার জন্য উইন্ডমিলও দেখা যায় প্রচুর। দেশটা খুব সমতল বলে সাইকেল এখানে যানবাহনের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। লক্ষ লক্ষ সাইকেল রাস্তা দিয়ে চলছে। মোটর গাড়ি চলার রাস্তার দুই পাশেই সাইকেল চালাবার পথ।

আমরা Utrecht ইউনিভার্সিটির একটা হস্টেলে উঠলাম। ছেলেমেয়েরা আমাদের ভ্রমণকাহিনী শুনতে চাইল। সন্ধ্যার পর একটা গ্যালারিতে গিয়ে আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত বললাম। ফলে কিছু রোজগারও হল।

পরদিন আমস্টারডাম শহরে পৌঁছলাম। প্রথমেই গেলাম একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম দেখতে। ইন্দোনেশিয়া হল্যান্ডের অধীন জনবহুল দ্বীপ। সে দেশে যত রকম শস্য উৎপন্ন হয় এবং তা দিয়ে কোন কোন শিল্প চলে তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই মিউজিয়ামে দেখলাম। ভারতবর্ষে যা কিছু উৎপন্ন হয় সেসবই ইন্দোনেশিয়ায়ও জন্মায়। তাছাড়া ওই দেশে পেট্রোল পাওয়া যায়। পর্যাপ্ত চিনি হয় যা বিদেশে বহু পরিমাণে রপ্তানি করা হয় এবং তাতে প্রচুর অর্থাগম হয়।

এখানে জগদ্বিখ্যাত ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি না দেখলে মনে হয় জীবন বৃথা। গ্যালারিতে গিয়ে রেমব্রাঁ, হোলবাইন, ভ্যান ডাইক প্রভৃতির অপরূপ অরিজিন্যাল পেন্টিং দেখলাম।

এককালে ডাচ মাস্টাররা পৃথিবীর লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁদের পেন্টিং বাস্তবধর্মী ছিল, সেজন্য চিরনতুন। যুগে যুগে কলাশিল্পে ইউরোপের কয়েকটি দেশের প্রাধান্য ঘটেছে এবং কালের প্রবাহে তা লীন হয়েছে, একমাত্র ফরাসি শিল্পের মহিমা যেন শাশ্বত।

হল্যান্ডে মধ্যযুগের বড় বড় আর্টিস্ট যখন অন্তর্ধান করলেন তারপর বহুদিন সেরকম কেউ তাঁর স্থান নেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবার একজন ডাচ পেন্টার: ভ্যান গঘ জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভ্যান হল্যান্ডকে আর্ট জগতে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভ্যান গঘের জীবনী পড়ে আমি মুগ্ধ। বইটির নাম 'মাই ব্রাদার্স লেটার্স'-থিও নামে ভাইকে লেখা চিঠির সমষ্টি। ভ্যান গঘ সারাজীবন চেষ্টা করে পাঁচ টাকার বেশি দামে কোনও ছবি বেচতে পারেননি। তাও কেবল একবার। তারপর দুঃখ দৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জীবন শেষ হয়েছে। আজ যদি কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে একটা ভ্যান গঘের ছবি কিনতে পারে কেউ, তা সে ভাগ্যবান। আগেকার দিনে সাহিত্য ও কলার ক্ষেত্রে সর্বত্রই দেখা গিয়েছে আর্টিস্ট বা সাহিত্যিক জীবদ্দশায় অতি কষ্টে কালাতিপাত করেছেন আর মৃত্যুর পর ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হয়েছেন।

রেমব্রাঁর 'সেলফ-প্রোট্রেট' আমার বিশেষ ভালো লেগেছিল। তাঁর চরিত্র স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ছবিতে।

আমস্টার্ডাম ছেড়ে আমরা ডেন হাগ নামে হল্যান্ডের রাজধানীতে গেলাম। রানির প্রাসাদের জাঁকজমক দেখলাম। তারপর আমাদের গন্তব্য রটারডাম শহর ও বন্দর। সেখান থেকে জাহাজ নিয়ে আমরা ইংল্যান্ডে রওনা হব।

রটারডাম পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল। কোথায় থাকব ভাবছি। Mr. Metsdagh-এর নামে একটি চিঠি ছিল, সেটা সদ্ব্যবহার করবার সুযোগ হল। মিঃ মেৎসদাঘ সেখানকার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। তিনি তাঁর বাড়ির বসবার ঘর ছেড়ে দিলেন। আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটালাম।

মিঃ মেৎসদাঘের চেষ্টায় দুদিন পরে একটা জাহাজ পেলাম, সেটা ডোভার বন্দরে নিয়ে গেল। সকালবেলায় পাসপোর্ট ইত্যাদি দেখিয়ে ইংল্যান্ডে প্রবেশ করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে রওনা হলাম সাইকেলে। দিনের শেষে ক্যান্টারবেরি শহরে পৌঁছলাম। এই কাউন্টি, কেন্ট খুব সুন্দর দেখতে, ছবির মতো। টনব্রিজ ওয়েলশ সেভেন ওকস পার হলাম।

ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রাল দেখতে গেলাম। চার্চ দেখে সন্ধ্যায় সাইক্লিস্ট ক্লাবে গেলাম। সেখানে অল্প খরচে থাকার ও খাবার ব্যবস্থা আছে। পরদিন ভোরেই রওনা হলাম লন্ডনের পথে।

আগের চেয়ে দিন অনেক বড় হয়েছে। আজ ১৭ এপ্রিল ১৯২৮ সাল, বিকাল চারটের সময় পৌঁছলাম লন্ডনে। আমরা লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রাবাসের কাছে এসেছি এমন সময় ঝুর ঝুর করে বরফ পড়তে শুরু করল। তারিখটা মনে রাখার মতো, কেননা আমি ভাবিনি এপ্রিল মাসেও বরফ পড়তে পারে লন্ডনে।

ছাত্রাবাস সাউথ কেনসিংটন পাড়ায়, ক্রমওয়েল রোডের ওপর। পথঘাট বাড়ি ইত্যাদি দেখে মনে হল পাড়াটা উচ্চাঙ্গের। ছাত্রাবাসের লোকেরা, আমাদের ঘিরে একটা ছোট্ট অভিনন্দন দিল। এখানে অধিকর্ত্রী, মিস বেক ছেলেদের ওপর নজর রাখেন। কেউ কেউ

বলত তিনি গভর্নমেন্টের চর। তিনি আমাদের বললেন যে পরদিনই যেন আমরা হাই কমিশনার ফর ইন্ডিয়া, স্যার অতুল চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করি।

ডেলি এক্সপ্রেস ও ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড কাগজের রিপোর্টার আমাদের ছবি নিল এবং ইন্টারভিউ করল। পরদিন বিস্তারিত বিবরণ বেরোল। পথে বরফের ঘূর্ণিঝড়ে কীরকম নাস্তানাবুদ হয়েছি সেসব প্রকাশিত হল।

আমি একটু হাল্কা হয়েই আমার এক বিশেষ প্রিয় বন্ধুকে টেলিফোন করলাম। সে থাকে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছাকাছি। নাম চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। ইউরোপে পৌঁছবার পর সমানে আমাকে চিঠি লিখে উৎসাহ দিয়েছে যাতে আমরা হাল ছেড়ে না দিই।

ভারতবর্ষে আমাদের দলের নাম ছিল ক্যালকাটা ট্যুরিস্ট ক্লাব। চন্দ্রনাথ ছিল তারই অন্যতম সদস্য এবং সে আমার সঙ্গে সাইকেলে লম্বা লম্বা পাড়ি দিয়েছে দেশে। সেজন্য সে বুঝত আমরা কী ভীষণ কষ্ট স্বীকার করে দেশের পর দেশ অতিক্রম করেছি।

অশোক, আনন্দ এবং আমি আশা করেছিলাম স্যার অতুলের কাছে আমাদের দেশের কমিটির চিঠি এসেছে। এবং হয়তো সেখানে সুখবর পাব। আমার দুই বন্ধু ইতিমধ্যে মুখ খুলে লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারছে- তাদের আগেকার জড়তা কেটে গেছে। ইংরিজি আমাদের ছোটবেলা থেকেই শেখা, তাই ভারতীয়রা ইংল্যান্ডে গিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে এবং কিছুটা অ্যাট হোম বোধ করে। তবে ইংল্যান্ডে এলে স্পষ্ট বোঝা যায় ইংরিজি ভাষাও কত রকমের। প্রত্যেক কাউন্টিতে ভাষা একটু অন্যরকম করে বলে। আমাদের দেশে যেমন মাদ্রাজি ইংরিজি, পাঞ্জাবি ইংরিজি বা বাঙালি ইংরিজি, সেরকম আর কি। শুনেছি চিন দেশের লোকেরাও সম্পূর্ণ অন্যরূপে ইংরিজি ভাষা বলে। তাকে পিজিন ইংরিজি বলা হয়। শুনলে মনে হয় টেলিগ্রাফিক ইংরিজি। যাইহোক, স্যার অতুল চ্যাটার্জি আই সি এস একজন খাঁটি সাহেব মানুষ। পান থেকে চুন খসলে তিনি বিরক্ত হন। আমরা সকালে ফিটফাট হয়ে হাই কমিশন অফিসে হাজির হলাম। স্যার অতুল ডেকে পাঠালেন, তাঁর প্রথম কথা ভারতবর্ষ ছাড়ার আগে তাঁকে কি একবার জানানো হয়েছিল? আমরা কেমন করে আর কেনই বা স্যার অতুলের মতো একজন চাকুরে, আই সি এস-এর হুকুম নিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরোব, ভেবে পেলাম না। তিনি হঠাৎ আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে পড়লেন ভেবে আমরা একটু বিস্মিত হলাম। তিনি বললেন কারও কাছ থেকে কোনও চিঠি আমাদের জন্য নেই। তিনি নিজে স্টেটসম্যান কাগজে ছবি দেখে মনে মনে বুঝেছিলেন একদিন হয়তো আমরা লন্ডনে পৌঁছব। তিনি এতদিন ধরে রাগ পুষে রেখেছেন আমাদের অপেক্ষায়।

শেষকালে কথা কাটাকাটি হল । স্যার অতুল-এর রক্তের চাপের মাত্রা বেড়ে গেল আর আমরা ছাত্রাবাসে ফিরলাম । যথাশীঘ্র অন্যত্র চলে যাবার হুকুম হল । মিস বেক আগেই খবরটা পেয়েছিলেন ।

বন্ধুরা মনমরা হয়ে পড়ল । সেদিনই বিকালে ব্রাজিলের অ্যাম্বাস্যাডর-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, আমার সেখানে যাবার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ।

অ্যাম্বাসাডার বুড়ো মানুষ এবং অত্যন্ত ভদ্র । তিনি সব শুনে এবং আমাদের কাগজপত্র দেখে রাজি হলেন তাঁর দেশে যাবার অনুমতি দিতে ।

অশোক ও আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে কাগজপত্রে সই করল । দুদিন পরেই জাহাজ ছাড়বে লন্ডন থেকে রিও ডি জানেরোর জন্য । এইসব ঘটনা এত দ্রুততালে এগোবে আমি ভাবতে পারিনি । আমি অশোক ও আনন্দকে বললাম যে আমি পৃথিবী ভ্রমণের আশা এখনও ছাড়িনি । আমি আমার দেশেই ফিরতে চাই সফল মনোরথ হয়ে । ব্রাজিলে যাব ট্যুর করার পথে তখন দেখা হবে । গুড লাক টু ইউ বলে ওরা ২৯ এপ্রিল রওনা হল জাহাজে ব্রাজিলের উদ্দেশে টিলবেরি ডক থেকে ।

এদিকে আমার ভ্রমণ যে কেমন করে চালাব, তার কোনও হদিশ নেই । তখন মনে হল যেমন করে হোক, যেখানে হোক সদুপায়ে দৈহিক বা মাথা খাটিয়ে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করব আর সেই অর্থে ভ্রমণ সম্পূর্ণ করতে পারব এমন আমার বিশ্বাস ছিল । একজনের মতো আয় করা সোজা ।

পরে যাই হোক, আপাতত আমার জীবনের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল এভাবে । তিনটি বীর বঙ্গসন্তান অ্যাডভেঞ্চারের তাগিদে আমার সঙ্গে একসঙ্গে দেশছাড়া হয়েছিল দুবছর আগে । তারা এখন গেলেম কে কোথায়, এই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি । প্রাণে অফুরন্ত আশা, দেহে অসীম শক্তিও ছিল । সব যেন নিমেষে আমাকে ছেড়ে চলে গেল । সঙ্গে যে টাকা আছে হিসেব করে চললে এক মাস চলে যাবে । ভাবলাম, এরমধ্যে খুঁজে নেব অন্য কাজ ।

লন্ডনে থেকে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কার্সের ফাইনাল অংশটুকু পরীক্ষা দিয়ে পাশ করা । খেলাধুলা ও শরীরচর্চা নিয়ে অনেকদিন দেশে কাটিয়েছি । ভবিষ্যতের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ফিরে গিয়ে উন্নততর কাজ যাতে করতে পারি তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে । দেশে থাকতে ক্যালকাটা কমার্শিয়াল কলেজে এ আই বি পরীক্ষার প্রথম দুই অংশ পাশ করা ছিল । এমন সুযোগ আর হবে না । তাছাড়া আমার খুব ইচ্ছা ছিল রয়্যাল ফটোগ্রাফির সোসাইটির হলে আমার তোলা সব ছবি দিয়ে একটা প্রদর্শনী করা ।

বিখ্যাত মিডল্যান্ড ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার, মিঃ হাইডের সঙ্গে দেখা করে আমার পরিচয় দিলাম আর ব্যাঙ্কে কাজ শেখবার সময় এ আই বি পরীক্ষা দেবার কথা বললাম ।

আমি মিঃ হাইডের কাছ থেকে নিয়োগপত্র নিয়ে পরদিন ১৯৬নং পিকাডিলি ব্রাঞ্চে উপস্থিত হলাম । আমার সহকর্মীরা সবাই ভদ্র ও ভালো । তারা আশ্বস্ত হল যখন শুনল যে আমি আগেই ব্যাঙ্কে কাজ করেছি । রোপার নামে একটি যুবকের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল । সে আমাকে আমার কাজ বুঝিয়ে দিল । এই পিকাডিলি ব্রাঞ্চে অনেক আর্টিস্ট, প্রোডিউসার ও ডিরেক্টরদের অ্যাকাউন্ট ছিল, কাজের ভেতর দিয়ে যাঁদের সঙ্গে আলাপ হল এবং তাঁদের সৌজন্যে আমার সৌভাগ্য হয় ভালো ভালো থিয়েটার দেখবার ।

পিকাডিলি হচ্ছে বিরাট লন্ডন শহরের কেন্দ্রস্থল । এখানে ভালো ভালো থিয়েটার, সিনেমা ও রেস্তোরাঁ আছে । দিনের চেয়ে রাতে এ পাড়া সরগরম । হাজার বাতি জ্বলে, একেবারে দিনের মতো দেখায় ।

লন্ডন শহরটা কত বড় একটু নমুনা দিই । লন্ডনের বাইরে যে কোনও এক জায়গা থেকে পিকাডিলি পৌঁছেতে অন্তত ৩০ মাইল পার হতে হবে । তার মানে শহরটা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অন্তত ৬০ মাইল, কোথাও কোথাও তার চেয়ে বেশি ।

আগে লন্ডনবাসীদের ককনী বলা হত, যাঁরা সেন্টপল গির্জার ঘণ্টাধ্বনি এলাকার মধ্যে জন্মাত । ক্রমে ক্রমে যত সাবার্বান বা শহরতলি আছে তারা লন্ডনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে নিল । টেমস নদীর দুই পারের সমস্ত লোক এখন লন্ডনবাসী ।

আমাদের কলকাতার তেমন সৌভাগ্য হয়নি । গঙ্গার ওপারে অন্য শহর হাওড়া । লন্ডনে দশ মিলিয়ান লোকের বাস । কলকাতায় মাত্র চার মিলিয়ান, এখন প্রায় সাত-আট মিলিয়ান । লন্ডন এক হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র । ভারতবর্ষ তথা পৃথিবী জুড়ে বহু দেশ এখান থেকে শাসিত হয় ।

আমি লেখাপড়া করি ও ব্যাঙ্কে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকি । সুবিধা পেলে আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়াম, থিয়েটার, নাচ ও গানের আসরে যোগ দিই । অনেক বন্ধু হয়েছে, তারা বেশিরভাগ ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান । কোনওদিনই জাতিবিচার করতে শিখিনি । মুসলমান বন্ধুরা আমাকে খুব ভালবাসত এবং আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গর্ববোধ করত ।

টটেনহাম কোর্ট রোডের ওয়াই এম সি এতে আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত বলবার নেমন্তন্ন পেলাম । অনেক স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে আলাপ হল । তার মধ্যে দুজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মিস চ্যানিং ও স্যার লুইস ক্যাসন ও তাঁর জগদ্বিখ্যাত স্ত্রী, সিবিল থর্নডাইক । মিস চ্যানিং

তাঁর বাড়ি, গোল্ডারস গ্রিনে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন পরের শনিবার। প্রতি রবিবার দুপুরে লাঞ্চ খেতে তাঁর বাড়িতে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন।

মিস চ্যানিং খুবই সুশ্রী ভদ্রমহিলা। বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে এক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম। বসবার ঘর ভর্তি কয়েক হাজার সংস্কৃত বই ও পুথি। মিস চ্যানিংয়ের বাবা আই সি এস হয়ে ভারতবর্ষে বড় কাজ করতেন। তিনি বেশিরভাগ সময় সিমলায় কাটাতেন। তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর অনুরাগ জন্মায়, সেজন্য ভারতীয়রা তাঁকে পণ্ডিত চ্যানিং নামে অভিহিত করেছিলেন। মিস চ্যানিং সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। সেজন্য তিনি নিজেকে ভারতীয় বলতেন, যদিও তাঁর চোখের রং নীল এবং চুল সোনালি রঙের। তিন বছর বয়সে তিনি ভারতবর্ষ ছাড়েন, কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি তাঁর অদ্ভুত টান।

মিস চ্যানিংয়ের সঙ্গে আলাপের পর ৪৫ বছর আমাদের বন্ধুত্ব টিকেছিল যতদিন পর্যন্ত না ৯৫ বছরে তাঁর মৃত্যু হয় এই কলকাতায়। এঁর কথা এত লেখবার আছে যে, একখানা পুরো বই লিখে শেষ করা যায় না। এমন আশ্চর্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ জীবন সচরাচর দেখা যায় না। তাই মিস চ্যানিংয়ের সম্বন্ধে অল্প কিছু এখন লিখছি।

বিলাতে ডেভনসায়ার-এর স্কুলে ও কলেজে পড়া শেষ করে তখনকার ইংল্যান্ডের রেওয়াজ অনুসারে সেবাব্রত নিয়ে নার্সিং শিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর দক্ষতার জন্য পরে ডিস্টিঙ্গুইশন সার্ভিসেস মেডেলও পান।

মিস চ্যানিং তারপর রাজনীতিতে যোগ দেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে লেবার পার্টিতে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আই সি এস-এর মেয়ে হয়ে কনসার্ভেটিভ পার্টিতে না ঢুকে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেবার মধ্যে মিস চ্যানিংয়ের মনের প্রসার ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন লেবার পার্টি প্রথম ক্ষমতায় আসীন হল তখন তারা মিস চ্যানিংকে মন্ত্রিত্ব পদে নিয়োগ করতে চাইল কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বন্ধু মিস মার্গারেটে বন্ডফিল্ডের নামোল্লেখ করলেন। আমি কর্মী থাকতে চাই, কোনও পদপ্রার্থী নই, এই ছিল তাঁর মনের কথা।

রবিবার দুপুরে লাঞ্চ খেতে গেলাম সিবিল থর্নডাইকের বাড়িতে। তাঁর স্বামী, স্যার লুইস ক্যাসন খুব বুদ্ধিমান ও সহৃদয় লোক। তাঁদের দুই মেয়ের বয়স তখন ২০, ২২ হবে। তাদের নাম অ্যান ও মেরি ক্যাসন। ভ্রমণ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক আলোচনা হল। তারপর স্যার লুইস রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটকের উল্লেখ করলেন। স্যার উইলিয়াম রদেনস্টাইনের সহায়তায় তিনি একবার 'ডাকঘর' নাটক ইংরিজিতে অভিনয় করেছিলেন।

রদেনস্টাইনের সঙ্গেও আমার বেশ ভাব জমেছিল এবং তাঁর বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছিলাম । রদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত হয়েছিলেন । শুনেছি ইংল্যান্ডের বিদ্বজ্জন সমাজে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও লেখা পরিচিত করেন যার ফল হল ইয়েটসের সঙ্গে সহযোগিতা এবং পরে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ।

আরেকজন ভারতীয় রদেনস্টাইনের কাছে বিশেষ উপকৃত । সে আমার পরম বন্ধু, উদয়শঙ্কর । স্যার উইলিয়াম রদেনস্টাইন রয়েল কলেজ অব আর্টসের নামকরা প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন । আর্ট জগতের সঙ্গে যাঁরা কোনওরকমে যুক্ত তাঁরা সবাই কামনা করতেন তাঁর সঙ্গ ।

আনা পাভলোভার সঙ্গে রদেনস্টাইন উদয়শঙ্করের আলাপ করিয়ে দেন কৃতী ছাত্র হিসাবে । উদয়শঙ্করের তুলির কাজের চেয়ে নাচে বেশি ঝোঁক ছিল । সে সময় বুঝে পাভলোভার কাছে 'কৃষ্ণ রাধা' নৃত্য 'ব্যালে' করার কথা বলল । আর একক ও যুগ্ম নাচে দেখিয়ে দিল নাচ কী ধরনের হবে । পাভলোভা মুগ্ধ । তিনি রদেনস্টাইনের কাছে উদয়কে ধার চেয়ে নিলেন এবং দুবছর পৃথিবীর নানা স্টেজে দুজন নাচলেন ।

এমনইভাবে উদয়ের জীবনে নাচ দেখা দিল । তারপর আমৃত্যু তাঁর সাধনা হল নাচের উৎকর্ষ সাধন । একজন সুইস ভদ্রমহিলা আর্টিস্ট এলিশ বোনার (পরে পদ্মবিভূষণ) তাকে খুব সাহায্য করেছিলেন দল গঠন করতে এবং ভারতবর্ষের বাইরে নানা দেশে উদয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে । উদয়ের মাধ্যমে মিস বিয়েট্রিস স্ট্রেট নামে আরেক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার আলাপ ও বন্ধুত্ব হয় । উত্তরকালে বিয়েট্রিস প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন উদয়কে ।

ফুটবলের দেশে এসেছি । একটা শনিবার ফিনসবেরি পার্কে বিখ্যাত আর্সেনাল ও চেলসির খেলা দেখতে গেলাম । কী বিরাট স্টেডিয়াম, খেলা হল খুব দ্রুততালে, এখানে ধাক্কা মেরে বল কেড়ে নেওয়া সম্পূর্ণ নিয়মসঙ্গত দেখলাম । আমার এক ফুটবল খেলার বাঙালি বন্ধু আর্সেনাল টিমে স্থান পেয়েছিল, তার নাম ননী সিকদার । খালি পায়ে খেলে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল । পরে যখন বরফ পড়তে আরম্ভ করল এবং মাঠ ভীষণ পিচ্ছিল হল, তখন তার খালি পায়ে খেলার উৎসাহ চলে গেল ।

এখন এপ্রিলের শেষেও ইংল্যান্ডে বসন্তকাল, কিন্তু শীত খুব । একদিন ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করে ক্রিস্টাল প্যালেসে বন্ধু চন্দ্রনাথের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে ও উইক-এন্ড কাটাতে গেলাম । আমি আমার একটি মাত্র লাউঞ্জ স্যুট পরে গিয়েছিলাম । চন্দ্রনাথ, ডাক নাম 'চনু' আমার কাপড়চোপড়ের সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছিল, চনুর ও আমার মাপ ছিল এক । আমার সামনে ভালো স্যুট বিছিয়ে দিয়ে সে বলল যেটা খুশি ও যটা খুশি বেছে নে । এইসব স্যুট আমার কোনও কাজে লাগবে না । এর অর্থ তখন বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম ।

চনু ছয় ফুট লম্বা ছিল আমার মতো এবং তার মতো বন্ধু-বৎসল, সহৃদয় ও বুদ্ধিমান যুবক আমি কমই দেখেছি। যে তাকে চিনেছে সেই ভালোবেসেছে।

গৃহস্বামিনী চন্দ্রকে খুব স্নেহ করেন। আমাকে তিনি উপস্থিত অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ডিনার শেষে সবাই আমার ভ্রমণকাহিনী শোনবার আগ্রহ দেখাল। আমিও খুব উৎসাহ করে বললাম। তখন রাত এগারোটা বাজে, কিন্তু তখনও শেষ হল না।

রাত বারোটার সময় বাড়ির সংলগ্ন বাগানে একটা চেরি গাছের নিচে আমি বিছানা পাতলাম যদিও চনুর প্রশস্ত শোবার ঘরে আমার বিছানা প্রস্তুত ছিল। রাত তখন তিনটে হবে, এমন একটা বিকট শব্দ হল, মাথার ওপরে যেন গাছটায় বজ্রপাত হয়েছে। আমি অবাক হয়ে নিজেকে দেখলাম অস্পষ্ট আলোতে যে আমি বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে আছি। ঘুমন্ত অবস্থা থেকে কেমন করে তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠলাম বিছানার ওপর, স্মরণে এল না। খানিকক্ষণ পরে বিছানার ওপর ধপ করে একটা ইঁদুর পড়ল। বুঝলাম পেঁচা আমার আগমনে অখুশি, তাই বিকট চেঁচিয়ে আমার ঘুম ভাঙাল।

ইঁদুরটা ফেলে দিয়ে আবার শুলাম। তখন বাড়িতে ঢোকবার সব দরজা বন্ধ। শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত্রে বেশ শীত আছে দেখলাম।

চার-পাঁচদিন পরে চনু বিকালে আমার বাড়িতে উপস্থিত। দুই বন্ধু মিলে ডিনার খাব এবং ড্রুরি লেন থিয়েটারে শো বোট দেখতে যাব। আমেরিকা থেকে এই বইটা নাম করে লন্ডনে এসেছে। স্টেজের ওপর জল স্টিমার, লোকজন উঠছে নামছে আর তার সঙ্গে নাচ-গানও চলছে। এরকম বিরাট স্টেজ কখনও দেখিনি। আমাদের দেশে কাপড়ের ওপর নানা রং দিয়ে আঁকা দৃশ্য ওপরে টাঙিয়ে রাখা হত। তারপর যেরকম সিন প্রয়োজন সেটি ওপর থেকে নামিয়ে দেওয়া হত। একেবারে সেকেলে ব্যাপার। অনেক বছর পরে শিশিরকুমার ভাদুড়ি আমাদের দেশে সেট সিন তৈরি করে অবস্থার উন্নতি ঘটান। এরজন্য তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং নানাবিধ উন্নতির ভেতর দিয়ে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন।

শো বোটের ওপর আকর্ষণ ছিল পল রোবসনের গান। ইংল্যান্ডের লোকেরা এত গুরুগম্ভীর গলার গান আগে কখনও শোনেনি। এই নিগ্রো গায়কের নাম তখন সবার মুখে শোনা যেত। কত গায়ক পল রোবসনের অনুকরণে ওলম্যান-রিভার গাইল কিন্তু কেউই তার ধারে কাছে এল না।

বন্ধুকে বিদায় দিয়ে আমি ছাত্রাবাসে ফিরলাম।

দুদিন পরে মিস বেক-এর কাছে শুনলাম স্যার অতুল আমাকে ডেকেছেন। স্যার অতুল আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন কবে আমি দেশে ফিরে যাব। আমার রাগ হয়ে গেল,

বললাম ‘যেদিন আমার ইচ্ছা ও সুবিধা হবে ।’ স্যার অতুল বললেন, হ্যারি পালটের লেকচার শোনবার জন্য লন্ডনে সময় কাটানোর অর্থ হয় না । প্রত্যুত্তরে বললাম যে আমি স্বাধীন দেশে আছি, তাঁর তাঁবেদার নই । স্বাধীনভাবে আমার সব কিছু করবার অধিকার আছে ।

দুদিন পরে ছাত্রাবাস ছেড়ে হ্যাম্পস্টেড হিথের খুব কাছে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে উঠে গেলাম । ফ্ল্যাটটা মিস চ্যানিং খুঁজে বের করেন- তাঁর বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে । একটা বসবার ও শোবার ঘর, একটা রান্নাঘর ও বাথরুম মিলে ফ্ল্যাটটা তিনতলার ওপর, মন্দ নয় একজনের পক্ষে । মিস চ্যানিং-এর টেলিফোন আমি ব্যবহার করেছি যথেষ্ট । তাছাড়া তাঁর নেমন্তন্ন লেগেই ছিল ।

হঠাৎ এক সকালে মিস থর্নডাইক, পরে ‘ডেম সিবিল থর্নডাইক’ (মস্ত সম্মানের অধিকারী) আমার ব্যাঙ্কে উপস্থিত । তিনি বললেন যে একটা অত্যুৎকৃষ্ট ‘প্লে’ হবে, তার নাম ‘ওথেলো’ । মরিস এভান্স, পল রোবসন, পেগি এসক্রাফট, থর্নডাইক নিজে ও স্কট ইত্যাদি মিলে ‘স্টার কাস্ট’ ।

মিস থর্নডাইক-এর মতে, এক অপূর্ব ‘ওথেলো’ দেখতে পাব । আমাকে একটা পাস দিলেন প্রথম রাত্রের অভিনয় দেখবার জন্য । পল রোবসনের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ । এত ভালো অভিনেতা তিনি খুব কম দেখেছেন । আরও বললেন যে শেক্সপিয়ার রোবসনের জন্য যেন ‘ওথেলো’ লিখেছিলেন ।

প্রথম রাত্তিরে অভিনয় এত ভালো হয়েছিল যে সবাই খুব প্রশংসা করেছিল । কোনও কোনও লোকের মতে, একটি মাত্র খুঁত হচ্ছে যে পল রোবসন নিগ্রো হয়ে শ্বেতাঙ্গিনী ডেসডিমোনার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করা দৃষ্টিকটু হয়েছে । অভিনয়ের মধ্যেও কালাধলার প্রশ্ন!

আমি অধীর আগ্রহে ‘ওথেলো’ দেখতে গেলাম চনুকে নিয়ে । সে টিকিট কেটে আলাদা বসেছিল । যা দেখলাম এবং যা শুনলাম সব যেন বাস্তবের রূপ নিয়েছিল দর্শকদের কাছে, এত সুন্দর ও ভালো অভিনয় । পল রোবসন কলেজে ছাত্রাবস্থায় শেক্সপিয়ারের নাটকে অভিনয় করেছে কিন্তু কারও ধারণা ছিল না সে কত উঁচু দরের অভিনেতা ।

দ্বিতীয় দিন অভিনয়ের পর ‘ওথেলো’ বন্ধ করে দেওয়া হয় বর্ণবৈষম্যের জন্য । আমি অবাক হয়ে ভাবলাম সাদা রং-এর কী দেমাক । মিস থর্নডাইকের মনে সাদা-কালোর পার্থক্য ছায়াপাত করে না । ক্যাসন পরিবারের লোকেদের প্রকৃতি বোধ হয় অন্য ধাতু দিয়ে প্রস্তুত ।

যাহোক আমি চিরদিন সেই রাত্রের 'ওথেলো' নাটকে রোবসনের অভিনয়ের কথা মনে রাখব। অনেক শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে এই অংশে দেখেছি। তুলনায় তারা রোবসনের ধারে কাছে আসে না। পল রোবসনের অভিনয় করা আর হল না। তিনি গান গেয়ে সবার মন জয় করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। ক্রমে ক্রমে কমিউনিজম তাঁকে আকৃষ্ট করল যদিও তিনি ইংল্যান্ডেই বসবাস করতে শুরু করলেন। আরেকটিবার আমি পল রোবসনকে 'ইউজিন ওনিলের' নাটক 'হেয়ারি এপ'-র ফ্লোরা রোবসনের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখেছি।

হ্যামস্টেড হিথ খুব কাছেই। আগস্ট মাসে White Monday Fair বসল সেখানে, আমি একরকম খেলায় দুবার জিতলাম। প্রথমবার পেলাম একটা হাঁস, দ্বিতীয়বার পেলাম একটি নারকোল।

আমার এক ভাগ্নে, সুকুমার ব্যানার্জি, আই সি এস পরীক্ষা দেবার জন্য অক্সফোর্ডে ছিল। আমি প্রায়ই তার কাছে যেতাম। তার অনেক ভারতীয় ও ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। সবাই মিলে লন্ডনে অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচ দেখতে আসবে এবং আমাকে টিকিট জোগাড় করে দিতে হবে। আমি রাজি হলাম।

অক্সফোর্ড থেকে পাঁচজন এল খেলা দেখতে। তিনজন ভারতীয় ও দুজন ইংরেজ। ওভালে খেলা হচ্ছে। ভালো বসবার জায়গা পেলাম। দুপুরবেলায় লাঞ্চ খাবার সময় একটা কাণ্ড হয়ে গেল। লাঞ্চপ্যাকেটের (৬ জনের জন্য) টিকিট কিনে বাক্স নেবার 'কিউ'-এ দাঁড়ালাম। টিকিটের নম্বর মিলিয়ে বাক্স দিচ্ছিল। আমার পালা আসবার আগেই একজন বিরাটকায় ইংরেজ আমার সামনে এসে দাঁড়াল এবং অবজ্ঞার সুরে সরে যেতে বলল। আমি প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কারণ জিজ্ঞাসা করতে কেবল এককথায় বলতে লাগল 'ইউ কান্ট স্ট্যান্ড বিফোর মি', অর্থাৎ তুমি আমার আগে 'কিউয়ে' দাঁড়াতে পার না। তখন আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, আমি তার টিকিটের নম্বর জানতে চাইলাম। সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আবার বলল, 'ইউ কান্ট স্ট্যান্ড বিফোর মি'। 'আই হ্যাড মেনি 'বয়েস' লাইক ইউ ইন ইন্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতবর্ষে তোমার মতো অনেক চাকর আমার অধীনে কাজ করত। লোকেরা কিন্তু বিরাট বপুর অন্যায় আবদারে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তারাও দুয়েকজন টিকিটের নম্বর দেখতে চাইল। কিন্তু লোকটার মারমূর্তি দেখে পিছিয়ে গেল।

তখন আমি অতিষ্ঠ হয়ে লোকটার গলা ধরে বললাম, 'তুমি বড় ঝামেলা করছ'। সে আমার হাতটা খপ করে ধরেই আমার চোখের ওপর এক ঘুষি মারল। গেলাম টেস্ট ম্যাচ দেখতে তারপর শুরু হল মারামারি। বলাই চ্যাটার্জি ও অশোক চ্যাটার্জির কাছে বৃথা বক্সিং শিখিনি। মুখটা চট করে সরিয়ে নিয়ে উল্টে একটা ঘুষি মারলাম পুরো জোরে।

ফলে রক্তপাত হল । ভিড় জমে গেল । দমবার ছেলে নই । মারামারিতে যখন বাধ্য করেছে তখন ফলভোগ করতেই হবে । সুকুমার ও তার বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখল মামা হাতাহাতি ছেড়ে ঘুষোঘুষি করছে এক ইংরেজের সঙ্গে ।

অবশেষে সাহেবকে মাটিতে ফেলে তার বুকে চড়ে বসলাম । দ্বন্দ্বের শেষ হল । লজ্জায় ও অপমানে লোকটার চমক ভাঙল । সব লোকের আমার প্রতি সহানুভূতি ছিল, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম । সবাই আমাকে সমর্থন জানাল, আমি উঠে খাবার নিতে চলে গেলাম ।

ছয় বাক্স খাবার নিয়ে টেবিলে খেতে বসলাম । খানিক পরে আশ্চর্য হয়ে দেখি সেই লোকটা সাত বোতল বিয়ার নিয়ে আমার দিকে এগোচ্ছে । আবার মারামারি হবে আশঙ্কা করে আমি আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইলাম । কোনও কথা না বলে সে টেবিলের ওপর বোতলগুলি রাখল এবং আমাকে লক্ষ করে বলল 'আমি কি বসতে পারি'? আমিও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রতা করে বসতে বললাম । ভাবলাম আজকের দিনটা মাটি হয়ে গেল । এমন সময় লোকটা বলল 'আই অ্যাম সরি' তারপর প্রত্যেকের সামনে একটা করে বোতল রেখে বলল 'এসব তোমাদের জন্য এনেছি- আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, আমি সত্যিই দুঃখিত' । আমাদের ঘিরে মস্ত ভিড় জমে গিয়েছিল । কী আর করি লোকটার বাড়ানো হাতে হাত রেখে করমর্দন করলাম এবং তখন জিজ্ঞেস করলাম যে সে ভারতবর্ষে কোনওদিন গিয়েছিল কিনা । খুব গর্ব করে বলল যে সে আসামে এক চা-বাগানে বিশ বছর ম্যানেজার ছিল । তখন আমি ব্যাপারটা বুঝলাম, ভারতবর্ষে তোমার মতো অনেক 'বয়' ছিল- এ কথাটার অর্থ ।

গাওয়ার স্ট্রীটের ভারতীয় ছাত্রাবাস আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করল লাঞ্চ খাবার ও ভ্রমণকাহিনী শোনাবার । অনেকের সঙ্গে আলাপ হল । বিশেষ খুশি হলাম পুরনো ক্লাস ফ্রেন্ডসের দেখা পেয়ে যেমন, অজয় আচার্য (পরে সুবিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার) ও শামসুজ্জোহা, সে উত্তরকালে কলকাতা হাইকোর্টে রিসিভার হয়েছিল । আর দুজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হল যারা আমার সারা জীবনের বন্ধু হয়ে গেল । একজন তুষার রায়, অন্যজন রঞ্জিতকুমার সেন ।

খ্যাতনামা কবি, সুরকার ও ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গেও পরিচয় হল । তিনি আমাকে প্রথম প্রশ্ন করলেন গান গাইতে জানি কিনা । আমি 'না' বলাতে দুঃখিত হলেন । মাঝে মাঝে তাঁর আসরে গান শুনতে যেতাম রঞ্জিত সেনের (টুলুর) সঙ্গে । চরিত্রগুণে অতুলপ্রসাদ সেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম । অমন অমায়িক রুচিসম্পন্ন বুদ্ধিমান লোক কম দেখা যায় । তন্ময় হয়ে তিনি ঠুংরি গান গাইতেন । টুলু সেনকে শেখাতেও তাঁর উৎসাহ খুব ।

আমার বন্ধু চন্দ্রনাথের কৃপায় প্রথম অভিজ্ঞতা হল কয়েকটি বিষয়ে । একদিন সে চেলসি ফ্লাওয়ার শো দেখবার টিকিট কিনে নিয়ে এসে হাজির । ‘এই ফ্লাওয়ার শো’তে একমাত্র ‘ক্রিসানথেমাম’ ফুলই দেখানো হয় । আমি কখনও একসঙ্গে এত ক্রিসানথেমাম দেখিনি ।

পরদিন শনিবার ‘ওয়েমল্বী’তে ফুটবল কাপ ফাইনাল দেখতে গেলাম । ‘স্টেডিয়ামে’র মধ্যে এক লক্ষ লোকের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি । খেলা আরম্ভ হতে প্রায় এক ঘণ্টা বাকি । মাঠের মাঝখানে একটা মঞ্চের ওপর একজন লোক দাঁড়িয়ে । ডান হাতে ছোট একটা সরু লাঠি নিয়ে সবাইকে একসঙ্গে গান ধরতে ইঙ্গিত করল । সব জানা গান, তাছাড়া হাজার হাজার কাগজে ১০টা গান ছেপে বিনামূল্যে সবাইকে বিতরণ করেছিল- আমার কাছেও এক কপি ছিল । এক লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ সমস্বরে গান ধরল- গণসঙ্গীত বা বৃন্দগান যাকে বলে । সব কটা গান হয়ে যাবার পর মঞ্চটা সরিয়ে নিল এবং টটেনহাম হটসপার বনাম বোল্টন ওয়ান্ডারার্সদের খেলা শুরু হল । ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জও এই মাঠে খেলা দেখতে এসেছেন ।

একটা জরুরি টেলিফোন সংবাদে জানলাম চন্দ্রনাথ পরদিন আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে, সাউথ কেনসিংটনের রাশিয়ান রেস্তোরাঁতে । যথাসময়ে দেখা হল ।

‘ওয়েট্রেস’ খাবারের অর্ডার নিতে এল । চনু দুটো বড় হুইস্কির অর্ডার দিল এবং জল বা সোডা না মিশিয়ে একটার পর একটা খেল । আমি হতবাক হয়ে বললাম এই রকম করলে কতদিন শরীর টিকবে? চনু আমার হাত ধরে বলল, মন দিয়ে শোন । আমার কাছে একটা চরম দুঃসংবাদ এসেছে । হার্লে স্ট্রীটের বিশেষজ্ঞ যাঁর চিকিৎসাধীনে সে ছিল অনেকদিন, তিনি জানিয়েছেন যে সাত থেকে দশদিনের বেশি চনু বাঁচবে না, এমনই খারাপ ধরনের টি বি তার গলায় হয়েছে । তখন এন্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়নি, টি বি-র কোনও চিকিৎসাই ছিল না । তবু আমার মনে হল ডাক্তার হয়তো ভুল করছেন । চনুর উচিত বাবা-মার কাছে যথাশীঘ্র চলে যাওয়া । আজকালকার মতো তখন এরোপ্লেন ছিল না । জাহাজে কলকাতা পৌঁছতে অন্তত ২০ দিন লাগত ।

ওয়েট্রেস স্যুপ নিয়ে এল । তার সঙ্গে আমার চোখের জল মিশিয়ে ফেরৎ দিলাম । এই দুঃসংবাদে আমারও আর কিছু খাওয়া হল না । চন্দ্রনাথ তখন ধীরস্থির, সে বুঝেছে মৃত্যু তার দ্বারে । খুব সহজভাবে সে কথাবার্তা বলল এবং অনুরোধ করল যাতে আমি কলকাতায় ফিরে তার বাবা মা স্ত্রীকে সব খবর দিই । বিদায় নিয়েই চনুর বাবাকে একটা লম্বা টেলিগ্রাম পাঠালাম । তিনি টেলিগ্রাফ মানি অর্ডার করে টাকা পাঠালেন এবং টিকিট কিনে দিলেন প্রথম জাহাজে জায়গা রিজার্ভ করে । তিন দিনের মধ্যে লন্ডন ছেড়ে আমার বন্ধু মার্সেলস-এর পথে রওনা হল । মিসেস মীশন ছেলের মতো ভালোবাসতেন চনুকে ।

তিনি ফ্রান্সে গেলেন জাহাজে উঠিয়ে দিতে। যাবার সময় চনু বলল 'এসব তোর কারসাজি, যাক ভালোই করেছিস যদিও আমার বাড়ি পৌঁছবার মতো পরমায়ু আর নেই'। আমি বললাম 'নিশ্চয়ই পৌঁছবি'।

চন্দ্রনাথ তারপর সাত বছর বেঁচেছিল। উত্তরপাড়ার কাছে গঙ্গার ওপর একটা বোটে সে তার বাবার সঙ্গে থাকত এবং যতদিন বেঁচেছিল আমাকে উৎসাহ দিয়ে চিঠি দিয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে।

রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম প্রদর্শনী করবার। একশো ছবি পাঠালাম। দশদিন কেটে গেল ছবিগুলো সাইজ-মাফিক সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠাতে। লোকের ভিড় জমতো ছবি দেখবার জন্য- এক সপ্তাহ পরে ছবি ফেরৎ আনলাম। কার্ডবোর্ড দিয়ে বাঁধাবার পর ছবিগুলো এক বোঝা হয়ে দাঁড়াল।

প্রদর্শনীর দুটো বড় ফল পেলাম। প্রথমটা হচ্ছে যে আমি এ আর পি এস নির্বাচিত হলাম। ফটোগ্রাফির জগতে এটি একটি বিশেষ সম্মান। দ্বিতীয় হচ্ছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ব্রুস, ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় সে কথা আমি আগেই বলেছি। জেনারেল ব্রুস এই সোসাইটির একজন বিশেষ সদস্য আর স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড হচ্ছেন রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। তিনি ইংল্যান্ডের এক কৃতী সন্তান। একাধারে সেনাধ্যক্ষ, লেখক ও পরিব্রাজক। তিনি অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে তিব্বত গিয়েছিলেন। তিব্বতে খুব ঘুরেছেন এবং অপূর্ব বই লিখেছেন। ইংল্যান্ডের মতো দেশে যেখানে যোদ্ধা, অ্যাডভেঞ্চারার, ট্র্যাভেলার বিপুল সংখ্যক সেখানে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি হওয়া অতি সম্মানের। স্যার ফ্রান্সিস এখন বৃদ্ধ। তিনি হিন্দু দর্শনশাস্ত্র নিয়ে মেতে আছেন।

জেনারেল ব্রুসের সঙ্গে সৌহার্দ্য জমে উঠেছিল। তিনি প্রায়ই আমাকে তাঁর বাড়িতে ডাকতেন। আমার মনে হত যেন এক ছোটখাটো ভারতীয় মিউজিয়ামে এসেছি, এত সুন্দর সুন্দর স্ট্যাচুয়েট ও পাথরের ওপর খোদাই করা কাজ চারদিকে ছড়াছড়ি।

স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ডের বাড়িতেও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। এঁর বাড়িতেও নানারকম তিব্বতীয় কারুকার্যে ভরা জিনিসপত্র দেখলাম। লেডি ইয়ংহাসব্যান্ড অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। ধীরে ধীরে কথা বলেন এবং ইয়ংহাসব্যান্ডকে ভগবানের অবতারের মতো সম্মান ও সমীহ করে চলতেন।

রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির মিটিংয়ে মোটামুটি কী বলব এবং কী বললে ভালো হয় সে সম্বন্ধে স্যার ফ্রান্সিস আমাকে তালিম দিলেন।

এক সপ্তাহ পরে সোমবার আমি আমার ভ্রমণের ধড়াচুড়ো পরে সাইকেলে সোসাইটি হলের মিটিংয়ে গেলাম । লোকে লোকারণ্য । ভারতবর্ষের নতুন হাই কমিশনার, স্যার বি এন মিত্র মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আলাপ হল । অফুরন্ত ট্র্যাভেলার-এর সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার ব্রুস আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন । আমার সেদিকে খেয়াল ছিল না । সামনে পরীক্ষায় কেমন করে পাশ করব সেই সম্বন্ধে মনের মধ্যে আলোচনা করছিলাম । একঘণ্টা পরে স্যার ফ্রান্সিস সভাপতি হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক বলে অভিনন্দন জানালেন । বেশিরভাগ লোক ইভনিং স্যুট পরে গিয়েছিল । মনে হল, খুবই গণ্যমান্য । মস্ত বড় হল আলোয় আলো ।

আমি এক রকম কম্পিত বক্ষে সন্ত্রস্ত চিত্তে আমার বক্তব্য শুরু করলাম । গলায় যেন আওয়াজ বেরোচ্ছে না । প্রথমে নিজের কথা নিজেই শুনতে পাচ্ছিলাম না । তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে জোর গলায় বলতে আরম্ভ করলাম । আমরা কত কষ্ট করে মরুভূমি এবং পরে শীতকালে সারা ইউরোপ পার হয়ে এসেছি সে কাহিনী শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল । স্যার ফ্রান্সিস এমন সময় উঠে মাইকে জানালেন যে আমি ভারতবর্ষ থেকে কোনওরকম সাহায্য পাইনি । সবাই আমার বক্তব্য শুনল, আমি পরে কোন পথে কোথায় যাব এবং কবে আন্দাজ বাড়ি ফিরব । আমার বক্তব্যের শেষে স্যার ফ্রান্সিস জানালেন সোসাইটির তরফ থেকে আমাকে ফেলোশিপ দেওয়া স্থির হয়েছে । প্রভূত হর্ষধ্বনি ও হাততালির ভেতর মিটিং শেষ হল ।

প্রশ্নোত্তরের সময় টি শ নামে এক ভদ্রলোক মরুভূমি কোন পথে পার হয়েছি জানতে চাইলেন । আমি বলার পর তিনি বললেন যে মোটামুটি ওই পথে তিনি উটের দল নিয়ে পার হয়েছেন এবং পায়ে হেঁটে বালির ওপর চলার কষ্ট তিনি ভালোরকমই জানেন । সৌদি আরব থেকে তিনি ডের-এর-জোর দিয়ে বাগদাদ গিয়েছিলেন অর্থাৎ আমাদের উল্টোপথে ।

স্যার ফ্রান্সিস ফিস ফিস করে আমাকে বললেন, ইনি হচ্ছেন লরেন্স অব আরেবিয়া । আমি বললাম, আমি আলাপ করে ধন্য হলাম ।

ইংরেজ সুধীজন সমাজে এত উৎসাহ পেলাম যে মনে মনে আরেকবার প্রতিজ্ঞা করলাম যেমন করে পারি এবং যতদিনে হোক আমার ভ্রমণ শেষ করব ।

মিটিং শেষ হল । স্যার ফ্রান্সিস আমাকে ‘শ’-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন । আমি নিমন্ত্রণ পেলাম হ্যাম্পশায়ারে তাঁর কটেজে যাবার ও থাকবার । সে সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল ।

শনিবার বিকেলে ক্রমওয়েল রোডে অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে চা খেতে গেলাম । লখনউয়ের অনেক গল্প হল । সেইদিনই বিকালে দিলীপ রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এবং দুজনে মিলে গান গাইলেন । এমন সময় রঞ্জিত সেনও (টুলু) এল । পরে, ভালো দেশি খাবার ও গান শোনবার ইচ্ছা হলে কতদিন যে টুলু সেনের ফ্ল্যাটে গিয়েছি তার ঠিক নেই ।

একদিন টুলু সেনের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি বার্লিনের নশা সেন । জার্মানি থেকে এম ডি পাশ করে ডাক্তার হয়ে বিলেতে আরও পড়তে এসেছে । আমরা তিনবন্ধু হৈ চৈ করলাম । পরে কয়েকদিনের জন্য বেলসাইজ পার্কে নশার ফ্ল্যাটের পাশেই আমিও একটা ঘর নিলাম এবং সেখান থেকে পিকাডিলিতে ব্যাঙ্কের কাজে যেতাম । আবার সপ্তাহের তিন সন্ধ্যায় রিজেন্ট স্ট্রীট পলিটেকনিকে ফটোগ্রাফি চর্চা করতাম । আমার সময় কোথা দিয়ে চলে যেত তার খেয়াল থাকত না ।

সাউথ কেনসিংটনে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, সায়েন্স মিউজিয়াম এবং ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম দেখে এলাম । কী ভালো লাগল! শেষোক্ত জায়গায় অনেক ভারতীয় চারুকলার সামগ্রী দেখেছি যেমন ইন্ডিয়া হাউস লাইব্রেরিতে দেখেছি ভারতীয় বই, পুথি ও মিনিয়েচার পেন্টিং ।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান । গ্রিক রোমান ও পুরাতন মিশরের অমূল্য প্রত্নতত্ত্বের জিনিসে ঠাসা । অনেক ভাস্কর্য ইত্যাদিও রয়েছে ।

একটু অবস্থাপন্ন ইংরেজের বাড়ি ও কন্টিনেন্টের লোকের বাড়ি যেমনভাবে চিন দেশের শিল্পকলার জিনিস দিয়ে ভর্তি দেখেছি তাতে আমার মনে হত যেন চিন দেশ উজাড় করে এরা ইউরোপে সব নিয়ে এসেছে । এই থেকে বোঝা যায় কী পরিমাণ আর্টসামগ্রী চিন দেশে জন্মেছিল । তার রপ্তানি আজও শেষ হয়নি । কোনও ‘সেল’ দেখতে গেলে প্রথমেই নজরে পড়ে চিন দেশের তৈরি জিনিস অসংখ্য সাজানো রয়েছে বিক্রির জন্য । অনেক চড়া দামে সব বিক্রি হয় । বড় লোকের বাড়ি সাজাবার, বিশেষ অঙ্গ এগুলি । জার্মানিতে ইজিপ্টের চারুকলার কাজও অনেক বাড়িতে দেখেছি ।

রয়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির মারফৎ একটা চিঠি পেলাম । আমার প্রদর্শনী দেখে খুশি হয়ে রাশিয়ান এম্ব্যাসি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে এই কথা জানিয়ে যে আমি যদি রুশ দেশে গিয়ে আমার যা ভালোলাগে তেমন একশো বাছাই ছবি তুলি তবে তার সমস্ত খরচ রুশ সরকার দেবে- খাওয়া-থাকার, তাছাড়া কিছু পারিতোষিকও ।

এই নিমন্ত্রণ পরে কাজে লাগিয়েছিলাম ।

দক্ষিণ কেনসিংটন দিয়ে চলবার পথে একদিন লক্ষ করলাম একটা বড় বাড়ির দরজায় লেখা ইউ আর ওয়েলকাম ।

ইতস্তত করতে করতে বাড়িতে ঢুকলাম । লোকেরা খুব সেজেগুজে ইভনিং ড্রেস পরা, চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আমাকে বিদেশি দেখে সবাই উৎসাহ দেখিয়ে একটা হলে নিয়ে গেল । সেখানে রুশ ভাষায় একটা নাটক হচ্ছিল । হংস মধ্যে বক যথা আমি সাধারণ বেশভূষায় রাশিয়ানদের মাঝে গিয়ে বসলাম । ভাষা বুঝি না কিন্তু এমন একটা হাসির ব্যাপার স্টেজে ঘটল যা দেখে আমিও হাসি থামাতে পারলাম না ।

ইন্টারভেলের সময় পাশের মেয়েটি আমাকে হাসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল আমি রুশ ভাষা জানি কিনা । না বলাতে তার উৎসাহ না কমে বেড়ে গেল । মেয়েটির নাম নীনা মেজকি, তার মার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল । ক্রিকেট খেলার বিখ্যাত মাঠ ওভালের কাছে তাদের বাড়ি । আমাকে তাদের বাড়ি নেমন্তন্ন করল ।

নীনারা আসলে হোয়াইট রাশিয়ান । রুশ বিদ্রোহের সময় এরা দেশ ছেড়ে **১৯১৭** সালে পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে ।

সেদিন রাশিয়ান এমিগ্রের দল পুনর্মিলন উপলক্ষে একত্র হয়ে হাসি গান থিয়েটার নাচ ইত্যাদিতে যোগ দিয়েছিল ।

থিয়েটার শেষ হবার পরই হল ঘর থেকে সব চেয়ার সরিয়ে দিয়ে, নাচ শুরু হল । নীনা আমাকে নাচের জায়গায় নিয়ে গেল । আমি খুব সহজেই নাচতে আরম্ভ করলাম । নীনা ছিল আনা পাভলোভার নাচের দলের একজন ব্যালে ডান্সার । দেখতে একটুও সুন্দর নয় কিন্তু ফিগার ভালো । আমার সঙ্গে ভাব হবার পর অনেক নিমন্ত্রণে তাকে নিয়ে নাচতে গিয়েছি । নীনা আমাকে আনা পাভলোভার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় । তাঁর মুখে উদয়ের প্রশংসা শুনলাম । উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে বললেন যদি সুযোগ পাই ।

নীনার মার কাছে রুশ চলিত ভাষা শিখতে আরম্ভ করলাম ।

সাউথ কেনসিংটনে থাকতে অনেক বন্ধু হয়েছিল । ৬ জুন বন্ধুরা বলল 'ডার্বি' ঘোড়দৌড় দেখতে যাবে এবং সেটা আমার যাওয়ার ওপর নির্ভর করছে । ওদের ধারণা আমি নিশ্চয় ঘোড়ার রেস সম্বন্ধে সব কিছু জানি যেহেতু খবরের কাগজের স্পোর্টসের পাতায় ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে লেখা আমি রোজ পড়ি । কিন্তু আমি কখনও রেস খেলিনি বা রেসের মাঠে যাইনি । ঘোড়া আমি ভীষণ ভালোবাসি । তাদের গতিবিধি আমি লক্ষ করি । কাগজে দেখি কে কত জোরে দেড় মাইল দৌড়চ্ছে- কোন ঘোড়ার বাবা এবং মা কে । তারপর জকিদের ইতিহাস মুখস্থ করা আমার রোগ বিশেষ ।

কাদ্রি নামে এক বন্ধুর গাড়িতে আমরা পাঁচজন নিউ মার্কেটে এপসম ডার্বি রেস দেখতে গেলাম ।

বন্ধুরা পকেট ভর্তি টাকা এনেছিল বাজি খেলার জন্য কিন্তু আমি বললাম কেবলমাত্র একটি রেসে আমি টাকা ফেলব, কেননা আগা খাঁর ঘোড়া বার্হামের রেকর্ড আমার খুব মনোমত এবং তার জকি, হ্যারি র্যাগও ভালো । সেদিন অন্য একটি ঘোড়া জিতবে এমনই মাঠের খবর । লক্ষ লক্ষ টাকা তার ওপর লোক ঢালল । আমি আমার ও বন্ধুদের টাকা নিয়ে বার্হাম-এর ওপর খেললাম । প্রথম দিকে খুব ভালো দাম ছিল । সাধারণের বিশ্বাস ফেয়ার প্রে জিতবে- বার্হাম জিতবে না সেজন্য দর ছিল এক টাকায় একশো টাকা ।

দারুণ উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে ডার্বি দৌড় শেষ হল । বার্হাম জিতল । টাকা নেবার বেলায় মাত্র আমরা দুজন বুকির কাছে গেলাম । আমার প্রত্যেক বন্ধু পঁয়ষট্টি পাউন্ড পেল পাঁচ পাউন্ডের পরিবর্তে, প্রায় হাজার টাকা । তখন বন্ধুদের আহ্লাদ ধরে না । তারা ঠিক করল আমি নিশ্চয় পাকা জুয়াড়ি, কিন্তু আমি ঠিক তার উল্টো । আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম কখনও খেলতে যাব না । ডার্বিতে যাওয়া শুধু একটা অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ।

টাকা তুলতে গিয়ে দেখি অন্যজন মিঃ এফ জি হোয়াইট । সে আমারই বয়সী, কলকাতায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে আমার বস ছিল ।

আমরা পরস্পরকে দেখে খুবই আনন্দিত । পকেট ভর্তি টাকা পুরে হোয়াইট বলল আর সে খেলবে না । আমারও সেই মত । ওদিকে পরের রেস খেলার ঘণ্টা বাজল । বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করা সত্বেও আমি তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম না । তারা মনমরা হয়ে রেস না খেলে চারদিক ঘুরে দেখতে লাগল । হোয়াইট তাদের কাছ থেকে আমাকে নিয়ে মাঠের বাইরে এল ।

আমি খেলাধুলা করতাম বলে দেশে থাকতে হোয়াইটের সঙ্গে আমার ভাব ছিল । সেখানে সে পদমর্যাদা বজায় রেখে চলত । এখানে সবাই স্বাধীন, সবাই সমান । বরং সে এমনভাবে ব্যবহার করতে লাগল যেন আমি তার এক পুরনো বন্ধু ।

পথে সে একটা টুথ ব্রাশ কিনল দেখে আমি বললাম ওটা কী হবে? হোয়াইট হেসে বলল তোমার জন্য । এই উইক-এন্ড তুমি আমার সঙ্গে কাটাবে এবং তোমার কাছে আমি ভ্রমণকাহিনী শুনব । সঙ্গে আমার কাপড়চোপড় কিছু নেই, তবে কি আমি এক কাপড়ে দুদিন কাটাব? হোয়াইট বলল তুমি আর আমি এক কাঠামোর, দেখো আমার কাপড়-জামা সব তোমার ফিট করবে ।

উইম্বলডন কমনের ওপর খুব সুন্দর বাড়িটা । হোয়াইট বাড়ি পৌঁছেই এক ভদ্রমহিলাকে চট করে আসতে বলল । তার নাম জ্যানি, এর সঙ্গে শীঘ্রই তার বিয়ে হবে,

তারপর দুজনে ভারতবর্ষে যাবে চাকরিস্থলে ।

জ্যানির স্বভাবটা ভালো, হোয়াইট আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল । তার এর আগে কোনও ভারতীয়র সঙ্গে পরিচয় হয়নি; অথচ ভারতবর্ষে বহু বছরের জন্য থাকতে যাবে হোয়াইটের সঙ্গে- এই অবস্থায় আমাকে দেখে বা পেয়ে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করল ।

চায়ের টেবিলে জ্যানি মাঝখানে এবং আমরা দুই পাশে দুজন বসেছি হঠাৎ জ্যানি আমার এবং হোয়াইটের হাত ধরে বলল, আমাদের বন্ধুত্ব যেন চিরদিন থাকে । আমার এই রকম সহৃদয় ব্যবহার খুব ভালো লাগল ।

ডার্বিতে জেতার আনন্দে আমরা দুজনে ভরপুর । বহু রাত পর্যন্ত তিনজনে গল্প করলাম, তারমধ্যে আমিই বেশি বক বক করেছি ।

পরদিন প্রাতরাশ খেয়ে আমরা ঠিক করলাম কিউ গার্ডেন্স (বোটানিক্যাল) দেখতে যাব । এত সুন্দর বাগান আর এত বড়- এর আগে কখনও দেখিনি । চারদিকে ফুল আলো করে রয়েছে । বেড়াতে বেড়াতে যেখানে লাইলাক ফুল রাশি রাশি ফুটে রয়েছে সেখানে গেলাম । প্রথমেই সে অপূর্ব দৃশ্য দেখে মনে পড়ল;

কাম টু কিউ

কাম টু কিউ

লাইলাক টাইম

কলিং ইউ ।

-কীটসের কবিতাটি । বেশিরভাগ ইংরেজ রেসে একগাদা টাকা জিতলে অন্তত এক পিপে মদ খেয়ে ফেলত । হোয়াইট তাদের মতো নয় । কেবলমাত্র ডিনারের সঙ্গে ফরাসি মদ খাওয়াল । হোয়াইট আমার গোমাংস খাওয়া দেখে অবাক । আমাকে বলল যে সে আমার জন্য অন্য কিছু রাঁধতে দিতে ভুলে গেছে । আমি ঠাট্টা করে বললাম যে তার মতলব ছিল আমার জাত মারবার । হোয়াইট আরও বলল যে ভারতবর্ষে সে মুরগি খেয়ে খেয়ে হয়রান হয়ে গিয়েছে- তাই বিলেতে এলে সুস্বাদু গো-মাংস খায় । আমি স্বীকার করলাম যে আমি যখন যা পাই তা খাই । খাওয়ার সঙ্গে জাতের কোনও সম্বন্ধ নেই । তাছাড়া আমি জাতিভেদও মানি না ।

জ্যানি বুঝল না আমরা কী বিষয়ে আলোচনা করছিলাম । হোয়াইট তাকে বলল যে যখন ভারতবর্ষে যাবে তখন সহজেই সব বুঝতে পারবে ।

রবিবার রাতটা মনে হল গল্প করেই কাটবে বসবার ঘরে । রাত একটার সময় আমি মনে করিয়ে দিলাম যে পরের দিন অর্থাৎ সোমবার আমাকে মিডল্যান্ড ব্যাঙ্কে চাকরিতে

যেতে হবে। জ্যানি তখন আমাকে অনুরোধ করল আরও দুয়েকদিন তাদের সঙ্গে কাটাতে, কিন্তু সেটা সম্ভব হল না। বললাম মিস চ্যানিং তাহলে পুলিশে খবর দিয়ে সার্চ পার্টি পাঠাবেন।

যা হোক আমি কথা দিলাম যে পরের শনিবার আসব উইক-এন্ড কাটাতে। সোমবার সকালে যখন হোয়াইট আমাকে ব্যাঙ্কে পৌঁছে দিল- আমি তাকে ভেতরে নিয়ে ম্যানেজার, মিঃ রলফ-মিচেল ও অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম।

পরের উইক-এন্ডও হোয়াইট ও জ্যানির সঙ্গে কাটালাম। তারপর আবার দেখা হয়েছিল দশ বছর পরে। দেশে ফিরে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রাজামুন্দ্রি ব্রাঞ্চে তখন আমি গিয়েছি- সে সব অনেক পরের কথা।

হ্যাম্পস্টেড হিথে একদল যুবক ছিল তারা প্রতিদিন সকালে হিথের মাঠে চার মাইল দৌড়ত। আমি তাদের দলে ভিড়লাম। লর্ড আইভির একটা সুন্দর বাড়ি আছে হিথের গভীরে। সেই বাড়ির আর্ট গ্যালারি দেখবার মতো। অনেক মাস্টার্সদের অরিজিন্যাল পেন্টিং আছে। এসব এই পরিবারের নিজস্ব কালেকশন। আইভির বাড়ির সামনে আমরা দশ মিনিট বিশ্রাম করে আবার বাকি পথ দৌড়ে বাড়ি ফিরতাম।

আমার অনেক ভালো ভালো উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তারা কেউ কেউ কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত। কেন জানি না কোয়েকাররা আমাকে আপনার লোক মনে করে তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করত এবং প্রায়ই খাওয়াত। কোয়েকাররা সকলেই উচ্চমনা এবং পরোপকার ব্রতসাধন করে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় এরা বিদেশীয় কি ভারতীয় কি নিগ্রোর মধ্যে কোনও পার্থক্য করত না। বরং মনের ভাবটা এই রকম যে সর্ব জাতির লোকের সঙ্গে মেশো, সবাইকে ভালোবাসতে শেখো।

মিস্টার ও মিসেস কিং খুব ধনী কোয়েকার। হ্যাম্পস্টেড হিথে তাঁর প্রকাণ্ড বাগান ও টেনিস কোর্টওয়ালা বাড়ি। নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়ে দেখি ষোলটি নানা দেশীয় যুবক-যুবতী টেনিস খেলতে গিয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি নিগ্রো ছেলে ও একটি মেয়ে। ভারতীয় আমি একা। বাকি সব কন্টিনেন্টাল ও আমেরিকান- তাছাড়া জন ও জেন কিং নামে তাদের ছেলেমেয়েও ছিল। একটা কোর্টে এতগুলি লোকের ভিড়। তবু আমি এক সেট খেলতে পারলাম।

এক শনিবার প্রাতরাশ সেরে ওয়েস্টমিনিস্টারে টেম্স নদীর ওপর স্টিমারে বেড়াতে গেলাম। দিনটা সুন্দর। নদীর ধারে ধারে কত লোক বসে লাঞ্চ খাচ্ছে বা পিকনিক করছে।

গ্রের এলিজি যে চার্চ নিয়ে লেখা সেটা দেখতে গেলাম । তারপর উইন্ডসর কাসল । এই কাসলের ভেতর সাধারণের প্রবেশ নিষেধ । রাজা রানি সেদিন কাসলে এসেছিলেন । লন্ডনে তাঁরা যখন হাঁপিয়ে ওঠেন তখন নদীর ধারে খোলামেলা এই জায়গায় রাজপরিবার চলে আসেন ।

একদিন পার্লামেন্ট ও ওয়েস্টমিনিস্টার এবী দেখতে গেলাম । পাশেই 'বিগ বেন' ঘড়ি । নদীর ওপর পার্লামেন্ট বাড়িটা । ফুটপাথের ধারে 'বডিসিয়ার' একটা পাথরের মূর্তি, অবশ্য কাল্পনিক ।

সেদিন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল । ভোরে যথারীতি লন্ডন হ্যারিয়াস দলের ছেলেদের সঙ্গে দৌড়তে বেরিয়ে গেলাম । হিথের পথ উঁচু-নিচু । ছুটতে ছুটতে কখন গর্তে পা ফেলেছিলাম খেয়াল নেই, ছিটকে পড়লাম এবং বিষম চোট খেলাম । বন্ধুরা তুলে ধরল । আমি তাদের সবাইকে বিদায় দিয়ে জন কিং-এর কাঁধে ভর করে বাড়ি চলে এলাম ।

কুঁচকিতে খুব ব্যথা । অসহ্য যন্ত্রণায় দুপুরে অতি কষ্টে চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালে গেলাম । একটা ইনজেকশন দিয়ে ২৪ নম্বর ফ্রি বেডে ভর্তি করে নিল ।

একজন আইরিস নার্স ছিল, তার তত্ত্বাবধানেই আমি ছিলাম । নার্সের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল, ভদ্র পরিবারের মেয়ে । অত্যন্ত ভদ্র এবং সৌজন্যপূর্ণ তার ব্যবহার । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কী হয়েছে? নার্স বলল, তুমি আছাড় খেয়েছ ঠিকই, তারপর কী হয়েছে সেটা এখন গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । পরদিন বড় সার্জেন এসে আমাকে পরীক্ষা করে সব শুনলেন এবং বললেন যে খুব সম্ভবত দুটো বড় বড় অস্ত্রোপচার করতে হবে । আমার মত জানতে চাইলেন । আমি বললাম যে আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করবেন । ডাক্তার আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনে খুবই আশ্চর্য ও আগ্রহান্বিত হয়ে বললেন যে মরুভূমিতে বালি ঠেলে ঠেলে চলে এবং ভারি মাল বয়ে 'গ্রয়েন' ফুলেছে এবং ব্যথা হয়েছে । দেখলে মনে হবে হার্নিয়া হয়েছে, কিন্তু তা নয় । অস্ত্রোপচার না করলে বিপজ্জনক হবে । দুপায়েই ভীষণ ব্যথা ।

সার্জেন বললেন, যে দুদিন পরে যখন এফ আর সি এস পরীক্ষা হবে, আমাকে পরীক্ষার্থীদের দেখাতে চান । পরদিন যন্ত্রণার মধ্যে কাটল । ইনজেকশন দিয়ে পরে ব্যথা কমল । সোমবার সকালে হাসপাতালের ব্রেকফাস্ট খাবার পর একটা ট্যাক্সিতে চারজন রোগীকে রয়্যাল কলেজ অব সার্জেন হলে পাঠানো হল । বুঝলাম সবকটা কেসই হেঁয়ালিপূর্ণ, আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তা নয় । ডাক্তার ঠকাবার কলকাঠি বলা চলে ।

বড় হলঘরের চারদিকে রোগীদের রাখা হয়েছিল । বিখ্যাত সার্জেনরা হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, যেমন পরীক্ষার্থীরা আসছে, তাদের রোগীদের কাছে পাঠাচ্ছেন । পরীক্ষার্থীরা ঠিক

জবাব দিলে ফেলোশিপ পাবে। না হলে আবার পড়, আরও পড়। আমার মনে হল এটাও একটা জুয়াখেলা।

পরীক্ষা হয়ে গেল। আমরা একটা ট্যাক্সিতে চারজনে হাসপাতালে ফিরে এলাম। আমাদের পারিশ্রমিক হিসাবে প্রত্যেককে একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট দিল। কিছু টাকা লাভ হল।

পরদিন আমার অপারেশন হল দুই পায়েই। যখন জ্ঞান হল শুনলাম আমার দুই পায়ে দশ ইঞ্চি করে অপারেশন হয়েছে। খুব যত্নের সঙ্গে নার্স আইলিন আমার সেবা করছিল। হঠাৎ মনে হল বিদেশে সবার অগোচরে যদি আমার জীবন শেষ হয়, কেউ জানতেও পারবে না কী হয়েছিল এবং কোথায় বা গেলাম। রোগশয্যায় শুয়ে মা বাবা ভাই বোনের কথা বারবার মনে পড়ছিল। দেখতে দেখতে দশদিন কেটে গেল। দুপায়ের সেলাই খুলে দিল। দুদিন পরেই আমি বাড়ি চলে যাব। কিন্তু পায়ে এত ব্যথা যে চলতে ফিরতে কষ্ট হচ্ছিল। যেদিন হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে ঠিক তার আগের দিন ভিজিটিং সময়ে দেখি আমার পরিচিত তুষার রায় হাতে এক ঠোঙা আঙুর নিয়ে রোগীদের মাথার কাছে নম্বর দেখে যেন কাকে খুঁজছে। পাছে আমায় দেখে ফেলে তাই মুখের ওপর চাদরটা টেনে ঢাকলাম।

আমার খাটের নম্বর ২৪ দেখে তুষার থমকে দাঁড়াল, তারপর আমার সামনে এসে মুখ থেকে ঢাকা সরিয়ে ফেলল। সে যে আমাকেই খুঁজছে এবং আমারই জন্য হাসপাতালে এসেছে সে কথা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল। খানিকক্ষণ গল্প করার পর তুষার চলে গেল এবং অফিস থেকে জেনে গেল কবে কখন আমাকে ছেড়ে দেবে।

আমি প্রমাদ গুনছিলাম যে ছাড়া পেয়ে হ্যাম্পস্টেডের বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটে উঠব কেমন করে। নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতাল আমাকে ছেড়ে দিল। চলতে পারি না। ফুটপাথের ওপর স্ট্রেচারে শুয়ে ট্যাক্সি ডেকে দিতে অনুরোধ করলাম নার্স আইলিনকে, সামনেই ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। উঠে দেখি ট্যাক্সির ভেতর তুষার রায়- সে হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে তুলল। আমি তো অবাক। আমার অবাক মুখের দিকে চেয়ে তুষার বলল যে সে হাসপাতালের অফিস থেকে শুনেছে আমার দুই পায়ের ১০ ইঞ্চি করে অপারেশন হয়েছে। অনেকদিন পর্যন্ত আমি চলাফেরাও করতে পারব না। ততদিন তুষারের গোল্ডার্স গ্রিনের বাড়িতে থাকব।

আমার মস্ত সমস্যার সমাধান করল তুষার। আমি মনে মনে খুব তারিফ করে ভাবলাম এত অল্প পরিচয়ে কোনও মানুষ আজকাল অন্যের কথা চিন্তা করে না। বেশ পরিষ্কার পাড়া, ‘উডল্যান্ডস’-এর বাড়িতে উঠলাম।

কিছুকাল পরে আবার একটু একটু করে চলতে আরম্ভ করলাম। পড়াশোনা করবার পক্ষে এটা ছিল প্রশস্ত সময়। যে দেশে বেলা তিনটের সময় শীতের দিনে সূর্যাস্ত হয় সেখানে এখন গরম, রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত দিনের আলো। একদিন নার্স আইলিন দেখতে এল।

কলকাতায় আগে একবার আমার ওপর বড় রকমের অস্ত্রোপচার হয় ইডেন হাসপাতালে। সেখানের বন্দোবস্ত, ব্যবহার ও খাওয়া-দাওয়া চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালের সঙ্গে তুলনা করা চলে, সেদিনের ইডেন হাসপাতালও এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল।

অপারেশনের পর দুমাস কেটে গেল। এখন অনেকটা চলতে পারি। রোজ রাত্রে দুই-তিন মাইল হেঁটে ঘুরে বেড়াই। যদিও এখনও দুপায়ে ব্যথা আছে এবং কোনও ভারি জিনিস তুলতে পারি না।

ছ-মাস পরে আমি পূর্বের সহজ অবস্থায় ফিরে গেলাম। সুবিধা পেলে অক্সফোর্ডে ভাগ্নের কাছে যাই। এত সুন্দর পুরনো শহর, এত ভালোভাবে রয়েছে দেখলে চোখ জুড়ায়। অনেক বড় বড় কলেজ চারদিকে। ইংরেজরা মনে করে ছেলে যদি অক্সফোর্ডে পড়তে পায় তো ভাগ্যের কথা, মেয়েদের জন্য মাত্র দুটি কলেজ। আমি বোট রেস দেখতাম আইরিস নদীর ওপর। আশপাশে অনেক সুন্দর বেড়াবার জায়গা ছিল, সেগুলো আবিষ্কার করতে ভালো লাগত। অক্সফোর্ডের সঙ্গে ভালোবাসার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

লন্ডনে ফিরে গেলাম এ আই বি (অ্যাসোসিয়েট অব দ্য ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কার্স) পরীক্ষা দিতে। পাশ করলাম।

আফ্রিকায় ঘুরতে যাব বলে আমি মেম্বার হলাম স্যার হোরেশ প্ল্যাঙ্কেট ফাউন্ডেশনে। সেখানে খুব ভালো লাইব্রেরি ছিল, অবসর মতো গিয়ে পড়তাম। এদিকে রবীন্দ্রনাথ লন্ডনে পৌঁছেছেন। একটা খুব ভালো বাঙালি হোটেল ছিল- রেজিনা। সেখানে উঠেছেন। দেখা করতে গেলাম। আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে তিনি কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। আমি বলেছিলাম কবির 'দুরন্ত আশা' পড়ে আমার দুরন্ত বাসনা হয় পৃথিবী দেখবার, তবে যখন সত্যি সত্যি আরব বেদুইনের সঙ্গে দিন কাটালাম তখন বুঝলাম বাস্তবের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য অনেক। বাস্তব অনেক রূঢ়।

রথীবাবু ও প্রতিমাদেবী কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁরা আসার পর রবীন্দ্রনাথ আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, রথী দেখেছ তোমার সঙ্গে বিমলের আশ্চর্য মিল আছে। আমি দেখলাম যে কয়েকটা বিষয় অন্তত সত্যিই মিল আছে। আমরা দুজনে একই রকম লম্বা, দুজনেরই রং ভালো, দুজনেরই চোখ কোটরগত। রথীবাবু খুশি মনেই আমার পাশে

এসে হাত ধরলেন । তিনি অনেকদিন এই কটি কথা মনে রেখেছিলেন এবং আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন ।

বললাম যে আমি 'গীতাঞ্জলি' সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছি এবং সেটি বাইবেলের মতো সর্বত্র আমার সঙ্গে ঘুরছে । কবিগুরু আমার কাছে আমার সামনে এক বিরাট পুরুষ । এই কথাগুলি তাঁকে শোনাতে পারব আমি ভাবিনি । তিনি খুশি হলেন এবং একটু হাসলেন । অসামান্য সুন্দর কবির মুখে যেন অপার্থিব রূপ দেখলাম । মনে মনে ভাবলাম এরকম সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুপুরুষ আগে কখনও কোথাও দেখিনি । দেখলেই সান্নিধ্য কামনা করতে ইচ্ছা হয় । কোটি কোটি লোকের ওপর এই আশ্চর্য, দেবতুল্য মানুষের প্রভাব পড়ছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন ।

কবিগুরু বললেন রথী, একটা চয়নিকা নিয়ে এস । সেই বইটি আমাকে উপহার দিলেন এবং আশীর্বাণী লিখলেন । আমার জীবনে একটি পরম মুহূর্ত কবির সামনে দাঁড়িয়ে । বলা বাহুল্য যে বইখানি আমার খুব প্রিয় । অনেক নিঃসঙ্গ দিন ও রাত্রের একমাত্র সঙ্গী ছিল সেটি । কবি আরও বললেন আমাকে, শান্তিনিকেতনে এস যখন দেশে ফিরবে । বহু বছর পরে আবার দেখা হল । তখন আমি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম । বয়সের ভারে কবি তখন নুয়ে পড়েছেন । আমার স্ত্রীকে প্রথমেই বললেন তোমার কর্তাকে জিজ্ঞেস কর, আগে আমি তার মতোই লম্বা ছিলাম কিনা ।

আমার মধ্যে দুটো অদম্য বাসনা ছিল- পৃথিবী ভ্রমণ ও শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করা ।

উডল্যান্ডস-এর বাড়িতে ফিরে একটা চিঠি পেলাম বি এস এ কোম্পানির বড় কর্তার কাছ থেকে । কমান্ডার হার্বাট হচ্ছেন বি এস এ বার্মিংহাম কারখানার কর্ণধার । তিনি ৪টে সাইকেল নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন আমাদের দেবার জন্য ১৯২৬ সালে । কমান্ডার হার্বাটের সঙ্গে মিডল্যান্ড ব্যাঙ্কের (১৯৬ পিকাডিলি) ম্যানেজার রলফ মিচেল-এর খুব ভাব । তাঁরা দুজনেই বার্মিংহাম শেলী ওক-এর কাছাকাছি বাসিন্দা । কমান্ডার হার্বাট আমাকে নিয়ে একটা মিটিং করতে চান যদি ভবিষ্যতে আমার ভ্রমণে কোনও সাহায্য হয় ।

যখন আবার ভ্রমণ শুরু করব তখন তো যাবই বার্মিংহামে । এটা হচ্ছে ট্যুরের বাইরে । একদিন পরেই রওনা হবার জন্য ইউস্টন রেলওয়ে স্টেশনে হাজির হলাম । আমাদের দেশে যেমন সময় হাতে নিয়ে ট্রেন ধরে আমিও তেমনই আধঘণ্টা আগে স্টেশনে পৌঁছলাম । কোনও ভিড় নেই । একটা ইঞ্জিন ট্রেনটাকে টেনে নিয়ে এসেছিল, সেটা সামনেই পড়ল । গাড়িতে উঠে জানলার ধারে বসলাম, ইঞ্জিনের দিকে মুখ করে । এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা আমার সামনের সিটে বসলেন । আমাকে বললেন যে আমি যদি কিছু

না মনে করি তো তিনি আমার সঙ্গে জানলার ধারে জায়গা বদল করবেন, কেননা তিনি ইঞ্জিনের দিকে পিছন ফিরে চলতে পারেন না। আমি তৎক্ষণাৎ জায়গা বদল করে বসলাম। খানিকক্ষণ পরেই বুঝলাম যে ভদ্রমহিলার ভুল হয়েছে- যে ইঞ্জিনটা দেখে তিনি জায়গা বদল করলেন সেটাতে মাত্র ট্রেনটাকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দিয়েছে। আসল ইঞ্জিন যেটা বার্মিংহামে আমাদের নিয়ে যাবে সেটা ১০-১৫ মিনিট পরে আসবে এবং ট্রেনের সামনে জুড়বে। তখনও অনেক সময় ছিল ভাবলাম আসল ইঞ্জিন যখন জুড়বে তখন আরেকবার জায়গা বদলের পালা শুরু করা যাবে। ভদ্রমহিলা রীতিমতো স্থূলাকৃতি ছিলেন। একমনে সেলাই করতে লাগলেন, আমি একটা উডহাউসের মজার বই পড়ছিলাম।

প্যাসেঞ্জাররা সব এক এক করে আসছে। এদেশে ট্রেনে জায়গার অভাব হয় না সচরাচর। ট্রেন ছাড়বার দুমিনিট আগে এলেও সবাই জায়গা পায়।

দু-চার মিনিট এমনই কাটল। তারপর এক বীভৎস কাণ্ড ঘটল। অন্য একটা ট্রেনের ব্রেক খারাপ হওয়ার ফলে অদূরে লাল সিগন্যাল দেখেও গাড়ি থামানো গেল না। জোরে এসে ট্রেনটা আমাদের ট্রেনে ধাক্কা মারল। আমি হঠাৎ বিকট শব্দ শুনলাম কাচ ভাঙার, কাঠ ভাঙার ও লোহা ভাঙার। ট্রেনের কামরাগুলো চুরমার হতে হতে তালগোল পাকিয়ে স্টেশন পার হয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছল। আমার সামনে মোটা ভদ্রমহিলার দেহ নিমেষে আমার মুখের ওপর আছড়ে পড়ল। গাড়ির দেয়ালগুলো একটার পর একটা জুড়ে ও ভেঙে গিয়েছিল। চিন্তা করবার কোনও অবকাশ ছিল না। আমি অন্ধকারে অচৈতন্য অবস্থায় ট্রেনের নিচে তলিয়ে গেলাম।

দুঘণ্টা পরে যখন জ্ঞান হল আমি বুঝতে পারলাম রেলের লাইনের ওপরে মাথা রেখে শুয়ে আছি। ওঠবার চেষ্টা করলাম, দেখি আমার একটা পা আটকে আছে উঠতে পারব না। একজন ভদ্রলোক আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন ভয় পেয়ো না। তোমাকে বার করার ভার আমার। কয়েক মিনিটের মধ্যে এসিটিলিন টর্চ (কাটার) হাতে একজন লোক এল। আগুন দিয়ে লোহা কাটবার আগে আমার পায়ের দুপাশে দুটো বড় বড় জ্যাক দিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোহা কাটা হল। অতি সন্তর্পণে আমার পা ছাড়িয়ে আমাকে টেনে তুলল এবং স্ট্রেচারের ওপর শোয়াল। পাশের স্ট্রেচারে চেয়ে দেখি সেই ভদ্রমহিলা যিনি আমার সঙ্গে সিট বদল করেছিলেন। দেহে প্রাণ নেই, মাথার আঘাত সাংঘাতিক, মুখের দিকে চাওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে একজন লোক এসে আমার নাম ধাম ও টিকিট নম্বর সব জেনে লিখে নিল। যাবার সময় বলল টিকিট সাবধানে রাখতে এবং কাউকে না দিতে।

প্ল্যাটফর্মে কতক্ষণ শুয়েছিলাম স্ট্রেচারের ওপর খেয়াল নেই । আমার মনে হচ্ছিল একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় আমি জড়িয়ে পড়েছি এবং আমি বেঁচে আছি শুধু এই জ্ঞান আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল মাঝে মাঝে । খুব ব্যথা মাথায় ও সর্বাঙ্গে টের পাচ্ছিলাম । মাঝে মাঝে ঘুমিয়েও পড়ছিলাম । ইতিমধ্যে অবশ্য আমায় ব্রান্ডি খাইয়েছে এবং ইনজেকশন দিয়েছে ।

হঠাৎ মনে পড়ল পরদিন সকালে বার্মিংহামে মিটিং-এর কথা । প্ল্যাটফর্মের অপর দিকে একটা ট্রেন দাঁড়িয়েছিল সেটা বার্মিংহাম যাত্রী । আমি বোধহয় প্রকৃতিস্থ ছিলাম না । স্ট্রেচার ছেড়ে ট্রেনের একটা কামরায় উঠলাম । অল্পক্ষণের মধ্যে ছেড়ে দিল । যাত্রীরা আমাকে শোবার জায়গা ছেড়ে দিল- ঘুমিয়ে পড়লাম ।

বার্মিহামে পৌঁছবার পরই পুলিশ আমাকে খুঁজে বের করল এবং অ্যাম্বুলেন্স-এ চড়িয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালে । ইউস্টন স্টেশন ছেড়ে চলে যাবার পরই আমার খোঁজ পড়েছিল ।

কেউ হয়তো বলেছিল আমি বার্মিংহাম-এর ট্রেনে উঠেছি । তৎক্ষণাৎ বার্মিংহাম পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছিল ট্রেনে আমার খোঁজ করতে এবং হাসপাতালে ভর্তি করতে ।

হাসপাতালে ঢুকেই বললাম, আমার খিদে পেয়েছে । তাড়াতাড়ি গরম স্যুপ ও অন্যান্য খাবার এল । খেয়ে-দেয়ে মনে হল আমি খুব জোর বিপদ থেকে বেঁচে গিয়েছি! নার্স এসে আবার ইনজেকশন দিল । বড় ডাক্তার পার্ডি এসে আমাকে দেখে গেলেন ।

ডাঃ পার্ডি একজন ভারতীয় নামকরা ধনী ডাক্তার । তিনি বললেন হার্বার্টের সঙ্গে তাঁর ভাব আছে । আমার সঙ্গে যে মিটিং হবার কথা ছিল, সেটা বাতিল হয়ে গেল । ডাঃ পার্ডি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে তুললেন । গৃহিণী ইংরেজ এবং কোমল স্বভাবের । বাড়িটা প্রকাণ্ড, প্রায় প্যালেসের মতো ।

খুব সুখে তিনদিন কাটিয়ে লন্ডনে ফিরলাম । মাঝে মাঝে মাথায় যন্ত্রণা হয় তাও অল্পক্ষণের জন্য । প্রকাণ্ড অ্যাক্সিডেন্টে সম্পূর্ণ অক্ষত ফিরে আসব এমন আশা করা ভুল । এল এম এস রেলওয়ের একজন লোক এসে আমাকে একশো পাউন্ডের একটা চেক ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিল ।

বেশ সুস্থ বোধ করছি কিন্তু এখনও সাইকেল চালাবার উপযুক্ত হইনি । কুঁচকিতে এখনও ব্যথা ।

হেনলি নামে একটা জায়গায় গেলাম রেগাটা দেখতে । রোয়িং আমার প্রিয় । পৃথিবীর নানা দেশ থেকে রোয়িং-পারদর্শী যুবকেরা এসেছে । দারুণ উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে প্রতিযোগিতা হল । জার্মান ছেলেরা দুটি খেলায় জিতল । ইংরেজদের মতো স্পোর্টস,

অ্যাডভেঞ্চার ও ভ্রমণ-প্রিয় স্ত্রী পুরুষ খুব কম দেখেছি । স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে কত পরিবার রোয়িং দেখতে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই । তাই বড় হলে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলার ভক্ত হয় ।

আমার নিজের জীবনে দেখেছি ইংরেজরা আমাকে ভ্রমণে বেরোতে যত উৎসাহ দিয়েছে ঠিক তেমন আর কোনও দেশের লোকের কাছে পাইনি । সেটা না পেলে সব আশা ছেড়ে, দেশে ফিরে যেতাম । লক্ষ করেছি যে যখন আমি পৃথিবী-পর্যটক বলে পরিচয় দিয়েছি তখন আমি একজন কেউকেটা, তার বাইরে আমি অতিসাধারণ কালা আদমিদের একজন । আজকাল ভারতীয়দের প্রতি যেমন ইংরেজ জাতির বিরূপ ভাব ১৯২৮ সালে তেমন কিছু ছিল না । আগে বন্ধুর দল ছেলেমেয়ে সবাই কত নাচের হলে গিয়েছি এবং মিউজিকের তালে কত নেচেছি । মেয়েরা সবাই ইংরেজ বা কন্টিনেন্টাল । মনে হয় না ১৯৭৮ সালে সেটা আর সম্ভব ।

জেনেরাল ইলেকশন দেখলাম । খুব শান্তির সঙ্গে শেষ হল । কনসার্ভেটিভরা হারল এবং লেবার গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হল । ভারতীয়দের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দাবি সম্পর্কে এরা সহানুভূতিশীল ।

কোচবিহারের মহারানি সুনীতি দেবীর সঙ্গে আলাপ হল । প্রতি রবিবার যতদিন তিনি লন্ডনে ছিলেন, নিজের বাড়িতে সকালবেলায় উপাসনা করতেন । আমারও সেখানে যাবার ইচ্ছা হল ।

প্রথম যৌবনে আমি খুব ধর্মপ্রাণ ছিলাম । প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা প্রাণায়াম, আহ্নিক ইত্যাদি করতাম । সেই জন্যই পৃথিবীর নানা দেশে ঘোরবার সময় বিভিন্ন ধর্মমত বোঝবার চেষ্টা করেছি । হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা আমার কাছে খুবই খারাপ লাগত ।

রবিবার সকালে সুনীতি দেবীর প্রার্থনা শুনতে গেলাম । সুন্দর বলবার ক্ষমতা, পিতা কেশব সেনের কাছে পেয়েছেন । উপাসনার সময় দেখেছি তাঁর মুখ ধর্ম ও শান্তভাবে উদ্ভাসিত । খুব ভালো লাগল ।

আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল । প্রায়ই দুপুরে তাঁর বাড়িতে খেতে যেতাম ।

প্রার্থনার সময় অতুলপ্রসাদ সিংহ ব্রহ্মসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত, কখনও কখনও অতুলপ্রসাদের গানও হত । ঘরোয়া বৈঠকে অতুলপ্রসাদের গান ভালোই লাগত । ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অলক্ষে আকৃষ্ট হলাম ।

কিছুদিন পরেই রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রিস্টলে যাওয়ার তোড়জোড় হল । এক ট্রেনভর্তি বাঙালি চললেন । আমার গাড়িতে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ও স্যার আলবিয়ান ব্যানার্জি ছিলেন । গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল,

তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রসদয়ের সঙ্গে আমার ভাব ছিল বলে । স্যার আলবিয়ান একজন ভারত-প্রসিদ্ধ লোক । মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান হিসেবে সুনাম করেছেন । পাশের গাড়িতে বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহতাব ও আরও অনেক স্বনামধন্য লোকেরা চলেছেন ।

ট্রেন সোজা ব্রিস্টল স্টেশনে থামল । শহরের মেয়র আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন । সবাই রাজা রামমোহনের স্মৃতিস্তম্ভের কাছে যেখানে তাঁর ভস্ম রক্ষিত হয়েছে, সেখানে গেলাম । ব্রিস্টলবাসী অনেক লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন । প্রথমে স্যার আলবিয়ান ও পরে গুরুসদয় মহাশয় রাজা রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর চরিত্রের মহত্ব ও বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন ।

এই স্মৃতিসভায় ব্রিস্টলের মেয়র ও গুরুসদয় দত্ত মহাশয় রাজার স্বাদেশিকতা বোধের কথা বললেন । আমরা নীরবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম । রামমোহনের স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে পড়ল রুপার্ট ব্রুক-এর একটা কবিতার অনুকরণে এক কলি- 'হিয়ার ইজ এ কর্নার অব ইংল্যান্ড হুইচ ইজ ফর এভার ইন্ডিয়া ।'

দুপুরে ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটি দেখতে গেলাম । তার আগে এই শহরের লোকেদের আয়োজিত ভোজে যোগ দিলাম । ইংরেজ গুণগ্রাহী, তাই রামমোহনের মতো একটি অসাধারণ ভারতীয়ের স্মৃতিবাসরে তারাই উদ্যোক্তা হয়ে আমাদের এত লোককে খাওয়াল । রামমোহন যেখানে থাকতেন সেই বাড়িটি দেখতে গেলাম । বাড়িটিতে এখন ছোট ছেলেদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে ।

লন্ডনে একদিন রাসেল স্কোয়্যারের ধারে পঙ্কজ গুপ্তর সঙ্গে দেখা । সে কলকাতায় আমার বাড়ির কাছে চায়ের দোকান 'বেলভিউ'তে (হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের সংযোগস্থলে) রীতিমতো আড্ডা দিত । অনেক স্পোর্টসম্যানদের 'বেলভিউ' রেস্তোরাঁতে দেখেছি । আমার সঙ্গে পঙ্কজ গুপ্তর ভাব ছিল ।

১৯২৮ সালে, পঙ্কজ গুপ্ত হকি খেলোয়াড়ের একটি দল নিয়ে প্রথমবার অলিম্পিকে লড়তে এসেছিল । রয়্যাল হোটেলে সবাই ছিল । সে আমাকে নিয়ে গেল তাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য । প্রথমেই ধ্যানচাঁদকে ডাকল- তারপর এক এক করে সবার কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিল । কলকাতায় আমি যখন টাউন হল থেকে বিদায় নিই তখন পঙ্কজ গুপ্ত সেখানে উপস্থিত ছিল । পঙ্কজ গুপ্তর বয়স বড় জোর তখন পঁচিশ হবে কি আরেকটু বেশি । এই একটি লোক ভারতবর্ষের হকি খেলার উন্নতি সাধনের জন্য প্রাণপাত করেছে । হকির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তার নাম লেখা থাকবে ।

সেই দিনই 'লন্ডন ইলেভেন' বনাম ভারতবর্ষ খেলা দেখতে গেলাম 'মার্টন এবি' গ্রাউন্ডে । দুঃখের বিষয় ভারতীয়রা খালি পায়ে খেলার জন্য ও বিশেষ করে পনেরো দিন

জাহাজের দোলা খেয়ে সবাই একটু আধটু টলমল করছিল, এক গোলে হারল। পরদিন কম্বাইন্ড ব্রিটিশ টিমের সঙ্গে খেলা। আমরা প্রমাদ গুনলাম, কিন্তু ভারতীয় দল অনায়াসে অনেক গোলে জিতল। হকি জগতে ধ্যানচাঁদ নামে এক নতুন সূর্যের উদয় হল সেদিন। অবলীলাক্রমে দৌড়বার সময় তার হকিস্টিকে বল যেন সেঁটে থাকত। সে ইচ্ছামতো গোল করতে পারত। সমস্ত পৃথিবীর লোকেরা মুগ্ধ হয়ে ধ্যানচাঁদের খেলা দেখেছে এবং তারিফ করেছে বহু বছর ধরে।

পাঁচদিন পরে অলিম্পিক খেলার জন্য অ্যামস্টার্ডামে ভারতীয় দলের উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন কিন্তু চারজন খেলোয়াড়ের 'ফ্লু' দেখা দিল। ডাক্তার ওষুধ ও চিকিৎসা চালাতে আরম্ভ করল, তাদের পরিবর্তে নতুন খেলোয়াড় দলে নিতে হবে। কে খেলবার উপযুক্ত এবং কাকে পাওয়া যাবে, তার কোনও স্থিরতা নেই। পঙ্কজবাবু বললেন, হকি খেলোয়াড় যারা লন্ডনে বা কাছাকাছি আছে তাদের নাম দিতে। আমি নীরেন দে ও জয়পাল সিংহের নাম বললাম। পঙ্কজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমি আমার নামটা বাদ দিলাম কেন। যদি দিতাম তো আমার জীবনের ধারা হয়তো বদলে যেত। হকি খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরে যেতে হত। পৃথিবী ভ্রমণ আমার কাছে তখন এত বড় ধ্যান জ্ঞান যে তার পরিবর্তে আর কিছু চাইতাম না। সে কথা পঙ্কজবাবুকে জানালাম। সে এক মুখ পান ঠুসে বলল যে জয়পাল যখন এসে যাচ্ছে তাকে দিয়েই কাজ হবে। নীরেন দে-কে (পরে অ্যাডভোকেট জেনারেল অব ইন্ডিয়া) জানানো হয়েছিল কিনা জানি না। জয়পাল নিজেই জানিয়েছিল লন্ডনে আসছে সেই দিনই। তিনদিন পর দেখা গেল সব খেলোয়াড় প্রায় সেরে উঠেছে এবং একজন ছাড়া অ্যামস্টার্ডামে সকলেই খেলতে পারবে। তার স্থান নেবে জয়পাল।

আমি সুবর্ণ সুযোগ ছাড়তে চাইনি। আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে ভারতের জয় জয়কার দেখে লন্ডনে ফিরলাম।

তারপর পৃথিবীতে হকি খেলার অনুশীলন চলতে লাগল। ভারত বহু বছর পুরোভাগে ছিল, এমনকি দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তান জন্মাবার পরেও।

লন্ডনে বিখ্যাত আলবার্ট হলে সুবিধা পেলেই আমি যেতাম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টরা সেখানে নাচ, গান ও বাজনায় আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছেন। একবার ক্রাইশলার বেহালা বাজাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি বারো বছরের ছোট ছেলে, নাম 'ইহুদি মেনুহিন'। ক্রাইশলারের বেহালা শোনবার জন্য ছয় মাস আগে টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। বিরাট হলে ৫,০০০ লোকের ভিড়। আমি ও ডাঃ শচীন ঘোষ দুটো ভালো জায়গায় বসবার সিট পেয়েছিলাম। বহু লোক থামের আড়ালে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না কিন্তু শুনতে পাচ্ছিল। ক্রাইশলার আশ্চর্য সুন্দর বেহালা বাজালেন। পাশে একটি তরুণী

আমার কাঁধের ওপর দিয়ে খুব দেখতে চেষ্টা করছিল ক্রাইশলারকে । আমি তখন তাকে নিজের সিট ছেড়ে দিলাম, আমি তো খানিকক্ষণ দেখেছি এই কথা বলে । ভদ্রমহিলাটি খুব আপত্তি জানালেন আমার জায়গা নিতে, শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে না পেরে আমার চেয়ারে বসলেন অনেক ধন্যবাদ দিয়ে । কথার উচ্চারণে বুঝলাম তিনি বিদেশিনী, আমেরিকান । ইন্টারভ্যালের সময় আরেকবার চেয়ার ফেরৎ দেবার কথা হল, আমি কান দিইনি ।

অপেক্ষাকৃত লম্বা বলে আমি স্পষ্ট দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম । ক্রাইশলারে বেহালা শোনবার পর মুহুর্মুহু হর্ষধ্বনি ও হাততালি দিয়ে শ্রোতারা তাঁকে উৎসাহিত করল । সবাই থামল যখন তিনি বললেন যে সঙ্গে একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছেন, নাম ‘ইহুদি মেনুহিন’- সে ক্রাইশলারের রচিত মিউজিক ও অন্যান্য মিউজিক বেহালায় বাজিয়ে শোনাবে । সবাই উৎসুক হয়ে ছোট্ট ছেলেটিকে দেখছিল ।

মেনুহিন আধ ঘণ্টা বেহালা বাজাবার পর আবার বিপুল করতালি শোনা গেল । ক্রাইশলার বললেন, আমি আজকের মিউজিক শুনে এক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, এই বালক একদিন জগদ্বিখ্যাত বেহালা বাদক হবে । সত্যিই তাই হয়েছে ।

আমি ও ডাঃ ঘোষ ভিড়ের থেকে বেরিয়ে সোজা কোনসিংটন গার্ডেনসের দিকে (হাইডপার্কের একাংশ) ওপেন-এয়ার রেস্তোরাঁ লক্ষ করে চললাম । জানি ভিড় হবেই আর তখন বসবার জায়গা পাব না । একটা টেবিলে আমরা দুটো চেয়ার অধিকার করলাম । বাকি দুটো চেয়ার খালি রইল অন্যদের জন্য । জায়গাটা খুব সুন্দর । চারদিকে বড় বড় গাছ, পায়ের নিচে সবুজ ঘাস । গ্রীষ্মের পড়ন্ত রোদমাখা দিন ছিল । চায়ের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছি । তখন প্রায় সব টেবিল ভর্তি লোক ।

আমরা দুজনেই লক্ষ করলাম যে মেয়েটিকে আমি বসবার জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলাম আলবার্ট হলে, সে একটা খালি চেয়ারের জন্য খোঁজাখুঁজি করছে । খুঁজতে খুঁজতে আমাদের সামনের চেয়ার খালি দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল এবং খুব হাসতে হাসতে বলল এবার তোমাকে জায়গা ছাড়তে হবে না । এই চেয়ার তো খালি বলে বসে পড়ল আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না রেখে । একটু পরেই খাবার এবং চা এল । ভদ্রতার খাতিরে ইয়ং লেডির জন্য আরও অর্ডার দিয়ে যা ছিল ভাগ করে খেতে আরম্ভ করলাম ।

তখনও পর্যন্ত আমরা কেউ কারও নাম জানি না । ভদ্রমহিলা পরিচয় দিতে বলল তার নাম মিস হেলেন পাইস, বাড়ি ফোর্টডজ শহরে, আমেরিকায় । পেশা লেখিকা । নিউইয়র্কে একটা ছোটদের পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে হয়, বয়স ২২-২৩ হবে । সুশ্রী দেখতে, লাজুক ধরনের । কথাবার্তায় আমেরিকান টান ছিল ।

আমরা নিজেদের পরিচয় দিলাম। আমার পরিচয় বলতে একমাত্র যাযাবর। বন্ধু শচীন ঘোষ, ডেন্টাল সার্জারি পড়ে, আমারই বয়সী। আমরা তিনজনেই কাছাকাছি বয়সের, ভাব হল সহজেই। অনেকক্ষণ গল্প হল। বিদায় নেবার সময় আমাদের প্রভূত ধন্যবাদ দিয়ে হেলেন তার বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ জানাল পরের সপ্তাহে।

লন্ডনের বাইরে বার্ক হেমস্টেড ছোট্ট জায়গা- না শহর না গ্রাম। বন্ধুর সেদিন হাসপাতাল ডিউটি ছিল, সেজন্য আমি একাই হেলেনের বাড়ি পৌঁছলাম। ছোট টিলার ওপর সুন্দর জায়গায় বাড়িটা। বাড়ির মালিক ইংরেজ আর্মি অফিসার, মেজর আর্মস্ট্রং, ভারতবর্ষে কাজ করে অনেক জায়গায় ঘুরেছেন এবং তারপর এখন অবসরপ্রাপ্ত।

খুব উৎসাহ করে মেজর চায়ের সরঞ্জাম ও খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন হেলেনকে সাহায্য করবার জন্য। কালা আদমি দেখে উৎসাহটা কমে গেল মনে হল, হতে পারে আমার কল্পনা। ভারতবর্ষ থেকে সাইকেলে ভূপর্যটনে বেরিয়েছি শুনে মেজরের আমার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেল। বলল, কী চমৎকার ব্যাপার, আমার ইচ্ছা হচ্ছে ভূপর্যটনে যোগ দিতে তোমার সঙ্গে। উৎসাহের চোটে আমাকে ডিনার খেয়ে যেতে বলল। সেটা সেদিন সম্ভব নয় বলে, পরের সপ্তাহে চা ও ডিনারের নেমন্তন্ন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

আলাপ হবার পর দেখলাম যে মেজর আর্মস্ট্রং লোকটি মন্দ নয়। সে ভারতবর্ষে জীবন কাটিয়েছে ঠিকই কিন্তু কোনও ভারতীয় ভদ্র সন্তানের সঙ্গে তার আলাপ হবার সুযোগ হয়নি। আর্মি তখন চাইত না যে অফিসাররা জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করে। হেলেনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আমাদের তখন দেখলে বিশ্বাস হত না যে মাসখানেক আগে আমরা কেউ কাউকেও চিনতাম না।

আমরা নানা দেশীয় রেস্তোরাঁতে খেতে ও থিয়েটার দেখতে ভালোবাসতাম। ইংরেজ জাতির এটা সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশেষ দিক। 'ওল্ড ভিকে' শেক্সপিয়ারের বই দেখতাম। তারপর 'শ্লোন' থিয়েটারে বার্নাড শর প্লেও দেখেছি।

একদিন আমি লক্ষ করলাম যে হেলেনের শুকনো মুখ ও বিমর্ষ ভাব। খাবার নেমন্তন্ন আগের মতো গ্রহণ করল না। একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়, জিজ্ঞাসা করলাম বার বার কিন্তু কোনও সঠিক জবাব পেলাম না। বলল যে দেশ থেকে ভালো খবর আসছে না, ব্যস ওই পর্যন্ত। আমার হঠাৎ মনে পড়ল যে ইংরেজি একটা খবরের কাগজে দেখেছিলাম আমেরিকায় একটার পর একটা ব্যাঙ্ক ফেল করছে এবং যারা আমেরিকান 'লেটার অব ক্রেডিট বা ট্র্যাভেলার্স চেক' নিয়ে বিদেশে গিয়েছে তারা পথের ভিখারির মতো অবস্থায় পড়েছে।

হেলেনের ব্যাপারটা তখন বুঝলাম । তার ট্র্যাভেলার্স চেক লন্ডনে অচল । বাড়িতে টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠিয়েছে কিন্তু সাড়া পাচ্ছে না । বোধহয় তার মা ও বোন গ্রীষ্মের ছুটিতে কোথাও বেড়াতে গিয়েছে তাই খবর পৌঁছয়নি । মেজর আর্মস্ট্রং-এর কাছে বহু টাকা পড়ে গেছে বলে সে খুব লজ্জিত । আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আমেরিকায় ফিরে যেতে তার আপত্তি আছে কিনা এবং জাহাজ ভাড়া সমেত তার ধার মোট কত টাকা ।

খুব অনিচ্ছাসত্বে সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল । লজ্জায় মুখ লাল । আমি একদিন পরেই জাহাজের টিকিট নিয়ে বার্ক হ্যামস্টেডে উপস্থিত হয়ে হেলেনের হাতে টাকা দিলাম । সে আপত্তি করল না । মেজরকে তার প্রাপ্য টাকা দিতে সেও খুশি হল । চায়ের পর আমরা দুজন লুটন হিলসের ওপর বেড়াতে গেলাম । সূর্য অস্ত যাবার পরেও আমরা অনেকক্ষণ গল্প করলাম । কেমন করে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দুজনের এত ভাব জমে উঠেছিল সেকথা বারবার মনে হচ্ছিল । জীবনের ও যৌবনের ধর্মই বোধহয় এইরকম, মনের মিল হলে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার সহজ হয়ে যায় ।

১৫ দিন পরে আমি টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফারে হেলেনের কাছ থেকে পেলাম সমস্ত টাকা ও সেইসঙ্গে হেলেন ও তার মা-বোনের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা চিঠি আর আমেরিকায় পৌঁছলে প্রাইসদের বাড়িতে থাকবার নিমন্ত্রণ । পরে এদের কথা আরও লিখব যখন আমেরিকায় পৌঁছব ।

সেই সময় বাঙালি কবি, কামিনী রায় লন্ডনে উপস্থিত হলেন । গাওয়ার স্ট্রীটে ছাত্ররা একদিন তাঁর সম্মানার্থে মিটিং ডাকল । কয়েকদিন পরেই সরোজিনী নাইডু লন্ডনের লাইসীয়াম ক্লাবে ‘মহিলাদিগের জন্য’ বলবার জন্য আহূত হলেন । তাঁর বিষয় ছিল রাউলেট অ্যাক্টের প্রতিবাদ । অপ্রীতিকর বিষয় হলেও মিসেস নাইডুর আশ্চর্য সুন্দর করে বলবার ক্ষমতায় তাতে তিক্ততা রইল না । আমরা ক্যাক্সটন হলে তাঁর বক্তৃতা শোনবার সুযোগ পেলাম ।

১৯৩১-এর গ্রীষ্মে ইংল্যান্ডে সাড়া পড়ে গেল গান্ধীজি আসছেন । একদল ছাত্রের সঙ্গে আমি মার্সেলসে গেলাম গান্ধীজিকে অভ্যর্থনা জানাতে । সেই সময় আমি কয়েকটি ছবি তুলেছিলাম গান্ধীজির । একটা ছবি কিস্টোন কোম্পানি কিনে আমাকে অনেক টাকা দিল যার ফলে আমার যাতায়াতের খরচ উঠে গেল । লন্ডনে পৌঁছবার পর আমি অনেকবার গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম । ভারতবর্ষের লোকেরা বিশ্বাস করত গান্ধীজি দেশকে স্বাধীন করতে পারেন, সে যেমন করেই হোক । সবাই উদগ্রীব হয়েছিল ইংরেজ গভর্নমেন্টের আলাপ আলোচনার ফলাফল জানবার জন্য । ইংল্যান্ড তখন হয়তো ভেবেছিল রাজনীতির চালে আরও বেশ কিছুদিন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভ ঠেকিয়ে রেখে দিতে পারবে । কেবল কথার পরে কথার মারপ্যাঁচ- হিন্দু-মুসলমান দুটো দল খাড়া করে

ইংরেজরা আমাদের লড়িয়ে দিল- আমরাও যথারীতি লড়তে আরম্ভ করলাম । এই সুযোগে ইংরেজ ভেবেছিল সুখে রাজত্ব এবং দোহন চালাবে । গান্ধীজি একটি কথায় সব বানচাল করে দিলেন 'আই শ্যাল গিভ দ্য মুস্লিমস অব ইন্ডিয়া এ ব্ল্যাঙ্ক চেক' অর্থাৎ আমি মুসলমানরা যা চায় তাই দেব । গান্ধীজির কথা লিখতে গেলে আমার গল্প আর ফুরোবে না, তাই এই পর্যন্ত ।

আমি আরেকজন মহাপুরুষকে জেনেছিলাম যিনি গান্ধীজির মতো সর্বত্যাগী, সাধারণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন । তাঁর নাম ডাঃ এলবার্ট সোয়াইৎজার । আমার একজন সুইশ বন্ধু, হানস মেটলার একদিন আমাকে ধরে নিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে আলাপ করাবার জন্য । আমিও আলাপ করে মুগ্ধ । অনেকাংশে গান্ধীজির সঙ্গে ডাঃ সোয়াইৎজারের সাদৃশ্য রয়েছে । একদিন হানসের সঙ্গে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে তাঁর 'অর্গান' বাজানো শুনতে গেলাম । সত্যিই অপূর্ব বাজালেন । বাক-এর মিউজিকের তিনি শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ।

ডাঃ সোয়াইৎজার আমাকে দেখলেই গান্ধীজির কথা শুনতে চাইতেন । তিনি গান্ধীজিকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন । একদিন বললেন যে রাজনীতিবিদ লোক সাধু হতে পারে আগে তিনি তা বিশ্বাস করতে পারতেন না ।

একজন ইংরেজ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে আমি একটা আধুনিক শিল্পগোষ্ঠী ও লেখকের দলে যোগ দিলাম । সবাই তরুণ-তরুণী । কেউ লেখে, কেউ ছবি আঁকে বা ভাস্কর্য করে । প্রতি শুক্রবার একজন কারও বাড়িতে বৈঠক বসে । আমি ছিলাম এই দলের বাইরে থেকে আলোচনা শোনবার শ্রোতা । ম্যাকডোনাল্ড নামে একজন কবি এবং ডানলপ নামে একজন পেন্টার কিছুটা খ্যাতি লাভ করছিল তখন, আজ পঞ্চাশ বছর পরে তাদের কারও নাম তো আর পাই না । এক শুক্রবারের সন্ধ্যায় আমার ওপর হুকুম হল যে ভারতীয় ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করতে হবে । আমি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করলাম । মানে বোঝালাম যত দূর পারলাম । সকলেই তখন একমত যে বাংলাভাষা খুব ছন্দমধুর, অনেকটা নাকি ফরাসি বা ইতালীয় ভাষার মতো ।

আগেই বলেছি আমার লন্ডনে আসার প্রথম দিকে ভাব হয়েছিল নীনার সঙ্গে । সে আমাকে নিয়ে গেল এক রবিবার সকালে পাভলোভার বাড়িতে । তিনি তখন নিজে কসরৎ করছিলেন তার সঙ্গে সঙ্গে দুটি মেয়েকে ও একটি ছেলেকে তালিম দিচ্ছিলেন । আমাদের দুটো চেয়ারে বসবার ইঙ্গিত করে নাচতে লাগলেন । আমি মুগ্ধ হয়ে বিনা খরচে নাচ দেখলাম ।

এই সম্পর্কে মনে পড়ল আরেক নৃত্য পটিয়সীর কথা । মাদাম আর্জেন্টিয়া- স্প্যানিস ডান্সার, জগদ্বিখ্যাত নাচিয়ে । দুই হাতে কাঠের কাস্টিনেট নিয়ে যখন নাচতেন তখন মনে

হত গানের কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ।

ভিয়েনা থেকে টেলিগ্রাম পেলাম আমার এক জাঠতুতো ভাই বিদ্যুৎ মুখার্জির কাছ থেকে যে সে লন্ডনে আসছে প্যারিসের পথে । ভাষার অসুবিধার জন্য সে চেয়েছিল যে আমি প্যারিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি এবং তাকে লন্ডনে নিয়ে আসি । এত অল্প সময় হাতে ছিল যে তাড়াতাড়ি লন্ডন, ডোভার, ক্যালের পথে প্যারিসে গেলাম । ভাই বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট এবং আমার স্নেহের পাত্র । আমাকে প্যারিসে দেখে বিদ্যুৎ যেন অকূল সমুদ্রে কূল পেল । ঠিক করলাম দুয়েকদিন প্যারিসে থেকে লন্ডনে ফিরে যাব । একটা এগজিবিশন হচ্ছিল প্যারিসে তার নাম ‘কলোনিয়াল এক্সপোজিসন’, আমরা দেখতে গেলাম । সে এক অপূর্ব আলোর ইন্দ্রপুরী তৈরি হয়েছিল আলোর মালা দিয়ে । প্রথমেই আঙ্কোরভাট মন্দির দেখতে গেলাম । ভারতবর্ষের বাইরে যত হিন্দু মন্দির আছে এটি তাদের মধ্যে বৃহত্তম । কাম্বোজ দেশে আসল মন্দিরের এটি প্রতিলিপি, তার এক-চতুর্থাংশ ভাগ হিসাবে তৈরি । এমনই ফরাসি কৌশলে তৈরি যে দিনে রাতে হাজার হাজার লোক মন্দিরের ওপরে এবং ভেতরে চলাফেরা করছে অথচ কেউ বুঝতে পারছে না যে এটি আসল মন্দির নয়, নকল মাত্র । নিখুঁত কারুকার্য ও ভাস্কর্য পাথরের ওপর ফুটিয়ে তুলেছিল । রাত্রে তাদের ওপর ফ্লাড লাইট দিয়ে একেবারে দিনের মতো করেছিল ।

আঙ্কোরভাট দেখে ঠিক করে ফেললাম যে কম্বোডিয়াতে গিয়ে আসল মন্দির দেখব । কিছুদিন আগেই এই মন্দির আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা সুন্দর বই পড়েছিলাম । বইটির নাম 'Four faces of Shiva' । অজন্তা গুহা যেমন হঠাৎ শত শত বছর পরে আবিষ্কৃত হয় ঠিক তেমনই এবং প্রায় একই সময়ে আঙ্কোরভাটেরও সন্ধান মেলে ।

আঙ্কোরভাট মন্দির দেখে এবং ফরাসি সুস্বাদু খাবার খেয়ে মনটা খুশিতে ভরে গেল । তারপর কাছেই একটা প্যান্ডেলের সামনে বিজ্ঞাপন দেখলাম Dance of Hindu Gods and Godesses. The wonder dancer, Uday Shankar ইত্যাদি ।

দুটো টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম । প্রথমেই এক সুইশ ভদ্রমহিলা আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কে এবং কোনও ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারি কি না । ভদ্রমহিলার নাম মিস এলিস বোনার । উদয়শঙ্কর যে আজ পৃথিবী জোড়া নাম করেছে তার গোড়াপত্তন করেন ইনিই ।

নাচ শেষ হলে মিস বোনার আমাকে নিয়ে গেলেন উদয়শঙ্করের সঙ্গে পরিচয় করাতে এবং নাচ কেমন লাগল তা বলতে । তেমন ভালো লাগেনি সেদিন যেমন পরে তার নাচ আমায় নেশার মতো পেয়ে বসেছিল । সে রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সেদিন তাই করতে পারিনি । এ সম্বন্ধে পরে লিখব সবিস্তারে ।

উদয়শঙ্কর আমাকে প্রথমেই নিকট আত্মীয়ের মতো গ্রহণ করেছিল । আমার সম্বন্ধে কারও কাছে হয়তো সে শুনেছিল, তাই সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রশংসা করে বলল যে পরদিনও নাচ দেখতে এবং একসঙ্গে খেতে । তিমিরবরণ, বিষ্ণুদাস শিরালি, তার ভাই রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র এবং রবিশঙ্করের সঙ্গেও আলাপ হল । আমাকে একটা বই দিল পড়ে পরদিন ফেরৎ দেবার জন্য । মূল্যবান বইটার নাম 'মিরর অব জেস্টাস' -আনন্দকুমার স্বামীর লেখা । আরও দুজনের সঙ্গে আলাপ হল, একজন উদয়শঙ্করের কাকা এবং অন্যজন মামা, কাকা হলেন কনকলতার বাবা । এদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোনও না কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে, বলা উচিত একাধিক বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে । তার ওপর নাচতে পারে, কাকা ছাড়া সবাই । আমি এরকম মিউজিক-লাভিং ফ্যামিলি কখনও দেখিনি । নাচিয়ে রবীন্দ্রশঙ্কর তখন বারো বছরের ছেলে এবং ভবিষ্যতে জগদ্বিখ্যাত সেতার বাদক রবীন্দ্রশঙ্করকে সেদিন 'রবু' বলে জানলাম । দ্বিতীয় দিনে বইটা পড়ার পর দেখলাম সত্যিই উদয়শঙ্করের নাচ খুব ভালো লাগল । প্রথম দিনে আরেকজন আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল । তার নাম সিমকি । ফরাসি দেশের মেয়ে । অপূর্ব ভারতীয় নাচ শিখেছে উদয়শঙ্করের শিক্ষাগুণে । সিমকি ভালো পিয়ানো বাজাতে পারত । দলে আরও কয়েকজন মিউজিশিয়ান ছিল । সবাই যুবক ও উৎসাহী । বইটা ফেরৎ দিতে গেলাম উদয়শঙ্করকে । প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল এবার নাচ কেমন লাগল । আমি বললাম ভীষণ ভালো । সেইদিন থেকে আমাদের মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল । সবার সঙ্গে 'তুমি'র সম্বন্ধ হল ।

নাচের সময় উদয়শঙ্করের দলের অনেকগুলি ছবি তুলেছিলাম । পরে ওরা যখন লন্ডনে নাচতে এল তখন কয়েকটি ছবি বিক্রি করে টাকা পেলাম । উদয়ের পরের ভাই, রাজেন্দ্রশঙ্করের খুব ফটোগ্রাফি শেখার ইচ্ছা । আমরা দুজনে একসঙ্গে অনেক ছবি তুলেছি এবং আলোচনা করেছি । রাজেন্দ্র ভালো লেখা-পড়া করেছিল এবং সাহিত্যানুরাগী ছিল । আমার খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল । পণ্ডিত রবীন্দ্রশঙ্কর, তখনকার 'রবু' আমাকে আপন দাদার মতো দেখত এবং দেখা হলেই ভ্রমণকাহিনী শুনতে চাইত । মাতুল তিমিরবরণ, শিরালিও আমাকে স্নেহের চোখে দেখত ।

লন্ডনে ফিরে এলাম বিদ্যুৎকে নিয়ে । হ্যাম্পস্টেডে একটা বাড়িতে তার থাকবার ব্যবস্থা করলাম ।

প্যারিসে গিয়ে দুটো লাভ হয়েছিল: উদয়কে আবিষ্কার করা ও মাদাম কুরির দর্শন লাভ ।

লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের সভ্য হিসাবে সেখানে প্রায়ই যেতাম । এখনই আমার ভ্রমণকাহিনী বলার পর অনেক বিদেশি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল । তাদের মধ্যে একটি মেয়ে ছিল যার গায়ে খুব জোর এবং বুদ্ধিদীপ্ত মুখ । নাম মিস এঞ্জেলা গেস্ট,

বাবা একজন সোসালিস্ট মেম্বার অব পার্লামেন্ট । সামান্য সুযোগ পেলেই এঞ্জেলা দাঁড়িয়ে উঠে সোসালিজম বা কমিউনিজম সম্বন্ধে লেকচার দিত ।

পরে এঞ্জেলা গেল স্পেনে মুক্তিযোদ্ধাদের একজন হয়ে । কিছুদিন ফ্রাঙ্কোর দলের সঙ্গে লড়াই করেছিল, তারপর বন্দুকের গুলিতে নিহত হয় । আমার আরেকটি ইংরেজ বন্ধু ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রাণ দিল । বহুদিন পরে একটি ফরাসি যুবকের সঙ্গে আমেরিকায় বসে আলাপ করবার সময় কথায় কথায় এঞ্জেলা ও অন্য যুবকটির মর্মন্তুদ কাহিনী শুনেছিলাম । ফরাসি যুবকটি জখম হয়ে পিরেনিশ পাহাড় পার হয়ে ফ্রান্সে ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়, তাই তার প্রাণ রক্ষা হয় ।

আমারও খুব ইচ্ছা হয়েছিল একবার 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে' যোগ দিয়ে স্পেনে লড়তে যাবার । কিন্তু পৃথিবী ভ্রমণ আমার সমস্ত মন-প্রাণ জুড়ে ছিল । সেই উদ্দেশ্য ত্যাগ করে আর কোনও অ্যাডভেঞ্চার বরণ করবার ইচ্ছা আমার ছিল না । কতবার ভেবেছি মাউন্টেনিয়ারিং শিখব এবং দেশে ফিরে 'মাউন্ট এভারেস্ট'-এর শৃঙ্গে উঠব । সুইজারল্যান্ডে ভ্রমণ করবার সময় সে সুযোগ আমি দুহাতে আঁকড়ে ধরেছি এবং অল্প প্রশিক্ষণ থাকা সত্বেও পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় উঠেছি ও নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি ।

রোজ কয়েক মাইল করে হেঁটে হেঁটে দুপায়ের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিলাম । সাইকেলটা নিয়ে রোজ খানিকক্ষণ চড়তাম যতদিন পর্যন্ত না বুঝলাম যে আমি চলবার উপযুক্ত হয়েছি ।

একদিন ওয়েলস বেড়াবার ইচ্ছায় বেরিয়ে পড়লাম । দক্ষিণ ইংল্যান্ডের হ্যাম্পসায়ার, ডরশেটসায়ার, ডেভনসায়ার খুব সুন্দর সাজানো কাউন্টি । ছোট ছোট পাহাড় কার্পেটের মতো ঘাস দিয়ে মোড়া । প্রথম প্রথম দিনে ৪০-৫০ মাইলের বেশি যেতাম না । হ্যাম্পসায়ারে একটা ঠিকানায় উপস্থিত হলাম । সামনেই মিস্টার শ, যিনি 'লরেন্স অব আরেবিয়া' নামে বিখ্যাত । তিনি একটা মোটর সাইকেল সারাচ্ছেন দেখলাম । ওভার-অল পরা কালিঝুলি মাখা কিন্তু সহজেই চেনা যায় । 'রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি'র মিটিংয়ে অল্প সময়ের জন্য দেখা ও আলাপ হয়েছিল । যা হোক আমার কথা তাঁর মনে ছিল । প্রথমেই আরবি ভাষায় সম্বোধন করলেন 'তুমি আমার বন্ধু ।' আমি হেসে উত্তর দিলাম । দুজনে দুকাপ কফি নিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করার পর আমি বিদায় নিলাম । 'শ' অল্পদিন পরেই মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় মারা যান ।

সোয়ান্সি পৌঁছলাম । বড় শহর, ওয়েলসের রাজধানী বলা চলে । কাছেই অনেক কয়লার খনি আছে তা স্পষ্টই বোঝা যায় । ওয়াই এম সি এ-তে উঠলাম । একদিন বিশ্রাম নিয়ে উত্তর ওয়েলসের দিকে চলতে আরম্ভ করলাম । মধ্য ওয়েলসে না গেলে

বোঝা যায় না দেশটা কত সুন্দর । পাহাড়, উপত্যকা, গাছপালা, হ্রদ, নদী-নালা আর বড় বড় নামের গ্রাম জোড়া দেশ । সব নামের আগে ‘হলান’ দেওয়া যেমন হলানবেরিশ, হলানডাননো ইত্যাদি ।

ওয়েলসের লোকেরা অপেক্ষাকৃত গরিব । ব্যবহার খুব ভালো । ছবি তোলবার পক্ষে ওয়েলস একটা ভূস্বর্গ । খাবার খুব সাদাসিধে, বেশিরভাগ সেদ্ধ ।

কুড়িদিন পরে ঘুরতে ঘুরতে মধ্য ওয়েলসের উপবনের দেশ থেকে উত্তরে সমুদ্রের ধারে হলানডাডনোতে পৌঁছলাম । গরমের দিনে সমুদ্রসৈকতে হাজার হাজার লোকের ভিড়, সৈকতের একধার থেকে রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর । সূর্যাস্তের পর এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ধারের শহরটিকে খুব সুন্দর দেখায় ।

অল ইংল্যান্ড সাইক্লিস্ট ক্লাবের নিমন্ত্রণে একটা তাঁবুতে থাকবার জায়গা পেয়েছি । খাওয়াটা ইউরোপে কোথাও কোনও সমস্যা নয় । সব জায়গায়, বিশেষ করে যদি জায়গাটা সুন্দর হয় তবে একাধিক খাবার রেস্তোরাঁ দেখা যায় ।

৬

দুদিন পরে একটা মাছ ধরার জাহাজের সঙ্গে ব্যবস্থা করলাম আয়ারল্যান্ডে যাবার। পাঁচদিন অপেক্ষা করার পর জাহাজ ছাড়ল, হেরিং মাছ ধরতে। সাধারণত নর্থ সীতে মাছের জন্য যায়, কিছুকাল আইরিশ সীতে চেষ্টা করার পর। জাহাজ বললে অত্যুক্তি হয়। দরকার হলে বড় জোর চারজন লোক সেখানে রাত কাটাতে পারে। আসলে সেটা একটা স্টিম লঞ্চ।

জাহাজটা সকাল ছটার সময় রওনা হল। সারাদিন ঠুক ঠুক করে চলে সন্ধ্যার একটু আগে আয়ারল্যান্ডের উত্তরে লন্ডনডেরি শহরের উপকূলে আমরা পৌঁছলাম। আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে এখানেই নামলাম। ওয়াই এম সি এ-তে উঠলাম।

ম্যানেজার একজন যুবক, খুব উৎসাহী। আগেই খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ডাকল। তারা ক্যামেরা নিয়ে হুড়মুড় করে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল কিছুক্ষণ পরেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলল। ছবিও তুলল। পরদিন খবরের কাগজে বিশদ বিবরণ বেরোল। তার মধ্যে ভুলও অনেক ছিল; যেমন আমাকে নাকি মরুভূমিতে বাঘে তাড়া করেছিল। যারা পড়েছে তারা নিশ্চয় হেসেছে এবং ভেবেছে কী গুলবাজ রে বাবা! মিঃ বাসবি আমাকে তাঁর বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে ডিনারের নেমন্তন্ন করলেন। পরিপাটি ছোট সংসার। আয়ারল্যান্ডের লোকেরা ভারতবাসীদের ওপর খুব সহানুভূতিশীল, যদি জানতে পারে যে আমরা স্বাধীনতাকামী। মিঃ বাসবি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক যদিও এই উত্তরাঞ্চলের লোকেরা বেশিরভাগ প্রোটেস্ট্যান্ট, তারা স্বাধীনতা চায় তবে ইংরেজের সঙ্গে সব সম্পর্ক বজায় রেখে- যা মোটেই সম্ভব নয়। ক্যাথলিকরা চায় সমস্ত আয়ারল্যান্ড, এমনকী উত্তরাংশও স্বাধীন রাজ্য হোক যেমন বাকি আয়ারল্যান্ড হয়েছে।

বাসবিদের কাছে বিদায় নিয়ে ওয়াই এম সি এ-তে ফিরলাম। শোবার ঘর ছিল না। দুটো সোফা জুড়ে ভালো বিছানা তৈরি করলাম।

একদিন শহরটা ঘুরতে বেরোলাম। বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই। পরদিন বেলফাস্টের পথ ধরলাম খুব ভোরে। পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। এই শহরের লর্ড মেয়র, স্যার জর্জ মনিপেনি আমাকে নাগরিক অভ্যর্থনা জানালেন। স্যার জর্জ, লন্ডনডেরির কাগজে

আমার ইতিবৃত্তান্ত পড়ে ঠিক করেছিলেন সিভিক রিসেপসন দেবার । এখানের সবচেয়ে বড় হোটেলে আমি তিনদিন থাকবার নিমন্ত্রণ পেলাম ।

হারল্যান্ড উলফ নামে জাহাজ নির্মাণের কারখানা- গ্রেট ব্রিটেনের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান- দেখতে গেলাম । জাহাজ তৈরির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবার সুযোগ পেলাম । আশা করলাম যেন আমাদের দেশেও একদিন এইরকম কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় । কয়েক সহস্র কর্মী জানাল যে আমি যেন তাদের সঙ্গে ক্যান্টিনে লাঞ্চ খাই । আমি রাজি হলাম । সে কি উদ্দীপনা আমাকে দেখবার জন্য । লাঞ্চের পর ছোটখাটো একটা বক্তৃতা করলাম ধন্যবাদ দিয়ে ।

বিকালে ভাইসরয় অব নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বাড়িতে চা খাবার নেমন্তন্ন পেলাম । ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের জন্য যে রকম জাঁকজমকের ব্যবস্থা আছে -এখানে সেরকম কিছু নয় । একজন নামমাত্র বড় অফিসার । আমার পৌঁছনোর খবর পেয়ে ভাইসরয় ও তাঁর স্ত্রী এবং একটি ছেলে আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন । বেশ ঘটা করে চায়ের বন্দোবস্ত হয়েছিল । শর্ট ব্রেড আমার খুব ভালো লাগে দেখে ভাইসরয়ের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের দেশে এই জিনিসটি হয় কিনা । আমি বললাম পাওয়া যায় কলকাতায় সেই সব জায়গায় যেখানে ইংরেজ, স্কটিশ ও আইরিশরা চা খেতে যায় । আরও বললাম যে আমাদের দেশে আমাদের নিজস্ব নানারকম খাবার পাওয়া যায় যা খুবই সুস্বাদু ও মুখরোচক ।

ভাইসরয় আমাকে পরামর্শ দিলেন বেলফাস্টের কাছাকাছি সুন্দর দ্রষ্টব্য সব দেখতে । স্বীকার করলেন যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে দক্ষিণ পশ্চিম আয়ারল্যান্ডের তুলনা হয় না- আমি যেন কিলার্নি বেড়াতে যাই ।

এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ডানলপ নামে একজন বেলফাস্টের লোক সলিড রাবার টায়ারের পরিবর্তে হাওয়া-ভরা টায়ার আবিষ্কার করে জগদ্বিখ্যাত হয় এবং প্রচুর ধন অর্জন করে । পৃথিবীর এমন কোনও দেশ নেই যেখানে ডানলপের টায়ার বিক্রি হয় না ।

একটি মধ্যবিত্ত আইরিশ পরিবারের মেয়ে মিস ডরথি ও কনেল আমাকে নেমন্তন্ন করে পাঠাল, তাদের সঙ্গে উইক-এন্ড কাটাবার জন্য । ডরথির সঙ্গে দেখা করার আমার প্রয়োজন ছিল । আমার একটি মুসলমান বাল্যবন্ধু, বেলফাস্টে ছাত্রাবস্থায় কয়েক বছর আগে ডরথির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং প্রেমে পড়ে উভয়ত । বন্ধুর নাম সামসুজ্জোহা । আমার সঙ্গে তার মিত্র ইনস্টিটিউশনে একই ক্লাশে পড়বার সময় ভাব হয় । সে অ্যান্টনিবাগানে অর্থাৎ আমার বাড়ির কাছেই থাকত । সেই ভাব অনেকদিন টিকে ছিল ।

ডরথিদের বাড়ি দুদিন কাটালাম । সামসুরের সঙ্গে বিয়েতে খুব অনিচ্ছাসত্বে মত দেন বাবা মা, তার প্রধান কারণ এই যে আর কখনও তারা মেয়েকে দেখতে পাবেন না । জাতি বৈষম্য ভাব ছিল না বরং জামাই উচ্চশিক্ষিত ভদ্র পরিবারের ছেলে ভেবে মনটাকে প্রস্তুত করেছিলেন এই বিষয়ে ।

ডরথি মেয়েটি খুব নম্র, ভদ্র ও মিষ্টি স্বভাবের, দেখতেও ভালো । আমাকে সে খুশি করবার জন্য সদাই ব্যস্ত । ভারতবর্ষের নানা বিষয় প্রায়ই জিজ্ঞেস করত যেমন দৈনন্দিন জীবন, স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক, শ্বশুর-শাশুড়ির পুত্রবধূর প্রতি ব্যবহার, গ্রীষ্মের প্রকোপ ইত্যাদি । সে মনে মনে ভারতবর্ষে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল । আমি সামসুরের কাছে 'ফার্স্ট ক্লাশ সার্টিফিকেট' -ডরথির নামে লিখে চিঠি পাঠালাম লন্ডনে । কোনও কারণে তার ও ডরথির শেষ পর্যন্ত মিলন হয়নি ।

বেলফাস্টের কাছে সমুদ্রের ধারে এক আশ্চর্য জিনিস দেখতে গেলাম । কারা যেন সমুদ্রের ধারে বসে পাথর পরিষ্কারভাবে কেটে খোদাই করে কী বানিয়েছে- ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্যে জলপথে সমুদ্রের নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত পাথরের স্তম্ভ যে রকম দেখা যায় অনেকটা সেই ধরনের, যদিও অনেক ছোট ।

ডরথি ও তাদের পরিবারের সবাইকে আতিথেয়তার জন্য প্রভূত ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ডাবলিনের দিকে রওনা হলাম । পথে এক রাত একটা নাম না-জানা ছোট্ট গ্রামে একটি চাষী পরিবারের সঙ্গে কাটালাম । ডাবলিন একটা মস্ত বড় শহর । এখানের ইউনিভার্সিটি বিখ্যাত, বিশেষ করে স্ত্রীরোগের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয় বলে ডাবলিনে পাশ করা গাইনোকলজিস্টদের সুনাম ও পসার পৃথিবীর সব দেশে ।

ডাবলিনে ওয়াই এম সি এ-তে উঠলাম । এখানে কোনও শোবার ঘর নেই । ম্যানেজার বললেন, আমার খুব কষ্ট হবে, তবে যদি যেমন করে হোক থাকতে চাই, তাতে তাঁর আপত্তি নেই । আমি রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে তিনতলার এটিকে গেলাম কয়েকটা চেয়ার জুড়ে শোবার বন্দোবস্ত করতে । ম্যানেজার বললেন যে পরদিন সকাল আটটার সময় ওয়াই এম সি এ-এর হলঘরে প্রার্থনা হবে । তিনি সেখানে আমার উপস্থিতির জন্য অনুরোধ করলেন ।

সারারাত ভালো ঘুমোতে পারিনি সরু সরু নড়বড়ে চেয়ারে শুয়ে, তাই খুব সকালেই উঠে পড়লাম । ওয়াই এম সি এ-র কাছেই একটা রেস্তোরাঁতে গিয়ে বেশ করে চা রুটি ডিম খেয়ে প্রস্তুত হলাম দিনের কাজের জন্য, আটটায় প্রার্থনায় যোগ দিতে গেলাম । অনেক লোক এসেছিল । একজন ৬০-৬৫ বছরের সুদর্শন, পাকা চুলওয়ালা ভদ্রলোক 'সারমন অন দ্য মাউন্ট' থেকে পাঠ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন । শেষ হলে

ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে এবং কোথা থেকে এসেছি । পরিচয় পেয়ে নিজেই আমার কাছে এসে দুই হাত বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । জিজ্ঞেস করলেন আমি কোথায় শুয়েছিলাম রাত্রে । তিনি যতদূর জানেন ওই বাড়িতে শোবার কোনও ব্যবস্থা নেই । এটিকের কথা বলাতে, তিনি তখনই চললেন তিনতলায় । সেখানে দু সার চেয়ার মুখোমুখি সাজানো ছিল তখনও । বৃদ্ধ ভদ্রলোককে চার্লি বলে সবাই ডাকত । চেয়ারগুলো দেখে হাসতে হাসতে বললেন আমি এখন বিশ্বাস করছি যে তুমি ভারতবর্ষ থেকে বাই-সাইকেলে সুদূর আয়ারল্যান্ডে এসেছ । তারপর আমাকে বললেন তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিতে যত শীঘ্র পারি, তাঁর বাড়িতে যেতে হবে থাকবার জন্য । এ কথা বলে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং ভারি রুকস্যাক যেটা আমার কাঁধের ওপর থেকে ঝোলে এবং যাতে আমার চলতি সংসারের যাবতীয় জিনিস থাকে, সেটা তুলে নিলেন । আমি বিছানাপত্তর গুটিয়ে ভাবছি সাইকেলটা নিয়ে কেমন করে যাব, জিজ্ঞাসা করে জানলাম তার বাড়ি বালিবোডেন প্রায় ১২ মাইল দূরে । আমি বললাম যে সাইকেলে চড়েই যাব, ইচ্ছা করলে তিনি এগোতে পারেন তাঁর মোটরে ।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররা হাজির । তাদের তাড়াহুড়ো করে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ওয়াই এম সি এ বাড়ির বাইরে গেলাম । বেরিয়েই দেখলাম চার্লির রোলস রয়েস দাঁড়িয়ে আছে । ম্যানেজার তাঁকে এই কথা বলে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন যে চার্লি ওয়াই এম সি এ-র শুভাকাঙ্ক্ষী এবং তরুণদের বন্ধু । এখন বুঝলাম চার্লি মস্ত বড়লোক । আমি রিপোর্টারদের সঙ্গে কথা বলবার সময় চার্লি তাঁর স্ত্রীকে টেলিফোনে জানালেন যে তিনি এক অদ্ভুত জীব নিয়ে বাড়ি ফিরছেন । কফি টফি ইত্যাদি যেন তৈরি থাকে । পাছে আমি মত বদলাই চার্লি আগে থেকেই তাই হ্যাভারস্যাকটা নিজের গাড়িতে উঠিয়েছিলেন । হাল্কা হয়ে আমি মোটর গাড়ি অনুসরণ করতে আরম্ভ করলাম অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে ।

প্রায় একঘণ্টা পরে বালিবোডেন পৌঁছলাম । সুন্দর একটা অ্যাভেনিউয়ের মধ্যে রাস্তা চলে গেছে বাড়ি পর্যন্ত । এক বৃদ্ধা ও তাঁর কন্যা চার্লির সঙ্গে আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন । বৃদ্ধা বললেন মেয়ের নাম আইভি । স্ত্রীর নাম গার্টি । দক্ষিণের বারান্দা থেকে খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় । দূরে একটা ডেয়ারি ফার্ম । এর মাঝখানে উঁচুনিচু মাঠে গরু চরে বেড়াচ্ছে । ছোট একটা জলাশয় ছিল যাতে কোনও কোনও গরু জল খাচ্ছে- সুন্দর একটা গ্রাম্যদৃশ্য । সেই বারান্দায় পরিচারিকা প্রকাণ্ড ট্রে সাজিয়ে কফি ইত্যাদি নিয়ে এল । কত গল্প হল তার ঠিক নেই । আমার ধর্মমত কী জিজ্ঞাসা করাতে বললাম যে আমি হিন্দু ।

অল্পক্ষণের মধ্যে আমাকে গার্টির এত ভালো লাগল যে হঠাৎ বললেন তাঁদের একটি পুত্র ছিল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারায় । সে ছেলে খুব বীর ছিল এবং অনেকটা আমার মতো লম্বা, রঙের তফাৎ অবশ্যই ছিল । ছেলের কথায় মাতৃ-হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল । চোখের জল মুছলেন ।

কফি খেয়ে চার্লির সঙ্গে এস্টেট দেখতে বেরোলাম । মাঠের ওপারে যে ডেয়ারি ফার্ম দেখা যাচ্ছিল সেটা চার্লির । ডাবলিন শহরে দুধ সাপ্লাই হয় চার্লির ফার্ম থেকে । বড় কারবার । আমাদের দেশি ভাষায় চার্লি একজন শিক্ষিত গোয়ালা । আমাদের দেশের গোয়ালাদের সঙ্গে এদের প্রভেদ এই যে তারা দুধের নামে জল দেয় না । পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও দুধের সঙ্গে জল মেশাতে দেখিনি । খাবারে ভেজাল দেওয়া আমাদের বিশেষত্ব!

ডেয়ারি ফার্মে ৫০০ ভালো গরু ছিল । বৈজ্ঞানিক প্রথায় গোপালন হয় যাতে গরুর সুস্বাস্থ্য হয়, অনেকদিন বাঁচে এবং ভালো দুধ দেয় ।

ফার্মের লোকেরা কয়েকটা হস্টেল করে থাকে । অপেক্ষাকৃত কম লোকের দ্বারা দুধ দোয়ানো হয় যেহেতু মেশিনে সে কাজ হয় । গরুর সামনে দিয়ে জল ও খাবারের পরিখা কাটা থাকে, যাতে সহজে একসঙ্গে সবাই জল এবং খাবার খেতে পায় । আমাদের দেশে গরুকে পুজো করে কিন্তু তার যত্ন করে না । গোয়াল এবং খাটাল নোংরামির ডিপো । তাই সেখানে দোয়ানো দুধ কীরকম দুষ্ট বীজাণু ভরা তা সহজেই অনুমান করা যায় । ছেলেমেয়েদের অনেক সময়ে নানা রোগ জন্মায় দুধ খাওয়ানোর ফলে ।

চার্লি আমাকে নিয়ে ফার্ম দেখতে গেলেন এবং সময় কাটালেন নানারকম সমস্যা ও হিসাবপত্র সামলাতে । বাড়িতে ফিরতেই গার্টি বললেন যে আমার ঘর তিনি নিজে ঠিক করে দিয়েছেন । চার্লির ঘরের কাছেই একটা বড় খুব সুন্দর ঘরে ঢুকে আমি অবাক হয়ে গেলাম । আমার হ্যাভারস্যাকের থেকে সব জিনিস বের করে পরিষ্কার করে ঝেড়ে মুছে ঘরের চারদিকে সাজানো । আর সেই সঙ্গে চার্লিদের অফুরন্ত দামি দামি স্ট্যাচুয়েট, কার্পেট ইত্যাদি রাখা ছিল । আমি প্রথমেই মনে মনে খুশি হলাম এই কথা ভেবে যে ওঁরা একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবককে বাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘর ছেড়ে দিলেন, তাঁদের খুব কাছেই থাকতে পারব বলে । গেস্টরুমও আছে এবং যথেষ্ট আরামেরও কিন্তু সেটা অনেক দূরে ।

বাথরুমে ভালো করে স্নান সেরে লাঞ্চ খেতে গেলাম । চার্লি ও গার্টির মধ্যে কী একটা আলোচনা হচ্ছিল আমাকে নিয়ে । আসলে দুজনে মতলব করছিলেন কী করে আমাকে তাঁরা বেশ কিছুদিন, অন্তত বড়দিন পর্যন্ত এগারোদিন আটকে রাখতে পারেন । আমাকে দেখে দুজনেই হেসে ফেলে মতলবটা স্বীকার করে ফেললেন । প্রত্যেক বছর চার্লি তাঁর ফার্মের লোকেদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের বড়দিনে এক বিরাট পার্টি দেন । এবার পার্টির

প্রধান আকর্ষণ আমাকে করতে চান । ভ্রমণ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে হবে । আমি যদি রাজি না হই তো আমার সাইকেল ছাড়া পাবে না । ইউরোপে প্রথম বড়দিন কাটিয়েছি, ঝড়, বরফ ও অল্প জামাকাপড় নিয়ে শীতের কষ্টের মধ্যে । এবার রাজসূয় যজ্ঞ দেখা যাক । অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলাম ।

লাঞ্চের সময় আমাকে ওঁরা বিয়ার দিতে চাইলেন কিন্তু আমি ধন্যবাদ দিয়ে 'না' বললাম । অসময়ে খাওয়ার জন্য এবং ঠিক মতো খাবারের অভাবে ও উপবাসের জন্যই হয়তো, আমার পেটে মাঝে মাঝে একটা ব্যথা অনুভব করতাম যদিও সেটা এখন খুব কম । আবার ভ্রমণ করতে পারছি বলে আমার মনে ফুর্তি অনেক, যদিও মাঝে মাঝে বন্ধুদের কথা ভেবে মন খারাপ হত । তারাও অনেক সাধ করে, অনেক চেষ্টার ফলে বাড়ি ছেড়েছিল । তারপর কে কোথায় গেলাম তার ঠিক নেই । এটা স্পষ্ট বুঝেই আমি একা চলব ঠিক করেছিলাম যখন দেখলাম সঙ্গে টাকা না থাকলে চারজনের দল মোটেই সফল হতে পারবে না । সাধারণ লোক চারজন ট্যুরিস্টকে হঠাৎ থাকতে, খেতে দিতে পারে না । চারজনের একসঙ্গে চাকরি জোটানোও প্রায় অসম্ভব ।

লাঞ্চ খাবার পর চার্লি ও গার্টি বিশ্রাম করতে গেল । আইভি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল তার জন্য তৈরি হচ্ছে যে ছোটদের স্কুলবাড়ি, সেটি দেখাতে । এস্টেটের একপ্রান্তে বেশ সুন্দর একটা বাড়ি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল । একশো ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী আশ-পাশ থেকে এসে সেখানে পড়বে । কোনও মাইনে লাগবে না । টিচাররা সবই বিনাপারিশ্রমিকে কাজ বা পরিশ্রম করবেন, শ্রমদানের মতো ।

আইভির স্বামী নিউইয়র্কে একটা বড় আমেরিকান ফার্মে কাজ করে । তার নাম ডীন, বছরে একবার সে ছুটিতে আয়ারল্যান্ডে আসে । তার মা বাবার বেশ বয়স হয়েছে, তাছাড়া বিরাট সম্পত্তির অধিকারিণী বলে আইভিকে ডাবলিনে থাকতে হয় মা বাবার কাছে । আইভি মাঝে মাঝে আমেরিকায় স্বামীর ঘর করতে যায় কিছুদিনের জন্য ।

আইভি আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে বলল যে অনেকক্ষণ ধোঁয়া না ছেড়ে তার অস্বস্তি লাগছিল । চার্লি সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে না । আমি বললাম যে আমিও খাই না, খেলে নিশ্চয় তাকেও খাওয়াতাম । তবে 'আই শ্যাল কিপ ইউ কোম্পানি' । আইভির আমার সব যাতে ভালো লাগে সে দিকে খুব দৃষ্টি ছিল । একটা বেড়াবার প্রোগ্রাম শেষ হতে না হতে সে আরেকটা তৈরি রাখত ।

সন্ধ্যার সময় চারজনে ড্রয়িংরুমে বসে নানারকম গল্প হত । ভারতবর্ষকে জানবার ও সেখানে যাবার ইচ্ছা খুব দুজনেরই, বিশেষ করে গার্টি চায় তাজমহল দেখতে ।

আমি বললাম পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে সব কষ্ট সহ্য করেও ভারতবর্ষে তাজমহল দেখতে যাওয়ার সার্থকতা আছে । আমার কোনও ভাষাই তার পার্থিব সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারবে না । তিনজনে মিলে ঠিক করল এবার জেমসের ছুটি বাড়িয়ে নিয়ে ইন্ডিয়া ট্যুরে চারজনে মিলে যাবে । আমার দেশে ফিরতে অনেক দেরি সেজন্য আমি ভারতবর্ষে সেই সময় থাকব কিনা তার কোনও স্থিরতা নেই । ইউরোপে সব দেশে দেখতাম তারা বিদেশিকে দেশ দেখার নানারকম প্রলোভন দেখাত । এমনিভাবে ছুটির সময় লক্ষ লক্ষ লোক এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়ায় । আমাদের দেশ এত সুন্দর কিন্তু কোনও সাদর আহ্বানের ব্যবস্থা নেই ।

রাত্রে ডিনার মানে ভূরিভোজ । ডিনারের পর আইভি গান গাইল পিয়ানোতে বসে । সবশেষে যখন শুতে যাবে ঠিক তার আগে চার্লি ও গার্টি বলল ‘আমরা শুতে যাবার আগে রোজ একটু প্রার্থনা করি’ । আমি ‘তথাস্তু’ বলে চেয়ার থেকে নেমে কার্পেটের ওপর অন্যদের সামিল হয়ে হাঁটুগেড়ে বসলাম এবং নীরব প্রার্থনা হল । এমনই রোজ পাঁচ মিনিটের জন্য হত ।

গারট্রুড হচ্ছে গার্টির আসল নাম, সে আয়ারল্যান্ডের বিখ্যাত ধনী পরিবারের মেয়ে । চার্লির অবস্থাও খুব ভালো ছিল, তার ওপর গার্টির অফুরন্ত ধন । চার্লি সাধারণের কাছে লর্ড রাথ ফার্নহাম নামে পরিচিত ।

পরদিন গার্টি বসে বসে তার বাপের বাড়ির যত আত্মীয় ও বন্ধু আছে সবাইকে আমার খবর দিল । উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার বাড়িতে এমন ইন্টেরেস্টিং অতিথি রয়েছে, তোমরা তাকে ডাকছ না কেন?

গার্টির রেকমেন্ডেশনের জোর ছিল । পত্রপাঠ গিনেশ পরিবার ও লর্ড আইভি পরিবারের কাছ থেকে নেমন্তন্ন এল আমার সঙ্গে চার্লি, গার্টি ও আইভির । এ বাড়ি সে বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে কাটালাম । আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কসগ্রেভের বাড়ি চার্লির বাড়ির কাছেই । নেমন্তন্ন করলেন পরদিন ব্রেকফাস্ট খাবার । কসগ্রেভ খুব বুদ্ধিমান ও বাস্তবধর্মী লোক, তাই ডি ভ্যালেরার মতো জনপ্রিয় নেতাকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন । একজন ফটোগ্রাফার কসগ্রেভ পরিবারের সঙ্গে আমার ছবি তুলল ।

আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধে ফিয়ানা ফেল দলের নেতা, ইমন ডি ভ্যালেরার সঙ্গে দেখা করবার আমার সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা ছিল । চার্লি সে সাধটা পূর্ণ করল ডি ভ্যালেরাকে টেলিফোনে আমার কথা বলে । তিনি সাদরে নেমন্তন্ন জানালেন তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য । রাজনীতিক্ষেত্রে চার্লি ও ডি ভ্যালেরা বিপরীতপন্থী, তবু দুজনের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব ছিল । ইমন ডি ভ্যালেরা হচ্ছেন আয়ারল্যান্ডের বিরাট পুরুষ । দীর্ঘদিন ইংরেজের

সঙ্গে লড়ে দেশে স্বাধীনতা আনতে পেরেছেন । সবাই খুব সম্মান করে তাঁকে । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু নেতা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন । ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা পেতেই হবে এই ছিল ডি ভ্যালেরার একটি মূলমন্ত্র । তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আন্তরিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে আবদ্ধ বলে জানালেন । যারা ভেবেছিল আয়ারল্যান্ডের মতো ছোট দেশ স্বাধীনতা পেলে ডুবে যাবে, তারা দেখল ইংল্যান্ডের সাহায্য না পেয়ে, তার শোষণনীতি থেকে মুক্তি পেয়েই এখন স্বাধীন আয়ারল্যান্ড ভালোভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে । ডি ভ্যালেরা আমার দেশের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করলেন । তারপর আমি সসম্মানে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় নিলাম । আমাদের দুজনের একটি ছবি তোলা হল লাইব্রেরি ঘরে ।

গার্টি আমাকে প্রায়ই বড় দোকানে শপিং করতে নিয়ে যেত এবং নানারকম কৌশলে আমার জন্য উপহার কিনত । আমার ভালো গ্লাভস নেই দেখে একজোড়া দামি চামড়া ও পশমের দস্তানা কিনে নিয়ে এল । সেইসঙ্গে রুমাল, মোজা ও সানগ্লাস । খ্রিস্টমাসের দিন সবাইকে যখন উপহার দেওয়া হবে তখন এগুলি আমি পাব । আমি মুশকিলে পড়লাম, তাহলে আমাকেও দিতে হয় চার্লি পরিবারের তিনজনকে । অত টাকা নেই । ভালো বই তিনজনের উপযুক্ত কিনে রাখলাম ।

বড়দিনে ডেয়ারি ফার্মের বড় বার্ন হাউসে, বিপুল সংখ্যক অতিথিদের সমাগম হয়েছিল, প্রায় ৫০-৬০ জন হবে, 'টার্কি' ডিনার খাবার জন্য । প্রথমে আইভির গান হল । চার্লি সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রত্যেকের শুভ কামনা করল । একটি ছোট্ট উপাসনা করে বলল, তার বাড়িতে খ্রিস্টমাস এবার বিশেষ অর্থপূর্ণ: 'বাইবেলে যেমন তিনজন পুবদিক থেকে রেড সী অতিক্রম করে পশ্চিমে এসেছিল, তেমনই আমার বাড়িতে এই অতিথি প্রাচ্য থেকে উপস্থিত হয়েছে ।' এই কথা বলে সে আমার দিকে আঙুল দেখাল । চার্লি আমাকে তার কাছে ডাকল এবং বলল 'জাস্ট সে এ ফিউ ওয়ার্ডস' অমনি সবাই হর্ষধ্বনি করে হাততালি দিল । থামবার পর আমি বললাম, আইরিশ আতিথেয়তায় আমি অভিভূত, আয়ারল্যান্ডের মতো আশা করি আমার দেশও স্বাধীনতা লাভ করবে । আবার হর্ষধ্বনি ।

পাছে বকর বকর দীর্ঘ হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি চার্লি উঠে বলল, বন্ধুগণ! আমি আরেকটা সুখবর দিচ্ছি, দ্য ডিনার ইজ রেডি । দুপুরে টার্কি ডিনার খেয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল । আমিও চার্লির বাড়িতে আমার ঘরে গেলাম ।

সন্ধ্যায় বসবার ঘরে 'খ্রিস্টমাস ট্রি' ভালো করে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল । গাছের ডাল থেকে কয়েকটা জালের মোজা ঝুলছিল, তার ভেতরে বাড়ির লোকেদের জন্য উপহার ছিল । আমি রবীন্দ্রনাথের তিনখানা বই কিনেছিলাম । ইংরিজিতে লেখা গীতাঞ্জলি, দ্য

গার্ডনার ও দ্য গোল্ডেন বোট । গার্টি আমাকে গ্লাভস দিয়ে সস্নেহ চুম্বন দিলেন । আমি সবাইকে বই দিলাম । রবীন্দ্রনাথের কোনও বই চার্লির লাইব্রেরিতে দেখিনি ।

চার্লি পরিবার সকাল থেকে এক সুরে সাধতে আরম্ভ করেছে যাতে আমি আর এক সপ্তাহ তাদের সঙ্গে থাকি । সেটা সম্ভব নয় অনেক কষ্টে বুঝিয়ে, আমি খ্রিস্টমাসের একদিন পরে রওনা হলাম ।

আমার উদ্দেশ্য দক্ষিণে কর্ক বন্দরে যাওয়া । কর্ক শহরের স্বাধীনতাকামী মেয়র ম্যাকসুইনি ৭২ দিন প্রায়োপবেশন করে প্রাণত্যাগ করেন । আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চিঠি লিখে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলাম ।

মিসেস ম্যাকসুইনি স্বামীর মৃত্যুর পর নিতান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করেন । স্বভাবতই তিনি স্বামীর সম্বন্ধে খুব গর্বিত । আমাদের দেশের অনেক নেতার কথা জানেন- বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্র বসুর । এই থেকে আমার মনে হয়েছিল যে বোধহয় নেতাজি আয়ারল্যান্ডের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে নিজের একাত্মবোধ জানিয়েছিলেন । মিসেস ম্যাকসুইনির বাড়িতে একরাত কাটিয়ে পরদিন পশ্চিমে গলওয়ে শহরের দিকে রওনা হলাম । শ্যানন নদীর ওপর বাঁধ তৈরি হচ্ছিল, সেটা দেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল । সমতল জমির ওপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছিল, তার পাশে গভীর খাল কেটে নদীর অধোগতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি হবার পর জল ওপরে উঠিয়ে আবার নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছিল । পৃথিবীতে আর কোথাও এমনভাবে (অবশ্য সেদিন পর্যন্ত) বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রণালী ব্যবহার করা হয়নি । এটি জার্মান ইঞ্জিনিয়ারদের কৃতিত্ব ।

এক আইরিশ বৃদ্ধার কাছে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে গলওয়ে শহর দেখতে বেরলাম । পুরনো শহর, জরাজীর্ণ অবস্থা । আয়তনে ছোট । সন্ধ্যার পর ক্লান্ত হয়ে রাস্তার ধারে একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকলাম । মালিক নিজে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কী খেতে চাই । পরমুহূর্তে বলল, ভালো মাছ, আলুভাজা দিতে পারে । আমি তথাস্তু বলে খবরের কাগজ পড়তে লাগলাম । যথাসময়ে একটা বড় প্লেটভর্তি লেমন সোলমাছ ও আলুভাজা দিয়ে গেল একটি ফুটফুটে মেয়ে, বয়সে ১২-১৪ হবে । হয়তো তার বাবারই রেস্তোরাঁ । আমি হাত ধোবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলাম ঘরের অন্য প্রান্তে যেখানে বেসিন ও কল ছিল সেইদিকে ।

ফিরে এসে দেখি একটা কাণ্ড হচ্ছে । পাঁচ-ছয়টি ছোট ছেলে আমার প্লেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সব আলুভাজা কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে । আমি যে পিছনে দাঁড়িয়ে সেদিকে কারও খেয়াল নেই । মালিক অপ্রস্তুত হয়ে হা হা করে উঠতে ছেলেরা দুহাতে যা

পারল আলুভাজা নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারা আমার জন্য মাছভাজাটা অক্ষত অবস্থায় রেখে গিয়েছিল। ব্যাপারটা বোঝবার জন্য মালিককে জিজ্ঞেস করলাম যে ছেলেরা কারা এবং কেন কেবলমাত্র আলুভাজা লুট করে ক্ষান্ত রইল।

মালিক শুকনো মুখ করে আমার দিকে চেয়ে বলল, স্যার, ওরা বড় গরিব। বোধহয় কদিন খেতে পায়নি। আমি এখনই আরেক প্লেট খাবার দিচ্ছি। প্লেটটা সরাবার সময় বলল যে আগে ওরা কখনও এমন করেনি। আমি তখনই রেস্তোরাঁর বাইরে গিয়ে দেখি সবাই ছুটে আরও একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। আমি সবাইকে এক প্লেট করে আলুভাজা দেব প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং যা হয়ে গেছে তার জন্য কোনও শাস্তি দেব না বললাম। ছেলেরা আমাকে বিশ্বাস না করে ভাবল যে তাদের ধরবার ফাঁদ পেতেছি বুঝি।

তখন আমি মালিককে বললাম, পাঁচ প্লেট আলুভাজা ছেলেদের জন্য দিতে। মালিক থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার বলতে বলতে রাস্তায় বেরিয়ে গেল এবং ছেলেদের নাম ধরে ডাকল। ছেলেরা অপ্রস্তুত হয়ে ইতস্তত করতে লাগল, তারপর একটি একটি করে রেস্তোরাঁতে এল। মালিক হেসে জানাল যে আমি সবার জন্য টাকা দিয়েছি। পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে ছেলেরা এসে আমার নাগালের বাইরে বসল। আমি সবার জন্য ফিস অ্যান্ড চিপস অর্ডার দিলাম। সবাই মহাখুশি, তবু মনে মনে ভয়, পাছে ধরে আমি তাদের শাস্তি দিই। আমাদের জন্য ছয় প্লেট মাছ ও আলুভাজা এল। ছেলেদের মুখে তখন হাসি ধরে না। একসঙ্গে সবাই বলল ভেরি সরি, স্যার। আজ সারাদিন কিছু খেতে পাইনি।

ছেলেদের মলিন বেশ, খালি পা, মুখে কখনও জল সাবান পড়েছে বলে মনে হল না। দুহাত দিয়ে খেতে যাচ্ছিল। মালিক বলল কাঁটা-ছুরি ব্যবহার করতে। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের মতো চলতে। স্পষ্টই বোঝা গেল তারা ছুরি-কাঁটাতে অনভ্যস্ত।

এই একটি ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় আয়ারল্যান্ডের আর্থিক অবস্থা কী, ইংরেজ রাজত্বের শোষণনীতির কী ফল। আশা করি স্বাধীন গণতান্ত্রিক আয়ারল্যান্ডে আবার সুখের দিন ফিরে আসবে।

আইরিশরা গরিব। জগৎজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নানারকম কাজ খুঁজে বেড়ায় এখানকার তরুণ-তরুণীরা, অনেকে সৈনিক হয়। মেয়েরা সবচেয়ে বেশি নার্স হয়। লন্ডনে আমার যখন অস্ত্রোপচার হয় তখন একটি আইরিশ নার্স কী পরিমাণ সযত্নে আমাকে দেখাশোনা করেছিল, তা চিরকাল মনে রাখব।

আইরিশ মেয়েরা দেখতে সুন্দর। আয়ারল্যান্ডের লোকেরা মনে করে যেহেতু তাদের দেশে খুব বৃষ্টি সেজন্য ঘাস ও গাছপালা যেমন চিরসবুজ তেমনই তাদের মেয়েদের ত্বকও

সুন্দর ও মসৃণ।

গলওয়ে ছেড়ে আসবার সময় মনে পড়ল যে আমি পশ্চিম ইউরোপের শেষ সীমান্তে পৌঁছেছি। এবার আতলান্তিক মহাসমুদ্র পার হলেই আমেরিকা।

আয়ারল্যান্ডের বিশেষ দ্রষ্টব্য, কিলার্নি হ্রদ বেশি দূরে নয়। কিলার্নির কাছে ওই নামে ছোট গ্রাম আছে। সেখানে এক বিপ্লবী, রবার্ট ও সিনের সঙ্গে চিঠির মাধ্যমে আমার আলাপ ছিল। রবার্টের বাড়িতে থাকবার নিমন্ত্রণ জানাল। বাড়িতে মা-বোন ছাড়া আর কেউ ছিল না। রবার্টের বয়স তখন ২৭-২৮। বোন দুবছরের ছোট, একটা স্কুলে পড়ায়। আমার জন্য একটা সাদাসিধে পরিষ্কার ঘর ঠিক হল। রবার্ট সাংবাদিক- আইরিশ হেরল্ড কাগজে লেখে। যা সামান্য রোজগার হয় তাতে কোনওমতে সংসার চলে যায়। সে অবিবাহিত। সারাজীবন ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে। তার কাহিনী শুনে আমার মনে হল আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস শুনছি। বন্দুক বোমা নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়িয়েছে। রবার্টের বান্ধবী ধরা পড়ল, তার ওপর অশেষ অত্যাচার ও পরে তার কারাদণ্ড হল। জেল খাটতে খাটতে দুরারোগ্য যক্ষ্মা ব্যাধিতে সে মারা গেল। যেদিন তার মরদেহ কফিনে ভরে সমাধিস্থ হচ্ছে সেদিন রবার্টও ধরা পড়ল। দুবছর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে তার ওপরে, সহকর্মীদের ধরিয়ে দেবার জন্য। শেষপর্যন্ত তার জয় হয়েছে। কারণ রবার্ট নিজের দেহের ওপর অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেছে, তবু বন্ধুদের ধরিয়ে দেয়নি। কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে তার জিদ বজায় রাখার জন্য। রবার্ট স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না, সারাক্ষণ তার অসাড় জিভ দিয়ে লালা পড়ে। তার কথা বুঝতে তাই অসুবিধা হয় কিছুটা। লেখার কাজ ছাড়া তার আর কোনও উপায় ছিল না। সে ডি ভ্যালেরার খুব স্নেহের পাত্র। আমি যখন ডি ভ্যালেরার সঙ্গে আমার ছবি দেখালাম তখন রবার্টের চোখ মুখ আনন্দে ভরে উঠল।

রবার্টের মা খুব সাদাসিধে ডিনার রেঁধেছিলেন। আলুর স্যুপ, রুটি, মাখন, কুমড়ো সিদ্ধ ও আলুভাজা। শেষকালে একটা পুডিং। রবার্ট বলল, তাদের এই ধরনের খাবার নিত্যনৈমিত্তিক। গরিবদের এছাড়া অন্য পন্থা নেই।

পরদিন সকালে রবার্ট একটা সাইকেল জোগাড় করে আমার সঙ্গ নিল। আয়ারল্যান্ডে কিলার্নির মতো এত সুন্দর জায়গা আছে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। সে কী অপরূপ শ্যামসমারোহ। পাহাড়, হ্রদ, গাছপালা, মাঠ মিলে এক স্বপ্নের দেশ মনে হচ্ছিল। আমার কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে রবার্ট প্রস্তাব করল যে কিলার্নির ওপর একটা আর্টিকেল লিখতে হবে 'আইরিশ ইন্ডিপেন্ডন্ট' কাগজের জন্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলাম। যা লিখেছিলাম তার থেকে সামান্য উদ্বৃত করছি। পঞ্চাশ বছর আগের লেখা

এখন আবার পড়ে প্রথমেই মনে হল কী রোমান্টিক ছিলাম তখন । প্রকৃতির বর্ণনা দিতে কবিত্ব করেছি তিন কলাম ছাপার অক্ষরে ।

'আমার ভ্রমণ পথে লোকেরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেছে আমার সবচেয়ে সুন্দর লেগেছে কোন জায়গা । এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল যতক্ষণ না রূপসী কিলার্নির অপরূপ রূপ দেখেছি । আমি কিলার্নি দেখলাম যেন এক স্বপ্নের রানি, কবির কবিতা, আর্টিস্টের কামনা বাস্তবে রূপায়িত । তার সৌন্দর্য কথার মালা গেঁথে বর্ণনা করা যায় না ।

বিস্তীর্ণ হ্রদ 'লাফলীন' (লেক অব লার্নিং)-এর কাকচক্ষু জলের ওপর ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ দেখলে মনে হয় হীরের বাক্স খোলা, তার মধ্যে মণিমুক্তখচিত নানা রঙের গহনা । হ্রদের ওপারে আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় (কারান্টিনো হিল) ও তার সাঙ্গপাঙ্গ পাহাড় একটার পর একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরীর মতো । এত সবুজ একসঙ্গে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না' । ইত্যাদি ।

পরদিন সকালে রবার্ট ও তার বন্ধু ডোনাল্ড এবং আমি সাইকেলে রওনা হলাম ব্লার্নি কাসল দেখবার জন্য । ভারতবর্ষের লোকের কাছে কাসলটি এমন কিছু নয়, তবে একটা কথিকা আয়ারল্যান্ডের সর্বত্র প্রচলিত, সেটা হচ্ছে এই যে কাসলের ওপর কষ্ট করে কেউ যদি একটি কালো কষ্টিপাথর চুম্বন করতে পারে তো সে একজন মনভোলানো বক্তা হতে পারবে । আমি ছাদের ওপর উঠে দেখলাম, যে পাথরটা খুব কঠিন জায়গায় অবস্থিত । খানিকটা ঝুঁকি নিয়ে আমি পাথরে পৌঁছলাম । তারপর আজও ভাবি, কই আমার তো অসাধারণ বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা হয়নি যদিও 'আই কিসড দ্য ব্লার্নি স্টোন' ।

তিন বন্ধু মিলে আমরা একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারলাম । বিকালে বাড়ি পৌঁছে দেখি 'আইরিশ ইন্ডিপেন্ডন্ট' কাগজের ফটোগ্রাফার আমার জন্য অপেক্ষা করছে । একটা ছবি তুলে, আর্টিকেলটা লেখার জন্য পঞ্চাশ পাউন্ড চেক দিল ।

কাছেই আরেকটা সুন্দর জায়গা আছে নাম গ্যাপ অব ডানলো । সেটা দেখতে গেলাম দুই আইরিশ বন্ধুকে নিয়ে । জায়গাটা সুন্দর কিন্তু চারদিকে রুক্ষ পাহাড় । লেকের কাছে একটা কটেজ দেখলাম । ডোনাল্ড বলল, সেটা কেট কিয়ারনিজ কটেজ । কেট কিয়ারনিকে নিয়ে অনেক কবিতা লেখা আছে । একটা ছোট্ট চার লাইনের কবিতা কটেজের ভেতর ঢুকেই চোখে পড়ল:

'Old Betty having lived here all her days,

Couldn't understand the Tourists' lavish praise.

She thought there was now't to see,

only the hills, Watter and the trees!

যে তিনটি জিনিস দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় যেমন পাহাড়, জল ও গাছ, তদের ওপর Kate Kearneyর বীতরাগ, Watter কথাটি তারই ব্যবহৃত।

ওসিন পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে ডাবলিনের দিকে ফিরে চললাম, মধ্য আয়ারল্যান্ড দিয়ে। পথে আগা খাঁর ঘোড়া রাখার বিরাট আস্তাবল। সমস্ত রেসের ঘোড়া আয়ারল্যান্ডে রাখার দুটো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমটা হচ্ছে, ইংল্যান্ডের চেয়ে অনেক কম খরচে ঘোড়া রাখা যায়। দ্বিতীয়ত, আয়ারল্যান্ডে অপেক্ষাকৃত কম ঠান্ডা, সেজন্য ঘোড়ার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আমাদের দেশে মানুষের প্রাণের দাম নেই। কিন্তু একটা ভালো রেসের ঘোড়ার দাম পাশ্চাত্য দেশে বহু লক্ষ টাকা।

ডাবলিনে পৌঁছে গার্টিকে ফোন করে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম যে পরদিন আমি ইংল্যান্ডে ফিরে যাব যদি জাহাজ পাই। গার্টি বলল তা তো হবে না। ওর বাড়িতে আমার নামে আইরিশ রেডিওস্টেশন থেকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য। তিনদিন পরে আমন্ত্রণ। এরকম অর্থোপার্জনের পন্থা ছাড়তে আমি অনিচ্ছুক, তবু গার্টিকে জানালাম যে ডাবলিনে কোনও হোটেলে আমি থাকব। টেলিফোন ইতিমধ্যে হাত বদল হল চার্লির কাছে। চার্লির সঙ্গে তর্ক করা চলে না। আমি আবার চার্লিদের বাড়িতে গেলাম। সে কি অভ্যর্থনা- যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে। চার্লি সবাইকে বিয়ার ও স্যান্ডউইচ খাওয়াল। ঠিক এই সময় ওদের মেয়েও বাড়ি ফিরেছে। সবাই মিলে ভীষণ হৈ চৈ আরম্ভ করে দিল আমাকে ঘিরে। আমার ভালো লাগছিল, তবু ভাবছিলাম কবে নিজের মা বাবা ভাই বোন ও বন্ধুদের কাছে ফিরে গিয়ে এমনই আনন্দ করতে পারব। মনে মনে জানি সেটা অনেক পরের কথা। তাই একটুক্ষণ পরেই ভুলে গেলাম সেসব কথা।

চার্লির এক বৃদ্ধ বন্ধু সেদিন ওইখানে ছিলেন আমাকে দেখবার জন্য। তিনি হঠাৎ বলে বসলেন কিছু বল। সবাই চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকাল। অগত্যা আমি আয়ারল্যান্ড ভ্রমণের কথা, কিলার্নির কথা এবং সর্বত্র কীরকম আতিথেয়তা পেয়েছি সেই সম্বন্ধে বললাম। অবশেষে বললাম যে চার্লি ও গার্টির বাড়িতে বালিবোডেনে ফিরে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি আমার বাড়িতে ফিরেছি। এই বলার পরই আইভি আমার পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলল আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ব্লার্নি পাথরে চুমু খেয়ে পরিব্রাজকের কীরকম মুখ খুলে গিয়েছে। তিনদিন পরে রেডিওতে আবার একবার তার প্রমাণ পাব।

পরদিন চার্লির সঙ্গে ডাবলিনে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল দেখতে গেলাম। প্রথমেই দেখা পেলাম ডাঃ অজয় আচার্য ও ডাঃ প্যাটেলের। একজন ইংরেজ ডাক্তারের সঙ্গে (ডাঃ চ্যাপল) লন্ডনে আরেক ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে আলাপ হয়েছিল। তারও দেখা পেলাম।

ডাঃ চ্যাপল লন্ডনে ফিরে গাইস হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত হয় ও পরে ডাক্তার হয় রয়্যাল ফ্যামিলির ।

রেডিওতে একটা বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর হল, নজরানা পেলাম ত্রিশ পাউন্ড । আরেক সপ্তাহ পরে যদি একটা এনগেজমেন্ট নিতে চাই ভারতে মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে বলবার জন্য, তা হলে সেই সুযোগ পাব । কিন্তু আমি নারাজ হলাম । বিষয়বস্তু খুব আমার মনোমত হওয়া সত্বে সময়ের অভাব আমাকে গররাজি হতে বাধ্য করল ।

এবার স্টিমার ধরে ইংল্যান্ডে ফিরলাম । হলিহেড থেকে লিভারপুল শহরে গেলাম । রাত্রের অন্ধকারে পৌঁছে সালভেশন আর্মির হস্টেলে উঠলাম । ছয় পেনি দিয়ে একটা বিছানাসুদ্ধ খাট ও একটা ছোট আলমারি পেলাম । একটা হলঘরে অনেক বিছানা পর পর সাজানো রয়েছে । বহু লোক বিছানার ওপর শুয়ে বা বসে রয়েছে । সবার মলিন বেশ । গরিব মনে হয় । কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না । স্নানের সময় যার যা সম্পত্তি আছে অফিসে জমা দিয়ে যায়, চুরি যাওয়ার ভয়ে । এই শহরে ‘ওয়ার্ল্ড জাম্বোরি’ হচ্ছে বয়েস স্কাউটদের । পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে স্কাউটরা এসেছে । আমি ভারতীয় ক্যাম্পে ‘স্যাটা বোস’-এর দলে ভিড়লাম ।

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল আমাকে দেখতে চাইলেন । ক্যাম্পে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল । একটু পরে লর্ড হাজির হলেন । আমি স্কাউট স্যালুট দিলাম । খুশি হয়ে কাঁধে হাত রাখলেন এবং একটা স্কার্ফ উপহার দিলেন । দুদিন জাম্বোরি ক্যাম্পে কাটিয়ে সোজা চেস্টার শহরে গেলাম । ইতালি থেকে রোমানরা পশ্চিমপ্রান্তে এতদূর অবধি রাজত্ব বিস্তার করেছিল । রাস্তাটাও রোমান যুগের সাক্ষ্য দেয় । বিশেষত্ব হচ্ছে যে রাস্তার দুধারে মাটি ও পাথর দিয়ে তৈরি দেওয়াল । চেস্টার ইংল্যান্ডের পুরনো শহর । সিজারের সৈন্যবাহিনী দুহাজার বছর আগে এ শহর দখল করেছিল ।

ইয়র্কের ক্যাথিড্রাল দেখে আমি গেলাম হোয়াইট হল বলে একটা খুব সুন্দর বাড়িতে । ব্যাঙ্কে কাজ করবার সময় এক সহকর্মীকে (ইংরেজ) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে ইংল্যান্ডে এলে তার মা বাবার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করব । সে আমার কথা লিখে মা বাবাকে চিঠি দিয়েছে । হোয়াইট হল বাইরে থেকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি বড়লোকের বাড়ি মনে হয় । প্রকাণ্ড বাগানের মাঝখানে বাড়ি । গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় কুকুর চিৎকার করে ছুটে এল আমার দিকে । সেইসঙ্গে সামনের বারান্দায় এক খুব সুশ্রী ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন এবং আমাকে দেখেই চিনে ফেললেন যে আমি তাঁর ছেলে স্টানের বন্ধু । কুকুর থামিয়ে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন এবং বললেন, ইউ আর বিমল- দ্য গ্লোব ট্রটার! আমি স্বীকার করলাম । ভদ্রমহিলার নাম লেডি ডানবার, তিনি স্টানের মা । আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । বললেন যে তাঁর স্বামী ডনকাস্টারে গেছেন, রেসের

ঘোড়ার তদ্বির করতে। সন্ধ্যার সময় ফিরবেন। স্যার লোরেন ডানবার রিটায়ার করবার পর রেসের ঘোড়া নিয়ে মেতে উঠেছেন এবং তাই নিয়ে খুব আনন্দে আছেন। বিশেষ করে সেদিন টেলিফোনে খবর দিলেন স্ত্রীকে যে তাঁর ঘোড়া প্রথম হয়েছে।

লেডি ডানবারের বাটলার এসে আমার হাত থেকে সাইকেল নিল। আমি হ্যাভারস্যাকটা কাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে ধরে আছি। স্ট্যানের মা আমাকে সাহায্য করবার জন্য রুকস্যাকের একাংশ ধরতে গেলেন, তারপর আমার যাবতীয় সংসারের ওজন দেখে বললেন বাপরে! এ যে একটা পাথরের মতো ভারি। তুমি কেমন করে এই জগদ্দল পাথর বয়ে বেড়াও। আমি বললাম পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে বোঝা বইতে শিখতে হয়েছে।

প্রশস্ত বসবার ঘরে ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর ধারে চায়ের সাজ-সরঞ্জাম তৈরি। লেডি ডানবার আমাকে সস্নেহে সেদিকে নিয়ে গেলেন। আরেকটি ইংরেজ ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন যে আমি তাঁর ছেলে স্ট্যানের বন্ধু কলকাতা থেকে আসছি।

চা খেতে বসে নানারকম গল্পগুজব হল। তারপর বাগান দেখতে বেরলাম। নানা দেশ থেকে গাছ ও বীজ সংগ্রহ করে খুব যত্ন করে বাগান সাজানো হয়েছে, দেখবার মতো।

প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এসেছে এমন সময় বাড়ির কর্তা, স্যার লোরেন ডানবার উপস্থিত হলেন। আমার দিকে হাসি হাসি মুখে দুহাত বাড়িয়ে এগোলেন। আমি হাত ধরলাম। বললেন ইউ আর দ্য ডেয়ারিং গ্র্যান্ডসন অব নিবারণ! (আমার ঠাকুর্দার ছোট ভাইয়ের নাম নিবারণ মুখার্জি) টেল মি অল এবাউট ইয়োর অ্যাডভেঞ্চারস। মাই সন থিঙ্কস নো এন্ড অব ইউ। ভদ্রমহিলা বাধা দিয়ে বললেন যে সব পরে হবে। এখন চা খাবে চল। যেতে যেতে দুবার শুনলাম, মাই হর্স ওয়ান ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দিস আফটার-নুন। ইউ ব্রট আস লাক। আই হোপ উইল স্টে উইথ আস ফর সামটাইম। হোয়াট ডু ইউ সে, মাদার?

স্যার লোরেনের বুড়ো বয়সের একমাত্র পুত্র স্ট্যানলি ডানবার ও আমি একসঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে কাজ করতাম। আমি সেখানে ১৯২৩ সালে যোগ দিই। আমাদের মধ্যে খুব ভাব ছিল। আর এই কারণেই সে অন্যান্য সহকর্মী ইংরেজের কাছে খানিকটা একঘরে, অত্যাচারিত ও অপমানিত হয়েছে। ভারতবর্ষে ভারতীয়দের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা তো দূরের কথা, একটু কাছে টেনে নিয়ে মানুষের যোগ্য সম্মান দিয়ে ব্যবহার করাও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সমাজে তখনকার দিনে অননুমোদিত ছিল। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটির দিনে যখন স্ট্যানকে দেখা গেল পেলিটি রেস্তোরাঁতে স্যান্ডি খাওয়াচ্ছে তখন শুরু হল তার অমার্জনীয় অন্যায়ের তালিকা। স্ট্যানলির বাবা স্যার লোরেন ডানবার

ছিলেন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার প্রথম গভর্নর । তাঁর সুনাম ও প্রতিপত্তি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল । তখনই তাঁর একটু-আধটু দুর্নাম ইংরেজ মহলে ছিল যে তিনি বাঙালি কর্মচারীদের সহানুভূতির চোখে দেখেন । শুনেছি অনেক গরিব কেরানির ছেলেকে পড়াতে তিনি অর্থ সাহায্য করতেন । এসব কথা আমি কলকাতায় থাকতেই শুনেছি তাঁর যুগের লোকেদের কাছে ।

এহেন লেকের ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা অথবা প্রতিবাদ করার সাহস কোনও ইংরেজের ছিল না । অথচ স্ট্যানের ব্যবহারে সবাই ক্ষুণ্ণ, যেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন সে অবশ্যাম্ভাবী করে তুলেছে । সাবধান করার পরও যখন অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না তখন তাকে কলকাতা থেকে অর্থাৎ আমার সঙ্গ থেকে অনেক দূরে লখনউতে বদলি করে দেওয়া হল এই কথা বলে, যে হেড অফিসে কাজ পরে শিখলেও চলবে, এখন ব্রাঞ্চ চালানো শিখতে যেতে হবে । তার জন্য অবশ্য স্ট্যানকে প্রমোশন দেওয়া হল ।

সে লখনউ পৌঁছেই চিঠির পর চিঠি এবং টেলিগ্রাম পাঠাল । ছুটি নিয়ে অন্তত কিছুদিনের জন্য সেখানে থাকবার অনুরোধ । এই সবের খবর যদি কলকাতার সাহেব মহল জানতে পারত তো আমার চাকরিতে ইস্তফা অনিবার্য হত ও স্ট্যানকে অপদস্থ করা হত নিশ্চয়ই ।

যখন একমাসের ছুটি পাওয়া হল, আমি চাঁদনি চকে গিয়ে দুটো ভালো সাদা ট্রাউজার প্রত্যেকটি ৫ টাকা দামে ও দুটো টুইলের শার্ট ২ টাকা ৪০ পয়সা দিয়ে কিনলাম । স্পোর্টসের জন্য হাফপ্যান্ট পরতাম । তাছাড়া মালকোচা দেওয়া ধুতি ও হাফ হাতা টুইলের শার্ট ছিল আমার বেশ ।

তৃতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারে আমি লখনউ স্টেশনে পৌঁছে দেখি ছয় ফুট লম্বা, সুদর্শন ইংরেজ যুবক তার ফোর্ড গাড়ি নিয়ে আমাকে খুঁজছে । তখন লখনউয়ের বড় মোগলাই স্টেশন তৈরি হয়নি । 'লং লস্ট ব্রাদারের' মতো দুজনে পরস্পরকে দেখে খুব খুশি । গাড়িতে উঠলাম । রয়্যাল হোটেল নামলাম । স্ট্যানের পাশের কামরায় আমার স্থান হয়েছিল । আমি এর আগে দামি হোটেলে কখনও উঠিনি । আমি এইসব খরচের কথা ভাবছি দেখে স্ট্যান বলল যে আমি তার অতিথি, সব খরচের ভার তার । স্ট্যানের সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম একজোড়া কেডস জুতো কেনার জন্য, দাম মাত্র আড়াই টাকা । বিকালে হোটেল সংলগ্ন টেনিস কোর্টে খেললাম যতক্ষণ না সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল । বিশ্রাম করে চা ইত্যাদি খেলাম কোর্টের ধারে, অন্য ইংরেজরা আড়চোখে আমাকে দেখল । ইতিমধ্যে স্ট্যানেরও অনেকটা আক্কেল হয়ে গিয়েছিল । আমার সঙ্গে মেশা যে তার লখনউ বদলি হবার একমাত্র কারণ সে কথা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল । ভাগ্যে এখানে তার ওপরওয়ালা কেউ ছিল না তাই আমার জন্য জবাবদিহি করতে হয়নি কারও কাছে ।

আমার বয়স তখন ২১। স্ট্যানের বয়স ২০। আমি লখনউ শহরে দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে বেরোতাম যখন স্ট্যান যেত ব্যাঙ্কে। ইমামবাড়া ইত্যাদি দেখে আমি মুগ্ধ। স্ট্যানের কাছে গল্প করলাম। সেও আমার সঙ্গে একদিন দেখতে গেল এবং ফিরে এসে বলল যে ভালো লেগেছে এবং আরও জানতে চাইল অযোধ্যার নবাবদের কথা।

সাদেক আলি নামে একজন বড় শিকারির সঙ্গে স্ট্যানের ব্যাঙ্কে আলাপ হয়েছে। আমাদের দুজনকে বাঘ শিকারে অনেকদূর হালডৌনি অঞ্চলে নিয়ে যাবে বলল। শনিবার একটা পরব ছিল। ব্যাঙ্কের ছুটি। শুক্রবার সন্ধ্যায় আমরা তিনজন রওনা হলাম। মাত্র একটি বন্দুক, তবু কারও ভয় নেই, সঙ্গে যখন সাদেক আলি আছে। সারারাত গাড়ি চালিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়ি জায়গায় পৌঁছলাম।

পরদিন দুপুরবেলায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে চারদিক সার্ভে করল সাদেক আলি। একটা গাছের ওপর আমাদের বসবার ব্যবস্থা হল।

চাঁদনি রাত ছিল। অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম একটা বড় বাঘ আমাদের গাছের সামনে দিয়ে চলেছে। সাদেক গুলি ছুড়ল। বন্দুকের গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বাঘ প্রচণ্ড লাফ দিল, তারপর অদৃশ্য হল।

পরদিন সূর্যের আলো যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখা গেল, আমরা সারারাত গাছে বসে মশার কামড় খেলাম। বাঘকে জখম করবার পর রাত্রে জঙ্গলে তার খোঁজ করা কিংবা চলাফেরা বিপজ্জনক। পরদিন গ্রামের লোকেরা এল। বন্দুকের শব্দ পেয়েছিল। তারপর খুব সাবধানে বাঘের দেহাবশেষ খুঁজতে বেরলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে একজন গ্রামের লোক দৌড়ে এসে বলল সে বাঘকে একটা ঝোপের কাছে শুয়ে থাকতে দেখেছে।

বাঘ নড়ে না চড়ে না দেখে সাদেক আলি সবাইকে কাছে আসতে বলল। বাঘটা মানুষ-খেকো নয় জেনে আমার আপসোস হচ্ছিল কেন অনর্থক অমন সুন্দর একটা জীবকে হত্যা করা হল। খুব সহজে বাঘ শিকার হল বটে কিন্তু তার পিছনে অধ্যবসায়, অভিজ্ঞতা ও অব্যর্থ বন্দুকের টিপ অনস্বীকার্য।

আলি বাঘের সৎকার করবে বলে গ্রামের লোকেদের সাহায্য চাইল, তারাও হাত লাগাবার জন্য খুব উৎসুক। তাদের কেবলমাত্র দুটি প্রার্থনা, কয়েকটা বাঘের নখ ও বাঘের চর্বি সবটাই দিতে হবে। আলি চামড়া ছাড়াতে বসল। সে বলল স্ট্যানকে চামড়াটা দেবে। সব ব্যবস্থা করতে দুদিন সময় লাগবে। সেজন্য আমরা রওনা হলাম লখনউ ফেরার পথে। স্ট্যানের কাছে আরও তিনদিন থেকে মথুরা, বৃন্দাবন ও হরিদ্বার দেখতে গেলাম। স্ট্যানকে আমার পৃথিবী ভ্রমণের ইচ্ছার কথা জানালাম। সে তখনই বলল যে

আমাদের দলে যোগ দেবে। সে তো অনেক পরের কথা। যা হোক বিলেত গেলে তার মা বাবার বাড়িতে থাকতে হবে।

স্যার লোরেনের ইচ্ছায় সে রাত্রের ডিনারের নাম দেওয়া হল বেঙ্গল ডিনার এবং মুরগির কারি, পাঁপড় ভাজা, আমের চাটনি ইত্যাদি দিয়ে খুব মুখরোচক ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল। হোয়াইট হল নাকি বেঙ্গল ডিনারের জন্য প্রসিদ্ধ, কর্তা গিন্নি দুজনেরই খুব তারিফ করে খেলেন, সেইসঙ্গে আমিও। তারপর ছেলে সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করে সব খবর জানতে চাইলেন। লেডি ডানবারের বাবা ইংরেজ কিন্তু মা বর্মার রাজপরিবারের একজন বর্মী রাজকন্যা। মিশ্র বিবাহের ফলে সাধারণত ছেলেমেয়েরা সুশ্রী ও সুন্দর দেখতে হয়। বাবা ইংরেজ হওয়ার ফলে লেডি ডানবার বেশ লম্বা ও মার দিকে পেয়েছেন সৌম্যকান্তি। আমাকে গৃহিণী যখন বললেন যে তিনিও আমার মতো ভারতীয়, আমি তাঁর মুখের ও অবয়বের দিকে চেয়ে দেখলাম কোথাও ভারতীয় গন্ধ আছে কিনা! তখন বললেন যে তিনি যখন জন্মান তখন বর্মা ভারতবর্ষেরই অংশ, আর সেই হিসাবে তিনি ভারতীয় এবং বর্মীয়। একদিন থিব পরিবারের সঙ্গে নিকট আত্মীয়তার বন্ধন তাঁর মায়ের ছিল।

পরদিন সকালে স্যার লোরেন বললেন যে তিনি কয়েকটি পরিবারকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন, আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। অর্থাৎ সেদিনও আমার রওনা স্থগিত রইল।

বিকালে স্বামী-স্ত্রী আমাকে নিয়ে মোটরে বেরলেন ইয়র্ক ক্যাথিড্রাল দেখবার জন্য, তারপর লেমিংটন স্পা দেখতে গেলাম। আমাদের দেশে বক্রেশ্বর বা রাজগীরের মতো। গরম জলের স্প্রিং আছে, সে জল গন্ধকমিশ্রিত, সেজন্য নানারকম বাতজাতীয় রোগের পক্ষে খুব উপকারী।

ইয়র্কের একটা দোকানে গাড়ি থামল। লেডি ডানবার আমার জন্য খুব সুন্দর একটা পশমের স্কার্ফ কিনে আনলেন। আমি অনেক ধন্যবাদ দিয়ে নিলাম। বাড়ি ফিরে স্ট্যানকে আমরা তিনজনে মিলে একটা চিঠি লিখলাম। সে সেই সময় দিল্লিতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখাতে কাজ করে।

রাত্রে বাড়ি আলোয় আলো। ছটি মাঝবয়সী স্বামী-স্ত্রী ডিনার খেতে এলেন। খাবার শুরু হবার আগে স্যার লোরেন আমার বড় করে পরিচয় দিলেন। এরপর আমার পালা। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ডানবারদের আতিথেয়তার কথা বললাম। কেমন করে তাঁদের সঙ্গে আমার জানাশোনা হল। এরপর তারা ভ্রমণকাহিনী শুনতে চাইল। ডিনার আমার মাথায় উঠে গেল। এই অবস্থায় আমি দেখেছি যে আমার ভাগ্যে খাওয়া হয় না। কথা বলতেই সময় কেটে যায়। যাহোক আমি শুরু থেকে ইয়র্ক পর্যন্ত মোটামুটি একটা

ইতিবৃত্ত দিলাম । পরে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল । এর ফাঁকে ফাঁকে কিছু খেয়ে নিলাম । খুব ভালো খাস ইংরিজি ডিনার হয়েছিল । ভ্রমণকাহিনী শুনে মনে হল সবাই খুশি এবং ডানবারদের সঙ্গে একমত যে আজকালকার ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাঙালিরা খুব সাহসের পরিচয় দিচ্ছে ।

আমি আমার নির্দিষ্ট ঘরে শুতে যাচ্ছি এমন সময় দেখি লেডি ডানবার এক কাপ ওভালটিন ও একটা আপেল আমার বিছানার পাশে টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে আসছেন । আমাকে সামনে দেখে বললেন তুমি তো ডিনার খাবার সুযোগ পাওনি তাই খিদে পাবে । সেজন্য কিছু খাবার রাখলাম । আমাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন আমি আরও দুদিন থাকতে পারি কি তাঁদের বাড়িতে? আমি না বলাতে তিনি দুঃখিত হয়ে বললেন, আচ্ছা কাল দেখা যাবে ।

স্ট্যানের মাকে দুঃখ দিয়ে আমার খারাপ লেগেছিল, তাই প্রাতরাশ খাবার টেবিলে পরদিন আমি বললাম ইউ উইন, আই স্টে ফর টু মোর ডেজ । আনন্দে ভদ্রমহিলা দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন । পরদিন রাত্রে বারোজন বন্ধুর নেমন্তন্ন হল । আমি গল্পচ্ছলে ধীরে-সুস্থে খেতে খেতে আমার ভ্রমণকাহিনী সেদিনও বললাম । প্রশ্নোত্তরের সময় মহিলা অতিথিরা প্রায় একবাক্যে জিজ্ঞাসা করলেন আমি বিয়ে করেছি কিনা, আমার কত বয়স এবং আমার মা বাবা আছেন কিনা । আরও কত প্রশ্ন হল মজার মজার ।

সবাই আমাকে ধন্যবাদ জানালেন । ডিনার পার্টি শেষ হল । স্ট্যানের মা বললেন উই আর ভেরি প্রাউড অব ইউ বিমল, অ্যান্ড উই হ্যাভ বিকাম ফন্ড অব ইউ ইন সাচ এ শর্টটাইম । আমিও তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করে শুতে গেলাম ।

দুদিন পরে সকাল নটার সময় আমি লাউঞ্জ স্যুট ছেড়ে ধড়াচুড়ো ও টপবুট পরলাম । তারপর প্রথমে লেডি ডানবারের সঙ্গে করমর্দন করতে গেলাম তিনি হাত ধরে সস্নেহে কাছে টেনে বললেন আমি স্ট্যানকে তোমার মধ্যে পেয়েছিলাম । দেশে ফিরে যেন তোমাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় ও সার্থক হয় ।

স্যার লোরেন আমার দুই হাত ধরে বললেন গড ব্লেস ইউ । তারপর একটা কাণ্ড করে বসলেন । আমার হাতের মধ্যে দুটো দশ পাউন্ডের নোট গুঁজে দিলেন ।

হাতের মুঠো খুলে যখন দেখলাম টাকা, তখন আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল, আমি অপমানিত বোধ করলাম । ধারণাটা হয়তো আমার সম্পূর্ণ ভুল কিন্তু তখন তাই মনে হয়েছিল । আমি ভাবতাম কখনও কারও দয়ার প্রার্থী হব না । একটা দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় খেলে গেল । বাটলার আমার কাঁধে যখন হ্যাভারস্যাক তুলে দিল আমি করমর্দন করে থ্যাঙ্কস বললাম ও একটা দশ পাউন্ডের নোট তার হাতে গুঁজে দিলাম । মেড একটা স্যান্ডউইচের

প্যাকেট নিয়ে এগিয়ে এল। আমিও থ্যাঙ্কস দিয়ে সেটা নিলাম এবং বাকি দশ পাউন্ডের নোট তার হাতে গুঁজে দিলাম। বাটলার ও মেড আমার বদান্যতায় অভিভূত। হাতের মুঠো খুলে দুজনেই প্রায় একসঙ্গে দেখল যে দুখানা বড় নোট। আমার মান-অপমান জ্ঞানটা হয়তো একটু বেশি টনটনে। পরে অনেকবার মনে হয়েছে যে স্যার লোরেন আমার সঙ্গে যে রকম আত্মীয়ের মতো প্রথম থেকে ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর মনে সদিচ্ছাই ছিল অপমানের চিন্তা ছিল না। ভেবেছিলেন টাকা দিলে কত সময় কত কাজে লাগবে। যা হোক আমার ব্যবহারে স্যার লোরেন মর্মাহত হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমি বাটলারকে সাইকেলটা একবার ধরতে দিয়ে বললাম প্লিজ ফরগিভ মি। আই ডু নট অ্যাকসেপ্ট মানি ফ্রম এনি ওয়ান আনলেস আই আর্ন ইট। স্যার লোরেন একটু হেসে বললেন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ অল রাইট অ্যান্ড আই এডমায়ার ইউ অল দি মোর। আমি সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ইয়র্কে থাকতে বি এস এ-র কর্ণধার কমান্ডার হার্বাটের সঙ্গে টেলিফোনে জানালাম যে দুয়েকদিন পরে বার্মিংহাম পৌঁছব। বার্মিংহাম মেল খুব পাবলিসিটি করেছিল। আমি শহরের প্রান্তে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে খবর পেলাম যে লর্ড মেয়র আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। সিটি হলে মেয়রের সঙ্গে দেখা করলাম। খবরের কাগজের রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার উপস্থিত ছিল সেখানে। অনেক গণ্যমান্য লোক ও ভারতীয়দের মধ্যে ডাঃ পার্ডি হাজির ছিলেন। লর্ড মেয়র একটা স্পিচ দিলেন এবং আমার সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রশংসা করলেন। বার্মিংহাম শহরে লোকেদের তরফ থেকে তিনি তিনদিনের জন্য কুইন্স হোটেলে থাকবার নিমন্ত্রণ জানালেন। আমার সেখানে থাকা হল না কারণ ডাঃ ও মিসেস পার্ডি আগেই আমাকে তাঁদের বাড়িতে থাকবার জন্য বলেছিলেন।

সিটি হল থেকে বি এস এ-র অফিস ও কারখানায় গেলাম। কমান্ডার হার্বাট মস্ত রিসেপশনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। অফিসের সমস্ত পদস্থ কর্মচারী কমান্ডারের ঘরে উপস্থিত। একটা ককটেল পার্টি হল। আগেই বলেছি কমান্ডার হার্বাট বি এস এ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমরা যখন কলকাতায় টাউন হল থেকে তিন বছর আগে যাত্রা শুরু করি, কমান্ডার হার্বাট উপহার হিসাবে আমাদের চারজনকে চারখানা সাইকেল দিয়েছিলেন।

সেদিনের লোকের ভিড়, উৎসাহ ও মিঃ জে এম সেনগুপ্তের বক্তৃতা তিনি ভোলেননি। ককটেল পার্টিতে সেই কথা উল্লেখ করে বললেন, মানুষ ও মেশিন দুই-ই সব বাধা বিপত্তির ঊর্ধ্বে উঠেছে। সেদিন কলকাতায় আমি নিশ্চিত জানতাম যে বি এস এ সহজে হার স্বীকার করবে না। কিন্তু তখন আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল যে চারজন আরোহী শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকবে কিনা। মরুভূমির অসহ্য গরম এবং আল্পসের ওপর বরফের ঝড়ে

অসহ্য শীত কেমন করে সহ্য করবে ভেবে ঠিক করতে পারিনি, বিশেষ করে যখন শুনলাম যে কারও কাছে একটা পয়সাও নেই।

আজ আমরা সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মিঃ মুখার্জিকে যাতে তিনি সফলকাম হন এবং সুস্থ দেহে বাড়িতে ফিরতে পারেন। তিনি একটা চিঠি খুলে সবার জন্য পড়লেন। তাতে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি জানিয়েছিলেন যে তাঁরা আমাকে ও সমস্ত অফিসারদের নেমন্তন্ন করেছেন কর্মচারীদের সঙ্গে ক্যান্টিনে লাঞ্চ খাবার জন্য। কমান্ডার হার্বার্টও নিমন্ত্রিত। লাঞ্চ খাবার সময় একঘণ্টা বেশি ছুটি দেবার অনুরোধ সেই চিঠিতে ছিল। সেদিন বিকালে একঘণ্টা বেশি পরিশ্রম করে তারা তা পুষিয়ে দেবে জানিয়েছেন।

বিরাট ক্যান্টিনের হল, তার একপাশে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে, চার-পাঁচজন লোক বসবার উপযুক্ত।

খুব উত্তেজনা ও উৎসাহের সঙ্গে মিটিং হল। ইতিমধ্যে আমার সাইকেলের নম্বর থেকে বি এস এ-র লোকেরা বের করে ফেলেছে কোন শ্রমিক সেটা ১৯২৬ সালে অ্যাসেম্বল করেছে। তাকে প্ল্যাটফর্মের ওপর আসতে বলা হল। একজন খুব লাজুক যুবক এল আমার কাছে। সবার দিকে তার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে আমি বললাম যে সবাই আমাকে বাহাদুরি দিচ্ছে কিন্তু যে লোকটি সেটা সম্ভব করেছে সে এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। আমি চাই তোমরা তারও যোগ্যতা স্বীকার কর। বলার সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার শ্রমিক একসুরে কাম অন পিটার বলে উঠল। অনেক হাততালি এবং শেষকালে বলল থ্রি চিয়ার্স ফর গ্লোব ট্রটার মুখার্জি, থ্রি চিয়ার্স ফর কমান্ডার হার্বার্ট, অ্যান্ড থ্রি চিয়ার্স ফর পিটার। হল ফেটে পড়ল হিপ হিপ হুড়রে ধ্বনিতে। সবাই যখন থামল তখন আমি চিৎকার করে বললাম, থ্রি চিয়ার্স ফর বি এস এ বাইসাইকেল। আরেকবার হাততালি ও হিপ হিপ হুড়রে হর্ষধ্বনি হল।

লাঞ্চ ছিল খুব সাধারণ সাদাসিধে ব্যাপার, লিভার অ্যান্ড কিডনি পাই ও পরে প্রুনশ ইন সিরাপ। আর চা যে যত চায়।

সন্ধ্যাবেলায় কমান্ডার হার্বার্টের বাড়ি এবং শেলি ওকে বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল ককটেল খাবার ও আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। সেখানে মিঃ হ্যারিসন নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি ডানলপ রাবার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। যেহেতু আমি ডানলপ টায়ার ব্যবহার করেছি, তাই তিনি তাঁদের কারখানায় যাবার নিমন্ত্রণ করলেন পরদিন। কমান্ডার হার্বার্টের বাড়িতে সাইকেল ব্যবসায়ের বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হল। সেখানে বিরাট ডিনারের ব্যবস্থা হয়েছিল। সবাই আমার কাছে ভ্রমণকাহিনী

শুনতে চাইল । আমি যথাসাধ্য বকবক করলাম । আর তারপর হর্ষধ্বনি ও হাততালি । আমি বললাম সে সবই কমান্ডার হার্বাটের প্রাপ্য ।

খুব ঘটা করে আমার বি এস এ সাইকেলটা শহর প্রদক্ষিণ করবে এই ব্যবস্থা হয়েছিল । আমারও গাড়ির সঙ্গে থাকার কথা কিন্তু আমি নারাজ বলে গেলাম না ।

বার্মিংহাম শহরের উপকণ্ঠে বর্নভিল নামে খুব সুন্দর জায়গায় ক্যাডবেরিজ চকোলেটের কারখানা আছে । ক্যাডবেরি কোম্পানির অফিস থেকে নেমন্তন্ন পেলাম কারখানা দেখবার । তার কর্ণধার, হোরেস আলেকজান্ডার যিনি পরে স্যার হোরেস হন, ক্যাডবেরি পরিবারের একজন বিশিষ্ট লোক ও পার্টনার । দুঃখের বিষয় সেদিন বিশ্বশান্তির ব্যাপারে তিনি জেনেভায় একটি মিটিংয়ে গিয়েছিলেন,তাই আমার সঙ্গে আলাপ হল না । কোয়েকার সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্যাডবেরি পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

স্যার হোরেস আলেকজান্ডারের নাম সব ভারতীয়দের কাছে স্মরণীয় দুটি কারণে, প্রথম হচ্ছে তিনি ভারতবর্ষে বসবাস করতে আসেন এবং কলকাতায় ফ্রেন্ডস অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন । গান্ধীজি স্যার হোরেসের ব্যবহারে আকৃষ্ট হন, যার ফলে স্যার হোরেস আলেকজান্ডার গান্ধীজির অনুবর্তী হন । বিদেশি, যাঁরা গান্ধীজির সঙ্গ কামনা করে তাঁর সঙ্গে মিলেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্যার হোরেস অন্যতম ।

আমি ক্যাডবেরির কারখানা দেখে যখন বেরিয়ে আসছি তখন আমার হাতে মস্ত বড় এক বাক্স চকোলেট দিয়ে গেল একটি সুন্দরী তরুণী, আর সেইসঙ্গে কনগ্র্যাচুলেশনস বলে করমর্দন করল ।

সন্ধ্যাবেলায় ইন্টারন্যাশনাল হাউস, শেলী ওকে নেমন্তন্ন ছিল । এটি একটি নানান দেশীয় ছাত্রাবাস । তারা সবাই পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পড়াশোনা করত । খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমাকে ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রহণ করল । আলাপ হল অনেকের সঙ্গে । চা-বিস্কুট খাওয়াল । সেদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল স্টুডেন্ট লাইফ ইন ইন্ডিয়া । আমি যথাসাধ্য ভারতবর্ষে ছাত্রজীবনের কথা পুরাকালে যেমন ছিল অর্থাৎ টোলে পড়া, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, নালন্দা থেকে বর্তমান যুগের (বিশ শতকের) স্কুল-কলেজ পর্যন্ত বললাম । সেই সময় পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা আজকের দিনের মতো প্রসার লাভ করেনি । কলেজে পড়া মেয়ের সংখ্যা তখন প্রায় এক হাতে গুনে ফেলা যেত । আজকাল যেমন মনে হয় ঠিক তার উল্টো । মেয়েরাই পড়াশোনা করে আগ্রহের সঙ্গে, ছেলেরা সিনেমা, পলিটিক্স, খেলাধুলা, মারপিট নিয়েই ব্যস্ত, পড়ার সময় কোথায়?

আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেকে উৎসাহী হয়ে প্রশ্ন করল, বিশেষ করে বার্মিংহাম মেল কাগজে আমার সচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে । অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা হল ।

ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ডিনার খাবার পর ফিল্ভম স্লাইড দিয়ে আমার তোলা ভারতবর্ষের মন্দির, স্থাপত্য সম্বন্ধে ছবি দেখালাম । মনে হল সবাই ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীতের ছবি দেখে মুগ্ধ । আমাদের দেশের সম্বন্ধে এদের ধারণা এতই কম যে সেদিক থেকে আমাদের অবস্থা প্রায় আফ্রিকার টাঙ্গানিকা কিংবা উগান্ডার সামিল ।

কথাবার্তা বলতে এত দেরি হয়ে গেল যে আমি তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটোবার চেষ্টা করছিলাম । ছেলেমেয়েরা নাছোড়বান্দা, তারা বলল যে রাত্রিবাস হস্টেলে করার ব্যবস্থা হয়েছে । পরদিন প্রাতরাশের পর ছুটি পাব । আমি রাজি হলাম এক শর্তে যে আমার পরে, নানা দেশের ছেলেমেয়েরা গান গেয়ে বা নেচে তাদের দেশের পরিচয় দেবে ।

জার্মান, ফরাসি, আফ্রিকান (বান্টু), নরওয়েজিয়ান ও সুইডিশ ভাষার অনেক গান হল । বান্টু ছেলেটি আফ্রিকার গোল্ডকাস্ট-নিবাসী । তার যেমন গলা তেমনই গাইবার ক্ষমতা ।

রাত দশটার পর নাচ আরম্ভ হল । অনেকের সঙ্গে নাচলাম । আগে নাচের নামে আমার গায়ে জ্বর আসত । কেবল মনে হত যদি পা মাড়িয়ে ফেলি, এখন সে অবস্থা কেটে গেছে, রীতিমতো উপভোগ করতে শিখেছি । রাত দুটো পর্যন্ত নাচ গান হল । ভাগ্যে সেদিন শনিবার ছিল । আমার কোনও কাজ ছিল না পরদিন । দুশো পরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমি একমাত্র ভারতীয় । আমার এত খাতির এবং জনপ্রিয়তায় ভালোই লাগছিল মনে মনে ।

রবিবার প্রাতরাশ খেয়ে ইন্টারন্যাশনাল হাউসের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম ।

বার্মিংহামে ফিরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল । তিনি একজন বিখ্যাত সাইকেল সিট প্রস্তুতকারক, ব্রুকসের পার্টনার, মিঃ মিড তাঁর নাম । বাড়িতে চায়ের ও রাত্রে ডিনারের অনুরোধ এড়ানো গেল না । বিকালে মিডের বাড়ি উপস্থিত হলাম । একটি ছোটখাটো পার্টি হচ্ছিল । সবাই অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাকে তাদের মাঝখানে বসাল, তারপর চায়ের সঙ্গে যথারীতি প্রশ্নোত্তর হল । অ্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধে সবাই জানতে উৎসুক ।

চায়ের পর অতিথিরা একে একে বিদায় নিল । মিডদের বাড়ির সংলগ্ন বাগানে একটু বেড়াতে গেলাম, একমাত্র কন্যা মিস আইরীনি মিডের উৎসাহে । সুন্দর সাজানো বড়লোকের বাগান, দেখলেই মনে হয় যেন পৃথিবীর সবরকম ফুল ও রঙের সমাবেশ সেখানে হয়েছে ।

ডিনার খাবার পর বাড়ি যাব ভাবছি এমন সময় আইরীনি তার মা বাবাকে বলল সে আমাকে নিয়ে ডান্সে যাবে । মিঃ মিড বললেন বেশ তো । গাড়ি নিয়ে যাও । মিসেস মিড

বললেন, আইরীনি একা বাড়ি ফিরবে সেটা কি ভালো হবে । আমি তখন বললাম যে বাড়িতে পৌঁছে আমি ট্যাক্সি করে ফিরে যাব । সেই কথাই রইল । আইরীনি গাড়ি আনতে গেল । যতদূর সম্ভব মিসেস মিডকে আশ্বস্ত করে গাড়িতে উঠলাম । আধুনিকা আইরীনি প্রথমেই আমাকে নাম ধরে ডেকে তার পাশে বসতে বলল । সে কিছু বলতে চায় মনে হল । একটা ডান্স হলে গিয়ে গাড়ি থামল । দু-চারবার নাচবার পর আইরীনি অনেকটা সহজ ও শান্তভাবে একটা টেবিলে বসল এবং গল্প জুড়ে দিল । বেশিরভাগ প্রশ্ন আমার সম্বন্ধে, আমি বিয়ে করেছি কিনা । আইরীনির ধারণা আমি এই ভ্রমণ শেষ করবার আগে মৃত্যুর কবলে পড়ব । আমি যে বেঁচে আছি সেটা অশেষ সুকৃতির ফল । চিরকাল যে আমার সৌভাগ্য অটুট থাকবে এ কথা কে বলতে পারে ।

আমি ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কী করতে বল শুনি একবার? আইরীনি উৎসাহিত হয়ে বলল যে আর বিপদের মধ্যে জেনেশুনে যেও না । তখন ঠাট্টা চালিয়ে বললাম তারপর? আইরীনি আমার হাত ধরে বলল, আমাকে সঙ্গে নাও । বিপদের সম্ভাবনা কমে যাবে । আমার টাকার অভাব নেই ।

উত্তর শুনে এবং আইরীনির মিনতিভরা মুখের দিকে চেয়ে আমি ঠাট্টা ভুলে তখন চমকে উঠেছি । এত অল্প আলাপে কোনও শিক্ষিত মেয়ে তার জীবনের একটা কঠিন সমস্যা এত সহজে নিষ্পত্তি করতে পারবে আমি কল্পনাও করিনি, ভাবা তো দূরের কথা । আমি বললাম, পৃথিবী ভ্রমণ আমাকে শেষ করতেই হবে । ইট ইজ সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মি । আমি কথা দিচ্ছি যে জেনেশুনে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব না । অনেক অনুরোধেও যখন কোনও ফল হল না, তখন আইরীনি হাল ছাড়ল । নাচবার জন্য আইরীনিকে যখন টানলাম, দেখলাম তখন সে আনমনা । অবস্থাটা হাল্কা করবার জন্য আইরীনিকে তার নিজের কথা বলতে বললাম । সে স্কুলের ও কলেজের কথা এবং দুজন মেয়ে বন্ধুর কথা বলল । একজন বন্ধু মার্গারেটের সম্প্রতি বিয়ে হয়ে গিয়েছে । ছেলে বন্ধু নেই । ছেলে বন্ধু চায় না, ছেলেরা মিথ্যা ব্যবহার করে বলে । আমি যে ছেলে সে কথা মনে করিয়ে দিলাম । আইরীনি বলল যে ইন্ডিয়ানস আর নট লাইক দ্যাট । আমি চা খাবার সময় সমবেত লোকেদের যখন অ্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধে বলছিলাম আইরীনি নাকি ঠিক করেছিল আমাকে মরতে দেবে না । আমি ভাবলাম নিশ্চয় মনস্তাত্বিকরা বলতে পারবেন আইরীনি কেন অমন মনস্থ করেছিল ।

আইরীনিকে বাড়ি পৌঁছে দেবার পথে কয়েকবার শুনলাম যে সে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে, একথা আমি যেন না ভুলে যাই । ইনফ্যাটুয়েশন কাকে বলে আমি প্রত্যক্ষ করলাম । আইরীনির জন্য দুঃখিত বোধ করা ছাড়া আর বেশি কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না । সে কিন্তু সিরিয়াস ।

বিছানায় শুয়ে অনেক রাত্তির পর্যন্ত আইরীনির কথা ভাবলাম আর মনে মনে বললাম, এমন অপাত্রে কেন কোনও মেয়ে 'রসস্য নিবেদনং' করতে গেল ।

আইরীনিকে আমার কোনও ঠিকানা দিতে পারলাম না, নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না । তার ঠিকানা আমি নিলাম কিন্তু মনে মনে জানতাম যে আমি চিঠি লিখে কোনওদিন ভাবপ্রবণ সুন্দর তরুণীর জীবন আর ঘোলা করে দেব না ।

পরদিন সকালবেলায় তল্পিতল্পা গুটিয়ে রওনা হলাম । সারাদিন সাইকেলে মিডল্যান্ডসের উঁচু-নিচু রাস্তা পার হয়ে অক্সফোর্ডে পৌঁছলাম । ইংল্যান্ড দেশটা খুবই সুন্দর যদি বৃষ্টি না হয় । মনে হয় সমস্ত দেশ সবুজ কার্পেটে মোড়া । অক্সফোর্ডে সাইক্লিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটা হস্টেলে উঠলাম । ঘর বলতে ছোট ছোট কিউবিকল, চারদিকে মাথা পর্যন্ত হাল্কা কাঠের দেওয়াল । একরাত থাকতে মাত্র এক শিলিং লাগে । অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারদের এই সুবিধা দেওয়া হয় । আমাকে অনেকদিন আগে সভ্য করা হয়েছিল । তখন সমস্ত অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালিত হোটেলের তালিকা আমাকে দিয়েছিল এবং সেইসঙ্গে একটা চিঠিতে সর্বত্র আমাকে সবরকম সুবিধাসমেত থাকতে দেবার অনুরোধ ছিল ।

অক্সফোর্ড শহরের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে, শত শত বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কলেজ সব দেখতে বেরলাম । বহু কলেজের ছবি তুলে একটা সিরিজ করলাম, স্লাইডে দেখাবার মতলবে । এখানে অনেক লোকের বাস, মরিসের কারখানার জন্য ।

বেশ কিছুদিন অক্সফোর্ডে কাটালাম । এ জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল । ইফলি খেলার মাঠ শহরের মধ্যে । প্রায়ই খেলা দেখতে যেতাম । আইসিস নদীতে ছেলেমেয়েরা রোয়িং, পান্টিং, কেনোয়িং ইত্যাদি নানারকম বোট নিয়ে দাঁড় বাইবার খেলায় ব্যস্ত । নদী খুব অপরিসর, নালা বললেই চলে । পরিষ্কার জল, টেম্স নদীতে গিয়ে মিলেছে ।

অক্সফোর্ড ছেড়ে হাই ওয়াইকম্বের পথে লন্ডনের দিকে রওনা হলাম । ওয়াইকম্বে এসে দেখি রাস্তায় ভিড় । বিখ্যাত আমেরিকান বক্সিং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন, জিন টানে তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে চার্চ থেকে বেরচ্ছে । আমি টানেকে কনগ্র্যাচুলেশনস জানালাম । টানে যেমন স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ, তার ব্যবহারও তেমনই অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক । সবাই টাকার লোভেই বক্সিং করে যায় যতদিন সামর্থ্য থাকে, টানেই একমাত্র ব্যতিক্রম । সে শ্রেষ্ঠ মুষ্ঠিযোদ্ধার আসন যেদিন অধিকার করল, তার কদিন পরে বক্সিং থেকে বিদায় নিল । মাঝে মাঝে কাগজে পড়ি যে টানে ব্যবসা করে খুব লাভবান হয়েছে এবং সুখে ও সম্মানের সঙ্গে ঘর সংসার করছে ।

লন্ডনে ফিরলাম । গোল্ডার্স গ্রিনে উডল্যান্ডসে তুষার রায়ের বাড়িতে উঠলাম । আবার ব্যাঙ্কের কাজ ও পড়াশোনা খুব মন দিয়ে করতে লাগলাম ।

যথাসময়ে A I B London পরীক্ষা দিলাম এবং আশাতীত ভালো ফল পেলাম । সারাজীবন তো পৃথিবী ভ্রমণ করে কাটাতে পারব না । ভবিষ্যতে একদিন স্থায়ীভাবে কোথাও থাকতে হবে এবং সংসারের সব দায়িত্ব পালন করতে হবে । অর্থ ছাড়া সেসব কিছুই সম্ভব নয় । এই পরীক্ষায় পাশ করার ফলে যে কোনও ব্যাঙ্কে ভালো কাজ করার উপযুক্ত হলাম ।

শীঘ্রই লন্ডন ছেড়ে উত্তর পুবের রাস্তা ধরলাম এবং রাতের অন্ধকারে কেম্ব্রিজে পৌঁছলাম । ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটি কেম্ব্রিজ । অক্সফোর্ড যেমন আর্টস বিষয় পড়ানোর জন্য বিখ্যাত, কেম্ব্রিজ তেমনই বিজ্ঞানের নানা বিভাগের জন্য খ্যাতি লাভ করেছে । ক্যাম নদীর ওপর কেম্ব্রিজ শহর । একেবারে ইউনিভার্সিটি টাউন যাকে বলে । দুদিন এখানে থেকে উত্তরে চলতে আরম্ভ করলাম । ইংল্যান্ডের লেক ডিস্ট্রিক্ট অপূর্ব সৌন্দর্যময় শুনেছিলাম । সবটা ভালো করে ঘোরার ইচ্ছে ।

প্রথমে দেখলাম স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এভনে শেক্সপিয়ারের বাড়ি ও তার সঙ্গে তাঁর মিউজিয়াম । রাত্রে শেক্সপিয়ারের একটা প্লে দেখলাম ইমোজেন ।

কবিওয়ার্ডসওয়ার্থের বাড়ি দি ডাভ কটেজ সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্যস্থান আমার কাছে । এখন বাড়িটা একটা মিউজিয়াম । আগেকার দিনে আমরা ছাত্রাবস্থায় পড়তাম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, শেলী, কীটস, বায়রন, স্কটের লেখা কবিতা । যেসব জায়গার ওপর লেখা বা যেখানে লেখকদের জীবন কেটেছে সেইসব জায়গা হয়ে গিয়েছিল তীর্থস্থানের মতো । এমন পরিপাটিভাবে সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে যে দেখে তৃপ্তি হয় ।

৭

স্কটল্যান্ডের প্রথম শহর গ্লাসগোতে পৌঁছলাম বৃষ্টির মধ্যে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, নিশীথরঞ্জন দাস আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল তার কাছে থাকবার জন্য। নিশীথের সঙ্গে আমি বঙ্গবাসী কলেজে পড়েছিলাম। তার কাছে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গল্প শুনতে ভালোবাসতাম। নিশীথের দাদা, সুধীরঞ্জন শান্তিনিকেতনের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম ছিলেন। আমাকে ছোট ভাইয়ের বন্ধু হিসাবে স্নেহ করতেন এবং পরে শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়ের মতো হয়েছিলেন।

নিশীথের সঙ্গে আরও তিনটি ছেলে তাদের কাছে থাকবার জন্য নেমন্তন্ন জানাল, বীরেন রায়, শর্মা ও সলিল সেন (যিনি পরে দিল্লি পলিটেকনিকের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন)। ইতিমধ্যে লর্ড প্রোভোস্ট অব গ্লাসগোর কাছ থেকে নেমন্তন্ন পেলাম দেখা করবার এবং কোবার্ন হোটেলে তিনদিন থাকবার- গ্লাসগো শহরের অতিথি হিসাবে। বিকালে প্রোভোস্ট এক সভা করে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

গ্লাসগো ছেড়ে স্কটিশ লেক ডিস্ট্রিক্ট দেখতে গেলাম। সুন্দর গাছপালা, কাচের মতো লেক ও হেদার ফুলে ভরা পাহাড়ের সমাবেশ, ভাষায় বলবার নয়। এডিনবরা আমার গন্তব্য স্থান ছিল। পথে লিনলিথগো ক্যাসল দেখতে গেলাম। লর্ড লিনলিথগো প্রথমবার যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন তখন আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়। আমরা কলকাতায় স্টার থিয়েটারে চিরকুমার সভা অভিনয় দেখাই। লিনলিথগো পরে ভারতবর্ষে ভাইসরয় হন। আমি কার্ড পাঠাবার পরেই তিনি বেরিয়ে এলেন এবং সাদরে গ্রহণ করলেন। তখন মস্ত বড় পার্টি চলছিল। আমাকে সবার সামনে উপস্থিত করে পরিচয় দিলেন। সবাই দামি ড্রেস পরে এসেছে, আমি ধুলায় ধূসরিত বেশভূষা পরে তাদের মধ্যে উপস্থিত। সবাই ড্রিঙ্ক অফার করল এবং আমাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করল। লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে আলাপ হওয়া থেকে স্কটল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছনোর ছোট্ট বিবরণ দিলাম। আমার জন্য ডাইনিং রুমে খাবার তৈরি ছিল। খেয়ে এসে আবার পার্টিতে যোগ দিলাম। পরদিন সকালে এডিনবরার পথ ধরলাম।

এডিনবরা শহরটা খুব সুন্দর। শহরের একদিকে পাহাড়। উপত্যকার ভেতর দিয়ে ট্রেন যাতায়াত করে। পাহাড়ের ওপর অনেক উঁচুতে একটা সুন্দর কাসল আছে নাম

হলিরুড ।

ভারতবর্ষে থাকতে ইংরেজ, স্কটিশ, আইরিশ ইত্যাদির বিশেষত্ব কী এবং কোনও পার্থক্য আছে কিনা বুঝতাম না । স্কটিশ জাতির লোকেরা আমাদের মতো স্বাধীনতাকামী এবং সেইজন্যই ভারতীয়দের স্বগোত্র বলে মনে করত এবং সর্বত্র সহৃদয় ব্যবহার জানাত আমাকে । এমনকী যে সব স্কট্‌ম্যান আমাদের দেশে বড় বড় কাজ করেছেন, কিংবা যে সব আই সি এস ছুটিতে দেশে ফিরেছেন তাঁদেরও আমার প্রতি ব্যবহার আশ্চর্যজনক ভালো দেখেছি । নিজ পরিবারের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তারপর গান-বাজনা, গল্প-গুজব বা তাসখেলা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মতো । আমি যেন কত কালের চেনা । সুয়েজ খাল পার হলেই এইসব পুরুষ পুঙ্গব ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল ফোর্সের একজন কেউকেটা, সে কথা যেন তাদের মনে পড়ে যেত । তখন ভারতীয়কে খাতির করা তো দূরের কথা বরং হরিজনের পর্যায়ে ফেলে দূরত্ব বজায় রাখতে ব্যস্ত থাকত ।

এডিনবরার প্রোভোস্ট (লর্ড মেয়র) আমার কাছে নেমন্তন্ন পাঠালেন শহরের অতিথি হয়ে দুদিন থাকবার জন্য । ভারতীয় ছাত্রগণ বিশেষ করে ডাক্তারি পড়ছিলেন যাঁরা, তাঁরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ।

বুড়ো মিত্র নামে এক ডাক্তার আমাকে তাঁর কাছে থাকবার নেমন্তন্ন করলেন । বুড়ো মিত্রর মনটা খুব ভালো । কত ছেলে পড়িয়ে পাশ করিয়ে দিয়েছে তার ঠিক নেই । পরীক্ষার দিন নিজে কিছুতেই মন প্রস্তুত করে পরীক্ষার হলে বসতে পারত না । ফলে জ্ঞান ও বয়স দুই বাড়ছিল । সন্ধ্যা হলে স্কটল্যান্ডের সেরা বোতলের আরাধনা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল । যাহোক কয়েক বছর পর মিত্র ভালোভাবে পাশ করল এবং আলজিরিয়াতে (আফ্রিকায়) চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল বলে শুনেছি ।

একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে, কলকাতা থেকে আমার এক ছোট বন্ধু একটা চিঠি লিখে আমাকে উৎসাহ দিয়েছিল, তার নাম ধীরেন বসু । আমার নাম লিখেছে খামের ওপর । তারপর ইন্ডিয়ান গ্লোব ট্রটার অন বাইসাইকেল লেখা । ঠিকানা জানত না বলে লিখেছিল, হোয়েরেভার হি মে বি ইন ইংল্যান্ড । প্রথমে লন্ডনে যেখানে ভারতীয়রা একত্র মিলিত হয় সেইসব জায়গায় খোঁজ করে চিঠিটা স্কটল্যান্ডের এডিনবরা শহরে আমার পিছনে ধাওয়া করে ঠিক পৌঁছেছিল ।

ট্রসাক্স আমার গন্তব্যস্থান । তারপর ফিরতি পথে ইংল্যান্ডের কোনও একটা পুবদিকের বন্দর থেকে জাহাজ নিয়ে নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড প্রভৃতি উত্তর প্রধান দেশে ভ্রমণে যাবার ইচ্ছা । উত্তর স্কটল্যান্ড বেড়াবার সময় ঘন পাইন দিয়ে ঘেরা একটা খুব সুন্দর

জায়গায় পৌঁছলাম । তারই নাম ট্রসাক্স । এই অঞ্চলে অনেক কাগজে আমার কথা লেখা হয়েছিল বলে, আমার পক্ষে পরিচয় দেওয়া সহজ হয়ে গিয়েছিল ।

এবারডিন শহরে পৌঁছলাম । খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর যেজন্য সবাই একে 'সিলভার সিটি অব দি নর্থ' বলে । এবারডিন শহরের মেয়রের কাছ থেকে আহ্বান এল পরদিন দুপুরে শহরের বড় বড় লোকদের সঙ্গে দেখা করবার এবং মধ্যাহ্নভোজের । যাঁরা ভোজনে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দুয়েকজন কলকাতায় থেকেছেন ।

মেয়র বললেন যে আমি একজন অদ্ভুত ভাগ্যবান পুরুষ । দারুণ গরম থেকে এসে সামান্য গরম জামার ওপর নির্ভর করে, বুভুক্ষু অবস্থায় ইউরোপের দারুণ শীত কাটিয়েছি বললে কম বলা হয়, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এবং মরিনি- এ কী আশ্চর্যের কথা! সকলেই খুব তারিফ করলেন । এমন সময় মেয়র বললেন যে একদিন পরে স্কটল্যান্ডের নিজস্ব মাছের ট্রলার জাহাজ আইসল্যান্ড অঞ্চলে মাছ ধরতে রওনা হবে । যেহেতু আমি ভাগ্যবান পুরুষ বলে তিনি মনে করেন, তাই তাঁর বদলে আমি যেন জাহাজের নামকরণ করি ।

এবারডিনে সিটি ফাদার্সদের বাড়ি দুদিন নেমন্তন্ন খেলাম । তারপর এল জাহাজ নামকরণের পালা । সেদিন সমস্ত এবারডিন শহরের লোক বন্দরে ভেঙে পড়েছিল । তারা অনেকেই জাহাজের মেডেন ভয়েজ, অর্থাৎ প্রথম সমুদ্রযাত্রা দেখার জন্য আমন্ত্রিত । মহা উল্লাসের মধ্যে জাহাজের নামকরণ হল 'মার্গারেট ক্লার্ক' একটি ছোট নয় বছরের মেয়ে, বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান, তার নামে । বাবা রোনাল্ড ক্লার্ক একজন মোটাসোটা মাঝবয়সী লোক । ব্যবসায় অনেক টাকা করেছে, এবার ট্রলারের ব্যবসা ধরল ।

আমি এক বোতল শ্যাম্পেন ভাঙলাম জাহাজের গায়ে । তারপর জাহাজটা নড়ে চড়ে উঠে জানিয়ে দিল সে যাবার জন্য প্রস্তুত । জাহাজে ওঠবার জন্য মিঃ ক্লার্ক আমাকে অনুরোধ করল । জাহাজে উঠে দেখি তিল ধরবার জায়গা নেই । ডেকের ওপর খাবারের পাহাড় জমে রয়েছে । যত স্যান্ডউইচ ছিল একটা রেজিমেন্ট খাওয়ানো যায় । কত বোতল বিয়ার ছিল গুনে শেষ করতে পারলাম না । জাহাজটা সারাদিন নর্থ সীতে পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যায় এবারডিনে ফিরবে । জাহাজে উঠে নানারকম ও স্তরের লোকদের দেখলাম । মেয়রের কাছেই মিঃ ক্লার্ক, তাঁর কন্যা ও আমি ছিলাম ।

স্কটল্যান্ডের লোকেরা কী পরিমাণ মদ খায়, বিশেষ করে যদি বিনামূল্যে হয়, তার প্রমাণ সেদিন পেলাম । দুপুরবেলায়ই বেশিরভাগ যাত্রী বেতালা । এই সময় জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ হল । একদিন পরেই জাহাজ অর্কনি ও শেটল্যান্ড দ্বীপ হয়ে আইসল্যান্ড যাত্রা করবে । তখনও একজন নাবিকের কাজ খালি ছিল । আমি ইচ্ছা প্রকাশ

করলাম আইসল্যান্ড যাত্রী-জাহাজে চাকরি নেবার । ক্যাপ্টেন আমাকে কাগজপত্রে সই করতে দিল । আমি মহাখুশি যে আইসল্যান্ড যেতে পারব । ক্যাপ্টেন আমাকে সাবধান করে দিল যে ট্রলারে কাজ নিয়ে আইসল্যান্ডের জলপথে দিনের পর দিন মাছ ধরা, কড লিভার অয়েল তৈরি করার কাজে সময় কাটাতে হবে, এককথায় জলের মধ্যে বাস করতে হবে । তাছাড়া জাহাজের কাজও বেশ কঠিন । শীত সাংঘাতিক, মাইনেও যথেষ্ট । জাহাজের মালিক যখন শুনলেন আমি নাবিক হিসাবে নাম লিখিয়েছি, তিনিও খুশি হলেন ।

জাহাজের ওপর ব্যান্ডপার্টি ছিল । তারা সমানে উৎসাহ দিচ্ছিল স্ত্রী-পুরুষদের নাচবার জন্য কিন্তু তখন খুব কম লোকই নাচবার অবস্থায় ছিল বা নাচতে উৎসুক ছিল । এমনিভাবে ট্রলারের প্রথম সমুদ্রযাত্রা শুরু হল ।

পরদিন আইসল্যান্ড যাবার উৎসাহে কয়েকটা গরম জামাকাপড় কিনলাম । কিন্তু অয়েল ক্লথের টুপি ও ওভার-অল যা ছাড়া জাহাজে একদিনও চলে না, তা কিনবার কথা আমাকে কেউ মনে করিয়ে দেয়নি ।

বন্দর লোকে লোকারণ্য । একজন আমাকে বললেন যে জাহাজে কাজ করবার জন্য নাম তো লিখিয়েছি কিন্তু আমার ধারণাই নেই আর্কটিক সমুদ্রে, আইসল্যান্ডে ট্রলার চালানো কী কঠিন জীবন । তিনি খুব সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে বাংলাদেশে অর্থাৎ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষ হয়ে আমার পক্ষে শীত ও জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে ট্রলারে কাজ করা সম্ভব হবে কিনা । শেষে যখন দেখলেন আমি অবিচল, তখন বললেন, আই উইশ ইউ ভেরি গুড লাক ।

রওনা হলাম । দশ মিনিটের মধ্যে ক্যাপ্টেন সবাইকে ডেকের ওপর একত্রিত করে কার কী কাজ বুঝিয়ে দিল । প্রত্যেক মাসে কাজ বদলে যাবে । তাছাড়া মাছ ধরা বা ট্রলিং ও মাছ কিওরিং শিখে নিতে হবে । যারা কাজ জানে আর যারা জানে না দুভাগ হল । জানার সঙ্গে অজানা লোক মিলে দল গঠন হল । মোট ১৩ জন নাবিক, ক্যাপ্টেনকে নিয়ে ১৪ জন । আমি ক্যাপ্টেনের সাগরেদ হলাম ।

আমার প্রথমদিনের কাজ হল স্টিয়ারিং হুইল চালানো কম্পাসের নির্দেশমতো । সোজা কাজ । শান্ত সমুদ্র, রোদমাখা দিন, যেন দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি । বিকালে শেটল্যান্ডের উপকূলে জাহাজ পৌঁছল । অনেক ভালো ভালো স্যান্ডউইচ ও সামন মাছ বেঁচেছিল । যার যত খুশি খেলাম । তখনও বুঝিনি জাহাজের নিত্যনৈমিত্তিক আহার কত খারাপ হতে পারে । আমার আটঘণ্টা ডিউটি দুভাগে, আরেকটি যুবকের সঙ্গে । দুদিন পরে আমরা আইসল্যান্ডের দক্ষিণে পৌঁছলাম ।

দিনেরবেলায় ট্রলার থেকে আগ্নেয়গিরি হেকলা দেখা যায় । হেকলার কাছাকাছি অনেক ট্রলার ঘোরাফেরা করছিল । রাতের অন্ধকারে ট্রলারের আলোগুলি মনে হয় জোনাকির মতো । এইসব ট্রলার দূর দূর দেশ, এমনকী রাশিয়া, গ্রিস, জার্মানি থেকে দলে দলে আসে আইসল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে মাছ ধরতে । মাছ বলতে বেশিরভাগ কড ধরে । জলপথে সীমিত জায়গার মধ্যে এত জাহাজ ট্রলিং করতে কেন আসে, তার একটা বিশেষ কারণ আছে । হেকলা আগ্নেয়গিরি থেকে যে লাভা উদগীর্ণ হয় তা সমুদ্রের নিচে চলে যায় । সেখানে বেশ সমতল একটা বেড তৈরি হয়েছে । লাভাতে খুব মিনারেল বা খনিজ পদার্থ থাকে যা মাছের প্রিয় এবং তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী । যুগ যুগ ধরে শত শত ট্রলার প্রতিনিয়ত কড মাছ ধরছে কিন্তু মাছের শেষ নেই ।

এখন মার্গারেট ক্লার্কের সারথি আমি । ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে সংকেত এল, জাহাজের গতি মন্থর করে দেবার । ট্রলিং বোর্ডস লোহার তারে বাঁধা জলের নিচে একেবারে বেড পর্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হল । তারপর জাহাজ চলতে শুরু করল বৃত্তাকারে । তিনঘণ্টা পরে জাল লাগানো ট্রলিং বোর্ড সমুদ্রের নিচ থেকে উঠল বিরাট জালভর্তি এক টনের ওপর মাছ নিয়ে । মাছের চাপে সব মাছ মরে যায় ওপরে ওঠার আগে । সামান্য কিছু বেঁচে থাকে যারা জালের মধ্যে ধরা মাছের তালের ওপরে থাকে ।

জাহাজের ডেকের ওপর কাঠের তক্তা দিয়ে চারদিকে দু-তিন হাত উঁচু বেড়া দিয়ে চারভাগ করা ছিল । ক্রেন দিয়ে জালটা ডেকের ওপর আনা হল, তারপর জালের মুখ খুলে মৎস্য বৃষ্টি হল । চারটে কম্পার্টমেন্ট মাছে ভরে গেল । শুধু কি কড মাছ, তাদের সঙ্গে হ্যাডক, প্লেশ, হ্যালিবাট, ক্যাটফিস, সময়ে সময়ে ছোট অক্টোপাসও উঠত । আরও কত কী ।

ক্রেন খালি জালটাকে টেনে নিয়ে ট্রলিং বোর্ডসুদ্ধ জলে ফেলে দিল । আবার ট্রলিং শুরু হল তিনঘণ্টার মতো । জাহাজের নাবিকরা মহাখুশি যে প্রথম ট্রলিংয়ে এক বড় ব্যাগ (মাছসুদ্ধ নেটকে ব্যাগ বলে) উঠেছে । পরেরবার মাছ উঠতে যে তিনঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে, তার মধ্যে ডেকের ওপরের সব মাছ কেটে সাফ করে ধুয়ে বরফ-ঠান্ডা ঘরে পাঠাতে হবে । পৃথিবীর এই অঞ্চলে জল এত ঠান্ডা যে জাহাজের নিচের তলা, যাকে হোল্ড বলা হয়, সেটা ফ্রিজিং ঠান্ডা । ডেক থেকে সুড়ঙ্গপথে মাছ নিচে পাঠিয়ে দেয় । সেখানে একজন নাবিক মাছটা নিয়ে সাজিয়ে রাখে যতদিনে না ১,০০০ টন হয় । জাহাজ অর্থাৎ ট্রলারটার মোট ক্ষমতা ১,০০০ টন মাল বইবার । তারপর কোনও বন্দরে গিয়ে সব মাছ বেচে দেয় । বেচার পর আবার ট্রলিং ।

এতদিনেও মাছ নষ্ট হয় না তার প্রধান কারণ যে মাছ ধরেই তার পেট কেটে ফেলা হয় । কেবলমাত্র লিভারটুকু রাখা হয়, বাকি অন্ত্র সব ফেলে দেয় । আরেকজন লোক,

সমুদ্রের লোনা জল হোসে করে জোরে মাছের ভেতরটা ধুয়ে নিচে পাঠিয়ে দেয় । এমনিভাবে বোটে অনেকদিন ভালো অবস্থায় মাছ থাকে । কড ছাড়া অন্য মাছ নিজেদের খাবার জন্য যতটুকু দরকার তা রেখে বাকি সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া রীতি ।

জাহাজের ট্রলিং শেষ হলে, যেই মাছের ব্যাগ উঠত, কোথা থেকে দু-তিনশো সী-গাল, আলবাট্রশ জাতীয় নানারকম পাখি জাহাজের ওপর এসে বসত, কেউ সারাক্ষণ কিচিরমিচির করে মাছের ভেতরের জিনিসগুলো সমুদ্র থেকে কুড়িয়ে খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত । মোটকথা পাখিগুলো শীত, জল, ঝড়ে আমাদের সঙ্গী হয়ে জাহাজে আশ্রয় নিত । আমার কত সময় কেটেছে এইসব পাখিদের ঝগড়া, ভালোবাসা, রেষারেষি, খাওয়া ইত্যাদি মুগ্ধ চোখে দেখতে দেখতে, দিনের পর দিন । সমুদ্রের ভীষণ আকর্ষণ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । আমার কানে সী-গালের ডাক ভেসে আসে আজও মাঝে মাঝে, ইচ্ছা করে একবার ফিরে যাই তাদের মধ্যে ।

সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করত আলবাট্রশ বা আম্ব্রেলা বার্ড । এরা মরা মাছ খেতে চায় না । জাল তোলবার পর অনেক মাছ জাল ছাপিয়ে লাফিয়ে জলে চলে যেত । আম্ব্রেলা বার্ড সেইসব মাছ ধরবার জন্য মুহূর্তে দুটো ডানা গুটিয়ে সমস্ত শরীরকে লাঠির মতো বা ছাতার মতো সরু করে জলে ঝাঁপ দেয় । তারপর সাপের মতো মাছের পিছনে তাড়া দিয়ে জলের গভীরে চলে যায় । শেষকালে মাছের চেয়ে দ্রুত গিয়ে সুস্বাদু মাছ ধরে ফেলে । মুখে মাছ ধরেই জলের ওপরে উঠতে আরম্ভ করে । এবং পরের দৃশ্যটি খুব সুন্দর, জল থেকে ওঠবার আগে ছাতা খোলার মতো জোরে দুটো ডানা খুলে যায়, তখন সে আবার পাখি । আলবাট্রশ পাখি মস্ত বড় । ডানার একপ্রান্ত থেকে অন্যদিক পর্যন্ত প্রায় আট-দশ হাত হবে । এত বড় ছাতা মুহূর্তে খোলার দৃশ্য খুব সুন্দর । মাছটা যতক্ষণ সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ না করে ততক্ষণ আলবাট্রশ আকাশে উড়ে বেড়ায় । শেষ হলেই আবার জলে ঝাঁপ, আবার সমস্ত দেহটাকে সঙ্কুচিত করে ছাতার বাঁটের মতো মাছের পিছনে তাড়া ।

আমি লক্ষ করেছি একটা আলবাট্রশ পাখি সারাদিন ধরে মাছ ধরল এবং খেল । রাত্রে দেখতে পায় না বলে বিশ্রাম ।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য পাখি মাঝে মাঝে দেখতাম, নাম Shit hawk. এদের দেখলে সব সী-গাল ভয়ে সচকিত হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যেত । হকের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, যে সী-গাল আকণ্ঠ মাছ খেয়েছে তাকে ধাওয়া করা । অনেকদূর পালিয়ে যাবার পর সী-গাল ক্লান্ত হয়ে সব মাছ বমি করে ফেলে; হক এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে । সী-গাল ছেড়ে দিয়ে তখন সেই বমি করা মাছ খায় । হক নিজে মাছ ধরবে না বা ধরবার চেষ্টা করবে না । সে বমির মাছ খায় । পৃথিবীতে কতরকম জীবই যে আছে তার ঠিক নেই!

আলবাট্রশের মতো সী-গালও অনবরত মাছ খেতে পারে এবং হজমও করে নিশ্চয়ই।

তিনঘণ্টায় এক টন মাছ কেটে ধুয়ে সাফ করে, উঠতে না উঠতে জাহাজের ঘণ্টা বেজে জানিয়ে দিল যে আরেক ব্যাগ মাছ উঠেছে এবং তখনই ডেকের ওপর ধীরে ধীরে ক্রেন নিয়ে আসছে সেটাকে। আবার বিরাট মাছের তাল ডেকের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। কাঠের পাটাতন দিয়ে উঁচু বাক্সের মতো কম্পার্টমেন্ট করা না থাকলে সব মাছ জলে আবার চলে যেত। এবারের ব্যাগে মাছের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেশি মনে হল।

ক্রেন ডেকের ওপর মাছ নামিয়ে ট্রলিং বোর্ডস ও জাল আবার সমুদ্রে ফেলল। আবার ট্রলিং শুরু হয়ে গেল। অন্যদিকে ডেক হ্যান্ডস সবাই পুনরুদ্যমে মাছ কাটা ও সাফ করার কাজে মন দিলাম। এই অঞ্চলে যখন মাছ দুবার উঠল তখন ট্রলারের আর বিরাম নেই, লোকেদেরও বিশ্রাম নেই। কখনও কখনও একটানা ৭২ ঘণ্টা দিবারাত্র এই রকম মাছ ধরা, মাছ কাটা এবং স্টক করার কাজ চলতে থাকে। অর্থাৎ যতক্ষণ মাছ জালে উঠছে কারও বিশ্রাম নেই। যার যখন সুবিধা হচ্ছে সে নিচে গিয়ে খেয়ে আসে।

একবার কোনও মাছ ট্রলিংয়ে উঠল না। ব্যস তিনঘণ্টা ছুটি। তখন নাবিকরা ছুটে যায় বাঙ্কে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে।। হাত ধোওয়ার নাম নেই। সেজন্য সমুদ্রের মাছের আঁশটে গন্ধ, সারাক্ষণ সর্বত্র অঙ্গের ভূষণ হয়ে যায়।

ট্রলারের ক্রুদের মতো এত খাটতে পৃথিবীতে খুব কম মানুষই পারে। জাহাজের লোকেরা প্রায়ই রাম খেত ক্লান্তি ভুলে থাকবার জন্য। জাহাজের কর্তৃপক্ষ যেমন দুবেলা পেট ভরে খাবার জোগাড় দেয় তেমনই রামও দিত বিনামূল্যে।

এখন শরৎকালের শেষ। দিন ছোট হচ্ছে। মাঝে মাঝে তবু সূর্যের উত্তাপ অনুভব করতাম। নভেম্বর মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া ও বরফ দেখা দিল। সমুদ্র উত্তাল। ঢেউ ট্রলারের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল। কাজে একটু অসাবধান হলে ঢেউ টেনে নিয়ে চলে যাবে ভেলার মতো জাহাজের ওপর থেকে। জাহাজ আর তখন জাহাজ-পদবাচ্য নয়। একটা ক্ষ্যাপা সমুদ্রের ওপর বালতির মতো একবার ডুবছে, একবার উঠছে, অথচ ট্রলিং সমানে হয়ে যাচ্ছে। নাবিকরা সেই জলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সব কাজ করছে। ট্রলারের ধার থেকে সমুদ্রের জল মাত্র পাঁচ-ছয় হাত নিচে। তখন সামান্য ঢেউও ট্রলারের ওপর দিয়ে চলে যায়। সমুদ্রে জলের ভীষণ স্রোত। গালফ স্ট্রিমের জন্য জল কখনও শান্ত নয়। একবার ট্রলার থেকে পা ফসকে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। ট্রলারের ডেকের ওপর চারদিকে আষ্টেপৃষ্ঠে লোহার মোটা তার বাঁধা থাকে, ধরে ধরে চলাফেরা করবার জন্য। জলে একবার টেনে নিয়ে গেলে তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। জলের স্রোত কোথায় টেনে নিয়ে যায় তার ঠিকানা নেই।

আমি যখন মেছো জাহাজে চাকরি নিই তখন মনে মনে বিশ্বাস ছিল ভালো ভালো মাছ অনেক খেতে পাব। লোভী বাঙালি ছেলের কাছে এটা ছিল মস্ত বড় প্রলোভন। তারপর 'হা হতোস্মি'! মাছ আছে পর্বতপ্রমাণ কিন্তু রাঁধে কে? তাই, দুবেলা আলুসিদ্ধই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সমুদ্রের মাছ ভালো করে ধুয়ে সেদ্ধ করে দিলে আঁশটে দুর্গন্ধ থাকে। গোলমরিচ গুঁড়ো খুব করে দিয়ে তারপর নাক বন্ধ করে খাওয়া। একদিন খেয়েই মাছ খাবার সব শখ উবে গেল। বেশিরভাগ সময় পাঁউরুটি, মোটা চিনির সিরাপ ও কফি খেয়েই দিন কাটাতাম। সব্জি নেই, মুখরোচক কিছু নেই, খাওয়ার ব্যাপারটা দিনগত পাপক্ষয়ের মতো।

নাবিকদের মধ্যে নানা জাতীয় লোক ছিল। নরওয়েজিয়ান দুজন, কিছু আইসল্যান্ডিক ও বেশিরভাগ স্কটিশ। একটি নরওয়েজিয়ান যুবক, তার বয়স কুড়ি ও আমি ভারতীয়, আমরা ট্রলিংয়ে অনভিজ্ঞ। অন্যরা বহু বছর সমুদ্রে কাটিয়েছে। খাটুনি অত্যধিক বেশি হলেও বেশি টাকার লোভ এবং অপর্যাপ্ত রাম খাবার আকর্ষণ এদের বারবার ট্রলারে টেনে আনে। জাহাজের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে গালাগালি ছাড়া কথা বলতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করতাম বাড়িতে স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের কাছে যখন ফিরে যাবে তখন মুখ সামলাবে কী করে। ওরা সবাই বলত ডাঙায় নামলে আমরা ভদ্র হয়ে যাই। এটা যে অসভ্য ভাষা শুনছ তা একেবারে সামুদ্রিক। এখানে কেবল আমরা- পৃথিবী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। এখানে যা খুশি বলতে পারি আর এমনিভাবে খাটুনির বোঝা লাঘব করি।

শ্রমিকদের মধ্যে আমি সবসময় সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছি। তাদের ধারণা যে যেহেতু আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, সেজন্য আমার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাদের চেয়ে অনেক বেশি। এ ধারণা ভুল হলেও, তাদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। গল্পগুজবের সময় খুব কম পেয়েছি, তবু মুখোমুখি দুজন কাজ করতে আরম্ভ করলেই কেবলই আমাকে ছোট ছেলেমেয়ের মতো বলত, গল্প বল।

সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে আমার জামাকাপড় ভিজে যেত দেখে একজন আমাকে একটা অয়েল স্কিনের টুপি ও ওভার-অল দিল। শীতের দিনে সবাই ৫-৭টা গরম, বাড়িতে বোনা মোটা মোজা পরে থাকত। আমাকে দুটো মোজা দিল যা পরে আমার মনে হল পায়ের আঙুলের সাড় ফিরে এল। ক্যাপ্টেনের অনেকগুলো রবারের বুট ছিল, আমাকে একজোড়া দিল। তবু জাহাজের সব লোকের তুলনায় আমার গরম জামাকাপড় খুবই কম ছিল।

আগেই বলেছি জাহাজটার ডেকের সর্বত্র মোটা লোহার তার, ধরে ধরে চলাফেরা করবার জন্য, জাহাজ থেকে যাতে কেউ জলে না পড়ে যায়। এই লোহার তারে বেশ ধার থাকত, তাছাড়া মাছের গা থেকে কাঁটা বিঁধে হাত ক্ষতবিক্ষত হত। সেজন্য মোটা সুতির দস্তানা ব্যবহার করবার রীতি ছিল। দস্তানা সবসময় জলে ভিজে থাকত। দিনের কাজ

আরম্ভ করবার আগে দুই হাতে একটা প্রলেপ লাগাতাম যাতে সারাক্ষণ লোনা জলে হাত ফুলে না যায় । তারপর ভিজে দস্তানা পরতে কী কষ্ট হত । হাত যেন ঠান্ডায় অসাড় মনে হত ।

এক সপ্তাহ পর আমার ডিউটি বদলে গেল । যত কড মাছের (সেইসঙ্গে অন্য মাছেরও) লিভার জমেছিল সেগুলো থেকে তেল বার করতে হবে । ক্যাপ্টেন আমাকে বুঝিয়ে দিল কেমন করে তেল বের করতে হয় । আমিও লেগে গেলাম । ফলে ট্যাঙ্ক ভর্তি (৪০০ গ্যালন) তেল জমা হল । তেলের রং পাতলা আলকাতরার মতো । বিকট দুর্গন্ধ । আমার সর্বাঙ্গে একেই মৎস্যগন্ধ, তার ওপর কড লিভার অয়েলের গন্ধ মিলে আমাকে একেবারে গন্ধরাজ করে তুলেছিল!

এক সপ্তাহ পর আবার ডিউটি বদলে গেল, এবার রান্নার কাজ । সবাই বলল যে সবচেয়ে সোজা কাজ এটি । দুটো জিনিস সিদ্ধ করা ছাড়া আর কোনও রান্নার কাজ নেই । মাছ ভাজবার শখ হল, কিন্তু তেল নেই, হলুদ নেই! আশা ছাড়লাম ।

এই রকম সপ্তাহে সপ্তাহে ডিউটি বদলাতে লাগল সবার । জাহাজের বয়লারে কয়লা ঢালতে হবে, আমার এই কাজ হল । আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হল নরওয়েজিয়ান ছেলেটি । যে রকম শীত, জল ঝড় বরফ পড়ছিল তখন এই কাজটা আরামের মনে হল । যদিও মাত্র দুসপ্তাহের মতো ।

মাঝে মাঝে যখন আগুনে কয়লা ঠেলতাম, মাথার ওপর ফানেল দিয়ে তখন ঠান্ডা কনকনে বাতাস আসত । একজন লোক ওপর থেকে দড়িতে ঝুলিয়ে খাবার ও কফি দিত । আর আমাদের কোনও প্রয়োজন ছিল না বয়লার ঘর ছেড়ে যাবার । বড় বড় কয়লার চাঁইয়ের ওপর ঘুমিয়ে রাত কাটাতাম । সকালে প্রাতঃকৃত্য সারতাম কয়লার ওপর যা সর্বংসহা আগুনের ওপর নিবেদন করতাম ।

ডিউটি বদলাতে বদলাতে নিচের বরফ ঘরে কাজ পড়ল । বয়লার ঘর শীতপ্রধান দেশে, বিশেষ করে উত্তরমেরু অঞ্চলে যেমন আরামের, বরফ ঘরের কাজ তেমনই কষ্টসাধ্য । আমার কাজ ছিল সাইজমাফিক শেলফের ওপর মাছ সাজিয়ে রাখা ।

আবার স্টিয়ারিং রুমের কাজ পেলাম । একদিন একটা সবচেয়ে বড় ব্যাগ (প্রায় তিন টন) মাছ উঠেছিল । দুঃখের বিষয় লোহার তারের একাংশ কমজোরি ছিল । ক্রেন জালটাকে টেনে ডেকের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় তারটা ছিঁড়ে গেল এবং সমস্ত মাছ জলে পড়ল । জাহাজ তখন থেমে ছিল । যে হুকে ব্যাগটা ঝুলছিল সেই হুক এক তাল লোহাসুদ্ধ (ডাভিট) নিমেষে জাহাজের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বিদ্যুৎ বেগে চলে গেল । জাহাজ চালানো বন্ধ করে আমি নরওয়েজিয়ান ছেলেটির সঙ্গে গল্প করছিলাম

। সে ছিল ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে । আমি তার দিকে মুখ করে স্টিয়ারিং রুমের জানলার দিকে চেয়েছিলাম । হুকটা আমাদের দুজনের মাঝখান দিয়ে চলে গেল । পরমুহূর্তে দেখি নরওয়েজিয়ান ছেলে ইয়রগেনের মুখ দিয়ে ভীষণ রক্ত পড়ছে, তার চোয়াল ভাঙা ।

ক্যাপ্টেনকে ডাকলাম । ওদিকে সবচেয়ে বড় মাছের ক্যাচ জলে গেল । তার ওপর বিপদ । ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য লোকেরা ইয়রগেনকে নিয়ে হাসপাতাল (নামমাত্র) ঘরে টেবিলের ওপর রাখল । এত বড় আঘাতে ইয়রগেন টের পায়নি যে তার চোয়াল ভেঙে গিয়েছে । ক্যাপ্টেন দেখলাম, খুব ধীর স্থির লোক । সেলাইয়ের তোড়জোড় করে হুকুম দিল রাইকাভিক বন্দরে নিয়ে যাবার । রাইকাভিক হচ্ছে আইসল্যান্ডের রাজধানী । দুদিন থাকতে হবে ।

সব মাছ বিক্রি হয়ে গেল । ইয়রগেন হাসপাতালে ভর্তি হল । একজন ডেনিশ সার্জেন বললেন যে খুব বড় ক্ষতি হয়নি । ক্যাপ্টেন ঠিক সময়ে সেলাই করে দেবার ফলে বিপদ বাড়েনি । যতদিন না তার ক্ষত শুকিয়ে যায় ইয়রগেন আর জাহাজে ফিরবে না । সমুদ্রের লোনা জোলো হাওয়ায় ঘা শুকোতে চায় না ।

আমরা পাঁচজন শহর দেখতে বেরলাম । প্রথমেই দেখি শহরের এখানে ওখানে গরম জলের প্রস্রবণ । সেই জল পাইপের ভেতর দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হচ্ছে, ঘর গরম রাখার জন্য । ছোট শহর । টিং টিং করে ট্রাম গাড়ি যাচ্ছে । বরফের দেশ নাম হলেও, গরমের দিনে বরফ থাকে না । বরং পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঘাস বা মস দেখা যায় । বেশিরভাগ লোকেরা ডেনিশ ভাষায় কথা বলে । ডেনমার্ক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব না করলেও, সাংস্কৃতিক যোগ রাখে এবং আইসল্যান্ডবাসীরা খুশি হয়ে মেনে নেয় । এমনকী নিজেদের স্ক্যানডিনেভিয়ান বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব বোধ করে ।

ইয়রগেনকে রাইকাভিকে রেখে আমরা মার্গারেট ক্লার্কে ফেরত এলাম । বরফ পড়ছে । দেখতে দেখতে বরফের ঘূর্ণিঝড় বইতে আরম্ভ করল । আমি অবাক হয়ে দেখলাম মার্গারেট ক্লার্কের চারদিকে সমুদ্রে বরফ জমে গেল । জাহাজ চলা অসম্ভব । দুদিন পর সমুদ্রের ঢেউ আবার তরল ও সচল হল । জাহাজ দুলতে লাগল, আমরা নোঙর তুলে জাহাজ ছাড়লাম ।

আমরা ক্রমাগত বরফের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগোচ্ছি উত্তর দিকে । সমুদ্র উত্তাল । আমাদের ছোট ট্রলার ঢেউয়ের তাণ্ডবনৃত্যে দুলছে, কাঁপছে, উঠছে ও আছাড় খেয়ে জলের ওপর পড়ছে ।

জাহাজটা নতুন ছিল বলে আমরা টের পাইনি । দিনকতক জলে ভাসবার পর দেখা গেল মার্গারেট ক্লার্কের চারদিকে ফুটো । সর্বত্র টুপটাপ বৃষ্টির মতো জল জাহাজের ভেতর

ও ঘরে ঘরে পড়ছে । বাঙ্কে শোবার সময় অয়েল স্কিন ঢাকা দিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়েছে সবাই । বাঙ্ক থেকে নামলে জলে পা দিতে হয় । আমাদের জুতোগুলো ছোট ছোট নৌকোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে । বাইরে জলের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে, ভেতরে জল থৈ থৈ । এই অবস্থার মধ্যে দিবারাত্র মাছ ধরা চলছে ।

অসংখ্য ট্রলার জল, ঝড়, বরফ ও কনকনে শীতের মধ্যে জাল ফেলছে, মাল তুলছে । কখনও মাছ উঠছে, কখনও ব্যাগ খালি ।

জাল টানার পর মাছ উঠছিল বলে বাহাত্তর ঘণ্টা সমানে জাহাজসুদ্ধ লোক কাজ করেছে, কারও ঘুমোবার অবসর নেই । একবার খাবার ঘরে কোনওমতে কাজের ফাঁকে আমার মতো জেলেরা গিয়ে কিছু খেয়ে আসছে । টেবিলের ওপর প্লেট রাখা যায় না । শক্ত করে এক হাত দিয়ে ধরে রাখতে হয় । না হলে প্লেটসুদ্ধ খাবার কোলের ওপর এসে পড়বে । খাবার বলতে আলুসেদ্ধ, মাছসেদ্ধ, সিরাপ, পাঁউরুটি ও মাখন । এর কোনও ব্যতিক্রম নেই ।

সূর্য কখন ওঠে কখন পাটে যায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই । যতই শীতের দিন এগোতে লাগল ততই বেশিরভাগ সময় অন্ধকার । ক্কচিৎ কখনও যদি সমুদ্র শান্ত থাকত তাহলে বেলা দুটো-তিনটের সময় অপূর্ব সুন্দর সূর্যাস্ত দেখেছি । পশ্চিমের আকাশে যেন আবীরের রং ছড়িয়েছে । দুঃখের বিষয় এত ভীষণ শীত যে প্রাকৃতিক শোভা দেখবার মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ছিল না আমাদের । কাজ থেকে বিরাম পাওয়া মাত্র একমাত্র চিন্তা ঘুমের । কারও চাঁদ বা সূর্য দেখবার অবকাশ নেই । এমনিভাবে চার মাস কাটল । একদিন জলের ভীষণ উঁচু ঢেউ ট্রলারের ওপর বার বার আছড়ে পড়তে লাগল । আমরা তারই মধ্যে এক হাতে লোহার তার ধরে অন্য হাতে যে যার কাজে ব্যস্ত । অন্ধকার রাতে জাহাজের অস্পষ্ট আলোয় কিছুই ভালো দেখা যাচ্ছিল না । হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠল অ্যালেক ইজ গন । ট্রলারের ঘণ্টা বাজতে লাগল । ক্যাপ্টেন ট্রলিং বন্ধ করে জাহাজের দুধার থেকে কাছিম বাঁধা লাইফ বয় দুটো ফেলে দিল । কিন্তু অ্যালেক কোথায়! হয়তো সমুদ্রের টানে ও ঢেউয়ে পড়ে আমাদের মধ্যে আধ মাইলেরও বেশি দূরত্ব হয়ে গিয়েছিল । সবাই সমুদ্রের ফেনার মধ্যে অ্যালেককে দেখতে পাবে আশা করে জলের দিকে উৎকীর্ণ হয়ে চেয়ে রইল । রাত তখন দুটো হবে । অ্যালেককে কোথাও দেখা গেল না ।

মার্গারেট ক্লার্ক ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেল । যত সময় যেতে লাগল ততই কঠিন সত্য আরও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল সবার । অ্যালেকের স্ত্রী ও একটি ছোট ছেলে জাহাজ ছাড়বার সময় বন্দরে এসেছিল । তাদের কথা মনে পড়ল ।

কাছে-দূরে যত ট্রলার ছিল সবাইকে জানানো হল একজন নাবিক ভেসে গিয়েছে । একটু নজর রাখতে ।

আর্কটিক সী-র কনকনে ঠান্ডা জলে বেশিক্ষণ মানুষের হাত-পা চলতে পারে না । নিশ্চয় অবশ হয়ে যাবে । ট্রলিংয়ের কাজ বন্ধ হল । দিনের আলোয় নতুন উদ্যমে অ্যালেককে খুঁজতে আরম্ভ করা হল । অন্তত তার মরদেহটা সমুদ্রের আলিঙ্গন থেকে তুলে আনবার চেষ্টা যদি সফল হয় ।

দুপুরবেলায় ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে একত্র হতে ডাকা হল । অ্যালেকের জন্য শোক প্রকাশ করল । সবাইকে বলা হল আরও সাবধানে শক্ত করে তার ধরে চলাফেরা ও কাজ করতে । তা না হলে আরও দুর্ঘটনা হতে পারে ।

কারও মুখে কথা নেই । চোখের সামনে এতবড় মর্মন্তুদ ঘটনা হয়ে গেল । কারও ক্ষমতা হল না সমুদ্রের কবল থেকে অ্যালেককে ছিনিয়ে আনে ।

খাবার ঘরে আবার সবাই মিলিত হলাম । যথারীতি গরম স্যুপ ও মাছসেদ্ধ দিয়ে গেল । কারও খাবার ইচ্ছা ছিল না । অনেকে রাম খেয়ে শুতে চলে গেল ।

আমার মনে হচ্ছিল যে সমুদ্র যখন শান্ত তখন মানুষ অবলীলাক্রমে জলের ওপর দিয়ে যেখানে খুশি যাচ্ছে । কিন্তু প্রকৃতির যখন রুদ্রমূর্তি, যখন সমুদ্র উত্তাল, ঝড় ও ঢেউয়ের জন্য জাহাজ বেসামাল তখন মানুষ অসহায় ।

আমার দ্বিতীয় চিন্তা হল যে মার্গারেট ক্লার্কের লোকেরা মনে করেছিল আমি সৌভাগ্যবান । বিপদের মধ্যে পড়ব ঠিকই এবং বিপদের থেকে উদ্ধার পাব, এমনই নাকি আমার সুকৃতি । তা তো হল না, ইয়রগেনের থেকে আমি অল্প ব্যবধানে লোহার তারের প্রচণ্ড ধাক্কা থেকে প্রাণে বাঁচলাম । কিন্তু ইয়রগেনের চোয়াল ভেঙে গেল । আশা করি সে সম্পূর্ণ সেরে উঠবে । অ্যালেক তো প্রাণ দিল । এই কথাগুলি ক্যাপ্টেনকে বললাম । ক্যাপ্টেন বলল পৃথিবীতে জীবিকা উপার্জনের যত পথ আছে তাদের মধ্যে আর্কটিক সমুদ্রে ট্রলিং করা সবচেয়ে কঠিন । কয়লার খনিতে আমি কাজ করেছিলাম অল্পকাল । সেও অতি কঠিন, অন্ধকারে থাকতে হয় বলে আরও কষ্টকর । ক্যাপ্টেন বলল এ রকম দুর্ঘটনা ট্রলারে প্রায়ই হয় ।

পরদিন সকাল থেকে পুরোদমে ট্রলিংয়ের কাজ আরম্ভ হল । বিষণ্ণ মনে সবাই যে যার ডিউটি করছে । সুবিধা পেলে মাঝে মাঝে জলের দিকে চেয়ে দেখি যদি অ্যালেকের দেহাবশিষ্ট পাওয়া যায় ।

আরও দুমাস কেটে গেল । শীত যেন ছাড়বে না । সর্বাঙ্গে ব্যথা অনুভব করেছিলাম । ভিজে কাপড়চোপড় পরে ভিজে বিছানায় শুয়ে থাকার ফল ।

ট্রলিং করে একদিন দুটো প্রকাণ্ড সামুদ্রিক কাঁকড়া উঠল । এককেটার ওজন হবে ২-৩ সের । কাঁকড়া দেখে আমার যত উৎসাহ তেমন আর কারও নেই । সবার মত, কাঁকড়াসেদ্ধ মোটেই ভালো খেতে নয় । জাহাজে সেদ্ধ ছাড়া আর কিছু হবে না, এ কথা মনে ছিল না । অনিচ্ছাসত্বে কাঁকড়া দুটো জলে ফেলে দিলাম । যেদিন একটা অক্টোপাস ধরা পড়ল সেদিন সবাই খুশি । অক্টোপাসের মাংস (মাথাটার দুপাশের নরম জায়গা) খাবার লোভে সবাই এগিয়ে এল । সেই অতীব কদাকার জীবটাকে পিটিয়ে মারল । স্বীকার করি অক্টোপাসের মাংস সুস্বাদু ।

মার্চ মাসের ভীষণ ঝোড়ো হাওয়ায় জাহাজটা রীতিমতো কেঁপে উঠছিল । আমার ডিউটি তখন নিচে ইঞ্জিনঘরে । হঠাৎ ঝড়ে বয়লারের ওপরের চিমনি ঘাড় ভেঙে পড়ল । পাছে সমুদ্রে চলে যায়, তাড়াতাড়ি চিমনিটাকে বেঁধে ট্রলার চলল ইসাফিওর্ড বন্দরের দিকে, আইসল্যান্ডের উত্তরে এটা ছোট এক বন্দর । আরেকটা স্পেনদেশীয় মালবাহী জাহাজ পাশেই নোঙর ফেলেছিল । আমাদের সঙ্গে তার লোকেদের ভাব হয়ে গেল । আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে একদিন স্প্যানিশ জাহাজ ইসাবেলাতে খাওয়াল । ট্রলারের সঙ্গে কার্গো জাহাজের কোনও তুলনা হয় না । ভালো ভালো রান্না জিনিস ও মাদেরা মদ খেলাম । ইসাবেলা চলেছে গ্রিনল্যান্ডের বন্দর গটহবের দিকে ।

ইসাবেলার ক্যাপ্টেন আমাদের ট্রলারে এসে কিছু পছন্দমতো মাছ নিয়ে গেল । পরিষ্কার ইংরিজি বলে । নাম স্টেফান । আমি গ্রিনল্যান্ডে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম । বললাম, আর্কটিক সমুদ্রে ট্রলিংয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে । জল দেখে দেখে চিত্ত হয়েছে বিকল । স্টেফান রাজি হল এবং স্বীকার করল যে এক এস্কিমো পরিবারে ইগলুতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করতে পারবে ।

আমি মার্গারেট ক্লার্কের ক্যাপ্টেনের কাছে ছাড়পত্র ও টাকাকড়ি চাইলাম । প্রচুর টাকা পেয়ে, বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে ইসাবেলা জাহাজে এলাম । আমার ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । দুজনের মতো ওপর নিচে বাঙ্ক আছে । আগে যেখানে জলে জুতো ভাসত সেখানে এ জাহাজে কার্পেট পাতা । আমার সঙ্গী ইংরিজি জানে না । আমি স্প্যানিশ ভাষা শিখতে হাতেখড়ি নিলাম সঙ্গী আমাডোর কাছে । মার্গারেট ক্লার্ক ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল । কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিয়ে সবার সঙ্গে বেশ একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম ।

খাবার ঘণ্টা বাজল ঠিক রাত আটটায় । খাবার ও বসবার ঘর বেশ বড় এবং সুসজ্জিত ।

খাবার এল পর পর তিনটে ডিস, মনে হল যেন রাজসূয় যজ্ঞের ব্যবস্থা ।

ক্যাপ্টেনের বড় বসবার কামরা ছিল। আমার ডাক পড়ল। স্টেফান বলল, ইঞ্জিন ঘরে সাহায্য করতে হবে। মার্গারেট ক্লার্কে আমার কীরকম ডিউটি ছিল সব মন দিয়ে শুনল এবং মন্তব্য করল, তোমার খুব সাহস আছে। তুমি একাজ করতে পারবে। অবসর মতো আমাকে ডেকে ক্যাপ্টেন আমার দেশের সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মার্চ মাসের শেষে কতখানি গরম পড়ে শুনে একদিন বলল, দ্যাটস দি কান্ট্রি ফর মি। আই কান্ট স্ট্যান্ড আইস, স্নো, ফ্রস্ট, এটসেটরা অ্যান্ড ইয়েট আই ক্যাপ্টেন দিস শিপ বিটুইন আইসল্যান্ড অ্যান্ড গ্রিনল্যান্ড, দো মাই কান্ট্রি ইজ সানি স্পেন। স্টেফানের বার্সিলোনাতে বাড়ি। খুব গর্ব করে বলল বার্সিলোনা ইজ ভেরি বিউটিফুল। মাই হোল কান্ট্রি ইজ বিউটিফুল। ইউ মাস্ট পে এ ভিজিট দেয়ার।

অনেকদিন পরে আরাম করে বাঙ্কে বিছানায় শুয়ে ঘুমোলাম। সারারাত ঢং ঢং শব্দ নেই, জল পড়ার শব্দের অস্বস্তি নেই। উইনচ ঘোরার হাড় ভাঙা শব্দও নেই।

৮

মার্গারেট ক্লার্ক বন্দরে রয়ে গেল। তখনও চিমনি সারানো হয়নি। আমরা শাঁখ ঘণ্টা অর্থাৎ ভোঁ বাজিয়ে রওনা হলাম। আমার পথ অজানা অচিন দেশে, গ্রিনল্যান্ডে।

জাহাজ উত্তরে চলেছে। মাঝে মাঝে আইসবার্গ (ভাসমান বরফের পাহাড়) দেখা গেল। এই বরফের পাহাড়ে যদি ধাক্কা খায় ৮,০০০ টন জাহাজ, তো আমরাই ডুবব। প্রচণ্ড পাহাড় হয়তো একটু কেঁপেও উঠবে না। এই অঞ্চলের সব জাহাজে ব্যবস্থা আছে বড় আইসবার্গ দেখলে তাকে কামান দিয়ে ভেঙে ফেলবার। বড় আইসবার্গ খুবই বিপজ্জনক। ওপরে হয়তো সামান্য ২-৪ হাজার ফুট উঁচু কিন্তু জলের নিচে বিশ হাজার ফুট গভীরে তার অস্তিত্ব ঠিক বোঝা যায় না। মনে পড়ে অতিকায় লুসিটানিয়া জাহাজের দৃশ্য। সেকালের বৃহত্তম জাহাজ আটলান্টিক পার হচ্ছিল দুই হাজার আমেরিকাযাত্রী সমেত। এমনই একটা বরফের পাহাড় নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের দিক থেকে ভেসে আসছিল। দুইয়ের সংঘর্ষ হল। ফলে লুসিটানিয়া আটলান্টিক মহাসাগরে সব যাত্রীসুদ্ধ নিমজ্জিত হল। যাত্রীদের মধ্যে একজন বঙ্গ সন্তানও ছিলেন।

এই উত্তর অঞ্চলে প্রায় আট মাস শীত এবং চার মাস গ্রীষ্মকাল। শীতের সময় সূর্যের মুখ একেবারে দেখা যায় না। বিকাল থেকে অরোরা বোরিয়ালিস বা নর্দার্ন লাইটের কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় এবং মোটামুটি সব কাজ সারা হয়। জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সূর্যের আলো দিবারাত্র পাওয়া যায়। অক্টোবর মাস থেকে ঝড়, বরফ ও শীতের সূত্রপাত। শীত যে কত কঠিন হতে পারে তা কল্পনার অতীত। -৫০ ডিগ্রি শীত যে কত কষ্টকর ভাবা যায় না। মরুভূমিতে ১৩৫-১৫০ ডিগ্রি গরম পেয়েছি। গ্রিনল্যান্ডে তার সম্পূর্ণ উল্টো।

ইসাবেলাতে এসে পর্যন্ত পুরনো সঙ্গীদের অভাব অনুভব করি। সবচেয়ে করি পাখিদের। সী-গাল, আলবাট্রশ ইত্যাদি যারা মেছো জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ইসাবেলা তো তা নয় সেইজন্য উদয়াস্ত কিচির মিচির পাখির ডাক শুনতে পাই না। আম্ব্রেলা বার্ডের হঠাৎ ডানা খোলার ও বন্ধ করার চাতুরিও দেখি না।

আইসবার্গের অত্যাচার বেড়েছে, আমাদের জাহাজ সন্তর্পণে চলেছে।

চতুর্থদিনে গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছলাম । প্রথমেই চোখে পড়ল সবুজের অভাব, গ্রিন কোথাও দেখলাম না । চারদিক চিরতুষারে ঢাকা একেবারে সাদা, লোকেদের স্বাস্থ্য ভালো । রং ফর্সা, অনেকাংশে যেন ভুটিয়াদের সঙ্গে মিল দেখা যায় । চামড়ার পোশাক পরা ।

ইসাবেলা সঙ্গে এনেছে মদ ও ময়দা এবং আলু-পেঁয়াজ ইত্যাদি । এস্কিমোরা সবচেয়ে ভালোবাসে স্প্যানিশ মদ খেতে । তাই এই দুই দেশের মধ্যে তার আদানপ্রদান আছে । ব্যবসার ক্ষেত্রে ডেনমার্কের সঙ্গেও সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ । ডেনিশ ভাষা অনেকে অল্পবিস্তর জানে । গ্রিনল্যান্ড দেশটা ডেনমার্কের অধীন নামে-মাত্র । এখানে লোকেদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে ।

পাছে এস্কিমোদের ওপর শোষণ হয়, ডেনমার্ক থেকে তাই নিয়ম জারি করা হয়েছে যে বিশেষ ইঞ্জিনিয়ার বা অভিযাত্রী ছাড়পত্র নিয়েই তবে গ্রিনল্যান্ডে ঢুকতে পারবে । পাদ্রীরা ধর্ম প্রচারের নামে অপকর্ম করবার সুবিধা যাতে না পায় সেজন্য তাদের প্রবেশ নিষেধ ।

ইসাবেলা জাহাজ থামবার পরই একজন এস্কিমো এসে স্টেফানের সঙ্গে করমর্দন করল । এস্কিমোটির নাম লেয়া, বেশি বয়স নয় । সে ময়দা, মদ ইত্যাদি গুদামজাত করবে এবং পরিবর্তে মাছ, মাছের তেল, চামড়া ইত্যাদি দেবে । লেনদেনের জন্য টাকাকড়ির প্রয়োজন নেই । মালের পরিবর্তে মাল, বার্টার সিস্টেম যাকে বলে ।

লেয়ার সঙ্গে স্টেফান আমার পরিচয় করিয়ে দিল এবং সে আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানাল । আমার হ্যাভারস্যাক ও সাইকেল নিয়ে গ্রিনল্যান্ডে পদার্পণ করলাম । লেয়ার অতিথি হয়ে থাকব, তার কাজে সাহায্য করব । আমি পরিশ্রম দেব । বরফের বাড়িতে লেয়ার স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে থাকতে হবে ।

বাড়ির কাছেই গুদাম । প্রকাণ্ড বরফের বাড়ি, মানে একটি ঘর । আমার সাইকেল গুদামে আশ্রয় পেল । গুদামে মাছ, সীলের চামড়া ও মাছের তেল, কড লিভার তেল ইত্যাদি ছিল । তিনদিন ধরে এইসব জিনিস ইসাবেলাতে তুলতে এবং সেখান থেকে মদ ও ময়দা, আলু ইত্যাদি নামাতে কেটে গেল ।

স্টেফান বিদায় নিল । আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম স্পেনে বার্সিলোনায় তার বাড়ি যাব । চারদিন কাজ করার জন্য কুড়ি পাউন্ড মাইনে পেলাম । আবার এক বছর পর শীতান্তে ইসাবেলা এই বন্দরে আসবে, ডেনিশ ও নরওয়েজিয়ান জাহাজ ক্বচিৎ কখনও আসে ।

লেয়ার অবস্থা ভালো । দেশের গভীরে সীল, শ্বেত ভালুক, সাদা খেঁকশিয়াল ইত্যাদির চামড়া পাওয়া যায় । অন্য এস্কিমো শিকারিরা এই সব মূল্যবান চামড়া সামান্য লাভে লেয়ার কাছে বিক্রি করে যায় । তারা মদ ও আলু, ময়দা, দেশলাই, বন্দুকের গুলি ইত্যাদি তার বদলে নিয়ে যায় ।

লেয়ার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল । নাম আন্না । ছেলের বয়স ৬, মেয়ের বয়স ৪ । আন্নার বয়স ৩০ হবে । লেয়ার সঙ্গে বয়সের বিশেষ পার্থক্য নেই । বাড়িটা বরফের, ঢোকবার রাস্তা হামাগুড়ি দিয়ে যেমন দক্ষিণ ভারতবর্ষে টোডাদের বাড়িতে দেখা যায় । একটা বরফের স্ল্যাবে দড়ি বাঁধা থাকে । ভেতরে ঢুকে দড়ি টেনে দিলে ঘরে আর কেউ ঢুকতে পারে না । স্ল্যাবের বাইরের দিকে একটি দড়ি আছে সেটা টানলে দরজা খুলে যায় । বাড়িকে ইগলু বলে । ইগলুর ওপর বরফের মাঝে একটু ফাঁক রাখা হয়েছে, ভেন্টিলেশনের জন্য । তাছাড়া দরজা জানালা নেই । দিনের আলো হলে কিংবা অরোরা বোরিয়ালিসের আলোয় ইগলুর ভেতরটায় সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে । রাত্রের অন্ধকারে ইগলুর ভেতর অন্ধকার দেখায় । মাছের তেলের আলো মিটি মিটি জ্বলে । অস্পষ্ট হলেও দেখা যায় সব ।

ঘরে চারটে বাঙ্ক বা বার্থ আছে । বিছানা বলতে কয়েকটা সীলের চামড়া পাতা, সীলের চামড়া দুটো পিঠোপিঠে সেলাই করে শ্লিপিং ব্যাগ করা হয়েছে । তার ভেতর ঢোকবার সময় ঠান্ডা বেশি হলেও একটু পরেই গরম ও আরাম লাগে । এদের দেশে শোবার সময় কাপড়চোপড় পরে ঘুমানোর রেওয়াজ নেই ।

শীতপ্রধান দেশ বলে এস্কিমোদের খুব কম ছেলেপুলে হয় । বাচ্চাদের খাঁদা নাক, ছোট চোখ হলেও মিষ্টি দেখায় । খুব ছোট বয়স থেকে এদের কড লিভার তেল মাখানো হয় কর্মঠ করবার জন্য । শীতের সময় বড়রা বুকে পিঠে কড লিভার তেল মাখে শীত সহ্য করবার জন্য । যে কোনও মানুষের চেয়ে এস্কিমোরা অনেক বেশি শীতের কষ্ট সহ্য করতে পারে । এদের পূর্বপুরুষরা বেয়ারিং অন্তরীপের বরফ পার হয়ে আলাস্কার পথে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল । সে কথা পরে হবে ।

শীতের দিনে একটা ছোট ইগলুর মধ্যে বন্দী হয়ে থাকার কথা আমি ভাবতে পারি না । কিন্তু ইগলুর বাইরের অবস্থা এমনই ভয়ঙ্কর, এতই পীড়াদায়ক যে সেকথা ভাবলে বন্দী হয়ে থাকার কষ্ট মনেই পড়ে না । ইগলু কথাটার মানে আশ্রয় আর সত্যিই সেটা তাই ।

এস্কিমোরা বলে যে যতদিন না পাদ্রীরা তাদের দেশে এসেছিল ততদিন তারা অনেক বেশি কর্মঠ ও শীতকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতার অধিকারী ছিল । এস্কিমোরা গরমের দিনে নগ্ন হয়ে কড লিভার তেল মাখত, পাদ্রীরা বলল তোমরা অসভ্য, কাপড় পরো । কাপড়-জামা পরার ফলে তারা দুর্বল হয়ে গেল এবং টি বি রোগগ্রস্ত হল । সব শেষে গ্রিনল্যান্ডে পাদ্রীরা নাকি আরও একটা ক্ষতি করেছিল, যৌনরোগও তারাই নাকি আমদানি করেছিল সেদেশে ।

লেয়া আমার জন্য একটা কাজ ঠিক করল, মাটির নিচে ক্রিয়োলাইট মাইন থেকে ধাতু ওপরে তোলা। ক্রিয়োলাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম হয়, বক্সাইটের মতো। বছরে প্রায় দশ মিলিয়ন ডেনিশ টাকার মতো দামের ক্রিয়োলাইট খনি থেকে তোলা হয়। এর অর্ধেক যায় আমেরিকায়। বাকিটা পৃথিবীর সর্বত্র বিক্রি হয়। কোপেনহাগেন শহরের একটি ধনী পরিবারের পাঁচজন এই বিপুল বাৎসরিক আয়ের মালিক। এক ক্রোনার প্রায় এক টাকার সমান। আমার এমন সৌভাগ্য যে ডেনমার্কে ওই পরিবারের যিনি সবচেয়ে বড়, আক্সেল ইয়ার্ল, তাঁর বাড়িতে বাড়ির ছেলের মতো অনেকদিন ছিলাম। কিন্তু সে তো পরের কথা।

খনিতে যেখানে ক্রিয়োলাইট পাওয়া যায় সেখানে গভীরতা অনেক, ২,০০০-৩,০০০ ফুট হবে। কয়লার খনি যেমন অনেক সময়ে নানারকম গ্যাসে দূষিত হয়, এখানে তেমন নয়। আমার কাজ হচ্ছে ক্রিয়োলাইট তুলে যন্ত্রের সাহায্যে ওপরে নিয়ে যাওয়া। খনির নিচে গরম। ওপরের ঠান্ডা হাওয়া ভালোই লাগে। খনিজ পদার্থটি আসলে পাথর। তার সঙ্গে সালফার আয়রন ইত্যাদি মেশানো থাকে। কোপেনহাগেন শহরে পাথর গুঁড়ো করে সালফার ও আয়রন ছেঁটে ফেলে খাঁটি ক্রিয়োলাইট বের করে। তারপর আরও গুঁড়ো করে ময়দার মতো অবস্থায় থলে ভর্তি হয় এবং বিক্রি হয়।

শুনলাম বন্দর থেকে ১৮ মাইল দূরে একটা শ্বেত ভালুক থাকে। প্রায়ই মাছ খাবার লোভে লেয়ার গুদামে হানা দেয়, বরফের নিচে নখ দিয়ে খুঁড়ে গর্ত করে এবং গুদামে ঢুকে খুব ক্ষতি করে।

একটা প্রকাণ্ড দল হল ভালুকটাকে শিকার করার জন্য। ভালুকটার খুব বড় দেহটা আট-দশ হাত হবে এবং গায়ের জোর অমানুষিক। এরা মানুষ দেখলে এত জোরে বরফের ওপর দিয়ে ছুটে এসে আক্রমণ করে যে তার তেজ ও দেহের ওজন সামলানো সম্ভব হয় না। কয়েক সেকেন্ড বড় জোর সময় দেয়, যদি বন্দুকের গুলিতে কিংবা বর্শা দিয়ে ভালুককে ঠেকানো যায়। আমাদের দলে চারটে রাইফেল এবং আটটা বর্শা। এস্কিমোদের সাহসও তেমনই। ভালুক প্রাণপণ জোরে ডাকতে আরম্ভ করে। এস্কিমোরা যদি বন্দুকের গুলিতে ছুটে আসবার সময় ভালুককে ঘায়েল করতে না পারে তো খুব দৃঢ়তার সঙ্গে ভালুকের পথ রোধ করে দাঁড়ায় এবং একজোট হয়ে বর্শা মারে।

সেদিনও ১০০ মিটার দূরে ভালুককে দেখা মাত্র তারা বন্দুক ছুড়ল। ভালুক বন্দুক অগ্রাহ্য করে, প্রচণ্ড বেগে দলকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসতে লাগল। যখন আর প্রায় ত্রিশ মিটার দূরে তখন অন্য একজন শিকারি এস্কিমো আবার বন্দুক ছুড়ল। কোথায় লেগেছে ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু ভালুক হোঁচট খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। সেই অবস্থায় ভীষণ জোরে ভালুক পিচ্ছিল বরফের ওপর দিয়ে আমাদের দিকে এগোতে লাগল। তারপর সে ওঠবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যে দেহটা সটান

হয়ে লুটিয়ে পড়ল বরফের ওপর। প্রাণপণ চিৎকার থেমে গেল, বুঝলাম ভালুকের দেহে প্রাণ নেই।

খানিকক্ষণ আমরা চুপচাপ অথচ সতর্কতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর উল্লাসধ্বনি করে ভালুককে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে আরম্ভ করলাম। বরফের ওপর দিয়ে টানা সোজা।

ভালুককে দেখামাত্র সবাই মিলে গুলি ছুড়তে পারত। কিন্তু শিকারের তা নিয়ম নয়। যে প্রথম দেখেছে সে প্রথমে গুলি ছুড়বে। অন্যরা অযথা গুলি করে চামড়া ফুটো ফুটো করে দেবে না। তাতে চামড়ার দাম অনেক কমে যায়। যত কম গুলি মেরে কাজ হাসিল করা যায় ততই বাঞ্ছনীয়। বিপদে পড়লে অবশ্য যত খুশি গুলি ছুড়ে শিকারিদের বাঁচাবে।

লেয়া সবাইকে টাকা দিয়ে চামড়াটা রেখে দিল এবং শিকার সার্থক হয়েছে বলে সকলকে মদ খেতে দিল। ভালুককে এমনিভাবে শিকার করতে হয়। কোপেনহাগেনের বাজারে একটা সাদা রেশমের মতো নরম পশমের বিরাট চামড়ার দাম ১০,০০০ টাকা।

যারা যারা শিকারে যায় তারা সবাই সেই টাকার ভাগ পায়। গ্রিনল্যান্ডে সবচেয়ে ভালো চামড়ার দাম বড় জোর ৪,০০০-৫,০০০ টাকা হবে। আমার ভাগে ৪০০ টাকা জুটল। কিছু না করেই এই টাকা আমার লাভ হল।

সাদা শেয়ালের চামড়া লেজসুদ্ধ বিক্রি করতে প্রায়ই এস্কিমোরা আসে। খুব নরম ও সুন্দর দেখতে। একটার দাম ৭০০-১,০০০ টাকা। জামার ওপর গলায় এরকম একটা চামড়া জড়িয়ে থাকলে শীতের দিনে মেয়েদের সুন্দর দেখায়, কষ্টও হয় না।

এদেশে মাছ ধরার পদ্ধতি বেশ মজার। মানুষ ও ভালুক একই উপায়ে মাছ ধরে। কে কার দেখে শিখেছে, কে জানে। বরফ তিনহাত নাগাদ খুঁড়লে জল পাওয়া যায়। ভালুক গর্তের পাশে চুপ করে বসে থাকে। অফুরন্ত মাছ গর্তের আলো দেখে ছুটে আসে। ভালুক সহজেই একটার পর একটা ধরে খায়। মানুষ তারে বঁড়শি বেঁধে জলে নামিয়ে দেয় এবং এমনিভাবে প্রচুর মাছ ধরে।

গ্রিনল্যান্ডের কোথায় প্যারমা-ফ্রস্ট (Perma-frost), আর কোথায় জলের ওপর ভাসমান বরফ, বলা শক্ত। দেশের গভীরে অনেক বরফের পাহাড় দেখা যায়। তার ওপর খুঁড়লে নিশ্চয় জল দেখা যাবে না। চিরকঠিন বর্মের তুষারের ওপর হাজার হাজার বছরের সঞ্চিত বরফ। গ্রাম নেই, লোকের বাস নেই। এক আঙুলে গোনা যায় কটা বন্দর আছে। সেখানে মুষ্টিমেয় এস্কিমোর বাস। সমুদ্রের জন্য বন্দরগুলোর কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত কম ঠান্ডা। রাজধানীর নাম থুলে। সেখানে অনেক বেশি ঠান্ডা। -৫০ ডিগ্রির চেয়েও কম হবে। শীতের চোটে লোহা বেঁকে যায়।

যদি দল বেঁধে গ্রিনল্যান্ডের ভেতর খনিজ পদার্থ কিংবা দেশ আবিষ্কার করতে যেতে পারতাম তো আরও ভালো লাগত। মে মাস এসে গেল। এখন দিন বড় হয়েছে কিন্তু শীতের বা বরফের ঘূর্ণিঝড় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে গেছে। বরফ আর ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে নরওয়ে যাবার। কিন্তু এখান থেকে কোনও জাহাজ সে দেশে যায় না। ডেনিশ জাহাজ ক্বচিৎ আসে-যায়। একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন রাজি হল আমাকে রাইকাভিক নিয়ে যেতে।

লেয়া, আন্না ও ছোটদের গুডবাই বলে গ্রিনল্যান্ড ছাড়লাম। শীত ও বরফের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল।

৯

রাইকাভিক পৌঁছেই শুনলাম মার্গারেট ক্লার্ক বন্দরে রয়েছে। আমার পুরনো সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলাম আর সেইদিনই স্কটল্যান্ডের দিকে রওনা হলাম। জাহাজ ভর্তি মাছ ছিল। পথে ট্রলিং করে আরও মাছ উঠল। মনে হয় সমুদ্রের নিচে এত মাছ, বিশেষ করে এই অঞ্চলে যা কড মাছ আছে মানুষ তা তুলে শেষ করতে পারবে না। কত দেশের ট্রলার তখনও ঘোরাফেরা করছে।

চারদিন পর এবারডিন পৌঁছলাম। যখন আমরা জাহাজ থেকে মাছ নামাতে আরম্ভ করলাম বহুলোক দেখতে এসেছিল। আমার বন্ধু, নিশীথরঞ্জন দাস ও শর্মা সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি তাদের মাছ দেখালাম ও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করলাম। এবারডিনের খবরের কাগজের ফটোগ্রাফাররা উৎসাহে আমাদের একসঙ্গে ছবি তুলল এবং আমার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি লিখে সেই ছবিগুলি প্রকাশিত হল।

এবারডিন শহর থেকে ডারহাম ও নিউ ক্যালস-অন-টাইনের ওপর দিয়ে হাল বন্দরে পৌঁছে, নরওয়ের বারগেন শহরে যাবার বন্দোবস্ত করলাম।

নরওয়েজিয়ান জাহাজ। তিনদিন পর বারগেন পৌঁছলাম। বারগেন সুন্দর শহর ও বন্দর। চারদিকে পাহাড়, তার মধ্যে উপত্যকাতেও সমুদ্রের জল গভীরভাবে ঢুকে পড়েছে। এর নাম ফিয়র্ড। জাহাজ যাতায়াত করে। ফিয়র্ডের ভেতর সমুদ্রের মাছ রোজই লক্ষ লক্ষ ঢুকছে এবং নরওয়েজিয়ানরা জাল ফেলে তাদের ধরছে। বারগেন শহরে অনেক মাছের কারখানা দেখা যায়। সারডিন, হেরিং, স্প্র্যাট ইত্যাদি টিনে পুরে পৃথিবীর নানা জায়গায় পাঠানো হয়। নরওয়েজিয়ানদের কাছে মাছের ব্যবসা খুবই লাভজনক। দেশটা পাহাড়ে ভর্তি। চাষবাসের সুবিধা নেই, এইজন্যই নরওয়েজিয়ানরা পশ্চিমমুখী হয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়েছে।

এখন আর সে অবস্থা নেই। আজ খনিজ পদার্থ নরওয়েকে উন্নতির পথে নিয়ে চলেছে। এরা শিক্ষিত, ভদ্র এবং সংস্কৃতিবান। ভাইকিংরা এদের পূর্বপুরুষ। সে অনেকদিন আগের কথা। মধ্যযুগে ডেনিশ ও নরওয়েজিয়ানরা ইংল্যান্ড আক্রমণ করে ক্যানুটের

রাজস্ব শুরু করে । আজও বহু শহর ও গ্রামের নাম ডেনিশ বা নরওয়েজিয়ান । যেমন হনবি, গ্রিমসবি ইত্যাদি ।

শহরের ওপরে পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে বহুদূর দেখা যায় । চোখে পড়ে সমুদ্র ও পাহাড়ের অপূর্ব সমাবেশ । দুটো হ্রদের মিষ্টি জল কাচের মতো স্বচ্ছ । সমুদ্রের জল ঘন নীল ।

গরম দিন আসছে । জুন মাস তবু সমুদ্রের জল এত ঠান্ডা যে স্নান করতে পারা যায় না । পাহাড়ের রাস্তায় উঠে নেমে অনেক কষ্ট করে অসলোতে পৌঁছলাম । পথে প্রায়ই ছাগলের দুধের চিজ দিয়ে রুটি খেতাম ।

ক্রিস্টিয়ানিয়া ফিওর্ডের ওপর অসলো রাজধানী অবস্থিত । মনে হল অসলো ছোট শহর । ভালো ইউনিভার্সিটি আছে । রাজার প্রাসাদ দেখতে গেলাম । এককালে যখন নরওয়ে স্বাধীন রাজ্য বলে নিজেকে ঘোষণা করল, তখন এরা ডেনমার্কের রাজার ভাইকে রাজা বলে আমন্ত্রণ করে তার হাতে রাজ্যভার তুলে দিল ।

ডেনমার্ক ও নরওয়ের ভাষা একই । ডেনিশ ভাষাই নরওয়ের লোকেদের ভাষা । বিখ্যাত ইবসেন নরওয়ের লোক কিন্তু তাঁর ভাষা ছিল ডেনিশ । নরওয়ের লোকেরা ইবসেনকে নিয়ে যতখানি গর্ববোধ করে, ঠিক ততখানিই ডেনমার্কের লোকেরাও ।

আজকাল দুদেশের ভাষাই একটু-আধটু করে বদলে যাচ্ছে । যেমন সুইডেনের লোকেরা তাদের ভাষার রূপ বদলে ফেলছে । আগে ডেনিশ ভাষার কাছাকাছি ছিল ।

নরওয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন খুব স্বাধীন । কলেজের ছেলেমেয়েদের মাথায় টুপি নানা রঙের । ইউরোপের অন্যান্য দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মতো এরাও একটা বিশেষ রেস্তোরাঁ পছন্দ করে নেয় । তার একাংশে সবাই বিয়ার খায় ও স্ফূর্তি করে ।

জার্মানিতে হিটলারের যুগে এইরকম বিয়ার হলগুলো তরুণ-তরুণীদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের কেন্দ্রস্থল হয়েছিল ।

নরওয়েকে বিখ্যাত করেছে অভিযাত্রীর দল । তারা উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু জয় করেছে । বরফের ওপর কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা এদের অসাধারণ । ন্যানসেন, পিয়ারী, আমুন্ডসেন এদের অগ্রণী । অসলো শহর থেকে ১৫ মাইল দূরে ফ্রগনারশেটেয়ার্ন নামে একটা জায়গায় অভিযাত্রীদের মিউজিয়াম সযত্নে রক্ষিত আছে । পৃথিবীর নানা দেশ থেকে প্রত্যেক দিন কত লোক আসে মিউজিয়ামটিতে, বীর যুবকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে । তাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্য মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকেদের উপযুক্ত রেস্তোরাঁ আছে ।

নরওয়ের বেতার কেন্দ্র আমাকে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাকল প্রশ্নোত্তর আসরের বৈঠকে । ইউনিভার্সিটিতেও আমার ভ্রমণকাহিনী বলবার নিমন্ত্রণ এল, ছেলেমেয়েদের খুব উৎসাহ দেখলাম । একজন যুবক জিজ্ঞাসা করল ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মানুষ কাকে মনে করি । আমি বিনা দ্বিধায় বললাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । একজন তরুণী তখনই বলল এক শ্রেষ্ঠ মহিলার নাম বলতে । আমি বললাম, সরোজিনী নাইডু । এদেশের লোকেরা এত কম আমাদের খবর রাখে যে সরোজিনী নাইডুর কথা কেউ শোনেনি । ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তাই নরওয়ের লোকেরা তাঁর নাম শুনেছে বা বই পড়েছে ।

যাহোক আমার দুই দিক থেকে টাকা লাভ হল, ইউনিভার্সিটি এবং বেতার কেন্দ্রের কাছ থেকে ।

নরওয়ে ছেড়ে সুইডেনের উত্তরদিকে গোটেবর্গ বন্দরের দিকে এগোতে লাগলাম । লোকেদের মনে হয় খুব সচ্ছল অবস্থা । অপর্যাপ্ত কাঠ, ইলেক্ট্রিসিটি ও লোহার খনিতে সুইডেন বড়লোক । ভালো rust free steel, সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সুইডেনে । বছরে দু-তিনবার ইংল্যান্ড ও জার্মানির এবং ফ্রান্স ও ইতালির লোকেরা সুইডেনে যায় লোহা কিনতে । মস্ত বড় শহর । বড় বড় হোটেল, দোকানভরা পণ্যসামগ্রী সাক্ষ্য দেয় সুইডেনের আর্থিক অবস্থার কথা ।

আরও উত্তরে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোলম শহরে পৌঁছলাম । খুব সুন্দর ও পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন শহর । লোকেদের বেশভূষা উন্নতমানের । রাস্তায় পুলিশদেরও যেন রাজপুত্রের মতো সাজ । দামি সিল্ক সার্জের নীল রঙের সার্ট, জামাকাপড় ।

শহরটায় অনেক জলপথ আছে । রাস্তা দিয়ে যেমন বাস চলেছে তেমনই জলপথে ছোট স্টিমার তাড়াতাড়ি শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দেয় । একেক জায়গায় মনে হয় যেন ভেনিস পৌঁছে গেছি, এত খাল চারদিকে ।

সুইডিশ ভাষার সঙ্গে ডেনিশ ভাষার সাদৃশ্য আছে, বাংলার সঙ্গে যেমন অসমিয়া ভাষা । একজন আরেক জনের কথা কিছুটা বুঝতে পারে ।

ইউরোপে যে কটা দেশ দেখেছি অবাধ মেলামেশা সবচেয়ে বেশি সুইডেনের স্ত্রী-পুরুষের ।

আমি একটা স্টুডেন্টস হস্টেলে উঠেছি । ৩০ জন ছাত্র থাকে । খরচ সামান্য ।

এদেশের ট্যাক্স নাকি খুব বেশি । গভর্নমেন্ট ট্যাক্স নিয়ে পরিবর্তে দেয় শিক্ষার সুবিধা, সুচিকিৎসার সুবিধা এবং বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনার সুবন্দোবস্ত, সবই বিনামূল্যে । সোশাল সিকিউরিটি ব্যবস্থা এত ভালো যে বুড়ো হলে কে আমাকে দেখবে বা কোথায় আমি থাকব, সে ভাবনা কাউকেই ভাবতে হয় না ।

কাছেই রুশ দেশ, তাই কমিউনিজম সম্বন্ধে এরা খুবই সচেতন।

আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে স্কানডিনেভিয়ান মুভমেন্ট বা সগোত্র ভাই ভাই ভাব খুব দেখা যায়। নরওয়ে সুইডেন ও ডেনমার্কে রাজা রানি এখনও বর্তমান। তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তা আছে। হিংসার ভাব দেখা যায় না।

এই পাঁচটা দেশই এক ধরনের সমাজতন্ত্র দ্বারা রাজ্য শাসিত হয়। রাজা রানিকে লোকেরা শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। তারা হিজ ম্যাজেস্টি বলতে অজ্ঞান হয় না। সামনা-সামনি দেখা হলে গুড মর্নিং মিস্টার কিং বলাই প্রথা।

আরও উত্তরে ভেস্তেরস নামে একটা জায়গায় গেলাম। সেখান থেকে সুইডেনের ইউনিভার্সিটি উপশালায় গেলাম। আমার কাজ ছিল দুটি বিষয়ে বক্তৃতা দেবার। প্রথম, আমার ভ্রমণকাহিনী, দ্বিতীয় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা।

লন্ডনে থাকাকালীন আমি লন্ডন হ্যারিয়াস নামে একটা দৌড়োবার দলে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে ফিনল্যান্ডের তিনজন শ্রেষ্ঠ দৌড় চ্যাম্পিয়ন, হোক্কার্ট, সালমিনেন ও কৎকাসের সঙ্গে আলাপ হয়। হোক্কার্টের সঙ্গে বেশ ভাব জমে উঠেছিল। তারা প্রায়ই হ্যাম্পস্টেড হিথে দৌড় শেষ করে আমার ফ্ল্যাটে আসত এবং প্রাতরাশ খেত। হোক্কার্টের ডাক নাম গুন্নার, আমাকে অনেক সেধেছিল তার দেশে বেড়াতে যাবার জন্য। ফিনল্যান্ডে যাবার ইচ্ছা আমারও ছিল, বিশেষ করে নুরমির সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। আমার তিন বন্ধু দেশে নুরমির সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ ও কসরৎ করে আগামী অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় নামবার তোড়জোড় করেছিল।

অনেকে আজ হয়তো নুরমির নাম জানে না। বলে রাখা ভালো যে নুরমি অলিম্পিকে জিতেছে। তাকে কেউ হারাতে পারত না। আমেরিকা তাকে লুফে নিয়ে গিয়ে নিজের দেশে যুবকদের ট্রেনিং দেবার ভার দিল। অনেক সম্মান ও অর্থোপার্জন করে সে ফিনল্যান্ডে ফিরে আসে এবং নিজের দেশের তরুণদের প্রশিক্ষণের ভার গ্রহণ করেছে।

স্টকহোলমে ঠিক করলাম ফিনল্যান্ডে যাব। হেলসিঙ্কি পৌঁছেই গুন্নারের খোঁজ করলাম। সে খুব সহজেই সমস্ত স্পোর্টসম্যানদের একত্র করে স্টেডিয়ামে জোটাল। মেয়র ও আরও একজন ভদ্রলোক, স্পোর্টসমন্ত্রী আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। নুরমি আমার কথা আগেই শুনেছিল। সে আমাকে ফ্রেন্ড অব ফিনল্যান্ড বলে পরিচয় দিয়েছিল।

একটা সুসজ্জিত ছোট ফ্ল্যাটে থাকবার ব্যবস্থা হল। এই ফ্ল্যাটটা গুন্নারের বাড়ির কাছে। প্রথমদিনই গুন্নারের বাড়িতে ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ হল। গুন্নারের বাবা ব্যবসায়ী লোক, স্বল্পভাষী। মা আশ্চর্য রকম বুদ্ধিমতী। পাঁচটি কন্যা ও দুটি পুত্রের মা হয়েও তিনি সময় পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের বই পড়বার যা ফিনিশ ভাষায় ও ইংরিজিতে তর্জমা হয়ে প্রকাশিত

হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের দেওয়া চয়নিকা আমার কাছে আছে জেনে ভদ্রমহিলা আমাকে ভালোবেসে ফেললেন । তাঁকে যে কত কবিতা বাংলা ছন্দে পড়ে শুনিয়েছি এবং ইংরিজিতে মানে বলেছি তার ঠিক নেই । তবু উৎসাহ কমেনি । অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমাকে বলতেন যে তিনি তাঁর অষ্টম সন্তানকে পেয়েছেন ।

রোজ সকালে নুরমি ও গুন্নারের দলের সঙ্গে স্টেডিয়ামে যেতাম দূরপাল্লা দৌড় অভ্যাস করতে । জগদ্বিখ্যাত দৌড়বিদদের সঙ্গে আমি শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারতাম । এটা বোধহয় পাইনভরা দেশের জল-হাওয়া ও সাউনা বাথের গুণে ।

পরে ১৯৩২ সালের অলিম্পিকে ১,৫০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় গুন্নার স্বর্ণপদক পেল এবং রেকর্ড করল । সালমিনেন একাই তিনটে স্বর্ণপদক পেল । ৩,০০০, ৫,০০০ ও ১০,০০০ মিটার দৌড়ের প্রতিযোগিতায়, কৎকাস স্বর্ণপদক পেল লং জাম্পে, ফিনল্যান্ডের সে একটা স্বর্ণযুগ এসেছিল নুরমির আবির্ভাবের ঠিক পরেই । এই দেশে যেরকম চর্চা দেখেছিলাম তাতে মনে হত ভবিষ্যতের অনেক নুরমি, হোক্কার্ট, সালমিনেন অলিম্পিক থেকে স্বর্ণপদক আনতে পারবে । ফিনিশ অ্যাথেলিটদের শিক্ষাপ্রণালী অন্য ধরনের । তারা যত দূরপাল্লার রেস দিক না কেন একেবারে শেষে অমানুষিক জোরে দৌড়বার ক্ষমতা সবাই রাখে ।

অনেকদিন আগে, সুইডেনের অধীনে ফিনল্যান্ড করদ রাজ্য ছিল । অনেক সুইডিশ এখানে ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া করেছে এবং এখনও করছে । ফিনরা তখন পিছিয়ে ছিল । ভালো ভালো চাকরি ব্যবসা সব সুইডিশদের হাতে ছিল । আমাদের দেশে অনুন্নত ক্লাসের লোকেরা যেমন উন্নত ক্লাসের লোকেদের হিংসা করে এখানেও তেমনই । তবে দেখা যাচ্ছে, ফিন ও সুইডিশদের মধ্যে পার্থক্য কমে আসছে ।

ফিনল্যান্ডের ছেলেমেয়েদের চুল একেবারে কাঁচা সোনা রঙের, কখনও কখনও মনে হয় শনের দড়ির মতো সাদা ।

ইউরোপের মধ্যে দুটি দেশের লোকেদের ঠিক ইউরোপীয় না বলে এশিয়াটিক বলা হয়, যেমন হাঙ্গেরি ও ফিনল্যান্ড । তুর্কির মতো এদের পীত জাতিও বলা হয় । এদের ভাষাও অন্য ধরনের, না ল্যাটিন, না অ্যাংলো স্যাকসন, না গ্রিকবংশোদ্ভূত । এ দুই ভাষার মধ্যে অবশ্য মিল নেই । হরফ দুই দেশেরই রোমান ।

গুন্নারের মা বাবা পুরনো সুইডিশ বাসিন্দা কিন্তু তাঁরা মনেপ্রাণে ফিনল্যান্ডকে আপনার দেশ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন ।

সুইডেনের মতো ফিনল্যান্ড দেশও পাইন গাছে ভর্তি । বার্চও অনেক । গাছের সম্পদ হয়েছে আজ বহু মূল্যবান । গাছ থেকে কাগজ হয়, ফার্নিচার হয় এবং ছোট ছোট নৌকো

তৈরি হয়। ফিনল্যান্ড অনেক দেশে কাঠের পালপ বা মণ্ড রপ্তানি করে প্রভূত অর্থোপার্জন করে। এই দেশটা বেশি চওড়া নয় কিন্তু প্রায় হাজার মাইল লম্বা, দক্ষিণ থেকে উত্তর সীমানা পর্যন্ত। কথায় বলে, ফিনল্যান্ডে লক্ষ হ্রদ ও সরোবর আছে। জলপথে সেই উত্তর থেকে সুদূর দক্ষিণে হেলসিঙ্কি পর্যন্ত পাইন গাছ কেটে পাঠানো হয়। জলের স্রোতে ভাসতে ভাসতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গাছ চলে গন্তব্য স্থানে। অনেক সময় দেখেছি যে অনেক কাঠের গুঁড়ির ওপর একটা ছাউনি করে মানুষও চলেছে, যাতে ঠিক জায়গায় মাল পৌঁছয়। এক জায়গায় কখনও না আটকে পড়ে।

চারদিকে জলাশয় এত যে, প্রচুর মিঠা জলের সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে মাছ রেঁধে বিক্রি করে। খুব পরিষ্কার বলে খেয়েছি এবং আনন্দ পেয়েছি। আরেকটা জিনিস এ দেশে অপর্যাপ্ত পাওয়া যায়, দুধ। রেস্তোরাঁতে খাওয়া শেষ হলে এক গ্লাস দুধ দিয়ে যায় বিনামূল্যে। ভারতবর্ষের লোকেরা ভাবতে পারে না খাঁটি দুধ, তাও আবার বিনামূল্যে, জাতির স্বাস্থ্য ভালো হবে বলে।

হেলসিঙ্কি ছেড়ে উত্তরে একটা জলপ্রপাত দেখতে গেলাম। জায়গাটা খুবই সুন্দর, তাম্পেরে। কাঠের তৈরি আমার শোবার ঘর জলপ্রপাতের কাছেই। সেজন্য জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ও লগস পড়ার শব্দ আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

আরও উত্তরে সাভনলিন্না, লেপ্পাভির্টা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর গ্রামের পথ ধরে এগোতে লাগলাম। তারপর যেখানে গেলাম, তার নাম পুঙ্কাহারিউ, সৌন্দর্যে এর তুলনা হয় না। দুধারে দুটো লম্বা হ্রদের মাঝখানে একটি সঙ্কীর্ণ জংলী পথ। শুকনো বার্চের পাতার শব্দ নিজের পায়ের তলায়। পা ফেলা বন্ধ করলে সব স্তব্ধ, নিঝুম চুপচাপ। আমি পায়ে হেঁটে সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে চলেছি, এমন সময় শুনলাম পিছনে কে যেন আমার উদ্দেশে কী বলছে। থেমে পিছন ফিরে দেখি হাত ধরাধরি করে একটি পুরুষ ও নারী আসছে।

একটু অপেক্ষা করার পর দুজনেই কাছে এল। মনে হল শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। আমি কে এবং সেই জনবিরল পৃথিবীর একপ্রান্তে কী করছি শুনে লোকটি বলল, ভালোই হয়েছে, আমরা একসঙ্গে যাব; তাতে আমার স্ত্রী অনেক শান্তিতে এদিকটা বেড়াতে পারবেন। হয়তো আমার অসুবিধা হবে এই আশঙ্কা করাতে আমি বললাম বেশ তো সে ভালো কথা, আমরা একসঙ্গেই পুঙ্কাহারিউ আবিষ্কার করব।

ভদ্রলোক পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি অল্পদিন হল হেলসিঙ্কিতে এসেছেন কন্সাল জেনারেল অব ফ্রান্স হয়ে। সুশ্রী দেখতে ভদ্রমহিলাটি তাঁর স্ত্রী। এই কথা বলে নিজের আইডেন্টিফিকেশন কার্ড বের করে দেখালেন। আমি ভদ্রতার খাতিরে পাসপোর্ট দেখালাম

। ভদ্রলোকের নাম মঁসিয়ে ভ্যাঁ সাঁ বা ভিনসেন্ট, পাসপোর্টের এপাতা ওপাতা উল্টে বললেন যে আমি তো ওঁদের দেশে আবার যাব, তখন যেন রোন উপত্যকা নিশ্চয়ই দেখতে যাই ।

মঁসিয়ে ভ্যাঁ সাঁ, তাঁর স্ত্রী ইভন ও আমার মধ্যে খুব ভাব হয়ে যায় । তিনদিন আমরা পুঙ্কাহারিউর অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখতে গেলাম । ফরেস্ট রেস্টহাউস সর্বত্র আছে । দু-তিনখানা ঘর কাঠের বাড়িতে । তক্তপোশ, কাঠের চেয়ার ও টেবিল সর্বত্র আছে । তখন ছিল সামার টাইম, দিন ফুরোতে চায় না । রাত বারোটা পর্যন্ত সূর্যের আলো জঙ্গলের পথ আলোকিত করে রাখে ।

সঙ্গে মাছভাজা, চিজ, পাঁউরুটি, মাখন ছিল । ভ্যাঁ সাঁদের খেতে দিলাম । তারাও নানারকম খাবারের টিন বের করে আমাকে উপহার দিল ।

ডিনার খাবার পর ইভন আবদার ধরল হ্রদের কাকচক্ষু পরিষ্কার জলে সাঁতার কাটতে যাবে । আমি ট্রাঙ্ক পরে জলের ধারে গিয়ে দেখি দুখানা তোয়ালে পড়ে রয়েছে । আদম ও ইভ জল থেকে আমাকে ডাকছে । কাছে গিয়ে দেখি দুজনেই বার্থ ডে অবস্থায় । এরকম দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম । এক ঘণ্টার ওপর সাঁতার কেটে রেস্টহাউসে ফিরলাম । আরামে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শুয়ে ঘুম দিলাম । খানিকক্ষণ অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে মাঝরাত্রে ঘন জঙ্গলের মধ্যে জলে লাফ দিয়ে সাঁতার কাটা ভারতবর্ষের কোথাও সম্ভব হত না । সাপ, পোকামাকড়, জন্তু-জানোয়ারের হাত এড়ানো যায় না সেখানে, কিছু না থাক তো জোঁক, বিছে ও মাকড়সার ভয়, লাল পিঁপড়ের ও মাছির ভয় তো আছেই । এই ভয়ঙ্কর শীতের দেশে বরফে সব মরে যায় ।

নিরীহ জন্তু যেমন হরিণ, খরগোশ ও খেঁকশিয়াল দেখা যায় । তারা মানুষের ভয়ে অস্থির । এই কারণে নিতান্ত নিশ্চিন্তে মানুষ যেখানে খুশি জামাকাপড় খুলে শুতে পারে বা জলে নামতে পারে । যেখানে প্রাণ চায় শুয়ে-বসে রাত কাটানো যায় । ভয়ের কোনও কারণ নেই । ভীষণ বরফের ঝড়ে কখনও কখনও নেকড়ে বাঘ দেখা যায় । চার্লস ভ্যাঁ সাঁ খুব আমুদে, সারাক্ষণ রসিকতা করত । হাতে থাকত একটা স্কেচের খাতা, মজার মজার ছবি আঁকত সারাক্ষণ । আমি যেন একটা মডেল তার কাছে । যা করছি সে সবের স্কেচ করত । অন্য মডেল হচ্ছে তার স্ত্রী । ছবি আঁকার হাত থেকে নিস্তার নেই ।

স্কেচ বইটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টে ছবি দেখলাম এবং প্রশংসা করে ফেরত দিলাম । ভ্যাঁ সাঁ না নিয়ে নিজেই স্কেচ বইয়ের আরও পাতা উল্টে আমাকে দেখাতে লাগল । আমি খুব তারিফ করলাম । আরও দেখাল তার স্ত্রীকে আঁকা অনেক অপূর্ব সুন্দর ছবি । সেগুলো আমার কেমন লাগল জিজ্ঞেস করাতে আমি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানালাম । ভ্যাঁ সাঁ হেসে

উঠে বলল, আমার স্ত্রী বলে বলছি না ও সত্যি সুন্দরী, হাসতে হাসতে ছবি দেখিয়ে বলল, ইমপ্রুভমেন্ট অন দি অরিজিনাল ।

হাস্যরসিকতা ও কৌতুকের মধ্যে তিনদিন কাটল । তারপর ছাড়াছাড়ি, কে কোথায় গেলাম তার ঠিক ঠিকানা নেই, ভ্যাঁ সাঁর স্কেচ বইয়ে আমার কত ছবি রয়ে গেল তারও হিসাব নেই ।

উত্তর ফিনল্যান্ডে দুজন শিকারির সঙ্গে দেখা হল । তারা বরফের দেশে কাছাকাছি থেকে বলগা হরিণ মারে এবং সুদূর হেলসিঙ্কি শহরে অনেক দামে মাংস বেচে ।

যে জায়গাটায় পৌঁছেছি তার নাম পেতসামো, একেবারে উত্তরে । একটা ছোট সুন্দর বন্দর । সেখানে মাছ ধরার ছোট নৌকো রয়েছে কয়েকটি । রাশিয়ার জাহাজ এই জলপথে সারা বছর যাতায়াত করে । যদি বরফে জল জমে যায় তো আইসকাটার জাহাজ দিয়ে পথ পরিষ্কার করা হয় । রাশিয়া ইউরোপের একেবারে মাথার ওপরে বন্দরে বন্দরে তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে ঘুরে বেড়ায় । যুদ্ধ বিগ্রহের দিনে যখন বলটিক বন্ধ হয়ে যায়, উত্তরমেরু অঞ্চলের এই জলপথে রাশিয়ার জাহাজ পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে ।

একবার মাত্র রুশ দেশ এই পথে আক্রান্ত হয়েছিল । চার্চহিল, ব্রিটিশ নৌবাহিনী মারমান্সকে পাঠিয়েছিল কমিউনিজম ধ্বংস করবার আশায় । সেটা ব্যর্থ হয় ।

পেতসামোর পর জলপথ পার হয়ে চিরতুষারের দেশ, একেবারে সোজা উত্তরমেরু পৌঁছনো যায় । একজন কল্পনা করেছিল জলপথে সাবমেরিনের সাহায্যে বরফের নিচ দিয়ে উত্তরমেরু পৌঁছনোর । এই দিয়ে সে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে উত্তরমেরুর চারপাশে হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে শুধু বরফের চাপড়া, ডাঙা জমি নেই । নিচে জল, ওপরে বরফ ভাসছে ।

ফিনল্যান্ডের দক্ষিণদিকে ফিরতি পথে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম না-জানা হ্রদ আর বার্চ গাছ দিয়ে ঘেরা জায়গা দেখলাম । এদেশে লোকের ভিড় কম ।

হেলসিঙ্কি পৌঁছে হোক্কার্ট পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম । গুন্নারের মা একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন । তাঁর সঙ্গে জগদ্বিখ্যাত সুরকার, ইয়ান সিবেলিউসের ভাব ছিল । কথায় কথায় একদিন আমার কথা তাঁকে বলেছিলেন । তখন সিবেলিউস ইচ্ছা প্রকাশ করেন আমার সঙ্গে আলাপ করবার । একদিন টেলিফোনে সিবেলিউসকে বললেন হেলসিঙ্কিতে আমার ফেরার কথা । সঙ্গে সঙ্গে কফি খাবার নেমন্তন্ন এল । গুন্নার আমাকে নিয়ে সিবেলিউসের বাড়িতে পৌঁছে দিল ।

ইয়ান সিবেলিউস সম্বন্ধে একটি কথা জানা ভালো । সিবেলিউস যেন ফিনল্যান্ড দেশের একচ্ছত্র রাজা । তিনি মিউজিক রচনা করেন । এমন কোনও ফিন নেই যে সিবেলিউসের

কথা শোনেনি বা তাঁকে শ্রদ্ধা করে না । পাশ্চাত্য দেশে ওয়াগনার, বিথোভেন, মোজার্টের সঙ্গীতরসজ্ঞ লোকেরাও সিবেলিউসকে সমকক্ষ কম্পোজার বলে মনে করে । বিথোভেনের মতো সিবেলিউসও নটা সিম্ভনি লেখেন । জগতের কাছে সিবেলিউসকে তুলে ধরে ফিলাডেলফিয়া ফিলহার্মনিক অর্কেস্ট্রার নেতা, মিঃ কুসেভিৎস্কি । অনেক রেকর্ড করানো হয় । দুজনেই বিখ্যাত লোক অথচ একজন অন্যজনকে দেখেননি, যদিও কুসেভিৎস্কি বহুদিন ধরে সিবেলিউস মিউজিকের বিশেষত্ব পৃথিবীসুদ্ধ লোককে শোনাচ্ছেন ।

সিবিলিউস ও তাঁর স্ত্রী নিজেরাই এগিয়ে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন । গুন্নার ট্র্যাক প্র্যাক্টিস আছে বলে পলায়ন করল । বলে গেল রাত্রে ডিনারের পর আমাকে নিয়ে যাবে ।

আমি দেখলাম সিবেলিউস ভারতবর্ষকে জানবার জন্য আগ্রহী । যেখানে যা পেয়েছেন আমার দেশের ওপর লেখা তাই মন দিয়ে পড়েছেন । জার্মান ভাষায় তর্জমা করা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছেন । ভালো লেগেছে । বললেন, বাংলা ভাষা শিখতে তাঁর ইচ্ছা করে কারণ, তা ভাবে ও সৌন্দর্যে ভরপুর ।

এই দিনই দুপুরবেলায় লাঞ্চ খাবার পর মিসেস সিবেলিউস আমাকে গেস্টরুম দেখাতে নিয়ে গেলেন । এমন সময় একটা টেলিগ্রাম এল । কুসেভিৎস্কি লিখেছেন দুদিন পরে তিনি হেলসিঙ্কিতে এসে সিবেলিউস মিউজিক পরিবেশন করবেন । সিবেলিউসরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, আনন্দে আকুল । একটা লক্ষ করবার বিষয় এই যে সিবেলিউসের মাথাটা মস্ত বড় এবং কেশহীন আর মিসেস সিবেলিউসের এক মাথা সাদা চুল ।

বিকালে চা খাবার সময় আরও অনেক গল্প হল । সিবেলিউস বললেন, ভারতবর্ষের মতো ফিনল্যান্ডেরও মিথলজি আছে যা বিখ্যাত । পৌরাণিক কাহিনীর নাম কালেভালা, আমাকে অনেক রঙিন ছবি দেখালেন কালেভালা অনুধাবনে আঁকা । আমাকে একখানা ছবি উপহার দিলেন ।

কুসেভিৎস্কির টেলিগ্রাম পাবার পর থেকে সিবেলিউস খুশিতে ভরপুর । ডিনারের পর বিদায় নেবার সময় বললেন যে কুসেভিৎস্কির সঙ্গে তাঁর প্রথম যখন দেখা হবে সেই সময়টি আমাকে ছবি তুলতে হবে স্টেজের ওপর ।

যথাসময়ে সিবেলিউস টেলিফোনে মিসেস হোক্কার্টকেও নেমন্তন্ন করলেন কুসেভিৎস্কির কনসার্টে হাজির থাকবার জন্য । দুখানা নেমন্তন্নর চিঠি এল ।

কনসার্ট হল লোকে লোকারণ্য । এত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা সবাই প্রত্যক্ষ করতে চায় । তাছাড়া কুসেভিৎস্কির পরিবেশনে সিবেলিউসের মিউজিক অন্যরকম সৌন্দর্যময় রূপ গ্রহণ করত । আমি ক্যামেরা হাতে মিসেস হোক্কার্টের সঙ্গে কনসার্ট হলে পৌঁছলাম । কার্ড

দেখানো মাত্র আমাদের নিয়ে গেল ম্যানেজারের ঘরে । তিনি বললেন যে স্বয়ং সিবেলিউস তাঁকে হুকুম করেছেন আমাকে যেন সর্বত্র যেতে দেওয়া হয় । অর্থাৎ স্টেজের ওপরেও আমার অবাধ গতি ।

যথাসময়ে কম্পোজার ও কন্ডাক্টরের প্রথম মিলন হল কনসার্ট হলে, স্টেজের ওপর । সর্বসমক্ষে দুটো ছবি তুললাম । ছবি দেখলে মনে হয় দুজনেই অভিভূত । সবাই দাঁড়িয়ে উঠে হর্ষধ্বনি করল ।

একটু পরেই কনসার্ট আরম্ভ হবে । ফিনল্যান্ডিয়া বাজাবার কথা । সিবেলিউস তাড়াতাড়ি স্টেজ ছেড়ে চলে গেলেন গ্যালারির ওপর বসে শোনবার জন্য । গ্যালারি অনেক উঁচুতে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই । বৃদ্ধ বয়সে, বিরাট দেহ টানতে টানতে সিঁড়ি বেয়ে চললেন ওপরে, আরও ওপরে । সঙ্গীতজ্ঞ মনে করেন যে গ্যালারিতে বসে যদি প্রত্যেকটি নোট স্পষ্ট শুনতে পান তবেই কনসার্ট সর্বাঙ্গসুন্দর, তবেই তাঁর মিউজিকের সার্থকতা সম্পূর্ণ । সবাই জানত সিবেলিউসের এই খামখেয়ালি অভ্যাস । হাঁপাতে হাঁপাতে গ্যালারিতে পৌঁছনোমাত্র সমস্ত লোক দাঁড়িয়ে উঠল এবং তাঁর পরিচিত জায়গাটি ছেড়ে দিল । ফিনল্যান্ডের লোকেরা কী প্রগাঢ় স্নেহ ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে এই শিল্পীকে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না । একমাত্র তুলনা করতে পারি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে । তিনি তাঁর রচিত গীতিনাট্য শোনাবার জন্য যদি থিয়েটারের উঁচু গ্যালারিতে উপস্থিত হতেন তবে বোধহয় লোকেদের এই রকম অবস্থা হত ।

আমি নিচে চলে গেলাম । সেখান থেকে অর্থাৎ অডিটোরিয়াম থেকে ক্যামেরা ওপর দিকে তুলে ইয়ান সিবেলিউসের একটা ছবি তুললাম । এক সার লোকের মধ্যে তিনি বসে আছেন । প্রকাণ্ড মাথাওয়ালা লোকটিকে সহজেই চেনা যায় । আমার মনে হয় এই রকম ছবি অতি বিরল । মাঝে মাঝে ছবিটা দেখি আর সেদিনের উত্তেজনাপূর্ণ সন্ধ্যার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে । বিরতির সময় সিবেলিউস নিচে নেমে এলেন এবং পায়চারি করতে লাগলেন আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে । আমাদের জন্য সবাই সসম্মানে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল । আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছিলাম, সবার চোখে প্রশ্নের চিহ্ন, এই কালো আদমিটি কে?

ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কে বা প্রধানমন্ত্রীর নাম হয়তো অনেকে জানে না, তারা জানে কিংবা শুনেছে ইয়ান সিবেলিউসের কথা । মিউজিক জগতে তাঁর স্থান ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠদের সমান পংক্তিতে, বিথোভেন, মোজার্টের মতো সম্মান লাভ করেছেন বিশ্ববাসীর কাছ থেকে । ফিনল্যান্ডবাসীরা গর্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে বলে, আমাদের দেশের একমাত্র রাজা ইয়ান সিবেলিউস । ফিনল্যান্ডের পরিচয় আর ইয়ানের পরিচয় একই কথা ।

দুঃখের বিষয় কি দেশি কি পাশ্চাত্য মিউজিকে আমি অনভিজ্ঞ, সিবেলিউসের বহু প্রশ্নের তাই উত্তর দিতে পারিনি । আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হিন্দু মিউজিক কী প্রকার? যতটুকু জানি আমি রাগরাগিণীর কথা বললাম । এও বললাম যে গায়ক কিংবা বাদকের সেখানে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে মূলসূত্রটি বজায় রেখে অল্প বিস্তর হেরফের করার, যেমনটি পাশ্চাত্য সঙ্গীতে সম্ভব নয় । গ্রিক পণ্ডিত পাশ্চাত্য মিউজিক সৃষ্টি করবার সময় একটি বাঁধা-ধরা নিয়মে চলেছেন । যে মূল রচনার যত কাছাকাছি গাইতে বা বাজাতে পারবে সে তত বড় আর্টিস্ট । হিন্দু মিউজিক তেমন নয় ।

আমি বললাম, ক্ল্যাসিক্যাল ভারতীয় মিউজিক বিজ্ঞানসম্মত ও শাস্ত্রানুমোদিত । তবে তা বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই । তখন সঙ্গীতজ্ঞ বললেন, আচ্ছা, রিমস্কি-কর্সাকভ যেমন লিখেছেন সেটি কি আসল রূপ? আমি বহুবার শুনেছি রুশ কম্পোজার, রিমস্কি কর্সাকভের একটি মিউজিক হিন্দু লাভ সং । অনেক হোটেলে আমি পৌঁছনোমাত্র খাতির দেখাবার জন্য এই পিসটি বাজাত ।

আসলে এটা যে কোনও ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা বয়ে আসছে না সেটা সিবেলিউসকে বললাম । একটা কল্পনার মিউজিক বলা চলে, যেমন আরেকটি লেখা ইন এ পার্শিয়ান মার্কেট ।

আমি রবীন্দ্রনাথের গান লেখার ও হাজার হাজার গানে সুর দেওয়ার অমানুষিক ক্ষমতার কথা বললাম । গানগুলি ভাব ও ভাষার চরম অভিব্যক্তি, পৃথিবীর কোথাও এমনটি দেখা যায় না । একাধারে শ্রেষ্ঠ কবিতা, গান ও সুরবিন্যাস ।

ইয়ান সিবেলিউস আমাকে এত আপনার করে কাছে টেনে নিয়েছেন দেখে মিসেস হোক্কার্ট ভীষণ খুশি । তাঁর বাড়িতে আমার ঘন ঘন ভোজের নেমন্তন্ন আসতে আরম্ভ করল । একজনের মুখে হাসি ধরে না, আর হাসলে যাকে খুব সুন্দর দেখায়, সে হচ্ছে গুন্নারের বোন জিম । মেয়ের কেন এমন পুরুষালী নাম হল জিজ্ঞেস করা হলে জিম বলল, সে একটা ইংরিজি ফার্মে কাজ করে । তার মালিক ইংরিজি ভালো জানার জন্য একদিন প্রশংসা করে বলেছিলেন, ‘ইউ স্পিক লাইক জিম’ । আমি তোমাকে জিম বলে ডাকব । জিমটি কে জানতে চাইলে তিনি বললেন যে সে তাঁর একমাত্র পুত্র । সে অবধি গুন্নারের তৃতীয় বোন জিম নামেই অভিহিত ।

এক শনিবার চাঁদনি রাত্রে জিম আর তার আরও দুটি ছোট বোন, বয়স ২১ ও ১৭ আমাকে নিয়ে গেল তাদের নিজস্ব একটা কটেজ আছে পাহাড়ের গায়ে, বিশ মাইল দূরে । পৌঁছেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল জ্বালানি কাঠ কুড়তে । নিচে একজন হ্রদ থেকে জল আনতে গেল । কটেজ ছোট, মোটামুটি চারজনের মতো শোবার বাঙ্ক ছিল । ঘর বলতে

একটা। রাত্রের খাবার সঙ্গেই ছিল। উইক-এন্ডের বাকি খাবার কটেজের চুলাতেই হবে। মেয়েদের উৎসাহ খুব। আমাকে কোনও কাজ করতে দেবে না। আমি নাকি অতিথি।

খাবারের তোড়জোড় শেষ করে যখন কটেজটা সাফসুফ করা হল, তখন সবাই চলল লেকের জলে, সাঁতার কাটতে। কটেজের দরজা সব খোলা রইল। আমরা নিচে গিয়ে জলে নামলাম। এত আরাম লাগছিল, কারও জল ছাড়বার ইচ্ছে হচ্ছিল না। রাত তখন দশটা হবে। তখনও সূর্যের আলোও ভালো রকমই ছিল।

কটেজের সিঁড়ির ওপর বসে খানিকক্ষণ গান হল। জিম ভালো গান গায়, খুব মিষ্টি গলা। সবচেয়ে ছোট বোন মরিয়ান্না পকেট থেকে মাউথ অরগ্যান বের করে বাজাতে লাগল। এমনিভাবে কেটে গেল প্রায় এক ঘণ্টা।

প্রত্যেক বাঙ্কে খড় ছিল কিছু কিছু, তার ওপর বিছানা খুব আরামের। শহর থেকে যারা এসেছে তাদের কাছে এর নতুনত্ব আছে। এটা আমার জীবনের এখন অঙ্গ হয়ে গেছে। শহরের চেয়ে বনে জঙ্গলে আমার বেশি ভালো লাগে। আপনার লোকের মতো কাছে ঘেঁসে তিন বোন আমাকে গান গাইতে বলল।

প্রচণ্ড শীতের দেশ বলে এই রকম একটা শোবার, বসবার ও খাবার ঘরই যথেষ্ট। একপাশে ছোট্ট রান্নাঘর ও অন্যদিকে বাথরুম। বছরের আট মাস বরফে ঢাকা থাকে। স্কিইং করবার পক্ষে পাহাড়ের গায়ে জায়গাটা চমৎকার। হ্রদের ওপরের জল যখন জমে শক্ত হয়ে যায়, তখন সবাই আইস স্কেটিং করে। গরমের দিনে সাঁতার ও বেড়ানো খুবই আরামদায়ক। ছেলেমেয়েদের অটুট স্বাস্থ্য, কর্মক্ষমতাও তেমনই। আধমন ওজনের একটা রুকস্যাক পিঠে নিয়ে তাতে প্রয়োজনীয় সব জিনিস ভরে, পাহাড়ের পথে ওঠা-নামা সব মেয়েরাই করে।

শীতের দেশে সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে এই যে খাবার জিনিস অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় না। চিজ, কয়েকটা ডিমসেদ্ধ, সসেজ এবং রুটি ও খাঁটি সুগন্ধী মাখন, জ্যাম হলেই যথেষ্ট হল। তাছাড়া টিনের সবরকম খাবার, দুধ ও স্যুপ তো আছেই।

আমাদের দেশে যেমন সারা বছর নানারকম ফল পাওয়া যায়, শীতের দেশে তেমন নয়। টক আপেল সর্বত্র পাওয়া যায়। কমলালেবু ও কলা এরা সুদূর দেশ থেকে আমদানি করে। কলা সবার প্রিয়। আপেল খেলে শরীর ভালো থাকে। এই বিশ্বাসে খুব ছোট থেকে ফল খেতে শেখে, তা যতই টক হোক। শীতের দেশে ফল মিষ্টি হয় না, ফুলও সুগন্ধী হয় না রোদের অভাবে। দক্ষিণ ইউরোপ থেকে মিষ্টি পিচ, প্লাম, পেয়ার্স ইত্যাদি আসে। সেইসব ফলের দাম অনেক। সেসব সাধারণের ভোগে আসে না। অপেক্ষাকৃত

মিষ্টি ফল চেরি মাঝে মাঝে খেয়েছি। আঙুর মিষ্টি হয় যদি দক্ষিণ স্পেনে মালাগা অঞ্চলের অথবা গ্রিসের রোদমাখা দেশ থেকে আসে।

ফিনল্যান্ডে সাউনা বাথ বা স্বাস্থ্যস্নান সম্বন্ধে কিছু না বললে কাহিনী সম্পূর্ণ হবে না। শহরের বাইরেই হয় আসল সাউনা। কিন্তু শহরেও আছে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। হেলসিঙ্কিতে আমাকে নিয়ে গুন্নার একটা বড় সাউনাতে গেল। ঢুকতে এক টাকা লাগল। একজন যুবতী এগিয়ে এসে হাসিমুখে একটা টাওয়েল দিল এবং একটা ঘর দেখিয়ে বলল এই ঘরটা তোমার, কাপড় ছেড়ে এস। আমি কাপড়চোপড় লোহার আলমারিতে রেখে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। আমার গায়ের রং রোদে পোড়া ব্রাউন। এরকম বোধহয় কখনও মেয়েটি দেখেনি। আমার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে রইল। কাছে এসে বললাম তারপর? মেয়েটি বলল, এখন তুমি টার্কিশ বাথ নিয়ে এস ওই ঘরের ভেতর। ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আবার এখানে এস। টার্কিশ বাথের ঘরটা গরম হাওয়ায় ভর্তি। অল্পক্ষণের মধ্যে ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম। তখন আরও বেশি গরম হাওয়া নেওয়ার জন্য দুধাপ এগিয়ে গেলাম। যখন গরম অসহ্য হল, বেরিয়ে এলাম। সাদা ইউনিফর্ম পরা মেয়েটি আমাকে দেখে এগিয়ে এল এবং কোনও এক অতর্কিত মুহূর্তে আমার কোমরে জড়ানো তোয়ালে খানা ফস করে টেনে নিল এবং তখনই বলল, চারদিকে চেয়ে দেখ, একজনও তোয়ালে বা অন্য কিছু পরে নেই। কথাটা ঠিকই, সবাই কিছু না পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাঁতার কাটছে, ম্যাসাজ হচ্ছে।

মেয়েটি আমার হতভম্ব অবস্থা ভালো না বুঝলেও বলল, দারুণ গরম থেকে বেরিয়েছ, এবার এই কনকনে ঠান্ডা জলে সাঁতার কেটে এস। জলে নেমে মনে হল হার্ট চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। ওপরে উঠলাম, আবার জলে পড়লাম। একটু পরে ঠান্ডা জলে খুব আরাম লাগছিল। সুইমিং পুলে অনেক নাগা সন্ন্যাসী জলে ডুবছিল, উঠছিল আবার পড়ছিল। আমার তখন মনে হল ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও কাপড়-জামা পরে স্নান করার রেওয়াজ নেই, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে।

জল থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিচিত মেয়েটি এসে একটা শ্বেত পাথরের ওপর শুতে বলল। তখন রীতিমতো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আমার দলাইমলাই অর্থাৎ ম্যাসাজ আরম্ভ হল। খুব স্মার্ট ও পরিপাটিভাবে ম্যাসাজ করল। সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর আবার স্নানে গেলাম শাওয়ারের নিচে। সেই মহিলাটি তোয়ালে হাতে অপেক্ষা করছিল। আমাকে ভালো করে মুছিয়ে বলল, ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে পড়, এক গ্লাস দুধ রাখলাম, খেও।

কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলাম এবং শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

যদি কেউ না বলে সে কী পানীয় চায় যেমন বিয়ার, হরলিক্স, বভরিল ইত্যাদি, তাহলে তাকে বিনামূল্যে এক গ্লাস দুধ দেওয়া নিয়ম ।

সাউনা বাথের এত কসরৎ করার ফল জিজ্ঞাসা করলে আমি বলব অনেক । খুব সহজ উপায়ে মেদ কমানো যায় । তাছাড়া শরীরটাকে দারুণ গরম ঠান্ডার ভেতর দিয়ে ইস্পাতের মতো সহনশীল শক্ত ও নরম কাজের উপযুক্ত করা যায় । মাংসপেশীর জড়তা কেটে যায় । আমারই ঘুম দিয়ে উঠে ইচ্ছা করছিল দশ-বিশ মাইল ছুটে আসি । মনে হল যেন শরীরের ও সেইসঙ্গে মনের সমস্ত অবসাদ কেটে গেল । আনন্দের অনুভূতি যে কীরকম তা লিখে বা বলে বোঝানো যাবে না ।

শহরের বাইরে সর্বত্র সব বাড়িতে একটা সাউনার ঘর আছে । তার মাঝখানে তিন-চার মন ওজনের একটা গ্র্যানাইট পাথর ইটের ওপর সাজানো । পাথরের নিচে সারাদিন কাঠ দিয়ে গরম করে রাখে । ঘরটার তিন পাশে কাঠের বাঙ্ক আছে । পাথরটা গরম হওয়ার সঙ্গে ঘরও বেশ গরম হয়ে যায় । ওপরের বাঙ্কে সবচেয়ে গরম, তার ঠিক নিচে অপেক্ষাকৃত কম ।

যারা সাউনা স্নান করতে চায় তারা পাথরের চারপাশে এসে বসে । হাতে একটি ছোট বালতি তাতে বার্চ গাছের হাল্কা ডাল । পরস্পর পরস্পরকে বার্চের ডাল দিয়ে শরীরে মৃদু আঘাত করে এবং পাথরের ওপর জলের ছিটা দেয় । ফলে খুব স্টিম হয় এবং ঘরটা অসহ্য রকম গরম হয় ।

বার্চ পাতাসুদ্ধ হাল্কা ডাল দেহের ওপর মারে, একে অন্যের শরীরে রক্ত চলাচলে সাহায্য করতে । তারপর রীতিমতো ঠান্ডা জলে স্নান করে কিংবা হ্রদের জলে লাফ দেয় । ঠান্ডার দিনে বরফের ওপর শুতে হয় । অন্যরা শরীরের ওপর বরফ ঘসে দেয় । ম্যাসাজ করার সমান কাজই হয় । বলা বাহুল্য সাউনা শহরেই হোক আর গ্রামাঞ্চলে হোক জামাকাপড় ছাড়াই হয় ।

দুদিন পরে সিবেলিউয়ের সঙ্গে দেখা করে আমার তোলা ছবিগুলো দিয়ে এলাম । বৃদ্ধ খুব খুশি ।

হোক্কার্ট পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে কষ্ট হচ্ছিল । কতবার এমন হল তার ঠিক নেই । কত লোক এত আপনার করে নেয় অল্প সময়ে, যেন চিরকালের চেনা, তারপর ছাড়াছাড়ি । কিছুদিন মনটা ভার হয়ে থাকে ।

হেলসিঙ্কি ছাড়ার পর ভিবর্গ শহরে থামলাম । ফিনল্যান্ড যদি কখনও শত্রুপক্ষে যোগ দেয় তো ভিবর্গে বসে বসে লেনিনগ্রাদের অশেষ ক্ষতি করতে পারে । অনেকদিন পরে, নাৎসিদের কুপরামর্শে ফিনল্যান্ড লড়তে গিয়েছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে । খারাপভাবে হেরে

গিয়ে ফিনল্যান্ডের এক টুকরো জমি (যেখানে এখন কারেলিয়া) এবং ভিবর্গ শহর ও উত্তরে পেতসামো শহর রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হল । সেইসঙ্গে গুন্নার, হোক্কার্ট ও জিমের ফিঁয়াসে (একজন এয়ার পাইলট) প্রাণ হারাল অন্য অনেক যুবকদের সঙ্গে । পরে ফিনল্যান্ড বুঝেছে যে বড় দেশের গায়ে গা লাগিয়ে শত্রুতা করা চলে না । রুশ জনসাধারণ অতিকষ্টে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে, কোনওমতেই তা হারাবার জন্য তারা প্রস্তুত নয় । এখন দুই দেশে খুব ভাব ।

১০

কারেলিয়া ছেড়ে লেনিনগ্রাদের পথ ধরলাম । রুশ সীমান্তে নতুন ইনল্যান্ড পাসপোর্ট দিল । তারপর দেশে প্রবেশ করলাম । লেনিনগ্রাদ আগে সেন্ট পিটার্সবুর্গ নামে পরিচিত ছিল । এইখানেই লেনিন প্রথম কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট স্থাপন করেন । সেসব জায়গায় ছবি তুললাম । আমি প্রথম থেকে ঠিক করেছিলাম যে বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিসের দুখানা করে নেগেটিভ রাখব, একখানা নিজের জন্য, অন্যটা রুশ গভর্নমেন্টকে দিয়ে পয়সা রোজগার করব ।

লেনিনগ্রাদ ভারি সুন্দর পরিষ্কার শহর । আমস্টার্ডাম শহরের মতো, এখানে চারদিকে জলপথ । রানি ক্যাথারিন দি গ্রেট-এর বাড়িটার নাম এরমিতাজ (Hermitage) । প্রকাণ্ড বড় ক্যানেলের ওপর রাজপ্রাসাদ । এখন ইউরোপের একটি শ্রেষ্ঠ আর্ট গ্যালারি বা চিত্রশালা হয়েছে । দুদিন লাগল ঘুরে ঘুরে অমূল্য ছবিগুলো দেখতে ।

রাশিয়া এখন আর কোনও ধর্মের ধার ধারে না । কোনও দেবদেবী নেই, মানুষের সেবাই একমাত্র ধর্ম । কিন্তু আজও অনেক সুন্দর সুন্দর গির্জা রয়ে গিয়েছে । যারা সে যুগের লোক, ধর্ম ছাড়তে বা ভুলতে পারেনি, তারা উপাসনা করতে যায় ।

আমি সারাদিন সাইকেলে চড়ে শহরময় ঘুরে বেড়াই । ১৯১৭ সালে যেখানে দশদিন ভীষণ সংগ্রামের পর কমিউনিজমের গোড়াপত্তন হল, সে সব জায়গাগুলির ছবি তুললাম । রাশিয়ানরা আজকাল সেখানে যায় তীর্থযাত্রীর মতো । সাম্যবাদ পৃথিবীতে নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে । রাশিয়াতে অতীতে কোটি কোটি লোক দুঃখে কষ্টে পদদলিত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেছে, আজ তারা স্বাধীনভাবে খেয়ে পরে বাঁচবার অধিকার পেয়েছে । মনে হয় এদের অনেক উন্নতি হবে একদিন । এদের ভবিষ্যৎ আছে- কেউ ঠেকাতে পারবে না ।

নেভস্কি প্রসপেক্ট নামক সড়ক ধরে নেভা নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম । ব্রিটিশ রাজদূতের বাড়ি ছিল এখানে । নদীতে একটা বাঁধানো ঘাট আছে, সিঁড়ি আছে এবং দুটি পাথরের ব্রিটিশ সিংহমূর্তি আজও সেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে ।

আমি অন্য দেশের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাব না । জ্ঞানের জন্য যতটুকু জানা দরকার সেইটুকুই জানব । কমিউনিজম ভালো কি মন্দ তাই নিয়ে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে । তবু আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথের ‘রাশিয়ার চিঠি’র তুলনা নেই ।

আমি যখন পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছি তখন কমিউনিজমের বিরুদ্ধাচরণ করে এমন কয়েকটি দেশেও আমি যাব । পাসপোর্টের ওপর রাশিয়া ভ্রমণের ছাপ থাকলে সেটা অন্তরায় হবে, তাই রুশ সরকার আমার পাসপোর্টে কিছু না লিখে অন্য পাসপোর্টে সব রেকর্ড রাখল । রাশিয়া ভ্রমণ করে আমি সেই ‘ইন্টারনাল পাসপোর্ট’ বহু বছর কাছে রেখেছিলাম । অর্ধ-শতাব্দী পরে সেটা আজ কোথায় গিয়েছে তার হিসাব নেই । পাসপোর্টগুলো সব আছে ।

একদিন বিকালে লেনিনগ্রাদের সবচেয়ে বড় গির্জার ছবি তোলবার ইচ্ছায় সুবিধামতো জায়গা খুঁজছিলাম । যেখানে এসে থামলাম সেখানে দেখলাম এক ভদ্রলোক টুপি মাথায় দিয়ে বেঞ্চিতে বসে রোদ পোয়াচ্ছে । বেঞ্চির ওপর উঠলে আমার মনোমত বা পছন্দসই জায়গা পাই ছবি তোলবার পক্ষে । তাই একটু ইতস্তত করে ভদ্রলোককে ছবি তোলবার কথা বললাম । আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, নিশ্চয়ই ছবি তুলবে । বেঞ্চের একপাশে সরে বসল । আমি ছবি তুলে নামবার পর ভদ্রলোক বলল, আচ্ছা তুমি কি ভারতীয়? আমি হ্যাঁ বলাতে ভদ্রলোক পাশে বসতে বলল এবং বাঙালি শুনে খুশি হয়ে বাংলায় কথা বলতে আরম্ভ করল । পরিচয় দিল তার নাম- দাউদ আলি দত্ত । বাঙালি সন্ত্রাসবাদী দলের একজন ফেরার । রুশ দেশে জীবনযাপন করছে । রুশ ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তাদের একটি সন্তান আছে । শীতের দেশে থেকে রংটা আরও ফর্সা হয়ে গেছে । মনে হয় যুগোস্লাভিয়ান কিংবা ইতালিয়ান । বহুকাল বিদেশবাসী ।

আমি যখন বললাম যে কলকাতায় আমার বাড়ি, দত্ত মশায় বাংলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন লেনিনগ্রাদে কবে এসেছি এবং কী করছি । আমার পরিচয় দিলাম ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমার দুহাত ধরলেন । বললেন, কয়েকদিন আগে ‘প্রবাসী’ মাসিক পত্রিকা এসেছে তার বাড়িতে । সে তার স্ত্রীকে আমার কথা পড়ে শুনিয়েছিল । তারপর জিজ্ঞেস করল, আমার তখন কী কাজ আছে । যদি জরুরি কাজ না থাকে তো তার বাড়ি যেতে । আমরা তার বাড়ি গেলাম । স্ত্রী বাজারে জিনিসপত্র কিনতে বেরিয়েছিলেন । একটু পরে বাড়ি ফিরলেন । আমি দাঁড়িয়ে ভারতীয় প্রথায় দুহাত জুড়ে ‘নমস্কার’ বললাম । তিনি না বুঝে বললেন, ‘নমস্কার’ । স্বামীর মুখের দিকে চাইলেন । গোস্পোদিন (অর্থাৎ মিঃ) দত্ত বললেন, এই সেই গ্লোব ট্রটারদের একজন । অন্যদের কথা জিজ্ঞেস করবার অবকাশ হয়নি ।

লন্ডনের বন্ধু নীনার মা-বাবার কাছে সারাক্ষণ রাশিয়ান ভাষা শুনে শুনে আমার কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল । কাজ চলা কিছু কিছু বলতেও আরম্ভ করেছি । অক্ষরগুলো উল্টোপাল্টা বলে শিখতে দেরি হচ্ছিল । রাশিয়ান ভাষার হরফ কিছুটা গ্রিক থেকে নেওয়া ।

ফ্ল্যাটটা ছোট । তিনখানা ঘর- স্বামী-স্ত্রীর একটা, ছেলের একটা ও অন্যটি রান্নার ও বসবার ঘর এবং খাবার ঘর । আগেকার দিনের বড়লোকের বাড়ি বলে ঘরগুলো খুব বড় । সাধারণত এত বড় ঘর ভাগ করে দেওয়া হয় কিন্তু ভারতীয় এবং রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী বলে এই পরিবারের প্রতি বিশেষ বিবেচনা দেখানো হয়েছে । মিঃ দত্ত বহু বছর আগে রাশিয়ান নাগরিক হয়ে গেছে । তার একমাত্র ছেলে ভালো আয় করে । কর্তার পেনশন ও ছেলের আয় থেকে সংসার চলে যায় । স্ত্রী ভালো জার্মান শিখেছেন । তিনি একটা ছেলেদের ক্লাবে সপ্তাহে দুদিন করে শ্রমদান করেন- বিনামূল্যে তাদের ভাষা শেখান ।

গল্প করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেল । আমাকে মধ্যাহ্নভোজ করতে বললেন । ম্যাকারোনি অনেক সেদ্ধ হয়েছিল, টমাটোর রস ও আলুভাজা দিয়ে তাই খেলাম । আড়ম্বর নেই, কিন্তু পেটভরা খাবার সবার জন্যই ছিল । ছেলে দুপুরে বাড়ি আসতে পারে না । যেখানে কাজ করে সেখানেই খেতে দেয় ।

আর খানিকক্ষণ গল্প করে আমি হোটেলে ফিরলাম । রাস্তার ধারে বড় বড় দোকান আছে । ছিল বললে ভালো হয়, কেননা আগে তারা ভোগ্যবস্তুতে ভর্তি ছিল, আজ বেশিরভাগ খালি পড়ে আছে ।

লেনিনগ্রাদ ছেড়ে মস্কো অভিমুখে রওনা হলাম । রাস্তা খুব ভালো । চারদিন পর মস্কো পৌঁছলাম । শহরের চেয়ে গ্রামের অবস্থা সচ্ছল । চাষবাস করে বেশিরভাগ লোক ভালোভাবে জীবিকা নির্বাহ করে ।

মস্কো বিরাট শহর । এখনকার রাজধানী । দেশের এক প্রান্তে বিশেষ করে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত বলে লেনিনগ্রাদ পরিত্যাগ করে মস্কোতে রাজধানী সরানো হয়েছে । ঠিক এই কারণে ইস্তাম্বুল থেকে রাজধানী সরিয়ে কামাল পাশা সেটা তুর্ক দেশের মাঝখানে আঙ্কারাতে নিয়ে যান । যেসব জাতির নৌবাহিনী বড় এবং ক্ষমতাপন্ন তারা সমুদ্র থেকে গুলিগোলা বর্ষণ করে রাজধানী বিপন্ন করতে পারে । দুই হাজার বছরের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় ।

মস্কো নদী শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে । শহরের ও নদীর নাম এক ।

আমি উঠলাম পিস হোটেলে। তিন তলার ওপরের ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে মস্কো নদী দেখতে পাই। নদীর ওপরে বিখ্যাত 'রেড স্কোয়্যার', আরেক দিকটায় উঁচু একটা টিলার ওপর ক্রেমলিন দুর্গ। এখন সেটা সরকারি দপ্তর। যদিও শহরের মাঝখানে, তবু ক্রেমলিন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আশপাশ থেকে।

এই হোটেলের খাবার খুব ভালো। সকালে প্রাতরাশের জন্য টোস্টের সঙ্গে কাঁচা মাছের ডিম দিত। স্টার্জন মাছ একমাত্র বলটিক সমুদ্রে জন্মায়। ওই মাছের ডিম কাভিয়ার নামে সবার প্রিয়। রুশ দেশের বাইরে কাভিয়ার রীতিমতো বড়লোক ছাড়া কেউ খায় না। তবে এদেশের দরজায় জন্মায় বলে রাশিয়াতে সবাই খায়। রুশ দেশে বড়লোক, গরিব লোক শ্রেণীগতভাবে নেই। যে যেমন কাজ করে তার মাইনে তেমন, ভালো কাজ করলে প্রমোশন চটপট হয়। সেই সঙ্গে সব রকম সুবিধা সে এবং তার পরিবার উপভোগ করে। এ আরেক ধরনের শ্রেণী বলা চলে।

ক্রেমলিনের ভেতরে ঢোকবার পাস নিলাম। সবদিক ঘুরে ঘুরে ছবি তুললাম।

বিকালে কিছু দূরে স্পোর্টস পার্কে বেড়াতে গেলাম। এখানে তরুণ-তরুণীরা নানা রকম শারীরিক পরিশ্রমের খেলায় ব্যস্ত। অফিস, কারখানা থেকে সোজা খেলার মাঠে আসে বলে অনেকের বেশভূষা খেলার উপযুক্ত নয়, কিন্তু তাতে কী আসে যায়! কালো কি ছাই রংয়ের ট্রাউজার পরে কি আর ক্রিকেট খেলা যায় না?

পরদিন 'বলশয়' থিয়েটারে- 'সোয়ান লেক' ব্যালে দেখতে গেলাম। কমিউনিজম আমদানি হবার আগে 'বলশয়' ছিল রীতিমতো বড়লোকদের আনন্দ উপভোগের স্থান। আজ আমার পাশে বসে আছে যারা তারা চাষী পরিবারভুক্ত মনে হয়। আগেকার দিনে তারা এই থিয়েটারে ঢুকতে পেত না। আগে আর্ট ছিল বড়লোকদের কুক্ষিগত।

শহরের চারদিকে রাস্তা তৈরি ও বাড়ি তৈরির ব্যস্ততা দেখলাম। মেয়েরা সব কাজে অগ্রণী। তারা ট্রাম, ট্রেন চালাচ্ছে, এমনকী জাহাজের কাপ্তেনও হয়েছে। অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে মেয়েদেরও দেখেছি। রাস্তায় স্টিম রোলার চালানো থেকে পিচ ঢালার কাজ মেয়েরা খুব সুষ্ঠুভাবে করছে। বুঝলাম এদেশের কর্মের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের কোনও পার্থক্য নেই। যে কাজ পুরুষের তা মেয়েদেরও। লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে। মেয়ে ভারি ট্রাক চালাচ্ছে দেখলে হাঁ করে না দেখে লোকে ড্রাইভিংয়ের তারিফ করতে শিখেছে। তখন কে ভেবেছিল যে একদিন এক রুশ মহিলা মহাকাশ যাত্রা করবে এবং সারা পৃথিবীতে সর্বাগ্রগণ্যা হবে।

মস্কোর দুটো বড় বড় চিত্রশালা দেখলাম। একটি রুশ যুবক আমার সঙ্গে ভাব করল। খুব আগ্রহ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানবার। তার নাম ইভান। একটা ছোট্ট এক ঘরওয়ালা

ফ্ল্যাটে সে থাকত। তার মেয়াদ আরও দুবছর। তারপর দুই ঘর ফ্ল্যাট পাবে। দেশসুদ্ধ লোককে থাকবার উপযুক্ত বাড়ি দেবে এই প্রতিশ্রুতি রুশ গভর্নমেন্ট অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

আমাদের দেশে আজও কুকুর বেড়ালের মতো লোকেরা ফুটপাথে শুয়ে জীবন কাটায়। অথচ আমরা প্রগতির বড়াই করি। রুশ দেশে কী পরিমাণ প্রগতি হয়েছে তা আমাদের কল্পনাতীত। ওদের তুলনায় আমরা এখনও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাস করছি।

পাঁচদিন পরে ইভানের সঙ্গে দেখা হল। সে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল যে শীঘ্রই সে সাইবেরিয়াতে চলে যাবে, একটা নতুন শহরের পত্তন করতে। সাইবেরিয়ার নামে আতঙ্ক জাগে মনে। প্রথমেই মনে হয় নিঃসঙ্গ দেশ আর হাড়ভাঙা শীতের কথা। ইভান বলল যে সে একদল লোকের সঙ্গে ছুটিতে সাইবেরিয়া বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে এক জায়গায় লোকের বসবাস হলেই গভর্নমেন্ট বাড়ি, স্কুল, সিনেমা, নাচঘরের ব্যবস্থা করে দেবে। তখন আর নিঃসঙ্গ নির্বান্ধবপুরী মনে হবে না। তাছাড়া কাজে চটপট প্রমোশন ও প্রতিপত্তি লাভ করাও সেখানে অনেক সোজা।

ইভানের ইচ্ছা দশ-বিশ বছর সাইবেরিয়ার একটা খনিতে কাজ করে নিজের উন্নতি সাধন করবে, তারপর উরাল পর্বতের এপারে আসার কথা ভাববে। যদি কাউকে ভালো লাগে তো সেখানেই বিয়ে করবে। ইভান খনিজ পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করেছে। সে খনির কাছে থাকতে চায়- তবেই তার উন্নতি হবে।

রাশিয়াতে হাজার হাজার যুবক আছে যারা দেশ গড়তে রাশিয়ার উত্তরে বরফের দেশে কিংবা সাইবেরিয়াতে যেতে প্রস্তুত। তাদের ধারণা আজ যে গ্রাম আছে কাল সেটা ছোট শহর হবে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার নানা রকম পথ উন্মুক্ত হবে এবং সব রকম জিনিসপত্র ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হবে।

দেশে এখন চারদিকে ভাঙা গড়ার কাজ চলছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে মস্কোতে পাতাল রেলওয়ে হয়েছে যা দেখবার মতো। আগে ও পরে যত আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে দেখেছি তাদের মধ্যে মস্কোর স্থান সর্বাগ্রে। প্রত্যেকটি স্টেশন দেখবার মতো। চারদিকে দামি পাথর দিয়ে গড়া থাম ও দেওয়াল। আলোর সুবন্দোবস্ত চোখে পড়ে। পাছে একঘেয়ে হয়, সেজন্য কর্তারা তরুণ স্থপতিবিদদের ডেকে বলল, তোমরা ইচ্ছামতো স্টেশন বাড়ি তৈরির প্ল্যান দাও। যুবকরা উৎসাহী হয়ে ডিজাইন দিল এবং তাদের বেশিরভাগ সাদরে গ্রহণ করে নতুন নতুন বাড়ি ও স্টেশন গড়বার কাজ চলল।

অত খরচ করে দামি দামি মার্বেল, মালাকাইট ইত্যাদি পাথর দিয়ে স্টেশন তৈরি করার সার্থকতা কী জিজ্ঞেস করে জানলাম যে বর্তমানপন্থীরা বলে একজন বড়লোকের বাড়িতে

কারুকার্য করে সাজিয়ে মুষ্টিমেয় লোকের আনন্দ দেবার চেষ্টা না করে, আমরা সাধারণের ব্যবহারের সব জায়গা সুন্দর করে সুরুচিপূর্ণভাবে সাজিয়ে সবাইকে ব্যবহার করতে ডাকছি । লোকেরা যে যত্ন করে ব্যবহার করে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । কোনও স্টেশনে একটু ধুলো নেই । পাথর সব চিক চিক করছে এমন পরিষ্কার ।

যখন আমি বললাম যে এত স্টেশন, ঘরের মতো সাজিয়ে পরিষ্কার রাখা এক দুরূহ ব্যাপার নয় কি? তখন এক মহিলা বললেন যে এত বড় কাজ এক রকম বিনামূল্যে হয় । ছাত্র-ছাত্রীদের দিন ধার্য আছে যাতে তাদের নিজস্ব মেট্রো চকচকে ঝকঝকে রাখবার জন্য তারা শ্রমদান করে । সৈন্যবাহিনীও চুপচাপ বসে না থেকে কখনও কখনও এইসব পরিষ্কার করার কাজে হাত দেয় ।

ইউক্রেনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় দেখেছি নবীন সৈনিকদের দিয়ে চাষবাসের কাজ করানো হচ্ছে । তারাও হাসিমুখে মাঠে হাল দিচ্ছে, গম কাটছে, গো-পালন করছে দেখা যায় । সবার সব কাজে প্রচণ্ড উৎসাহ । আমাদের দেশে এ রকম ভূতের ব্যাগার খাটার লোক পাওয়া যায় না । রাশিয়াতে সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে সাম্যবাদ চালু হবার পর থেকে সবার মনে দেশপ্রেমের বন্যা বইছে । ‘আমার দেশ এবং আমার দেশের সব জিনিস পবিত্র, তাকে নষ্ট করবার, ভাঙবার কথা মনে আসে না’- এই ভাব সর্বত্র ।

আমাদের দেশে যেমন ট্রেনের আলো, বসবার গদি ইত্যাদি চুরি করে কেটে ছিঁড়ে নষ্ট করে, সে রকম এদেশে কল্পনাতীত । দেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যখন আবালবৃদ্ধবনিতা দেশের সব জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও যত্নবান হয় ।

অক্টোবর রেভোলিউশনের দিনে প্যারেড কুচকাওয়াজ ইত্যাদি ঘটা করে হয় । জনসাধারণ এইসব প্যারেডে যোগ দেয়, একেকটি দল করে । আবার ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে থেকে ধুমধামও দেখতে পারবে । আমাদের হোটেলে একটি তরুণী এসে বলল, রেভোলিউশন অ্যানিভার্সারিতে যারা যোগ দিতে চায় তারা যেন নাম দেয় । আমি নাম লেখালাম । আমাকে বলা হল যে ইংরিজি ভাষা-ভাষীদের দলের পুরোভাগে যেন আমি থাকি । প্রায় ১০০ জন (পুরুষ) ইংরেজ ও অন্যদের নিয়ে একটা দল হল । আমাকে বেশি কিছু খাটতে হয়নি । সবাই নিয়মে চলে, তাই নিয়ম মানলেই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে হয় ।

১০ অক্টোবর ভোরে উঠে যথাস্থানে হাজির হলাম । আমাদের দলকে লাইনবন্দী করে একটু ঘোরাফেরা করে তৈরি থাকলাম যে যখন ডাক আসবে সঙ্গে সঙ্গে ক্রেমলিনের পাশে রেড স্কোয়্যারে যাব । যখন সময় হল, আমাদের দল মস্কো নদীর ওপর চওড়া সেতুর মুখে গিয়ে দাঁড়াল, নদী পার হলেই, বিরাট রেড স্কোয়্যার ।

চারদিকে বাজনা বাজছে, পতাকা উড়ছে, লোকে লোকারণ্য। আমরা দেখতে লাগলাম। আগের দল চলে গেলে আমরা এগোতে পারব।

এমন সময় একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। লন্ডনে থাকতে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে একটি তরুণীর সঙ্গে ভাব হয়। তার নাম মিস এঞ্জেলা গেস্ট। এঞ্জেলার বাবা একজন মেম্বার অব পার্লামেন্ট। এঞ্জেলা লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে গবেষণা করত প্রফেসর ল্যাস্কির অধীনে। ভালো ছাত্রী কিন্তু তার মাথায় তখন কমিউনিজমের চিন্তা। কমিউনিজমের ফলে পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে এই তার বিশ্বাস। বিশ্বাসের মাত্রা খুব বেশি ছিল, সেইজন্য কথায় কথায় তার সঙ্গে তর্ক শুরু হয়ে যেত। এঞ্জেলার মনটা খুব দরদী তাই ঝগড়া সহজেই ভুলে যেত।

এঞ্জেলার গায়ে জোর ছিল অমানুষিক। সে যে কোনও ছেলের সঙ্গে লড়তে পারত।

রেড স্কোয়্যারের ঘটা দেখে মনে পড়ল এঞ্জেলার কথা। সে এই আয়োজন ও আনন্দ সমাবেশ দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হত।

মস্কো নদীর ওপর সেতুর প্রায় মাঝখানে পৌঁছেছি তখন রেড স্কোয়্যার থেকে ফিরতি একটা মহিলার দল উল্টোদিক থেকে আসছিল। অবাক হয়ে দেখলাম সেই দলের প্রথমেই এঞ্জেলা গেস্ট। আমরা দুজনেই পরস্পরকে দেখে নাম ধরে ডাকলাম চিৎকার করে, তারপর বললাম যে কোন হোটেলে আছি। এরকম হঠাৎ দেখা হওয়ায় দুজনেই খুব খুশি।

তারপর এগিয়ে চললাম, থামবার ফুরসৎ নেই। রেড স্কোয়্যারে সব দলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল সমবেত জনমণ্ডলী হাততালি দিয়ে। লেনিনের মরদেহ যেখানে রাখা আছে সেখানে আমার দল নিয়ে এক মিনিট দাঁড়ালাম এবং মনে মনে মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম।

বিকালটা কাটল অ্যামুজমেন্ট পার্কে বাইচ খেলা দেখতে। তারপর ফায়ার ওয়ার্কস দেখে রাত্রে হোটেলে ফিরলাম। শোবার সময় মনে হল এমন দিনে মস্কোতে না কাটালে রাশিয়ায় আসা বৃথা।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খেয়ে একটা ইংরিজি খবরের কাগজ খুঁজছি, ওদিকে অফিসে আমার খোঁজ পড়েছে। এঞ্জেলা এসে হাজির। সে সবেমাত্র একদিন আগে মস্কো পৌঁছেছে। শহরের সে কিছুই দেখেনি তখনও।

সকালবেলায় দলের মাথায় আমাকে খাড়া করে দিয়েছিল বলে পরে অনেকে আমার সঙ্গে নিজে থেকে এসে আলাপ করল, ভাব জমল একজনের সঙ্গে- প্রফেসর ব্রাউন। সে আমারই সমবয়সী, আমেরিকান প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়। ব্রাউন যখন শুনল যে

আমি সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছি এবং রাশিয়া দেশটি কেমন আবিষ্কার করা আমার উদ্দেশ্য, তখন সে আমার সঙ্গে সব জায়গায় যেতে চাইল । এঞ্জেলারও তাই মতলব । তার এক বন্ধু, প্রফেসর উইলিয়ামস কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে গণিতশাস্ত্র পড়ায় । আমরা সবাই সমবয়সী । সহজেই ভাব হল । এরা সবাই মিলে দল করে বলল, এস দেশটাকে আবিষ্কার করা যাক । কেন জানি না আমাকে তাদের দলের নেতা বানিয়ে দিল । দলে আরেকজন জুটল, তার নাম সুশান । তার জীবন সম্বন্ধে দু-চার কথা বলছি । সুশান বাবা-মার একমাত্র কন্যা । বয়স ২৩, সুশানের বয়স যখন পাঁচ, তখন রাশিয়া থেকে বিদ্রোহের সময় তার মা-বাবা লন্ডনে চলে যায় । দেশের অনেক কথা শুনেছে মা বাবার কাছে । কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের কথাও শুনেছে বড় হয়ে স্কুল-কলেজে পড়ে । সব জায়গায়ই সে ইংল্যান্ডের লোকেদের মধ্যে রাশিয়ার প্রতি ঘৃণা লক্ষ করেছে । তার ফলে সে ঠিক করল যে রাশিয়া, তার মাতৃভূমিকে দেখতে হবে, ইনট্যুরিস্টের সাহায্যে । মস্কো পৌঁছেছে সবেমাত্র । সে আমাদের দলে ভিড়ল । তার মা-বাবা ভয় দেখিয়েছিল যে রাশিয়ায় তাকে বন্দী করে রাখবে । এ পর্যন্ত আটক হওয়া তো দূরের কথা বরং সব দেখে শুনে সে উচ্ছ্বসিত ।

আমাদের কাউন্সিল বসল, কে কী দেখতে চায় সে সম্বন্ধে ঠিক করে মস্ত বড় লিস্ট হয়ে গেল । প্রথমেই পাড়ার কাছে হাই স্কুলে যাওয়া এবং ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বসে তাদের পড়াশোনার মাপকাঠি ঠিক করা । আমরা পাঁচজন স্কুলে ঢুকে প্রথমেই হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করলাম এবং মতলব জানালাম । তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন, যে কোনও ক্লাসে গিয়ে বসতে পারি, বাড়িটা চারতলা ।

আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স বুঝে একটা বড়দের ক্লাসে ঢুকলাম । হেডমাস্টার সেখানে টিচারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন । ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কের প্রশ্ন ছিল, সেটা ছেলেমেয়েরা খাতায় লিখে কষছিল । ব্রাউন ও উইলিয়ামস দুজনেই বিভিন্ন জায়গায় খাতার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিল । বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে সহজেই কষে ফেলল । তখন দুজনেই বিচার করতে আরম্ভ করল, এই ধরনের অঙ্ক আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের কোন বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে উপযুক্ত । দেখা গেল বয়স ও ক্লাস ইংল্যান্ডের মতোই । তবে ছেলেমেয়েরা মেধাবী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ।

আরও একটা ক্লাসে গেলাম এবং সেখানের ছাত্র-ছাত্রীরা অপেক্ষাকৃত কমবয়সের বলে আমরা তাদের মধ্যে গিয়ে বসলাম । ক্লাসের পড়া শেষ হবার পর আমরা উঠলাম । তখন একটি ছাত্রী বলল যে আমরা কে কোন দেশের লোক সে সম্বন্ধে কিছু বলতে । মেয়েটি খুব সপ্রতিভ । অধ্যাপক ব্রাউন বেশ গুছিয়ে ছোট্ট অল্প কথায় আমেরিকান স্কুলের

ছেলেমেয়েদের কথা বলল । তারপর মস্ত প্রশংসা করে বলল যে রুশীয় স্কুলের ছেলেমেয়েরা বরং এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে । সুশান তর্জমা করে দিল ।

স্কুল পরীক্ষা করতে গিয়ে সারা সকাল কাটল । বিকালে একটা ক্রেশ দেখতে গেলাম শহরের বাইরে একটা নগণ্য গ্রামে । ছোট ছোট গুড়গুড়ে ছেলেমেয়েরা একটা কাঠের ঘরের চারদিকে আপনমনে বসে রয়েছে । একটি তরুণীর ওপর তাদের দেখাশোনার ভার । মনে হল সে একটা গল্প বলছিল বাচ্চাদের । তাদের জন্য একটা ঘরভর্তি ছোট ছোট খাট আছে । খাওয়া, খেলা এবং তার মধ্যে যাতে বুদ্ধির বিকাশ হয় সে বিষয়ে চেষ্টা আছে । তরুণীর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে আমরা সেই গ্রামের একটা মিডল স্কুল দেখতে গেলাম ।

তখন সেখানে ড্রিল হচ্ছিল । এই স্কুল বাড়িটা কাঠের কিন্তু মস্ত বড় । বেশ সুষ্ঠুভাবে ড্রিল করছিল ছেলেমেয়েরা, তাদের কোনও ইউনিফর্ম ছিল না কিন্তু সবাই বেশ পরিপাটি । ড্রিল মাস্টার একজন ভদ্রমহিলা, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কে । আমাদের মধ্যে দুই প্রফেসর দেখে, ভদ্রমহিলা আগ্রহ করে আমাদের ডাকলেন । এদেশে স্কুল-কলেজে পড়তে কোনও খরচ লাগে না, তাই শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি এবং ব্যাপকভাবে ।

সন্ধ্যা হয়ে এল । আমরা গ্রামের কাঁচারাস্তা ধরে যেখানে পড়বার জন্য ছেলেমেয়েরা একত্র হয় সেই ওপেন এয়ার লাইব্রেরি দেখতে গেলাম । মনে হল গ্রামের সবাই সেখানে উপস্থিত । কাগজ, ম্যাগাজিন, বই- অবিশ্যি রুশ ভাষায় লেখা, সবার কাছে । সবাই আগ্রহ ভরে পড়ছে ।

গ্রামে এখনও সেই আগের আমলের কাঠের ছোট ছোট বাড়ি আর কাঁচা রাস্তা দেখা যায় । জল সরবরাহ করছে ভারী দিয়ে জল বয়ে এনে । এখানেও ভাঙা গড়ার কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে । নদী থেকে শোধিত জল দুমাসের মধ্যে গ্রামের সব অঞ্চলে পাবে, তার বিরাট আয়োজন চলছে ।

আসল লাইব্রেরি দেখতে গেলাম একটা পুরনো বাড়িতে । সেখানে ছেলেমেয়েরা ভিড় করে বই নিচ্ছে, দিচ্ছে অথবা পড়ছে । এত বই পড়ার আগ্রহ আমি আগে কোথাও কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না । অধ্যাপক ব্রাউন বলল, এ একটা আশ্চর্য ঘটনা, এরকম অনুসন্ধিৎসা সাধারণ লোকেদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, বিশেষ করে একটা নগণ্য গ্রামে ।

লাইব্রেরিয়ান আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোন দেশের লোক । আমি ভারতীয় এবং বাঙালি শুনে বললেন যে রবীন্দ্রনাথের তিনখানা বই ইংরিজি থেকে রুশ করে তর্জমা করা হয়েছে । তাদের চাহিদা এত দেখা গিয়েছে যে রুশ গভর্নমেন্ট নির্দেশ

দিয়েছে রবীন্দ্রনাথের সব বই তর্জমা করা হবে বাংলা থেকে । সুবিধা হলেই উৎসাহী মহিলা কিংবা পুরুষকে পাঠানো হবে কলকাতায় । তারা ভালোভাবে শিখে মূল বাংলা থেকে রুশ ভাষায় তর্জমা করবে ।

সুষ্ঠুভাবে এই কাজ শুরু করবার আগেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লেগে গেল এবং রাশিয়ার ঘোর বিপর্যয়ের সময় এল । সামলে উঠে রুশীরা পূর্ব পরিকল্পিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে । এক ভদ্রমহিলা আমাদের দেশে আসেন রবীন্দ্রসাহিত্য অনুধাবনের জন্য এবং কিছুকাল এখানে থেকে তর্জমা করতে আরম্ভ করেন । মৈত্রেয়ী দেবী তাঁকে খুব সাহায্য করেন । তার ফলে আজ রাশিয়ায় সর্বত্র লক্ষ লক্ষ রবীন্দ্রসাহিত্যের বই ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছে । খুব কম বিদেশি লেখকেরই এত বই রুশ ভাষায় ছাপা হয়েছে বলে শুনেছি ।

এ পর্যন্ত আমরা যতটুকু দেখেছি তা আমাদের মুগ্ধ করেছে । এঞ্জেলা ও সুশান খুবই গর্ববোধ করছিল । দুই প্রফেসর লোক ভালো, তাই উৎসাহের সঙ্গে সব গ্রহণ করতে পারছিল । আমি ছবি তুলতে ব্যস্ত ।

রাশিয়াতে আমরা অনেক কলকারখানা দেখলাম । অনেক জিনিস নজরে পড়ল, যেমন ক্যামেরা, ক্যাপস্টান, লেদ ইত্যাদি যা জার্মান লাইকা ক্যামেরার ও বিলেতি লেদের হুবহু অনুকরণ । একজন রুশ যুবক আমাকে জানাল যে এ সব নকল । রাশিয়া কপিরাইট মানবে না বলল । আরও বলল যে কপিরাইটের দোহাই দিয়ে কেউ রাশিয়ার অগ্রগতি ব্যাহত করতে পারবে না ।

রাশিয়ান ক্যামেরা দিয়ে আমি ছবি তুলে দেখেছি তারা জার্মান ক্যামেরার চেয়ে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয় । কপিরাইটের দোহাই দিয়ে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী শক্তিকে খর্ব করা হয়েছে এবং এর ফলে পৃথিবীর প্রগতি ব্যাহত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ।

সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে মস্কোতে ফিরলাম সন্ধে সাতটায় । খুব তেষ্টা পেয়েছিল বলে একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকলাম । আমরা বিদেশি দেখে ম্যানেজার নিজেই এগিয়ে এল এবং আমাদের সবচেয়ে ভালো জায়গায় বসতে দিল । আমরা সবাই মদ অর্ডার দিলাম । বছরের এই সময়টায় টাটকা আঙুরের রস পাওয়া যায় । বেশি অ্যালকোহল থাকে না বলে রস কয়েকদিনের বেশি ভালো থাকে না ।

রেস্তোরাঁর একপাশে ছোট্ট একটা স্টেজ ছিল । একটা কসাক বেশভূষা পরা ছেলে ও একটি তরুণী নাচছে । রীতিমতো কসরৎ করছে, দেখতে ভালো লাগল । অল্প সময়ের মধ্যে রেস্তোরাঁ স্ত্রী-পুরুষে ভরে গেল ।

একটা নাচুনে সুরের মিউজিক হচ্ছিল । সবাই এক সুরে গান ধরল ।

হোটেলে ফিরে ঠিক করলাম পরদিন শহর থেকে দূরে একটা কাপড়ের কল দেখতে যাব ।

কালিনিন গ্রামের কাছে কারখানা, বেশ বড়, দিবারাত্র কাজ হচ্ছে । ২,৫০০ লোক কাজ করছে । মেয়েরাই বেশি । আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করলাম যে সমস্ত যন্ত্র চাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে । কারণ জিজ্ঞেস করে জানলাম যে রুশীরা মনে মনে জানে পশ্চিমদিক থেকে একদিন না একদিন জার্মানি তাকে আক্রমণ করবে, তখন সব মেশিন তুলে নিয়ে উরাল পাহাড়ের ওপরে চলে যাবে এবং সেখান থেকে যুদ্ধ চালাতে হবে ।

এই কারণে নিজেকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য রুশ অসংখ্য ট্যাঙ্ক তৈরি করেছে । আমি অল্পদিন রাশিয়াতে থেকেছি কিন্তু আমার চোখে এটি স্পষ্ট, রাশিয়াকে যে আক্রমণ করবে সে ভুল করবে ।

এঞ্জেলা ও সুশানকে ওরা দুটো বড় রুমাল উপহার দিল ।

দুপুরবেলায় লাঞ্চ খাবার সময় কর্মীরা আমাদের নেমন্তন্ন করল তাদের ক্যান্টিনে খাবার জন্য । সারি সারি মেয়েদের মধ্যে আমাদের বসবার স্থান হল ।

খাবার খুব আড়ম্বরবিহীন । আলুসেদ্ধ, এক টুকরো মাংস এবং কালো রুটি, বাঁধাকপি নুনে জারানো । সবাই ভালোবেসে খেল ।

সুশানের খুব সুবিধা । সে রুশ ভাষায় অনবরত বক বক করছিল শ্রমিকদের সঙ্গে । সাত ঘণ্টা ডিউটি হয়ে গেলে কর্মীরা নানা কাজে চলে যায় । অনেকে পড়াশোনা করে । এ যেন একটা নতুন দেশ, সমুদ্রমন্থন করে চলেছে । সপ্তাহে দুদিন ছুটি সবাই পাবে ।

রবিবার একটি নির্দিষ্ট দিনে সবার ছুটি হয় না । সারা সপ্তাহ কারখানা চলে, তার মধ্যে কর্মীরা প্রত্যেকে বিভিন্ন দিনে দুদিন করে ছুটি উপভোগ করছে ।

ক্লান্ত হয়ে রাত্রে হোটেলে ফিরলাম । ঠিক হল পরদিন কোনও প্রোগ্রাম না করে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে যাব । শহরের বাইরে, তারপর যা মন চায় দেখব ।

প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে একটা মেঠো পথ ধরে চলেছি । দুধারে গমের খেত । তার মাঝখানে একটা ছোট্ট ঝুপড়ির মধ্যে এক বৃদ্ধ বসে বসে ফসল পাহারা দিচ্ছিল, যাতে পাখিরা সব না খেয়ে যায় । আমরা মাঠের রাস্তা ছেড়ে খেতের ওপর দিয়ে সেই বৃদ্ধের কাছে পৌঁছলাম । লোকটি বেশ শান্ত প্রকৃতির । আমরা পাঁচজন বিদেশি রাশিয়া দেখতে এসেছি শুনে খুব আনন্দিত হল । বার বার বলল, আমার দেশটা মস্ত বড় । একেক দিক একেকরকম । সুশান তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল । আমরা জমির মালিকানা নিয়ে অনেক প্রশ্ন করলাম । সে বলল যে সামনের দুটো খেত ছোট ছোট এবং মেশিনে চাষবাসের

উপযুক্ত নয় । সেজন্য সেই জমির স্বত্ব মালিকের । ফসল কো-অপারেটিভে জমা দেয় । ইচ্ছে করলে একই দরে সে অন্যদের কাছে বেচতে পারে ।

পাশের গ্রামে কোলখজ বা জাতীয়করণ করা হয়েছে চাষবাসের জমি । আমরা দেখতে গেলাম কীরকম বিরাটভাবে চাষের কাজ চলছে । পাশাপাশি গো-পালন আছে, মেশিনারির সাহায্যে সব কাজ হচ্ছে ।

এখানে আমাদের কমিউনিটি কিচেন দেখবার সুযোগ হল । সবার জন্য কিচেনে রান্না হয়েছে । ভালো স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পাওয়া যায় । এখানে কাউকে বাড়িতে রাঁধতে হয় না । আমাদের দেশে রোজ উনুন ধরাতে, বাজার করতে, কুটনো কুটতে এবং রাঁধতে যে অফুরন্ত সময় চলে যায়, সেটা থেকে বাঁচবার একটা পথ বের করেছে এদেশে । লোকেদের স্বাস্থ্য ভালো । এদিকে কর্তৃপক্ষের খুব সতর্ক দৃষ্টি । লক্ষ করেছি যে খাবার টেবিলে শাকসব্জি, মাংস, দুধ, ফল ইত্যাদির দ্রব্যগুণ হিসেব করে ছোট ছোট লিস্ট দিয়েছে, প্রত্যেক লোককে ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে দেয় তার শরীরে কোনও ভিটামিনের অভাব আছে কিনা । সেইমতো খাবার পছন্দ করে খেলে অর্থাৎ ভিটামিনের অভাব অনুসারে সেটা পুরোমাত্রায় খেলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে । ডাক্তারের খরচ লাগে না । বৃদ্ধ বয়সে কাজ থেকে বিশ্রাম নিলে কিংবা কাজে অপারগ হলে বৃদ্ধদের আবাসে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে ।

এই রকম হোম খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । একটা বাড়িতে গিয়ে দেখলাম বাগানে ডেক চেয়ারে সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বসে রয়েছে । প্রয়োজন হলে নার্স এসে সাহায্য করবে । মোটামুটি দেখলাম এদেশে পড়তে খরচ লাগে না, অসুখে খরচ নেই, বুড়ো বয়সে হোমে থাকবে বিনা খরচায় ।

লোকেদের ভবিষ্যতের জন্য দুর্দিনের জন্য সংস্থান করবার কথা ভাবতে হয় না । তাই রোজগারের সবটাই খরচ করতে কোনও বাধা নেই । যে দেশে সাধারণের মঙ্গলের জন্য কর্তৃপক্ষ এতদিকে দৃষ্টি রাখে সে দেশ পৃথিবীতে ধন্য । তার স্থান সবার ওপরে ।

শেখবার জন্য, আবিষ্কার করবার জন্য স্কুল-কলেজ ও কারখানার দ্বার সব সময় উন্মুক্ত ।

রাশিয়ানদের মনে হয়েছে যে দেশ তাদের জন্য এত করে, প্রতিদানে তারা তার দেশের জন্য কী করতে পারে? অনেকে ছুটির সময় শ্রমদান করে । তাদের যাতায়াতের রেল বাসের টিকিট লাগে না । বিনামূল্যে পাস দেখিয়ে চলতে পারে ।

যৌথ খামারে সুশান ও এঞ্জেলা অফুরন্ত প্রশ্ন করে গেল, লোকেরা হাসিমুখে উত্তর দিল । সুশান বলল যে এতদিন সে তার বাবা মার কাছে যা শুনেছে রাশিয়ান শ্রমিক সম্বন্ধে,

সেসব ভুল। এখন সে রাশিয়াতে বরাবরের জন্য থাকতে চায়।

সন্ধ্যাবেলায় মস্কো রেডিওতে আমার ভ্রমণ সম্পর্কে ইন্টারভিউ হল। সবার শেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার রুশ দেশ কেমন লাগছে।

শুনলাম সাক্ষাৎকার খুব ভালো হয়েছে।

একদিন পরে আবার আমার নিমন্ত্রণ হল রেডিওতে বলবার জন্য। বিষয় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষা। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা ভাষার জন্মদাতা, সেজন্য আমি রবীন্দ্রনাথের জীবনের ওপর কিছু বললাম। পরে 'হৃদয় আমার নাচেরে' কবিতাটি আবৃত্তি করলাম এবং শেষে একটা গানও গাইলাম। দুদিনে ১,০০০ রুবল লাভ হল।

আমার কাজ ছবি তোলা। যা ভালো দেখি, যা লোককে দেখাবার উপযুক্ত, সে সবের ছবি তুলছি। আরেকদিন বলশয় থিয়েটারে গেলাম।

আরও দুদিন মস্কো শহরে কাটালাম। তারপর যে যার দেশে চলে যাবার পালা। কার ওপর কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে বেশ বোঝা গেল। প্রফেসর ব্রাউন ও এঞ্জেলা একেবারে উচ্ছ্বসিত। তারা চায় সমস্ত পৃথিবী রাশিয়ার অনুকরণ করুক। অধ্যাপক উইলিয়ামস ও আমি সব জিনিস দেখলাম, শুনলাম এবং মনে মনে তারিফ করলাম। সুশানের তো কথাই নেই। সে মনে করছে যে নিজের দেশে ফিরে এসেছে। তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা মাটির টান বলে বোধ হল।

পরিণত বয়সে আমাদের পাঁচজনের কার কী হল মাঝে মাঝে ভাবি। আমরা ছাড়াছাড়ি হবার এক বছর পরে, আমি যখন ডেনমার্কে তখন আমার একটি লন্ডনের বন্ধু রঞ্জিতকুমার সেনের (টুলু) কাছ থেকে একদিন চিঠিতে জানলাম, এঞ্জেলা আর ইহজগতে নেই। সে স্পেনে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের হয়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিল, সেখানেই মারা গেছে লড়াইয়ে। ব্রিগেড ছিল, যাদের কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি আছে তাদের নিয়ে গড়া। বলা বাহুল্য যে এরা বেশিরভাগই মারা পড়েছিল ফ্রাঙ্কোর সৈন্য ও গোলাগুলির আঘাতে। এঞ্জেলার কথা চিরদিন মনে থাকবে। আদর্শবাদী মেয়ে ছিল, আদর্শের জন্য সে প্রাণ দিল।

আমি দক্ষিণে কিয়েভের পথ ধরলাম। ইউক্রেন সমতল দেশ। রাস্তার অবস্থা যুদ্ধের ফলে খারাপ হয়ে গিয়েছে। তবু সাইকেল চালানোর পক্ষে খুব অসুবিধা ছিল না। পথে পাঁচদিন লাগল। ছেলেদের ক্লাবে বেশিরভাগ রাত্রে আশ্রয় নিয়েছি। একদিন এক চাষীর বাড়ি উঠলাম। চাষবাস জাতীয়করণ হয়েছে কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমও রয়েছে। এই চাষীকে তার ব্যক্তিগত চাষের জমিতে ফসল ফলাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে। কো-অপারেটিভের কাছে তার সমস্ত গম বিক্রি করতে হয়। চাষীটি খুব ভালো মানুষ। জার-

এর যুগেও সে চাষ করেছে। বলল যে আগে চাষ করত সে এবং ফল ভোগ করত জমিদাররা। এখন সেই অবস্থা ঘুচেছে। চাষীর বাড়িতে পিয়ানো, রেডিও, ট্রাক্টর ইত্যাদি রয়েছে।

একেবারে দক্ষিণে, ব্ল্যাক সীর ধারে ওডেসা শহর। গ্রিক যুগ থেকে এই শহরটি দাঁড়িয়ে আছে। এখনও গ্রিক আমলের সাক্ষ্য দেয় বিবলিওয়েট অর্থাৎ লাইব্রেরি। ওডেসা শহরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা খোলা চত্বর আছে। সেখানে হাটবারে হাজার হাজার গরু হাত বদল হয়।

রাশিয়া যুদ্ধের পর বিরাট দেশটার সর্বত্র ভালো করে উঠতে পারেনি। সবদিকে চওড়া পাকা রাস্তা তৈরি আরম্ভ হয়েছিল। ইতিমধ্যে ব্যবস্থা হল, ভারবাহী এরোপ্লেনে সবাই দূর জায়গায় যাতায়াত করবে। এমনকী প্লেনে গরু, ঘোড়া ও ছোট ছোট গাড়িও। ওডেসায় দুদিন কাটিয়ে একটি গ্রিক জাহাজ ধরলাম গ্রিসে পৌঁছবার জন্য। জাহাজটার নাম পিরায়ুস। জাহাজটা খুব ছোট, মাত্র ৫,০০০ টনের দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কূলে কূলে পণ্য সম্ভার দেওয়া-নেওয়া করে।

১১

গ্রিসে পৌঁছলাম। এই সেই ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মস্থান। কলা, কৃষ্টি ও যুদ্ধবিদ্যায় গ্রিকরা একদা শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিল। দেশটা খুব ছোট্ট। চারদিকে পাহাড় ও সমুদ্র। মূল দেশের সঙ্গে অফুরন্ত দ্বীপপুঞ্জ সংযোগ রাখে জলপথে। এইজন্য এককালে গ্রিক নৌবহর খুব শক্তিশালী ছিল।

আমার আশ্চর্য লাগে যে এই ছোট দেশটা বহুধা-বিভক্ত বিভিন্ন শাসন প্রণালীতে শাসিত হয়েও পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর রেখেছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ভাস্কর্যে, মনীষীর সমাবেশে ও দার্শনিক অবদানে। আমরা ভ্রমণ করতে করতে একদিন হঠাৎ লক্ষ করলাম যে মরুভূমির মাঝখানে ৭০-৮০ ফুট উঁচু একটা বাড়ির খিলান ও দুটি দেওয়াল আজও দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় প্রাসাদ যখন তৈরি হয়েছিল তখন মনে হয় দেশটা এমন বালুময় ছিল না বরং সেখানে জনপদ ছিল ও নিশ্চয় চাষবাসও হত। কালের অমোঘ নিয়মে আরব দেশ থেকে মরুভূমি বাড়তে বাড়তে শস্যশ্যামলা সুফলা মেসোপটেমিয়াকে (অধুনা ইরাক) গ্রাস করে ফেলেছে। গ্রিস দেশটা ভারি সুন্দর। পাহাড়, নীল আকাশ, সুনীল জল, চারদিকে অলিভ গাছ। তেমন শীত নেই বরং গরমই বলা চলে। অনেক দিন পর মুখরোচক খাবার খেলাম। বেগুন ও টম্যাটোর ভেতর মাংসের পুর দিয়ে সব রেস্তোরাঁতে বেচছে। অনেকটা ভারতীয় পদ্ধতিতে রাঁধা, মশলা দিয়ে, তবে ঝাল বাদ।

পিরায়ুস জাহাজটার মালিকের সঙ্গে আলাপ হল। অনেকদিন আমেরিকায় ছিল বলে ইংরিজি সহজেই বলতে পারত। আমাকে তার বাড়িতে থাকবার নেমন্তন্ন করল।

এথেন্স শহরে দেখবার জিনিস অফুরন্ত। খ্রিস্ট জন্মাবার ৫০০-৭০০ বছর আগে থেকে গ্রিক সভ্যতার প্রসার লাভ করেছে। সেই পুরনো যুগের মন্দিরগুলি এবং মুক্তাঙ্গন থিয়েটার ও বাথ ইত্যাদি আজও তার মহিমা প্রচার করছে।

গ্রিকরা দেবদেবীর পূজা করত। তাদের জন্য বিরাট মন্দির করেছিল সর্বত্র। মোটামুটি তিন ধরনের স্থাপত্য দেখা যায়: ডোরিক, আইয়োনিয়ান এবং কোরিন্থিয়ান।

খ্রিস্টধর্মের অভ্যুদয় হয় অন্তত ৮০০ বছর পরে, গ্রিকদের খ্রিস্টান হতে অনেক বছর কেটেছে। কোনও কোনও জায়গায় দেখেছি মন্দিরকে গির্জায় পরিণত করা হয়েছে একটু

আধটু বদল করে। তারা অটুট দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও।

জাহাজের ক্যাপ্টেন, আমার হোস্টের নাম ক্যানারিশ। বয়স পঞ্চাশের মতো হবে। স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা নিয়ে ঘরসংসার। বাড়িটা একটা ছোট টিলার ওপর। ঘর থেকে বাইরের দৃশ্য অপূর্ব। সমুদ্রের নীল জল পাথর ভর্তি দ্বীপগুলির গায়ে আছড়ে পড়ছে, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

ক্যানারিশের স্ত্রী কিছুদিন আমেরিকাতে ছিলেন। বয়স ৪৫ হবে। তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে কিছুদিন আগে। আপাতত বাবা মার কাছে বেড়াতে এসেছে। সকলের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। আমাকে একটা খুব সুন্দর ঘরে থাকতে দিয়েছে।

ক্যানারিশ ব্যবসার জগতে আছেন। লোকেদের অসাধু ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলল যে তুমি ইতিহাসে যে গ্রিকদের কথা পড়েছ, সে গ্রিক আজকাল আর নেই। আমাদের দেশের লোকেরা এখন ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা আচরণ করে। কে বলবে যে এরা হোমার, সফোক্লেশ, পিথাগরাস ও প্লেটোর বংশধর। চারদিকে অবনতি!

ক্যানারিশ খেদ করে যা বলল তা বোধহয় বেশিরভাগ দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য।

গ্রিসে অলিভের চাষ ছাড়া মদও তৈরি হয় প্রচুর। দুপুরবেলায় লাঞ্চ খেলাম, দুটোরই যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করে। অলিভের তেলে রান্না হয়। তাই লোকেদের স্বাস্থ্য ভালো। অলিভ অয়েল খুব সস্তা, দশ আনা থেকে বারো আনায় সের পাওয়া যায়। গ্রিক পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা অনেক বেশি সুন্দর দেখতে। রূপচর্চার জন্য অলিভ তেল গায়ে মাখে। সেজন্য ত্বক মসৃণ হয়, সব চর্মরোগেরও ঔষধ হিসাবে এই তেল ব্যবহার হয়। হয় খাবে নয় মালিশ করবে। ক্ষতের ওপর প্রলেপ দেয়। পেটের রোগ সারে।

ক্যানারিশের সঙ্গে দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি যেমন পার্থেনন, এক্রোপলিস ইত্যাদি দেখে এলাম। ধ্বংসাবস্থায় তাদের সৌন্দর্য ও বিরাটত্ব দেখে মুগ্ধ হতে হয়। পাথরের তৈরি বলে আজও দাঁড়িয়ে আছে। মাথাটা সব খালি। কাঠ দিয়ে ঢাকা ছিল একদিন। কালের প্রবাহে সেসব ধ্বংস হয়ে গেছে।

বিকালে ক্যানারিশ তার ইয়টে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। আমরা চারজন যাত্রী। ইয়ট হল পাল তোলা জাহাজ, যার মধ্যে ইঞ্জিনও আছে। বাতাস বন্ধ হলে কলে চলে। সেদিন শনিবার ছিল। সাদা পাল তুলে মরাল গতিতে জাহাজ সুনীল সাগরে চলেছে। ক্যানারিশের মেয়ের নামে জাহাজের নাম রাখা হয়েছে হেলেন।

এথেন্স থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি। জাহাজে খাবার ও শোবার ঢালাও ব্যবস্থা আছে। সুন্দর সূর্যাস্ত দেখলাম। গোধূলিতে আকাশ জল সব লাল হয়ে গেল। ধীরে ধীরে

অন্ধকার নেমে এল। ওদিকে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল পুবাকাশে। সে আরেক রকম সৌন্দর্য। দূরে, বহুদূরে এথেন্স শহরে আলো জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের ওপর শহর বলে দূরে জল থেকে মনে হয় যেন একটা মণিমাণিক্য খচিত রাজার মুকুট ঝিকঝিক করছে।

মেয়ে আবদার ধরল যে অনেকদিন ইয়টে রাত্রিবাস করেনি, তাই বলল ইয়ট নিয়ে রবিবার সন্ধ্যায় ফেরবার কথা। ক্যানারিশ ভালো মুডি ছিল। মেয়ের কথায় সানন্দে যোগ দেবার আগে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, কোনও অসুবিধা বা আপত্তি আছে কিনা। স্ত্রী খুশি মনে রাজি হলেন। আমার হাতে অপর্যাপ্ত সময় ছিলই।

সন্ধ্যার পরেই ক্যানারিশ সুরা পানের জন্য ডেকের ওপর ব্যবস্থা করল। একটা মিষ্টি মিষ্টি গ্রিক মদ, সদ্য আঙুর নিংড়ানো এবং অ্যালকোহলের মাত্রা কম, খুবই ভালো লাগল। বছরের এই সময়, শরৎকালে এরকম নিরামিষ গোছের মদ পাওয়া যায়। বেশি দিন রাখলে নষ্ট হয়ে যায় যথেষ্ট স্পিরিটের অভাবে।

মন মাতানো বাতাস বইছিল। ইয়ট যারা চালায় তাদের মধ্যে একটি যুবককে ডেকে ক্যানারিশ গান গাইতে বলল। গানের জন্য সে নাকি বিখ্যাত। খুব মোটা দরাজ গলায় গান ধরল। যুবকটির উচিত ছিল ইয়টে যোগ না দিয়ে অপেরাতে যোগ দেওয়া। চাঁদনি রাতে স্বপ্নের দেশে চলেছি মনে হচ্ছিল। মিসেস ক্যানারিশের হাতে একটা গিটার ছিল, তিনি আস্তে আস্তে বাজাতে লাগলেন।

ডেকের ওপর আমাদের খাবার ব্যবস্থা হল। জাহাজ ধীর মন্থর গতিতে চলেছে উত্তরে। খেয়ে উঠলাম তখন রাত প্রায় দশটা। ইয়ট নোঙর ফেলল। আমি শুতে গেলাম। ভালো হোটেলের মতো সুন্দর ব্যবস্থা।

ক্যানারিশ তার দেশকে ভালো চেনে। জল থেকে ডাঙার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ওইসব জায়গার ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়ে গেল। ওই পাহাড়ের ধারে উপত্যকায় হয়েছিল ব্যাটল অব থার্মপলি। এই জলপথে প্যারিস সাঁতার দিয়ে আরেক হেলেনের কাছে পৌঁছেছিল ইত্যাদি।

ভোরে ডেকে এসে বসলাম। জাহাজের নাবিকরা সবাই কাজে ব্যস্ত। জাহাজের নোঙর তুলে নিয়ে রওনা করা হয়েছে, ইয়টের কাজ ছাড়া রান্না-বাড়ার কাজে সকলে খুব ব্যস্ত।

ক্যানারিশ পরিবারের ঘুম ভাঙল যখন সূর্য অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে। ছায়াতে বসলে ভালো লাগে, না হলে বেশ তাপ।

আমাদের কোনও কাজ নেই। দফায় দফায় খাওয়া এবং চারদিকের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করা। গ্রিসকে জল থেকে দেখাই সবচেয়ে ভালো।

গৃহিণী প্রাতরাশ খেতে ডাকলেন । তিনিও স্বামীর মতো জাহাজে সময় কাটাতে ভালোবাসেন । ওদিকে পাকা গৃহিণী, সবার সুখ সুবিধার ওপর নজর আছে ।

জলে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় এথেন্স পৌঁছলাম ।

আরও সাতদিন থাকতে হল ক্যানারিশদের বাড়িতে বিশেষ অনুরোধে । সেখান থেকে প্রায় রোজই একেকদিকে ঘুরে বেড়ালাম ।

ক্যানারিশকে বলে পোর্ট সৈয়দগামী একটা জাহাজে ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে আফ্রিকায় নামব ঠিক করেছিলাম । এক সপ্তাহ পরে খবর এল একটা ছোট জাহাজ পোর্ট সৈয়দ যাবে । গণতন্ত্রের আদি পীঠস্থান গ্রিস ছেড়ে চললাম অনিশ্চিত এবং বিপদসঙ্কুল আফ্রিকায় । ইচ্ছা আছে কায়রো থেকে কেপ টাউন পর্যন্ত যাবার । কিন্তু রাস্তা নেই, নদীর ওপর বেশিরভাগ জায়গায় ব্রিজ নেই, তাছাড়া হিংস্র বন্যজন্তুর হাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা যথেষ্ট । মানুষও নাকি হিংস্র প্রকৃতির । শেষের কথাটা আমি বিশ্বাস করতাম না । ভাষা না জানার ফলে এবং ভুল বোঝাবুঝির জন্য অনেক সময় উপজাতিদের সঙ্গে বহির্জগতের লোকের সংঘর্ষ ঘটে । এটা এড়ানো যায় যদি মনে ঘৃণার বদলে ভালোবাসা নিয়ে এদের কাছে এগনো যায় ।

ক্যানারিশরা খুব আপনার লোকেদের মতো ব্যবহার করছিল আমার প্রতি । তাদের বিদায় দিয়ে জাহাজে উঠলাম । পোর্ট সৈয়দ মাত্র ১৬ ঘণ্টার পথ ।

সন্ধ্যার সময় লেসেপ্সের প্রস্তর মূর্তির সামনে দিয়ে জাহাজটা বন্দরে ঢুকল । পোর্ট সৈয়দ আলোয় আলোকময় । প্রথমেই নজর পড়ল ভারতবর্ষের চা বিক্রেতা ব্রুকবন্ডের মস্ত বড় বিজ্ঞাপন । তাইতেই মনে হল যেন আমার ও ভারতবর্ষের মাঝখানে যোগসূত্রের মতো সেটা দাঁড়িয়ে ।

পোর্ট সৈয়দে জাহাজ থামে । প্যাসেঞ্জাররা নামে ওঠে । ডাঙার ওপর চলাফেরা করে জড়তা কাটায়, আমোদ-প্রমোদ করে । এখানে ইংরেজের প্রভুত্ব সর্বত্র । এখানকার লোকেরা নৌকো ভর্তি মিশরীয় নানা জিনিসের পসরা নিয়ে বড় জাহাজের কাছে যায় এবং কেনাবেচা করে । উটের চামড়ার বাক্স, বসবার মোড়া, ব্যাগ ইত্যাদি খুব সস্তা দরে পাওয়া যায় । এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ লেসেপসের অক্ষয় কীর্তি সুয়েজ ক্যানাল- ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র পথ । আগে জাহাজ যেত কেপ অব গুড হোপ হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে । তাতে অনেক সময় নষ্ট হত এবং খরচও পড়ত অনেক বেশি ।

জাহাজ চলাচলের ফলে কোম্পানির বেশ মোটা টাকা লাভ হয় । সুয়েজ খাল কোম্পানির অংশীদাররা বেশিরভাগ ইংরেজ ও কিছু ফরাসি । ইংরেজের শোষণ নীতি

অবাধে চলছে।

স্টুডেন্টস হস্টেলে তাঁবু ফেললাম। ছেলেদের একত্র করে একদিন আমার ভ্রমণকাহিনী বললাম। তাতে কিছু আয় হল। শিক্ষকরা বললেন যে তাঁরা কখনও শিক্ষিত ও অ্যাডভেঞ্চারাস ভারতীয় দেখেননি- গান্ধীজির নাম শুনেছেন।

পোর্ট সৈয়দ থেকে কায়রোর পথ খুব সুন্দর পিচে ঢাকা। তিনদিনের মধ্যে মিশরের রাজধানীতে পৌঁছলাম। উঠলাম ওয়াই এম সি এ-তে। ম্যানেজার খুব ভদ্র খ্রিস্টান। তিনি মিশরীয়। মনে হল কায়রো শহরটা বেশ বড়। তবে যেমন মাছি, তেমনই গরম। দুপা বাড়ালেই বহু প্রকাণ্ড মসজিদের ডোম ও মিনারেট দেখা যায় কায়রোতে।

ওয়াই এম সি এ-র এক সভ্যর সঙ্গে আলাপ হল। নাম মিঃ ইয়ুনুশ, দূর সম্পর্কে সে মুক্তিযোদ্ধা জগলুল পাশার আত্মীয়। খেলাধুলায় ইয়ুনুশের খুব ঝোঁক। টেবিল টেনিস, ফুটবল তার প্রিয় খেলা। কলেজের হয়ে দুটো খেলাতেই সে পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

কায়রোর রাস্তা সব কলকাতার মতো। সরু, ট্যারা-বাঁকা তার মধ্যে ইলেক্ট্রিকের গোছা গোছা তার, মনে হয় শহরে জাল ফেলেছে। একেকটা পাড়ায় বড়বাজারের মতো বড় বাড়ি ও সঙ্কীর্ণ পথ। মেয়েরা ভূতের মতো বোরখা পরে দোকান বাজার করছে। বোরখা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। মনে হয় পুরুষের নারীর প্রতি কী অমানুষিক দুর্ব্যবহার। তারা চায় বলেই তো মেয়েরা পর্দার আড়ালে থাকে।

তুর্কিতে দেখেছি কামাল পাশার সময় বোরখা তুলে দেওয়া হল। পুরুষদের চারটে বিয়ে উঠে গেল। সভ্য জগতের সঙ্গে একতালে এক বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হল। অন্য মুসলিম দেশ তার অনুকরণ করল না। ধর্মের দোহাই দিয়ে মেয়েদের ওপর কঠিন অবিচার চালু রেখেছে সব মুসলিম দেশ। সে রকম ক্ষমতাপন্ন মুসলমান স্ত্রী নেত্রীও কেউ জন্মায়নি যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দেশের মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বোরখার মধ্যে থেকে স্ত্রী জাতির পক্ষে মাথা তোলা খুব কঠিন। মিশরীয় স্ত্রী লোকেরা বিদেশি মেয়েদের স্বাধীনতা দেখে নিশ্চয় বোরখাকে ঘৃণা করে, কিন্তু ছাড়বার সাহস নেই।

মেয়েদের কলেজে গেলাম। সেখানে বড় মেয়েরা বোরখা ফেলে খেলাধুলা করছে। কলেজের বাইরে বেরোলেই নিজেকে ঢেকে ফেলবে। গরম দেশে কী ভীষণ কষ্ট হয়, সে কথা কেউ চিন্তা করে না। অন্যায় চলেছে- চলছে।

এদেশে নেতা হবার জন্য সবাই ধর্মের দোহাই দেয়। আর তার জন্য সমাজে যা ঘৃণ্য, যা অন্যায়, কোরানের নামে তা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম বাদ দিয়ে এখানে রাজনীতি হয় না অথচ ধর্মের মূল আদর্শ গ্রহণ করবার আগ্রহ কম লোকেরই আছে।

এখানে মস্ত আরবি শিক্ষাকেন্দ্র, বহু লোক পড়াশুনা করতে আসে। আমাদের দেশের নেতা, আবুল কালাম আজাদ কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষায় গবেষণা করতেন।

মসজিদের স্থাপত্য মোটামুটি এক ধরনের। ডোম, মিনারেট এবং নমাজের জন্য মস্ত হল কিংবা খোলা চত্বর। আমাদের দেশে জুমা মসজিদ দেখার পর আর কোনও মসজিদ চোখে লাগে না। কাচ দিয়ে মোজেকের কাজ প্রায় দেখা যায়। মসজিদের ভেতরে কিছু দেখবার থাকে না। যা কিছু দ্রষ্টব্য সব বাইরে। রাস্তায় সর্বত্র লোকারণ্য। জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে তীব্রগতিতে। তারা সব শহরেই থাকে। শহরের বাইরে মরুভূমি, গ্রাম নেই বললেই চলে।

বালির দেশে একমাত্র সান্ত্বনা হল নাইল নদী। নদী দীর্ঘ, চওড়া। নদীতে পান্নার মতো সবুজ রংয়ের পরিষ্কার জল; দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে উত্তরে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বয়ে চলেছে। এই নদীর দুধারে শত শত মাইল জুড়ে চাষবাস হয়। এদেশের কাপাস তুলো বিখ্যাত, সারা পৃথিবীতে তার রপ্তানি চলে। মাল নিয়ে দূর জায়গায় অল্প খরচায় যাওয়া সোজা জলপথে। পাল তোলা নৌকো যাতায়াত করছে।

ইজিপ্টের পুরনো নাম মিশর। মিশরের সভ্যতা খুব প্রাচীন। যীশু জন্মাবার প্রায় তিন হাজার বছর আগে মিশরের যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল তার অনেক অনেক স্বাক্ষর আজও পাওয়া যায়। পাথরের গায়ে খোদাই করে মিশরের রাজারা অনেক জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা পশু, পাখি ইত্যাদি পূজা করতেন। অসংখ্য পশুকে পাথরের ভাস্কর্য দ্বারা চিরন্তন করেছেন। ভাস্কর্য এত উঁচু স্তরের যে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

হাজার হাজার বছর আগে এই দেশে পিরামিড তৈরি হয়েছিল। পিরামিড পৃথিবীর মধ্যে এক আশ্চর্য স্থাপত্য-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। যখন ক্রেন ছিল না, তখন যে কেমন করে তারা বিরাট, বিরাট গ্র্যানাইট চতুষ্কোণ পাথরকে উঁচুতে নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে বসিয়েছে নিখুঁতভাবে! তিনটে বিরাট পিরামিড ছাড়া ছোট পিরামিডও আছে অনেক। দেখা যায় তার নিচে তৎকালীন রাজা রানিদের মরদেহ যত্নে রাখা হত মমি করবার পরে। মৃত্যুর পর দেহের বিনাশ বন্ধ করবার জন্য মিশরীয় লোকেরা মমি করত। পৃথিবীর আর কোথাও এ বিদ্যা জানা নেই।

১৯২০ সাল নাগাদ একদল ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ মিশরে ভ্যালি অব দি কিংস-এ একটা পিরামিডের নিচে খুঁজতে খুঁজতে রাজা তুতেনখামেন ও তাঁর স্ত্রী নেফারতিতির দেহ বার করে। মাটির নিচে একটা দরজা। সেটা খুললে একটা প্রশস্ত হল ঘর। তার মাঝখানে খুব সাজসজ্জা। রাজবেশে ভূষিত মমি, তার চারপাশে রাজা কিংবা রানির দৈনিক

ব্যবহারের জিনিস, এমনকী সোনার গয়না, ধনরত্ন ও প্রসাধনের সব জিনিস দেহের চারদিকে সাজিয়ে রাখা থাকত।

শোনা যায়, দরজার ওপর নাকি লেখা ছিল 'তুমি দরজা খুলবে না এবং যাঁরা চিরশান্তি উপভোগ করছেন তাঁদের তুমি বিরক্ত করবে না বা কোনও উপদ্রব করবে না। যদি কর তো মৃত্যু অনিবার্য।'

ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদদের নেতা মিঃ হাওয়ার্ড কার্টার সেই লেখা অগ্রাহ্য করে দরজা খোলেন। তখন দেখা গেল একটা মস্ত ভোমরার মতো কালো কীট উড়ে এসে হাওয়ার্ডের ঘাড়ে কামড়ে চলে গেল। সেই বিষাক্ত কীটের কামড়েই নাকি হাওয়ার্ড প্রাণ হারান।

রাজা দ্বিতীয় রামেসিসের মরদেহ মাটির গভীর থেকে তুলে প্রত্নতত্ত্ববিদরা মিশরের রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। এ সব মমি যীশুখ্রিস্টের জন্মের ২,৫০০-৩,০০০ বছর আগেকার।

বলা যায় না কতকাল ধরে দুষ্কৃতকারীরা মাটির নিচে সমাধি সব খুঁড়ে যুগ যুগ ধরে লুট করেছে।

ইজিপসিয়ান মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। বার্লিন মিউজিয়ামের চেয়ে এটা সমৃদ্ধ। বর্তমান ইজিপসিয়ানরা আগেকার মিশরের গৌরবময় ইতিহাস সম্বন্ধে হুঁশিয়ার ছিল না। যার ফলে জার্মান ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদরা ইজিপ্ট লুট করেছে বহু বছর ধরে। পশ্চিমের বহু ধনীর বাড়িগুলি মিশর ও চিনের অমূল্য জিনিসপত্রে সাজানো।

কায়রোর আল আজহার ইউনিভার্সিটিতে আমার ভ্রমণকাহিনী বলবার নিমন্ত্রণ পেলাম।

এদেশে এখন রাজতন্ত্র। রাজারা আরাম ও আমোদ আহ্লাদ নিয়েই ব্যস্ত- বিদেশি শাসকরা যা খুশি করছে। দুপকেট ভর্তি টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে দেশে।

প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কি জার্মানির দলে যোগ দিয়েছিল। ইজিপ্ট ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তুর্কি যখন যুদ্ধে হারল, ইংরেজ ইজিপ্ট অধিকার করল। এমনভাবে ইংরেজের মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। তুর্কির অধীন দেশগুলি কিছু ফরাসি ও বেশিরভাগ ইংরেজ ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিল।

একজন ইজিপসিয়ান, জগলুল পাশা ইংরেজের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশকে উদ্বুদ্ধ করছেন। তিনি দেশবাসীকে বলছেন মিশরকে স্বাধীন করতে হবে, শোষণনীতি বন্ধ করতে হবে। পাশার কপালে অনেক দুঃখ ও কারাবরণ ছিল। তবু বহু লোক তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে দেশপ্রেমের মূল্য বুঝেছে। ছাত্ররা সব একজোট হয়ে জগলুলকে সমর্থন করে। একটি লোকের ক্ষীণ স্বরের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে হাজার কণ্ঠে, আমাদের দেশে যেমন

গান্ধীজি, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে জনতা হাত মিলিয়েছে আর তাইতে ব্রিটিশ সিংহাসন টলমল করছে। এদেশেও সে অবস্থা হতে বেশি দেরি নেই।

মিঃ ইয়ুনুশের বাড়ি গতকাল নেমন্তন্ন ছিল। খ্রিস্টান বলে ইয়ুনুশ অনেকাংশে আধুনিক, ভূরিভোজ খাওয়াল। দুঃখের বিষয় কফিতে পর্যন্ত উটের গায়ের বোঁটকা গন্ধ। উটের দুধ দিয়ে কফি তৈরি হয় বলে এই গন্ধ এড়ানো যায় না। বহুদিন নাক টিপে খেয়েছি কিন্তু তবু উটের গন্ধ বরদাস্ত করতে পারি না। দুধ ছাড়া ঘন কফি আমার বেশি ভালো লাগে।

ওয়াই এম সি এ ও ইউনিভার্সিটিতে ভারতবর্ষের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। আমার ভ্রমণকাহিনীও বললাম।

কায়রো ছেড়ে রওনা হলাম দক্ষিণে। রাস্তা ভালো। এত অসহ্য গরম যে কষ্ট হচ্ছিল। সাইকেল চালাবার সময় একটা গরম হাওয়া পাওয়া যায় কিন্তু থামলে অতিষ্ঠ লাগে।

দুদিন চলবার পর একেবারে ডানদিকে নুবিয়ার বিস্তীর্ণ দেশ জুড়ে বালির পাহাড় দেখলাম। এটা সাহারা মরুভূমির পূর্ব অংশ, দেশটার নাম সুদান। উটের ওপর চড়ে ছাড়া এ দেশের যাতায়াত করা যায় না। ১২০-১৩০ ডিগ্রি তাপমাত্রা। মানুষ একটু ছায়া পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। সুদানের লোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হচ্ছে। দুর্ধর্ষ জাতি।

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকে ইজিপ্ট, সুদান এবং পুরো উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা মুসলমান হয়ে যায়। মোটামুটি আফ্রিকার মানুষকে দুভাগে ভাগ করা যায়। আফ্রিকার নানা উপজাতি ও মুসলমান সম্প্রদায়।

দেখতে দেখতে ৭০০ মাইল দক্ষিণে এসেছি। দিনে ৫০ মাইলের বেশি সাইকেল চালাতে পারছি না গরমের কষ্টে।

একদিন বিকালে নুবিয়ার মরুভূমিতে অস্পষ্ট দেখলাম দুটো সিংহ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছাদন ছাড়া বাইরে কোথাও রাত কাটানো যাবে না। এক্ষেত্রে কাপড়ের তাঁবু ফেলে শোওয়া বিপজ্জনক। সিংহের কোনও অভিজ্ঞতা আমার নেই। দেখামাত্র আক্রমণ করবে কিনা জানি না। বন্দুকটা হাতে নিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম।

প্রায় আট মাইল চলবার পর আশ্রয় পেলাম এক মিশরীয় চাষীর কুঁড়ে ঘরে। সে বলল যে সিংহ সাধারণত আক্রমণ করে না মানুষকে, যদি মানুষ তার দিকে তেড়ে না যায়। অফুরন্ত জীবজন্তু আছে, তাদের জলাশয়ের ধারে জল খেতে গেলে ধরে খায়। মরুভূমি-প্রধান জায়গায় জন্তুরা জল না খেয়ে কেমন করে বেঁচে থাকে জানি না। দূরে দূরে জলাশয় আছে নিশ্চয়। সিংহের গায়ের বা লোমের রং এবং বালির রং একই। খুব সহজে গা ঢাকা দিয়ে জলাশয়ের কাছে বসে থাকে।

মাঝে মাঝে দেখতাম ছোট ছোট গাছের ঝোপ, প্রাণপণে মরুভূমির প্রকোপ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

এগারো দিন পর আসওয়ান শহরে পৌঁছলাম। ইজিপ্টের সব শহর নাইল নদীর গা ঘেসে। আসওয়ান একেবারে দক্ষিণে। এক প্রকাণ্ড মন্দির নাইলের জলের ধারে। এটির বয়স অন্তত চার হাজার বছর, অনেক ভাস্কর্যে ভরা দেবদেবীর পাথরের মূর্তি। খুব নিখুঁত কাজ। যখন লোহা বা ইস্পাত আবিষ্কার হয়নি তখন কেমন করে বা কী দিয়ে এমন সূক্ষ্ম খোদাই করতে পেরেছিল পাথরের ওপর, আজ ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এটি পুরনো মিশরীয় শিল্পের একটি সেরা নিদর্শন।

আসওয়ানে তিনদিন বিশ্রাম নিলাম। বড় শহর। তুলোর প্রধান কেন্দ্র। ঠিক পাশেই নাইল নদী বয়ে চলেছে। উত্তর ইজিপ্টের চেয়ে এ অঞ্চলের লোকেরা শান্ত প্রকৃতির।

আসওয়ান থেকে একশো মাইল দক্ষিণে চলেছি। সামনেই সুদানের দ্বিতীয় বড় শহর ওয়াদি-হাইফা। সুদান মস্ত বড় দেশ। ইজিপ্টের দ্বিগুণের চেয়ে বেশি জমি। কিন্তু মরুভূমির চাপ অর্থাৎ সাহারার প্রকোপ দেশটাকে বালুময় করে তুলেছে। ওয়াদি-হাইফায় উট আর উট। মাটির তৈরি দোতলা ঘরবাড়ি। মরুভূমির উপযুক্ত নানা রকম জিনিসের কারবারের জন্য বহু লোকের এই শহরে আনাগোনা।

নদীর ধারে তুলোর চাষ পুরোদমে চলে। মিশরের মতো সুদানের তুলোরও খুব সুনাম আছে। বিদেশে রপ্তানি করে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা হয়। নানা দেশে উটও সরবরাহ করা হয় চাষের জন্য ও মাংসের জন্য।

সামনে কঠিন পরীক্ষা আসছে। রাস্তা খারাপ হতে আরম্ভ করেছে, কাঁচা মেঠো পথ যদিও চওড়া। এদিকে কোনও যানবাহন চলে না। বন্য আফ্রিকা বলতে যা বোঝায় তা এখান থেকে শুরু। পথে জনমানব দেখলাম না। পঞ্চাশ মাইল অতি কষ্টে যাবার পর একটা ছোট গ্রাম পেলাম। এখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে জরিপের কাজ করবার জন্য। আরও কিছুদূরে রেল পাতার কাজ শুরু হয়েছে দেখলাম।

ইংরেজের মতলব কায়রো থেকে কেপটাউন পর্যন্ত রেলপথ সংযোগ করবে। অনেকটা কাজ এগিয়েছে কিন্তু প্রকাণ্ড বাধা পাচ্ছে, বুনো হিংস্র জন্তুর কাছে।

রেলওয়ে লাইন পাতা কেবলই বাধা পাচ্ছে হাতি ও সিংহের অত্যাচারে। একজন রেলকর্মী বলল যে সে কাজে ইস্তফা দিয়েছে। সিংহ তাকে তাড়া করেছিল, ধরতে না পেরে আরেকজন কর্মীকে মুখে তুলে নিয়ে চলে গেল। কাজ করবে না ঠিক করেছে। কর্তৃপক্ষ অগত্যা বন্দুকধারী গার্ড রাখবার ব্যবস্থা করল। তা সত্বেও লোক মারা পড়ত মাঝে মাঝে।

রেললাইন পাতার কাজ বন্ধ রইল বেশ কিছুদিন। অবশেষে ঠিক হল যে চারদিকে আগুনের পরিখা করে তার মধ্যে লোকজন কাজ করবে। একে গরমের দেশ তার ওপর চারদিকে আগুনের মধ্যে রেললাইন পাততে লোকেদের খুবই কষ্ট।

ইতিমধ্যে একদল হাতি এল, কালান্তক যমের মতো প্রকাণ্ড। খাবার গুদাম ভেঙে চাল ডাল খেয়ে রাত্রে চলে গেল। আবার রসদ জোগাড় করতে লোক ছুটল। রেল কর্তৃপক্ষ বিপর্যস্ত। তারা সহজে কাজ ছেড়ে দেবার লোক নয়। অনেক বন্দুক আমদানি করা হল এবং ছোটখাটো আর্মি তৈরি হল। সিংহকে ঠেকিয়ে রাখা গেছে শেষ পর্যন্ত। আবার রেললাইন পাতার কাজে লোকজন যোগ দিয়েছে।

তাতে আমার দুঃখ ঘুচল না। পথে যদি একাধিক হাতি কিংবা সিংহ দাঁড়িয়ে থাকে তো আমার পথ বন্ধ। কবে রাস্তা ছাড়বে ও আমি এগোতে পারব, তার স্থিরতা নেই।

রাত্রে একটা মাশাইদের গোল মাটির ঘরে শোবার স্থান পেলাম। পরদিন রওনা হয়ে গেলাম। পথে জেব্রা, জিরাফ, গ্নু ইত্যাদি দেখতে দেখতে চলেছি। মনে মনে জানতাম যে সিংহ কাছেই কোথাও আছে। এই জীবগুলোকে খেয়েই তারা বেঁচে আছে।

রাস্তা মোটেই ভালো নয়। দিনের পর দিন চলেছি, খুব একা মনে হয়। লোকজন দেখাই যায় না। দেশটা বিরাট। ভারতবর্ষের চেয়ে বহুগুণ বড়, গরম খুব। সঙ্গে যা খাবার এনেছিলাম সব ফুরিয়ে গেল। একটা গ্রামে উপস্থিত হলাম। গ্রামে বেশ কয়েক ঘর লোকের বাস। একটা দোকান আছে- সব নাকি পাওয়া যায়। গিয়ে দেখি আমার নিজের দেশের একজন লোক সেই দোকানের মালিক। বলা বাহুল্য যে আমি ভারতীয় একজনকে দেখে যেমন আশ্চর্য হয়েছিলাম, সেও তেমনই অবাক হয়ে আমাকে দেখছিল। দোকানির নাম মোহনলাল দেশাই। বয়স ৪৫, বোম্বাই থেকে জাহাজে মোম্বাসা পৌঁছেছিল ভাগ্য অন্বেষণে। তারপর পনেরো বছর ধরে নানা রকম কাজ করেছে। টাকা জমিয়ে দোকান করেছে এই সুদূরে।

মোহনলাল তার বাড়িতে আমাকে আতিথ্য গ্রহণ করতে বলল। সে পরিষ্কার দুটো ভাষাই বলে। সহেলি ও মাশাই। একজন কর্মচারীকে বাড়িতে পাঠাল দুকাপ চা আনার জন্য। গুজরাটি চা হলেও চা, বহুদিন পরে তৃপ্তি করে খেলাম।

মোহনলাল জিনিস কেনাবেচা করছিল। সন্ধ্যার পর কেউ দোকানে আসে না, এজন্য সকাল সকাল দোকানপাট বন্ধ করে আমাকে নিয়ে দেশাই বাড়ি গেল। বাড়িটা বেশি দূরে নয়। আমাদের দেশের আটচালা ধরনের, আফ্রিকানদের মতো গোল মাটির বাড়ি নয়।

আমি গুজরাতি ভাষা বুঝতে পারি। দেশাই-গৃহিণী ইংরিজি জানেন না। তাই হিন্দিতে শুরু করলাম 'নমস্তে' বলে। দেশাই আমার পরিচয় দিয়ে বলল আমাকে তাদের সঙ্গে

দুয়েকদিন থাকবার নেমন্তন্ন জানিয়েছে।

সূর্যাস্তের পর অন্ধকার ও ঠান্ডা নেমে আসে। দিনেরবেলায় যত কষ্ট হোক, রাত্তিরটা আরামের।

দেশাই বলল, তার একটি ছেলে আছে, বিলাতে 'সেভেন ওকসে' পড়াশোনা করে। বয়েস তেরো। খুব ইচ্ছা যে ছেলে ডাক্তার হয়ে আফ্রিকায় প্র্যাক্টিস করে।

মোহনলালের বাড়ির সংলগ্ন প্রকাণ্ড এক গুদাম ঘর। বহু টাকার হাতির দাঁত, নানা রকম চামড়া ও পাথর সংগ্রহ করা আছে সেখানে। অন্যদিকে মনিহারী জিনিসপত্র, চাল, ডাল, মশলা ইত্যাদি। দেখলেই বোঝা যায় বেশ পয়সাওয়ালা লোক। একটা ছোট লরি আছে, নানাদিকে মালবোঝাই করে পাঠানো হয়। এক মাসের মতো টিনে ভর্তি পেট্রোল মজুত আছে। আশপাশে দশটা গ্রামে উপজাতিরা কম কাপড় পরে, তবু যেটুকু দরকার সব মোহনলালের দোকানেই পাওয়া যায়।

দেশাই আমাকে বলল যে পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার সব জায়গায় দোকানদার এবং ব্যবসায়ী হচ্ছে ভারতীয়, বরং বলা উচিত গুজরাটি। তারা সবাই পয়সা করেছে খনিজ পদার্থ রপ্তানি করে। আফ্রিকার লোকেরা মনে হয় বেনে জাতিকে ঈর্ষা করে কিন্তু তাদের সাহায্য ছাড়াও তাদের জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব।

সন্ধ্যার সময় দেশাইয়ের বাড়ির সামনে একদল উপজাতি গ্রাম থেকে এল আমাকে দেখতে। তাদের মধ্যে কর্তাব্যক্তি যে সে আসলে ওঝা। এদেশে খুব বিষাক্ত সাপ আছে। তারা কামড়ালে ওঝাকে ডাকে কিন্তু ওঝা বাঁচাতে পারে না। যখন বিষাক্ত নয়, এমন সাপ কামড়ায় তখন ওঝা খুব বাহাদুরি করে।

যা হোক ওঝা কেন জানি না আমাকে দেখে মন্তব্য করল যে আমি ভালো লোক। দেশাই অনুরোধ করল নাচ দেখাবার জন্য। নাচ সহজে হবার নয়। একপাত্র সোমরস আর তার সঙ্গে বড় ড্রাম চাই। দেশাই দুটোই বের করে দিল। এরা মাশাই উপজাতি। মহা উল্লাসে সবাই কোমর বাঁধতে শুরু করল।

মাশাইদের দীর্ঘ ঋজু দেহ। ড্রামের তালে তারা নাচতে আরম্ভ করল। খুব কসরৎ করে নাচবার সময়। দেখতে দেখতে মাশাই রমণীরা উপস্থিত হল। বেশ আনন্দের রোল বয়ে গেল।

যত সোমরসের মাত্রা বাড়ছে ততই নাচের লয়ও বাড়তে আরম্ভ করল। এরা এরকম সারারাত নাচে কিন্তু আমি সাইকেল চালিয়ে এবং বোঝা বয়ে ক্লান্ত। বললাম, রাত এগারোটার পর শুতে যাব। সবাইকে তাই বলা হল।

দুজন মাশাই যুবক দেশাইয়ের কাছে গিয়ে বলল যে তারা আমার সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণে যাবে । তাদের ইচ্ছা আমাকে বন্যজন্তুর হাতে থেকে রক্ষা করা, আমি বন্দুক দেখিয়ে বললাম আমার রক্ষী এই । তবু ধন্যবাদ জানালাম অনেক ।

মাশাইদের প্রথম পরিচয়ে ভালো লাগল । ভাষা জানি না বলে অসুবিধা হচ্ছিল । দোভাষীর কাজ করছিল দেশাই ।

দেশাইদের ছেড়ে দক্ষিণের রাস্তা ধরলাম । রাস্তা নামে মাত্র । মাঠের ওপর দিয়ে, ঝোপের পাশ দিয়ে যেখানে সেখানে চলেছে । তবে দিক ঠিক আছে, গাড়ি ঘোড়া বা মোটর চলে না । সেজন্য রাস্তার সমতল জায়গাটার ওপর বন্যজন্তু শুয়ে বসে বিশ্রাম করে ।

সারাদিন সাইকেল চালিয়ে কত যে বুনো পশু ও পাখি দেখলাম তার ঠিক নেই । একজোড়া চিতা বাঘ আমাকে দেখে রাস্তা থেকে উঠে মাঠের দিকে হেলতে দুলতে চলে গেল । এদেশে এত বুনো গাই, 'গ্নু' আছে যে পঙ্গপালের মতো দেখায় । মনে হয় পৃথিবীর সব জন্তুজানোয়ার এই দেশে জমা হয়েছে ।

গণ্ডার দেখবার সুযোগ হল অনেক দূর থেকে । বাইনোকুলার দিয়ে দেখলাম চামড়ার রং কালচে । দুটো খড়্গ । আকৃতিতে আমাদের দেশের গণ্ডারের মতোই । শুনেছি এই গণ্ডার নাকি রাগীবাবুর মতো সব সময় ক্ষেপে থাকেন । ভীষণ জোরে ছুটতে পারে । এদের ঘাঁটাতে সিংহও সাহস পায় না, হাতি দূরে দূরে থাকে । আমি বন্দুক হাতে নিয়ে চলেছি । হাতির দল প্রায়ই দেখা যায় । হাতির এত বিরাট দেহ আগে কখনও দেখিনি । আমাদের দেশে সব চেয়ে বড় হাতি এখানের হাতির চেয়ে অনেক ছোট । মাথা ও কান দেখলে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড পাথর নড়ছে চড়ছে । দাঁতও তেমনই বড় বড় । একেকটা ছয় ফুট থেকে সাত ফুট লম্বা হবে । শুনেছি তার চেয়েও নাকি বড় হয়, তবে আমার নজরে পড়েনি ।

আফ্রিকার হাতিকে পোষ মানানো যায় না, আমাদের দেশের হাতি মানুষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে । হাতিকে লোকেরা কত কাজে লাগায় । পৃথিবীতে যত সার্কাস আছে সর্বত্র ভারতীয় হাতির দল খেলা দেখায় ।

হাতির দাঁত অমূল্য । দাঁত দিয়ে নানা রকম গয়না ও সাজাবার জিনিস তৈরি হয় । পাশ্চাত্য দেশের শিকারিরা নির্মমভাবে হাতিকে গুলি করে মারে দাঁত পাবার জন্য । শুনলাম একজন জার্মান শিকারি বই লিখে গর্ব করেছে যে সে এক সপ্তাহে ২৫টা হাতি মেরেছে । এটা যে কত বড় অন্যায় তা বলা যায় না । এই হারে হাতি মারলে আফ্রিকার

মতো মহাদেশ হাতিশূন্য হয়ে যাবে, ১০০ বছরের মধ্যে। শিকারিদের বাধা দেবার কেউ নেই। যার যত ইচ্ছা বন্যজন্তু সামান্য লাভের জন্য মেরে ফেলছে।

মাশাইরা ঢাল ও বর্শা দিয়ে সিংহ শিকার করে। ঢালটা গণ্ডারের চামড়ায় তৈরি। মাশাইদের মধ্যে নিয়ম আছে যে মাশাই যুবক যদি সিংহ মারতে পারে তবেই তাকে বিয়ে করবার উপযুক্ত বিবেচনা করা যাবে, না হলে নয়। বর্শা ও ঢাল নিয়ে সিংহ মারতে যাওয়ার মধ্যে সত্যিই সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও তরুণ, সিংহ মেরে তার ল্যাজটি ভাবী স্ত্রীকে উপহার দিলে বিয়ের প্রস্তাব পাকা হয়। পৃথিবীর অন্যত্র যদি এই শর্তে বিয়ে করতে হত তা হলে বেশিরভাগ যুবকের বিয়েই হত না।

সাধারণ মাশাই ও সিংহ পাশাপাশি বাস করে, কোনও বিরোধিতা নেই। যদি কোনও সিংহ দুষ্টবুদ্ধির বশে গরু ছাগল ইত্যাদি খেতে আরম্ভ করে তখনই মাশাইরা দল বেঁধে সেই উৎপাতকারী সিংহকে সরাবার জন্য ঢাল ও বর্শা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দলটা গায়ে গায়ে লেগে প্রায় কুড়িজন থাকে এক লাইনে।

সিংহকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে। লাইন তখন ধনুকের মতো বেঁকে যায়। সিংহ চকিতের মধ্যে পাল্টা আক্রমণ করে কিন্তু এইরকম সারবন্দী লোক দেখলে ঘাবড়ে যায়, কাকে কামড়ে ছিনিয়ে নেবে ঠিক করতে পারে না। দলের শেষের দুই পাশে বার বার ঝাঁপিয়ে লোক ধরবার চেষ্টা করে কিন্তু দল তৈরি থাকে। যাকে আক্রমণ করে তাকে ঘিরে অন্যরা চারদিক থেকে বর্শা হাতে এগিয়ে আসে এবং সিংহকে বারবার আঘাত করে। দলবদ্ধভাবে আক্রমণের ফলে মাশাইরা শেষ অবধি জয়ী হয়, সিংহের জীবনান্ত হয়।

বিশেষ ঘটা করে যখন মাশাই পুরুষেরা সাজগোজ করে, তখন কারও কারও কাঁধের ওপর সিংহের চামড়া থাকে। সিংহ মারবার পরের দৃশ্য হচ্ছে অসীম উল্লাস ও নৃত্য। মেয়েরাও যোগ দেয়।

সাধারণত চলাফেরার সময় মাশাইয়ের হাতে বর্শা কিংবা লম্বা লাঠি থাকে। জঙ্গলের নানা রকম জন্তু যেমন বুনো শুয়োর, সজারু, খরগোশ ইত্যাদি মেরে তারা খায়।

আমাদের দেশের আরেকটি জীব এখানে দেখলাম- শকুন। একেকটা গাছে বসে কিংবা মাথার ওপর আকাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। জন্তু প্রায়ই নানা কারণে মারা পড়ে, তখন শকুন সব চেটেপুটে সাফ করে খেয়ে ফেলে, পড়ে থাকে হাড় কখানা। হায়নাও প্রায়ই দেখতাম। তারাও কাজ করে শকুনের মতো।

আজ পর্যন্ত উটপাখি দেখলাম না। জিরাফ মাঝে মাঝে দেখেছি। মানুষ দেখলে ওই প্রকাণ্ডকায় জীব ছুটে পালায়। সামনের পা বড়ো ও পিছনের পা অনেক ছোট বলে

ছোটবার সময় জিরাফকে খুব মজার দেখায় । আত্মরক্ষার জন্য সে বিপুল বিক্রমে লাথি ছুড়তে থাকে । লাথির এত জোর যে বেশিরভাগ জানোয়ার ঘায়েল হয়ে যাবে যদি লাগে ।

মাশাইদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকি । অল্প দু-চার কথা শিখেছি, বাকি আভাসে ইঙ্গিতে সারতাম । এরা গাছের শেকড় বেটে তা থেকে বার্লির মতো পানীয় তৈরি করে খায় । পুষ্টিকর নিশ্চয়ই । না হলে মাশাইদের এত সুন্দর, সুঠাম দেহ হত না ।

ভোরবেলায় রওনা হলাম । দিনের উত্তাপ ভয়ানক বেশি । এদেশে গাছপালা কম । বড় গাছ আছে শিরীষের মতো দেখতে, কিন্তু পাতা বিরল । ভোরে চলাফেরার বিপদ হচ্ছে ছোট-বড় নানা রকম জন্তুর সামনে পড়তে হয় । রোদ ওঠার সঙ্গে তারা আশ্রয় নেয় যতক্ষণ না সূর্যদেব অস্তাচলে যান ।

তখন ৬টা হবে । সাতটা অতিকায় হাতি কালো একটা ছোট পাহাড়ের মতো রাস্তার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে । আমি থমকে দাঁড়ালাম । আমার সাইকেলের ওপর জানোয়ারদের যত আক্রোশ । তারা এটা ভেঙে চুরমার করে দিতে চায় । হাতির ছোট ছোট চোখে মনে হয় সাইকেলের প্রতি আপত্তি জানাচ্ছে । আমি নাচার । আমার অতি পুরনো বিশ্বস্ত বাহনের ওপর অনাবশ্যক কটাক্ষ আমার মোটেই পছন্দ নয় ।

হাতি যদি তেড়ে আসে সেই ভয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম দুঘণ্টা, তারপর হাতি বাবাজিদের কী মনে হল জানি না, ধীর মন্থর গতিতে মাঠের দিকে চলে গেল আমাকে পথ ছেড়ে দিয়ে । আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাইকেলে উঠলাম ।

আজ সারাদিন ধরে দামামা বাজছে । গুরুগম্ভীর শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যায় । শুনেছি ড্রাম বাজিয়ে এক জায়গার লোক অন্য জায়গার লোকেদের সঙ্গে সাঙ্কেতিকভাবে কথা বলে । একটা বড় গ্রামে পৌঁছলাম । এটা পরবের দিন । সবাই অপেক্ষা করে আছে বিকালের জন্য । সোমরস পান করবে এবং সারারাত ধরে নাচবে ছেলেমেয়েরা ।

লক্ষ করবার বিষয় হল যে উপজাতির মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা যথেষ্ট রয়েছে । ছেলেরা সাধারণত কুঁড়ে, মেয়েরা যাবতীয় কাজ করে । ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে তাকে খাসিয়ানীদের মতো পিঠে বেঁধে সারাক্ষণ কাজ করে যায় ।

গ্রামে একটি মাত্র দোকান, সেটা এক গুজরাটির । এখানে আর আতিথ্য গ্রহণ না করে এক আফ্রিকান সর্দারের বাড়িতে উঠলাম । এদের ভাষা সহেলি, মাশাইদের থেকে এরা ভিন্ন রকমের দেখতে । জীবনপ্রণালী মোটামুটি এক রকমের ।

স্ত্রীলোকেরা গায়ে কাপড় দেয় না যেমন আমাদের দেশে বহু উপজাতির মেয়েরা দেয় না । ছেলেমেয়ে বড় হলেও স্তন্যপান করে ।

গ্রামের ধারে একটি সিংহ এসেছে এবং গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে দূরের দিকে মুখ ফিরিয়ে, এইরকম ভাব যে গ্রামের জীবজন্তুতে তার কোনও স্পৃহা নেই। অনেকক্ষণ ধরে দূরবীন দিয়ে ভালো করে সিংহকে দেখতে লাগলাম। গ্রামের লোকেরা সিংহকে তাড়াচ্ছে না দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সর্দার বলল যে যতক্ষণ সিংহ বাড়ির গরু, ছাগল, মুরগি গ্রাস না করে ততদিন সিংহের সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই।

আকাশ মেঘলা, মনে হয় বৃষ্টি হবে। দূরের কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে। সর্দার বলল, সিংহের দিকে দেখতে, যেন তার দেহ থেকে তেল বা মোম বেরিয়ে ঘাড়ের ও গায়ের লোম ভিজিয়ে দিল। এই থেকে বোঝা যায় যে বৃষ্টি সুনিশ্চিত, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে বৃষ্টির আগে সিংহের গায়ে মোম দেখা যায়। সিংহের গলায় তো স্তূপাকার লোম। সেই লোম জলে ভিজলে ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা, এমনকী নিউমোনিয়াও হতে পারে সিংহের।

সিংহ থাকে তরুলতাহীন খোলা মাঠে। মাথার ওপর বৃষ্টির সময় আচ্ছাদন পাবার সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য এই মোমের উদ্ভব, প্রকৃতিরই নাকি এই ব্যবস্থা। বৃষ্টির সময় গাছের নিচে যদি দাঁড়ায় তো টুপটাপ করে তার গায়ে জল পড়ে। এটা সিংহের খুবই অপছন্দ। তার চেয়ে খোলামেলায় দাঁড়ানো ভালো।

এদিকে লোকেরা মুসলমান নয়। এরাই আফ্রিকার আদিবাসী। এরা চিরকাল বন্যজন্তুর পাশাপাশি বিনা দ্বিধায় বাস করে এসেছে। কেউ কাউকে ভয় পায় না। জঙ্গলের জীবনের এই রীতি।

মাম্বা নামে একরকম বড় সাপ আছে, তাদের থেকে সবাই দূরে থাকে। সাংঘাতিক রকম বিষাক্ত সাপ। এত তাড়াতাড়ি চলে যে মনে হয় চরকিবাজি হচ্ছে।

আজ সারাদিন আমোদ আহ্লাদ, পান ভোজন ও নৃত্য বহু রাত পর্যন্ত চলবে। কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সর্দার বলল যে নতুন ফসল উঠেছে এবং ফসল ভালো হয়েছে, সেজন্য সবাই একদিন আনন্দ প্রকাশ করে আমাদের দেশের নবান্নর মতো।

এই গ্রামের লোকেদের কোনও স্কুল নেই। কেউ লেখাপড়া ও বইয়ের ধার ধারে না। সব বিষয় লোকেরা সর্দারের শরণাপন্ন হয় এবং তার বিবেচনায় যা ঠিক হয় তা সবাই পালন করে।

কোনও গ্রামে হাসপাতাল নেই, ডাক্তারের ভীষণ অভাব। গ্রামের ওঝা আছে। অসুখ বিসুখে তার কথা মেনে চলতে হয়। আসলে এখানে যার পরমায়ুর জোর আছে সেই বেঁচে থাকবে। কোনও বাহাদুরি নেই মেডিসিন ম্যানের।

আরও তিনদিন চলার পর মনে হল যতই এগোচ্ছি ততই বেশি সংখ্যক বন্যজন্তুর দেখা পাচ্ছি। আজ একটা নদী পার হলাম নৌকোয়। জলে অনেকগুলি হিপোপট্যামাস ডুব

দিচ্ছে, উঠছে। আমাদের নৌকোটা দেখে প্রকাণ্ড হাঁ করে জানিয়ে দিল যে নৌকো থেকে জলে পড়লে তাদের মধ্যাহ্নভোজন হবে। কুমিরের অভাব নেই। জল দেখে ইচ্ছা করছিল নদীতে ডুব দিয়ে আসি কিন্তু জলে নামে কার সাধ্য। আমি ভাবছিলাম কুমিরগুলো কেন হিপোদের খেয়ে শেষ করে দেয় না। নিশ্চয় হিপোর ভালো রকম আত্মরক্ষার ক্ষমতা আছে।

নদীর ওপারে নামতে গিয়ে দেখি একপাল গ্নু (গরুর মতো দেখতে, কিন্তু খবু বিশ্রী) জল খেতে নেমেছে। নৌকোয় চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া অন্য পথ নেই যতক্ষণ না সবাই জল খেয়ে চলে গেল। সৌভাগ্যক্রমে তারা মাঠের ওপর দিয়ে গেল আমার পথ ছেড়ে।

আরেকটি হিংস্র জীবের কাছ থেকে আমাকে দূরে এবং সাবধানে চলতে হল, তারা হল বেবুন। দলবেঁধে গাছে ও মাঠে ঘুরে বেড়ায়। মানুষকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করে না। বেশিরভাগ বন্যজন্তু এদের ভয় পায়, এমনকী চিতাবাঘ পর্যন্ত। বেবুনের কামড় ভীষণ। ফলমূল, ফসল খায়, মাংস পেলে আরও খুশি। দলবেঁধে থাকে বলে সিংহ যতই ক্ষুধার্ত হোক, বেবুনদের ঘাঁটায় না। হয়তো চেষ্টা করলে একটা বেবুন ঘায়েল করতে পারবে কিন্তু তার বদলে প্রাণ যাবার সম্ভাবনা বেশি।

যত দক্ষিণে এগোচ্ছি ততই মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বন্যজন্তুদের মুক্তাঙ্গনের সম্মুখীন হচ্ছি। একটা উট পাখিকে ধরে ঘেরা জায়গায় রেখে দিয়েছে একটা গ্রামে। পাখিটা এত বড় যে স্বচ্ছন্দে পিঠে মানুষকে বসিয়ে দূর-দূরান্তে নিয়ে যেতে পারে। বালির ওপর চলতে উটপাখির কোনও অসুবিধা নেই। এরা উড়তে পারে না, কিন্তু ডানার সাহায্যে ছোটবার সময় ঝড়ের বেগে এগিয়ে যেতে পারে।

এখন এসেছি জুবা নামে ছোট গ্রামে, সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া হ্রদ মাত্র ১৮০ মাইল। সামনে উগান্ডা, বাঁয়ে কেনিয়া, ভিক্টোরিয়া হ্রদ পার হলেই ট্যাঙ্গানিকা, এখন ট্যানজানিয়া। দুমাইল দূরে লোকজন কাজ করছে রেললাইন বসাতে। আগুনের লাইনের ভেতর লাফ দিয়ে সিংহ মানুষকে তুলে নিয়ে গেছে তাই কদিন রেলের কাজ বন্ধ।

হঠাৎ রাস্তার সামনে দেখি একপাল সিংহ, সংখ্যায় এগারোটা, পথের ধারে গাছের ওপর এবং পথের ওপরে শুয়ে বসে রয়েছে। চমকে উঠলাম। বন্দুক খুলে হাতে নিলাম যদিও জানি সেটা আমাকে বাঁচাতে পারবে না যদি একাধিক সিংহ আক্রমণ করে। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর স্থির করলাম যে পিছু হটে এক আদিবাসীর বাড়িতে আশ্রয় নেব। চারদিকে একটিও মানুষ দেখতে পেলাম না। বাড়িটা আসলে গরু ছাগল থাকার খোঁয়াড়। আমি গেটের ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিলাম। সাইকেলের ঘন্টা শুনে দুজন

লোক বেরিয়ে এল । তাদের বুঝিয়ে বললাম যে রাস্তার ওপর সিংহ রয়েছে । ওরা না উঠলে যাব কেমন করে । ওদের খেপিয়ে এগনো যাবে না ।

লোক দুটি বোঝাল যে সিংহগুলি দুষ্ট প্রকৃতির । রেললাইন পাতার কাজে ব্যাপৃত লোকেদের ধরে এনে প্রায়ই ওই জায়গায় বসে খায় । আপাতত খোঁয়াড়ের ওপর ভীষণ আক্রোশ । তারা গরু ছাগল নিয়ে যাবার জন্য উপদ্রব করছে । সেদিন গরু ও ছাগলদের খোঁয়াড়ের বাইরে চরাতে নিয়ে যেতে পারেনি । আমারই অবস্থা । আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে কবে সিংহের দল সরে যাবে । লোক দুটি বলল, তার কোনও স্থিরতা নেই । দেখা যাচ্ছে দুটো সিংহী রোজ জন্তু ধরে নিয়ে আসছে এবং সিংহমশাইদের ভূরিভোজন করাচ্ছে । আজ একটা জেব্রা মেরেছে ।

আমি আদিবাসীদের কাছে আশ্রয় চাইলাম । তারা বরং খুশি হল আমার কাছে বন্দুক আছে দেখে । আজ আমার অগ্রগতি মাত্র ২৩ মাইল । খোঁয়াড়ের গেটের পাশে বসে দেখতে লাগলাম সিংহের দল ওঠবার নাম করে কিনা ।

সঙ্গে এক টিন মাছ ছিল, সেটা খুলে দুটি লোককে ভাগ দিলাম । তারা আমাকে গাব ফল খেতে দিল । সারাদিন বসে থাকলাম । অবস্থার কোনও পরিবর্তন হল না । সন্ধ্যার অন্ধকার হবার আগে খোঁয়াড়ের গেট বন্ধ করে যেখানে অন্য দুটি লোক বসেছিল তাদের কাছে গিয়ে বসলাম । গরুদের চরানো হয়নি । আজ তারা খিদেয় অস্থির হয়ে কেবলই ডাকছে সমস্বরে ।

সারারাত ভালো ঘুম হল না । বন্দুক খুলে হাতে নিয়ে শুলাম । টের পাইনি কখন একটা সিংহ গেট পার হয়ে খোঁয়াড় থেকে একটা গরু ধরে নিয়ে চলে গেছে । সকালবেলায় সবই স্পষ্ট হল । দুটি লোক হায় হায় করতে লাগল । আমাকে গুলি করে সিংহ মারবার জন্য তাগিদ দিতে লাগল । আমি অতি কষ্টে বোঝালাম যে সিংহের দলকে একটা বন্দুক ঠেকাতে পারবে না, হয়তো আমাদের সবার তার ফলে প্রাণ যাবে ।

পরদিন চুপচাপ বসে দেখতে লাগলাম সিংহের মিটিং ভাঙল কিনা । কিন্তু নড়বার কোনও লক্ষণ দেখলাম না । মহা চিন্তায় পড়েছি । খোঁয়াড়ে বসে বসে সিংহের লাগাতার ধর্মঘট দেখব, না অন্য কিছু করবার আছে । ইতিমধ্যে একটা সিংহী মরে গেছে বলে মনে হল । দূরবীন দিয়ে দেখে বোঝা গেল সত্যিই আমাকে যারা পীড়া দিচ্ছে তাদের মধ্যে একজনের জীবনান্ত ঘটেছে । মৃত সিংহীকে মাঝখানে রেখে অন্যরা শোকসভা আরম্ভ করল ।

দুজন আদিবাসী বলল যে তারা উত্তরদিক দিয়ে ঘুরে গ্রামে যাবে এবং গরু মারার খবর দেবে । তারপর কর্তারা যা হোক ব্যবস্থা করবে । খোঁয়াড়ের বাইরে গরু বেরতে পারছে না

বলে তারা অভুক্ত রয়েছে, অস্থির হয়ে চেঁচাচ্ছে। বড়জোর আরেকদিন তাদের ধরে রাখা যাবে, তারপর খোঁয়াড় খুলতেই হবে।

আমি আমার নিজের সমস্যা কিছুতেই সমাধান করতে পারছি না। এগোলে নিশ্চিত মৃত্যু। পিছনে ফিরলে আমার কার্যসিদ্ধি হবে না। ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত দেখতে যাবার খুবই ইচ্ছা, বিশেষ করে এত কাছে এসে গেছি যখন। হাজার হাজার বড় বড় পাখি দক্ষিণে যাচ্ছে। মনে হয় তারা ভিক্টোরিয়া হ্রদে থাকে।

খোঁয়াড়ে আমি একা বসে থাকলাম। পিছন দিকে দুজন আদিবাসী চলে গেল বর্শা হাতে গ্রামের দিকে। দুঘণ্টার পরে তিনজন লোক নিয়ে ফিরল, সবার হাতে বর্শা ও ঢাল। আগন্তুকরা সব দেখে বলল, এ পরিস্থিতিতে কিছু করা যাবে না। দলবদ্ধ সিংহকে তাড়াতে যাওয়ার ফল খারাপ হবে, এ বিষয় সবাই নিঃসন্দেহ। একটা সিংহী মরেছে, তাও স্পষ্ট বোঝা গেল।

ঠিক হল গ্রাম থেকে দূরের পথ দিয়ে গরুর খাবার এনে দেবে। খোঁয়াড় খোলা চলবে না কোনওমতেই। আমার জন্য ভাতসেদ্ধ এবং নুন দেবে বলে গেল। খোঁয়াড় দেখার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিল। আমি আশ্রয় পেয়েছি বলে আমারই ধন্যবাদ দেবার কথা।

আরও একটা দিন কাটল। সিংহরা মরা সিংহী থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। হায়না ও শকুন নিজ নিজ কাজ করছে। আমি ভেবেছিলাম যে মৃতকে অন্য সিংহরা হয়তো খাবে কিন্তু তা হল না।

দুপুরবেলায় অনেক লোক খড় ও গরুর খাবার নিয়ে ফিরল। বর্শা ছিল সবার কাছে। গরুর একটা উপায় হল। আমার পথের কণ্টক কিন্তু সরল না। সিংহের দলের দিকে চেয়ে বসে থাকা ছাড়া আমার আর কাজ নেই।

তিনদিন এমনিভাবে কাটাবার পর আমাকে মনস্থির করতে হল। দক্ষিণে যাবার একটি মাত্র পথ, তাও আটকা। গ্রামের লোকেরা যখন উত্তরদিক দিয়ে বাড়ি গেল, আমিও তাদের সঙ্গ নিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত সিংহের দৃষ্টির মধ্যে ছিলাম। তারপর তাদের বিদায় দিয়ে সাইকেলে উঠলাম ফিরতি পথে। ভিক্টোরিয়া হ্রদ দেখার শখ মিটল না। সুদানের পরিচিত পথ ধরলাম।

বারোদিন পরে আসওয়ানে পৌঁছে একটা স্টিমারে উঠলাম। সাতদিন পর আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছলাম জলপথে।

আলেকজান্দ্রিয়া ইজিপ্টের একটা বন্দর। একদিকে নাইল নদ, অন্যদিকে ভূমধ্যসাগর। এখানে জলের দুরকম রং স্পষ্ট দেখা যায়। নাইলের জল ফিকে সবুজ, ভূমধ্যসাগরের গাঢ় নীল জলে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে।

বিদেশি ও মিশরি বড়লোকদের সমুদ্রসৈকতে স্নানের ব্যবস্থা আছে। লাইনবন্দী ছোট ছোট নানা রঙের কাঠের ঘর। তার ভেতর কাপড় ছাড়ে।

এদেশ আলেকজান্ডার জয় করবার পর এই বন্দরের নাম রাখা হয় আলেকজান্দ্রিয়া। পশ্চিম দেশের উপকূলে একটা ছোট বন্দর আছে। একই কারণে তার নাম রাখা হয় ইস্কান্দ্রুন। তুর্কিতে ঢোকবার সময় আমরা ইস্কান্দ্রুনে গিয়েছিলাম।

আলেকজান্দ্রিয়াতে অনেক গ্রিকের বাস। উত্তর মিশরের প্রায় সব শহরে গ্রিকরা আছে অল্পবিস্তর সংখ্যায়। গ্রিক ও মিশরি রমণীর সংমিশ্রণে যারা জন্মেছে তারা বেশ সুন্দর দেখতে।

এখানে সব কিছু পাওয়া যায়। অনেক টিনের খাবার সঙ্গে নিলাম। আমার কাঁধের ওপর, সাইকেলের ওপর এত বোঝা বইতে হয় যে ইচ্ছা থাকলেও আর মাল বইতে পারব না।

এবারে পশ্চিমে এগোতে শুরু করলাম লিবিয়ার মধ্যে। সমুদ্রের ধারে একটা রাস্তা বেনগাসি পর্যন্ত চলে গেছে। মাঝে মাঝে মরুভূমির বালি রাস্তা ঢেকে দিয়েছে। ভূমধ্যসাগর থেকে মৃদু বাতাস সব সময়ই বইছে। এটা আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ বীর হানিবলের দেশ, যিনি দক্ষিণ ইউরোপ জয় করেছিলেন খ্রিস্ট জন্মাবার ২৪৮ বছর আগে। কার্থেজ থেকে তিনি স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও ইতালি জয় করেন। বিরাট সৈন্য সমাবেশের সঙ্গে তাঁর অশ্বারোহী ও হাতির সাঁজোয়া বাহিনী ছিল। আল্পস ও পিরেনিস পার হবার সময় শীতে অনেকে মারা পড়ে!

পথে কার্থেজ গেলাম। আজও দুর্গ, প্রাসাদ ইত্যাদির ভগ্নাবস্থা অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পাথর দিয়ে সব তৈরি হয়েছিল বলে কালের কবলে পুরোপুরি যায়নি।

বেনগাসি আধুনিক শহর। দেখলেই বোঝা যায় যে ইউরোপের কাছে এসে যাচ্ছি। ভূমধ্যসাগর পার হলে ইতালি। এখানে ব্যবসাদার ও হোটেলের মালিক সব ইতালিয়ান।

দ্বিতীয় বড় শহর ত্রিপোলিতে পৌঁছলাম। এককালে সারা দেশটাকেই ত্রিপোলি বলা হত।

পশ্চিমে আরও একশো মাইল চলবার পর টিউনিস দেশের সীমানায় পৌঁছলাম। এটা ফরাসিদের অধীনে ছোট একটা দেশ, মুসলমানপ্রধান।

টিউনিসের রাজধানীর নামও টিউনিস, চারদিকে ফরাসিরা ঘোরাফেরা করছে। টিউনিসিয়ান মেয়েরা বোরখা পরা। ফরাসিদের সঙ্গে টিউনিসবাসী মেয়েদের সংমিশ্রণ হয়েছে খুব। মিশ্র জাতের ছেলেমেয়েরা আরও সুশ্রী দেখতে। এ দেশের লোকেরা ইউরোপীয়দের মতো ফর্সা। ফরাসিরা রাজত্ব চালায়। টিউনিসের লোকেদের মধ্যে

স্বাধীনতার চিন্তা এখনও আসেনি । তবে চিরদিন এমনই যাবে না । ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে পড়তে যায় । তারাই একদিন স্বাধীনতা দাবি করবে যেমন আমার দেশের নেতারা করেছেন । স্বাধীন দেশে গেলে স্বাধীনতার মর্ম হৃদয়ঙ্গম হয় নিশ্চয়ই । ভারতবর্ষের বেশিরভাগ স্বাধীনতাকামী নেতা বিলেতে জীবনের একাংশ কাটিয়েছেন দেখা যায় ।

টিউনিস শহর সমুদ্রের ওপর । উত্তরে ভূমধ্যসাগর অল্প পরিসর । অদূরে সিসিলি দ্বীপ দেখা যায় । আমি একটা মাঝারি ধরনের ফরাসি হোটেলে উঠেছি । হোটেলের মালিক ভালো লোক, সাদা কালোর পার্থক্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে আমার মনে হল না । একদিন ফরাসি দেশেও যাব শুনে সে খুব খুশি ।

বন্দরে গিয়ে খোঁজ করলাম যদি ইউরোপগামী স্টিমার পাওয়া যায় । বেশি কষ্ট করতে হল না । একটা স্টিমার পেলাম টিউনিস থেকে সিসিলি দ্বীপের সিরাকিউস শহরে যায়, মাত্র ছয় ঘণ্টার পথ । ইতালির দক্ষিণে এই প্রকাণ্ড দ্বীপটি, ইতালিরই অংশবিশেষ । সিরাকিউস অতি প্রাচীন গ্রিক শহর । পথে মাল্টা দ্বীপ পড়ল ।

১২

এই সময় দলে দলে উত্তর ইউরোপের লোক ইতালি ও সিসিলি ভ্রমণে আসে, কোনও হোটেলে তাই ঠাঁই নেই। অগত্যা বড় এবং দামি হোটেল ভিলা ইজিয়াতে উঠলাম। আকাশের নিচে গ্রিক থিয়েটার দেখতে গেলাম। সমুদ্রের ধারেই, পাথর কেটে বসবার জায়গা তৈরি হয়েছে। তিন হাজার লোক বসতে পারে বৃত্তাকারে। স্টেজের সামনে জলের পরিখা যাতে দর্শক ক্ষেপে গিয়ে কিংবা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীদের আক্রমণ না করে। স্টেজে কোনও সীন থাকত বলে মনে হয় না। স্টেজের পিছনেই নীল সমুদ্রের জল দেখা যায়। এই থিয়েটারটি অনুমান দুহাজার বছর আগেকার।

গ্রিকরা এককালে আশপাশের দেশ জয় করে যে বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করে, সিসিলি তার মধ্যে ছিল প্রথম ও প্রধান। এই দ্বীপটি বেশ বড়। চারদিক ঘুরে ভালো করে দেশটি দেখবার সুযোগ হয়েছিল।

দ্বিতীয় ডিয়নিসাসের সময় সিরাকুশের মধ্যে ভূগর্ভে খনি ছিল, নানা রকম পাথর কেটে ধাতু বার করা যেত। আমাদের হোটেলটা ছিল ওই রকম একটা খনির ওপরে। বিস্তীর্ণ বাগানে নানা রঙের ফুল গাছ। একদিন সকালে একটা বেঞ্চে বসে আমি বাগানের সৌন্দর্য উপভোগ করছি, এমন সময় আরেক ভদ্রলোক এসে বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসলেন। হঠাৎ মনে হল ভদ্রলোকের মুখ যেন পরিচিত। কেমন করে তা সম্ভব, ভাবছি। আরেকবার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে এবার নিশ্চিত হলাম। দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন জানালাম, ইওর ম্যাজেস্টি বলে। ভদ্রলোক তখনই দাঁড়িয়ে উঠে আমার দিকে হাত বাড়ালেন করমর্দন করবার জন্য। ইনি স্পেনের রাজা, প্রথম অ্যালফানসো। পরিষ্কার ইংরিজি বলেন। ইংরেজ রাজ পরিবারের মেয়ে, খুব সম্ভব রানি ভিক্টোরিয়ার এক কন্যাকে বিয়ে করেন। বর্তমানে ইনি রাজ্যচ্যুত।

আমরা দুজনে বেঞ্চে বসে সারা সকাল গল্প করলাম। রাজা বললেন যে ইউরোপের মধ্যে সিসিলির বিশেষ স্থান আছে। সাতটি সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে এই দ্বীপে। গ্রিস থেকে আরম্ভ করে রোমান, গথ, ভ্যান্ডাল, স্প্যানিশ, ইতালিয়ানরা পালাক্রমে রাজত্ব করেছে এই দেশে। স্পেনের অধীনে এখানে খুব উন্নতি হয় এবং সর্বত্র বড় বড় বাড়ি, গির্জা তৈরি হয়।

আমাকে রাজা বললেন যে যদি আমি তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যাই গাড়িতে, তাহলে শহরে যত স্প্যানিশ স্থাপত্যের বাড়ি আছে তা তিনি দেখাতে পারবেন। ঠিক হল পরদিন সকালে প্রাতরাশ খেয়ে রওনা হব। শহর থেকে দূরে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত মনরিয়ালে গির্জা ও ক্লয়স্টার দেখতে যাব। সিরাকুস শহরে এত স্প্যানিশ ধরনের বাড়ি, ক্যাসল আছে তা না দেখিয়ে দিলে আমি চিনতে পারতাম না। মনরিয়ালের কারুকার্য এবং স্থাপত্য দেখে আমি মুগ্ধ। স্পেনের লোকের তৈরি বলে মুরীশ স্থাপত্য স্পষ্ট চেনা যায়।

এটা অলিভ তেল ও ছোট কমলালেবুর দেশ। সমুদ্রের ধারে সুন্দর বাঁধানো রাস্তা আছে। তার মাঝখানে সার বাঁধা অলিভ গাছ। একটা জায়গায় রাজার গাড়ি থামল। আমরা নামলাম।

অ্যালফানসো বললেন, এইখান থেকে আর্কিমেডিস বুদ্ধি করে আয়নায় সূর্যের আলো ফেলে শত্রুর জাহাজের পালে আগুন লাগিয়ে দেন এবং গ্রিকরা জয়লাভ করে। আজকে আমরা একসঙ্গে ডিনার করব, তখন অনেক গল্প শুনো।

এখানে ট্যানজারিন কমলালেবু খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু। রাজা এই দ্বীপে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন এবং সমস্ত দেশটা তাঁর নখদর্পণে।

যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৫০ বছর আগে রোমানদের বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। পূর্বে তুর্কি ও এশিয়া মাইনর, পশ্চিমে ইংল্যান্ড পর্যন্ত সে রাজত্ব করেছে। দক্ষিণে আফ্রিকার মিশর দেশও তার করায়ত্ত ছিল।

সিরাকুস ছেড়ে এটনা আগ্নেয়গিরি দেখতে গেলাম। আগ্নেয়গিরি মাঝে মাঝে লাভা উদিগরণ করে। লাভা যেখানে পড়ে সেটা অনেক বছর পরে ঠান্ডা অবস্থায় আঙুর চাষের পক্ষে উর্বর জমিতে পরিণত হয়। সেজন্য আগ্নেয়গিরির ভয় থাকা সত্বেও আগ্নেয়গিরির বিপদসীমার মধ্যে গিয়েও লোকেরা আঙুর চাষ করে। বিখ্যাত মার্শালা মদ এই অঞ্চলে হয়।

এটা মুসোলিনির রাজত্বকাল। সর্বত্র ভালো রাস্তা ও নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এটনা প্রায় ৮,০০০ ফুট উঁচু। পাহাড়ের চূড়ায় বরফ। সেখানে স্কিইং ও স্কেটিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। দুয়েক হাজার ফুট নিচে বরফ নেই।

এটনা থেকে নেমে কাটানিয়া শহর এবং সেখান থেকে বড় রাস্তা চলে গেছে। এই সময় আমন্ডস বাদামের গাছে ফুল হয়। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। দুধারের গাছে ভর্তি গোলাপি রঙের ফুল, ফুলের কিছু পাপড়ি রাস্তার ওপর পড়েছে, ওপর নিচ ডাইনে বাঁয়ে ঘন গোলাপি রঙে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে।

আগ্রিগেন্টো পৌঁছলাম। ভারি সুন্দর শহর। সমুদ্রের ওপর। রোমানরা এখানে একটা মুক্তাঙ্গন থিয়েটার তৈরি করেছিল। সেটা আজও রয়েছে, এখানেও পিছনে সমুদ্র। ইউরোপের কত লোক যে এই শহরটি দেখতে আসে তার ঠিক নেই।

রাজা আমাকে আরও দুটো জায়গা দেখতে বলেছিলেন, এন্না ও পালের্মো। সিসিলি পাহাড়ের দেশ। উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে এন্না পৌঁছলাম কয়েক হাজার ফুট ওপরে। এন্নার অন্য নাম কাস্ত্রো জিওভান্নি। শহরটা পাহাড়ের ওপর বলে মনে হয় সমস্ত দেশটা পায়ের নিচে। এখানের সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য হল গির্জা। ২,০০০ বছর আগে গ্রিকরা একটা বিরাট মন্দির তৈরি করেছিল, উত্তরকালে খ্রিস্টানরা সেটি অল্প পরিবর্তন করে গির্জায় পরিণত করে।

এন্নাতে খুব কম ট্যুরিস্ট বেড়াতে আসে। প্রথম কথা এখানে পৌঁছনো কষ্টকর। ভালো রাস্তা নেই। বাস চলাচল করে না। তাছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী সব শহর থেকে অনেক দূরে। তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে এখানে সিসিলিয়ান ডাকাতদের জগৎজোড়া নাম। আজকালকার মাফিয়ারা যাদের বংশধর, তাদের আদি বাসস্থান হচ্ছে এন্নার কাছে দুরারোহ পাহাড়ের আশপাশে। কেউই সাধ করে এদের খপ্পরে পড়তে চায় না।

এন্না ছেড়ে উত্তর-পূর্বদিকে দ্বীপের রাজধানী পার্লেমো শহরে গেলাম। মস্ত বড় শহর। সমুদ্রের জলপথ বেশি দীর্ঘ নয়। দূরে মেশিনা শহর দেখা যায়। ছোট-বড় নানা জাতীয় জাহাজ স্ট্রেটের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করছে।

অনেক বছর আগে মেশিনা শহর ভূকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তারপর শহর নতুন করে গড়ে উঠেছে। জলপথ পার হয়ে পরদিন ইতালি পৌঁছলাম।

নেপলসের পথ ধরলাম। এক সপ্তাহ লাগল ৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে। রাস্তা খুব ভালো। দিনে ৬০-৭০ মাইল চলেছি। রাস্তার অবস্থা দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল আমি উন্নত দেশে, ইউরোপে পৌঁছেছি।

নেপলস এক বিরাট শহর। বোধহয় ইতালির সবচেয়ে বড় শহর। পাহাড় সমুদ্র গাছপালা মিলে নেপলসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। তাতে যোগ দিয়েছে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি। সমুদ্রের জলের ধারেই পাহাড়ের ওপর আগুন ও ধোঁয়া লোককে চমৎকৃত করে। ইংরিজিতে কথায় বলে 'মরবার আগে নেপলস দেখো' কথাটার সত্যতা নিজের চোখেই দেখলাম। নেপলসের ন্যাশনাল মিউজিয়াম জগদ্বিখ্যাত। কত সুন্দর ভাস্কর্য দেখলাম তার তুলনা হয় না। গ্রিক যুগ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রাক্সিটেলিস ও মাইরোনের তৈরি মহামূল্য স্ত্রী ও পুরুষের মূর্তি দেখে মুগ্ধ হলাম। রোমান যুগের অনেক

প্রস্তর মূর্তি রয়েছে । সেগুলিও কারুকার্যের দিক থেকে অমূল্য । দুদিন মিউজিয়ামেই কাটালাম । ইচ্ছা করছিল আরও দুদিন কাটিয়ে ভালো করে দেখি ।

বড় বড় জাহাজ এখান থেকে আমেরিকা ও দূর দূর দেশে যাত্রা করে । ছোট একটা স্টিমারে উঠলাম স্বর্গপুরী, কাপ্রি দ্বীপ দেখবার উদ্দেশে । পথে সুন্দর সুন্দর গ্রামে স্টিমার থামল, যেমন আমালফি ও সোরেন্টো ।

কাপ্রি একটা ছোট্ট দ্বীপ । বে অব নেপলসের ঘন নীল জলের ওপর কাপ্রি অপূর্ব সুন্দর দেখায় । পৃথিবীর সব জায়গা থেকে ট্যুরিস্ট আসে এই দ্বীপে । চারদিকে হোটেল ও রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি ।

স্টিমার থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে অনেক ওপরে উঠতে হয় কাপ্রি শহরে পৌঁছবার জন্য । লিফটও আছে সাধারণের সুবিধার জন্য ।

মাঝপথে একটা রেস্তোরাঁতে খেয়ে নিলাম ও অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করলাম । রেস্তোরাঁটি পাহাড়ের গায়ে এবং নিচের দিকে চাইলে দেখা যায় বন্দরে ছোট-বড় নৌকো নীল জলের ওপর ভাসছে ।

কাপ্রি শহরটা কিন্তু এমন কিছু সুন্দর নয় ।

কাপ্রি থেকে একটা ডিঙি বোট নিয়ে একটি গ্রটো দেখতে গেলাম । একটা অপরিসর ফাঁকের ভেতর দিয়ে বোটটা ঢুকল যেখানে জল মাটির নিচে অল্পদূর গিয়েছে । ভেতরে ঢুকলে দাঁড়াবার মতো উচ্চতা আছে । বোটে বসে জলের নিচে নীল রঙের খেলা দেখলাম । এজন্য এটিকে নীল গ্রটো বলা হয় ।

কাপ্রিতে ফিরে সলফাটারা নামে একটি পুরনো গ্রামে গেলাম । এখানে দ্রষ্টব্য জিনিস হচ্ছে এক জায়গায় বালি গরম হয়ে ফুটছে, যেমন জল ফুটলে দেখা যায় । অনেকের মতে, এই বালির নিচে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আছে ।

নেপলসে ফিরে একদিন পরেই জীবন্ত মাছের মিউজিয়াম দেখতে গেলাম । কাচের বড় বড় চৌবাচ্চা সমুদ্রের লোনা জলে ভরা । এমনকী অক্টোপাসও রয়েছে । একটি ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল । সে মাছ ও মৎস্য জীবন সম্বন্ধে গবেষণা করছে । নাম মেহেতা, বোম্বাইয়ে বাড়ি ।

সকালে উঠেই রওনা হলাম ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির ৩,০০০ ফুট চূড়ায় ওঠবার জন্য । চূড়া থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল । সেই ধোঁয়ার সঙ্গে গন্ধক মিশ্রিত ছিল, নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয় । দুপুরবেলায় আগ্নেয়গিরির একেবারে ওপরে পৌঁছলাম, সেখান থেকে সামনেই গলিত পদার্থ ফুটন্ত অবস্থায় স্পষ্ট দেখা গেল । একটা ইতালীয় তামার পয়সাকে লাভা দিয়ে যখন মুড়ছি, হঠাৎ পায়ের নিচে জমিটা দুলে উঠল । সাবধান হয়ে দূরে নিরাপদ জায়গায় ছুটে

পালালাম । কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল । ভিসুভিয়াসের চূড়া ভীষণ শব্দ করে ওপরে কয়েক শত ফুট উঁচুতে উঠে গেল এবং যখন আমি দৌড়ে পালাচ্ছি তখন আমার চারপাশে ছোট এবং বিরাট বড় পাথরের চাঁই ছড়িয়ে পড়ল । কী ভাগ্যি যে আমি কোনও পাথরের আঘাত পাইনি ।

সন্ধেবেলা চূড়া থেকে নিচে নেমে এলাম । লক্ষ বাড়ির আলো জ্বলে উঠেছে । গাঢ় নীল জলের ওপর আলোর প্রতিচ্ছবি চারদিক মনোরম করেছিল । নেপলস যে খুবই সুন্দর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ।

আমার হোটেলের সামনেই বে অব নেপলসের জলপথ, ওপারেই ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি । প্রথমেই আমার নজরে পড়ল যে আগ্নেয়গিরির ত্রিকোণ সরু মুখটা, কালকের বিস্ফোরণের ফলে উঠে গিয়েছে এবং তার চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে ।

এটনায় চড়বার সময় যেমন দেখেছিলাম ভিসুভিয়াসেও তেমনই আগ্নেয়গিরি বিপজ্জনক জেনেও ইতালিয়ানরা পাহাড়ের গায়ে আঙুর চাষ করছে । বলা বাহুল্য যে এই আঙুরের মদের চাহিদা খুব বেশি ।

পরদিন ভিসুভিয়াস পার হয়ে প্রথমেই পম্পেই শহর দেখতে গেলাম । এই শহরটি ২,০০০ বছর আগে ধ্বংস হয়ে যায় । আগ্নেয়গিরি থেকে উদগীর্ণ গরম ছাই এবং বিষাক্ত গ্যাস শহরের সব লোককে মেরে ফেলে । বহুকাল কেটে গেছে তারপর । প্রত্নতত্ত্ববিদরা পম্পেই শহর মাটি খুঁড়ে ছাই সরিয়ে তাকে আবিষ্কার করেছে । ছাই ঢাকা ছিল বলে ঘরবাড়ি জিনিসপত্র ভালোভাবেই রক্ষিত হয়েছিল । পুরো শহরটাই পুনরুদ্ধার হয়েছে । বড় বড় মন্দির, নাট্যশালা, সাধারণ লোকের বসতি, দোকান, রাস্তা ভালোভাবে দেখা যায় । দুহাজার বছর আগেকার দোকানে সাজানো পাউরুটি আজও যথাস্থানে রয়েছে, গরম ছাইয়ে পুড়ে গিয়েছে মাত্র ।

মানুষ ও জন্তু দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল, যে যেমন অবস্থায় মারা গিয়েছে আজ তেমনই অবস্থায় মানুষ ও কুকুর ইত্যাদি দেখা যায় । সব পুড়ে মমি হয়ে গিয়েছে ।

রাস্তার ওপর দিয়ে এক কালে চ্যারিয়ট যাতায়াত করত, সে জন্য মাটি ও পাথরের ওপর চাকার দাগ সুস্পষ্ট দেখা যায় । বাড়ির ছাদ থেকে জল নিকাশের জন্য সীসার পাইপ দেখলাম । জীবনধারা উন্নতমানের ছিল সন্দেহ নেই । একটা বড় বাড়ি অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় দেখলাম । এর নাম ভেট্টি ব্রাদার্সের বাড়ি । এটি মদ খাওয়া ও আমোদ-প্রমোদের জায়গা ছিল । পম্পেই শহরের ওপর মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিসুভিয়াস পাহাড় ও আগ্নেয়গিরি ।

আরেকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর এরকুলানিয়াম অনতিদূরে রয়েছে। সেটা আমার দেখা হবে না। ইতালিতে এত প্রত্নতত্ত্বের জিনিস আছে দেশ জুড়ে যে আমি এই ভ্রমণে দেখে শেষ করতে পারব না।

পম্পেই শহরের কাছেই একটি ভালো ব্যবসা গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শাঁখ এনে তার ওপর নরুন দিয়ে কেটে চিত্রবিচিত্র করা। যত লোক ধ্বংসাবশেষ দেখতে আসে তারা শাঁখের ছোট-বড় কিছু না কিছু জিনিস কিনে নিয়ে যায়। এই শাঁখের বিশেষত্ব এই যে সুন্দর গোলাপি, গেরুয়া রঙের হয় এবং তা দিয়ে বাতিদান, কানের গয়না, গলার হার ইত্যাদি তৈরি হয়।

শহরে খুব জবর খবর যে আগামীকাল সেন্ট জেনরে অর্থাৎ সেন্ট জানয়ারের রক্ত দেখা যাবে। পরদিন গির্জার দিকে গেলাম। সেখানে এত স্ত্রী পুরুষের ভিড় যে অতি কষ্টে গির্জার সামনে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ লোকেদের হর্ষধ্বনি শুনলাম, রক্ত দেখা গেছে, রক্ত দেখা গেছে রব সবার মুখে। একজন পাদ্রী গির্জার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং একটা কাচের টিউব উঁচু করে তুলে ধরে বললেন, এই দেখ রক্ত, সেন্ট জেনরের, বিরাট জনতা একসঙ্গে উল্লাস প্রকাশ করল। এইরকম গরম রক্ত ওই টেস্ট টিউবে ভরা, দুবার বছরে দেখা যায়। যতদিন রক্ত দেখা যায় ততদিন দেশের কোনও বিপদ নেই, নেপলসবাসীদের এই ধারণা।

এখানে আর্ট গ্যালারি অনেকগুলি আছে। আমি ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে অনেক বিখ্যাত ইতালিয়ান চিত্রকরদের ছবি দেখলাম। একদিন টারন্তেলা নাচও দেখা গেল।

নেপলস, যার আসল নাম নাপোলিতে, সেখানে আরও দুদিন কাটিয়ে সান্তামারিয়া ও সান্তালুচিয়া অঞ্চলে ভালো ভালো ইতালিয়ান রান্না খেলাম। এখানে বাচ্চা অক্টোপাস ভেজে খাওয়ার রেওয়াজ সর্বত্র। খেতে সুস্বাদু এবং মনে হয় চিংড়ি মাছ ভাজা খাচ্ছি।

নেপলস ছেড়ে ইতালির রাজধানী রোমের দিকে রওনা হলাম। রাস্তাটা সমুদ্রের ধার দিয়ে গিয়েছে। খুব সুন্দর চওড়া রাস্তা। তিনদিন পরে অস্ট্রিয়া শহরে পৌঁছলাম। রোম শহর সমুদ্রের ওপর নয়। রোমের স্ত্রী-পুরুষ অস্ট্রিয়াতে যায় আট মাইল দূরে সমুদ্রস্নান করতে। এই আট মাইল পথে এত আলো দেওয়া হয়েছে যে মনে হয় দিন হয়ে গেছে।

রোম বা রোমা পৌঁছলাম বেলা তিনটের সময়। একটা জায়গা পেলাম হোটেল রতশে, ভিলা বোর্গেশের খুব কাছে। অদূরে ভিয়া আপ্পিয়া এবং পিয়াজা দেল পোশেগালো অনতিদূরে। রোমের বয়স দুই হাজার বছরের ওপর। আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। কত বাড়ি, টেম্পল, প্রাসাদ হাজার হাজার বছরের সাক্ষ্য দিচ্ছে, ভাবলে অবাক লাগে। প্রাক খ্রিস্টীয় যুগের তৈরি কলসিয়াম, আর্ট অব টিটুস, পান্থেয়ন এমনই কত কীর্তি মুগ্ধ

হয়ে দেখলাম। ভিয়াডেল ইম্পেরো হচ্ছে পুরনো রোমের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি রাস্তা। একদিকে বিরাট কলসিয়াম অন্য দিকে আধুনিক রাজা ভিক্টর এমানুয়েলের স্মৃতিসৌধ, সুন্দর সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি। বাড়িটি মস্ত বড় কিন্তু খুব সৌন্দর্যের পরিচয় দেয় না।

রোমানদের পার্লামেন্ট বা ফোরাম যেখানে ছিল সেটি ভিয়াডেল ইম্পেরোর ডানদিকে, যদি কলসিয়ামের দিকে যাই। 'ব্রুটাশ তুমিও' যেখানে সিজার বলেন, সেই জায়গাটি ট্যুরিস্টদের আজও দেখানো হয়।

ডোরিয়া চিত্রশালা দেখতে গেলাম, সুন্দর ছবি ও প্রস্তর মূর্তি দিয়ে সাজানো। একটা ভিনাসের মূর্তি এমন ভাবে রাখা হয়েছে যে দেখলেই মনে হয় ভিনাস স্নান সেরে জল থেকে সবেমাত্র উঠেছে।

একদিন পান্থেয়ন দেখতে গেলাম। দেশের বিখ্যাত এবং কৃতী লোকের মৃত্যুর পর তার মরদেহ এখানে আনা হয়। এর চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু নেই। পান্থেয়ন দু হাজার বছরের পুরনো পাথরের বাড়ি।

সেদিন সিজারের জন্মদিন ছিল। ভিয়াডেল ইম্পেরোর ফুটপাথে ব্রোঞ্জের অনেক মূর্তি আছে। হঠাৎ দেখলাম সিজারের মূর্তির সামনে কয়েকটা গাড়ি থামল এবং মুসোলিনি নামলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দেখলাম যে প্রপাগান্ডার জন্য স্টেজ তৈরি হল। মুসোলিনি বেঁটে ছোট্ট সাইজের লোক। কিন্তু গলাটা ভারিক্কি চালের।

তিনি বললেন, আজ সিজারকে সম্মান দেখাতে এসে আমরা নিজেদের সম্মানিত করছি কেননা আমরা সেই বিরাট পুরুষের বংশধর। আমরাও রোমান, আজকের দিনের। সেদিনের রোমানদের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য ছিল তুর্কি থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের কী আছে? কিছুই না। ইংরেজ ও ফরাসি চক্রান্ত করে সমস্ত পৃথিবীটা ভাগ করে নিয়েছে। আমাদের কর্তব্য হল এবিসিনিয়া জয় করে আমার লোকেদের স্থানাভাব ঘোচানো। ফটোগ্রাফাররা ছবি তুলল, চেষ্টা হল আমাকেও ছবির অন্তর্ভুক্ত করবার।

পিয়াৎসা ভেনেসিয়ার ওপর মুসোলিনির অফিস। একদিন বক্তৃতা শুনতে গেলাম। ওপরের বারান্দা থেকে নিচের জনতাকে লক্ষ করে এক দীর্ঘ বক্তৃতা শুনলাম। তার সারমর্ম হল সেই একই কথা যে পৃথিবীটা সবাই ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। এমনকী আফ্রিকাতে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের বিস্তার করেছে। ইতালিতে ঠাঁই নেই। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যাবে কোথায়?

আবার উল্টো আরেক সুরের বক্তৃতা শুনলাম, ইতালি যদি পৃথিবীর বড় বড় জাতির সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে চায় তবে তার আর্মি অনেক বড় করতে হবে। অনেক লোক

চাই। আমি চাই ইতালি তার যোগ্যস্থান অধিকার করুক। তোমরা অনেক সন্তানের জননী হও এই কামনা করি। শ্রোতারা হাসতে হাসতে যে যার কাজে চলে গেল।

ইতিমধ্যে কয়েকটা ছোট যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করেই মুসোলিনি ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছেন। এখন ইংরেজরা মাল্টাতে ঘাঁটি করেছে, নৌবহরের সার নিয়ে। জিব্রাল্টার, আলেকজান্দ্রিয়া ও মাঝখানে মাল্টাকে ঘাঁটি রেখে ইংরেজ ভূমধ্যসাগরকে সুরক্ষিত করেছে। মাল্টা ইতালির খুবই কাছে এবং সেই কারণে মুসোলিনির গাত্রদাহ। ইতালিয়ানরা ভূমধ্যসাগরের আরেকটা নামকরণ করেছে নস্ত্রামারে অর্থাৎ আমাদের সমুদ্র। তবে আমাদের সমুদ্র বলে চেঁচালেই বা লিখলেই তো ভূমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব ইতালির হাতে পড়বে না।

স্পষ্ট বোঝা যায় ইতালি আফ্রিকার আবিসিনিয়া সাম্রাজ্য দখল করতে চায়। তার সপক্ষে জনমত তৈরি করবার চেষ্টা হচ্ছে ফতোয়া ঝেড়ে আর গুণ্ডাবাজি করে।

আমি ইতালিতে দেখেছি, মুসোলিনির চেষ্টায় নিয়মানুবর্তিতা মেনে সবাই চলেছে। পথঘাট পরিচ্ছন্ন। ট্রেন সময়মাফিক আর কলকারখানা পুরোদমে চলে। সবাই মুসোলিনির এসব সাফল্যে মুগ্ধ।

এমনকী ওই সময় আমিও।

ইতালি মিউজিকের জন্য বিখ্যাত, অপেরা দেখতে গেলাম, খুব ভালো গান শুনলাম এক টেনর, লউরি ভল্পির গলায়। টেনর হচ্ছে পুরুষের মিহি গলা। ইউরোপের দক্ষিণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির শ্রেষ্ঠ গায়করা টেনর, তেমনই উত্তরের শীতপ্রধান দেশের গায়কদের মোটা গলার বলে বেশ কিংবা বারিটোন। বেশ-বারিটোন রাশিয়ান গায়ক চালিয়াপিনের গান শুনেছি। গভীর মোটা সুন্দর গলার গান অপূর্ব। ভোলগা নদীর, গান যে শুনেছে সে ভুলতে পারবে না। আমেরিকান পল রোবসনের গলা এই ধরনের ডিপ বেশ, তার গান ওল্ডম্যান রিভার পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তেমনই ইতালির টেনররা বিখ্যাত কারুশো, জিলি, ভল্পির গান রেকর্ডের মাধ্যমে দেশে দেশে পরিচিত।

অপেরার নাম ডন জিওভান্নি, খুব ভালো লাগল।

ইতালির দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দেশে কালাব্রিয়ার লোকেরা বেশ রোদে পোড়া এবং কালো হয়। আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে আমি কালাব্রিয়া কিংবা সিসিলির লোক কিনা।

দুদিন পরে রবিবার। ঠিক হল ঐতিহাসিক জায়গাগুলি দেখব। এডেন্টাইন হিলসে বাথ অব কালিগুলা দেখলাম। নেরো কোথায় দাঁড়িয়ে রোমকে পুড়তে দেখেছিল সেই জায়গাটি একজন নির্দেশ করল। ইতিহাস যেন বাস্তবে এসে থেমেছে। রোম শহর সাতটা

পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। বাইরে থেকে একোয়াডাকট বেয়ে জল সরবরাহ হত, আজও একোয়াডাকটগুলি অতীত দিনের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ইতালিয়ানরা সবাই রোমান ক্যাথলিক। পোপ তাদের ধর্মগুরু। পৃথিবীর মধ্যে সেরা গির্জা, সেন্ট পিটারের বিরাট গির্জার সামনে বিশেষ দিনে ধর্মগুরু পোপ সাধারণকে দেখা দেন। সামনের চত্বরটা প্রকাণ্ড। এক লক্ষ লোক একসঙ্গে পোপের আশীর্বাদ নিতে পারে। পোপের বাড়ি সেন্ট পিটার্স গির্জার সংলগ্ন। বাড়ি বললে ভুল বলা হয়, সে একটা মস্ত রাজপ্রাসাদ, নাম ভ্যাটিকান। ভ্যাটিকান অনেক জায়গা জুড়ে এবং সেটি ইতালি রাজ্যের মধ্যে একটি স্বাধীন রাজ্য। বড় বড় মিউজিয়াম, চিত্রশালা এমনকী দূতাবাসও আছে।

এককালে পোপরা ধর্ম সিকেয় তুলে, দেশ জয় করতে এবং রাজত্বের আয়তন বাড়াতে মনোনিবেশ করেছিল। তাদের মধ্যে খুব অবনতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু ক্ষমতা ছিল অনেক দেশ জুড়ে এবং অপ্রতিহত।

এখনকার দিনেও পৃথিবীর যত রোমান ক্যাথলিক ক্রিস্টান আছে তাদের নেতা এবং সব ধর্ম বিষয়ে পোপের নির্দেশ হচ্ছে শেষ কথা।

সেন্ট পিটার্স গির্জা তৈরি করেছিলেন মিকেল এঞ্জেলো। গির্জার ওপরে, ভেতরে ও বাইরে অগণিত পাথরে ভাস্কর্য মূর্তি তাঁর তৈরি।

সিঁড়ি বেয়ে সেন্ট পিটারের ওপরে উঠলাম। ডোমটা আসলে দুটো, একটার ভেতরে আরেকটা ছাদে পৌঁছলাম। এখান থেকে নিচের ও সামনের দৃশ্য খুব সুন্দর। ছবি তুললাম। অদূরে টাইবার নদী, নদীর মাঝখানে একটা দুর্গ। দুধারে শহর, দুই হাজার বছর তার বয়স।

ভ্যাটিকান চিত্রশালা ও আর্ট সংগ্রহ দেখতে গেলাম। শত শত বছর ধরে পোপকে যে যা উপহার দিয়েছে সেগুলি সাধারণের দেখবার জন্য সাজানো রয়েছে।

পোপের বাগানাবাড়ি রোম শহর থেকে কুড়ি মাইল দূরে। দেখতে গেলাম। বিরাট কেয়ারি করা নানা ফুল গাছে সজ্জিত কাস্টেল গন্ডলফো বাগান। মস্ত প্রাসাদ। পোপকেও দেখা গেল। বাগানের একটা পথ ধরে কোনও একটা বই পড়তে পড়তে পায়চারি করছেন।

মিকেল এঞ্জেলোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ক্যাপেলা সিস্টিনে অর্থাৎ সিস্টিনে চ্যাপেল বললে ভালো হয়। এই চ্যাপেলের ভেতরে সিলিং ও দেওয়ালে আঁকবার জন্য মিকেল এঞ্জেলাকে কয়েক বছর বন্দী করে রাখা হয়। সিলিংয়ে আদম ও ইভের জন্মকথা পূর্ণাবয়ব ছবি দিয়ে আঁকা রয়েছে। কয়েক শত বছর পরে ছবিগুলিতে রঙের ফাটল দেখা যায়। তাতে ছবি তারিফ করবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় না। ওপরের দিকে চেয়ে

চেয়ে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায় বলে চ্যাপেলের ভেতর ট্যুরিস্টদের হাতে আয়না দেওয়া হয় । তাতে ঠিক দেখে যেন আশ মেটে না । বরং ইচ্ছা করে মাটির ওপর শুয়ে পড়ি এবং ভালো করে দেখি । দেওয়ালের সমস্তটা জুড়ে একটা প্রকাণ্ড ছবি দি ডে অব জাজমেন্ট শত শত চরিত্র নিয়ে আঁকা । সুন্দর এবং বিশাল কাজ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ।

মিকেল এঞ্জেলোর তৈরি অনেক শ্বেত পাথরের মূর্তি নানা জায়গায় দেখলাম । তাদের মধ্যে ফ্লোরেন্সের ডেভিড এবং সেন্ট পিটার্স গির্জার ল্যা পিয়েটা সর্বোৎকৃষ্ট ।

ক্যাপিটালের ওপর উঠে মিউজিয়াম দেখলাম । এখানেও একটা প্রাসাদের ওপর দুটি মর্মরমূর্তি দেখা যায় । একটির নাম দিন, অন্যটির নাম রাত্রি । এ দুটিও মিকেল এঞ্জেলোর তৈরি ।

পুরনো রোমের নানা জায়গায় বড় বড় ফোয়ারা আছে । একটি খুব সুন্দর ফোয়ারা স্টেশনের কাছেই দেখলাম । এটিও মিকেল এঞ্জেলোর তৈরি । আরেকটি ফোয়ারা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে, ফন্তানা ডেল ট্রেভি । একটা বাড়ির দেওয়ালের গায়ে এই ফোয়ারা । অনেক সুন্দর সুন্দর পাথরের মূর্তি দিয়ে ফোয়ারাটি সাজানো । জলের মধ্যে দেখা গেল অসংখ্য পয়সা পড়ে রয়েছে । লোকে পয়সা ফেলে এই বিশ্বাসে যে আবার রোমে বেড়াতে আসতে হবে । আমাদের দেশে মেয়েরা যেমন গাছে ইট পাথর বাঁধে এবং আশা করে তাই দিয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে ।

শহর থেকে দূরে হাদ্রিয়ানের সমাধি দেখে এলাম । ইউরোপে কখনও ইউক্যালিপ্টাস গাছ দেখিনি । এইখানে সার বাঁধা ছটা খুব উঁচু ও বড় ইউক্যালিপ্টাস গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে । দেখলে মনে হয় তারা অনেক দিন ধরে মাথা উঁচু করে খাড়া আছে ।

আরেকদিন শহর থেকে দূরে ফ্রাস্কাটি ও টিভোলি দেখে এলাম । এমন বিচিত্র ফোয়ারা দিয়ে জলের শোভা আগে কখনও দেখিনি । রোমানরা খুব আরামপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল । এইসব তারই নমুনা । প্রথম দিকে এরা গ্রিকদের দেব-দেবী পূজা করত ।

কলসিয়াম শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরি এক বিরাট সৌধ । আজকালকার স্টেডিয়াম যাকে বলে । ৩০,০০০ লোক বসতে পারত । প্রথম যারা খ্রিস্টান হয়েছিল তাদের ওপর রোমান সম্রাটদের এত রাগ ছিল যে তাদের কলসিয়ামে রক্ষিত সিংহের সামনে ছেড়ে দিত । অনেকে এমনিভাবে প্রাণ দিয়েছে । আরেকটি স্পোর্টস ছিল, অপরাধীদের মধ্যে দুজনের আমরণ যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া । যোদ্ধাদের গ্ল্যাডিয়েটর বলা হত । অনেক সময় দুজন খুব গায়ে জোরওয়ালা লোককে লড়তে বলা হত এবং যতক্ষণ না একজনের মৃত্যু হত ততক্ষণ লড়াই চলত ।

রোমে এত দেখবার জিনিস আছে যে তা দেখেই জীবন কাটানো যায় । মিকেল এঞ্জেলো যেমন ভাস্কর্যে সবচেয়ে পারদর্শী ছিলেন, তেমনই রাফেল ছিলেন ছবি আঁকায় । এত পরিচ্ছন্ন, সুন্দর কাজ সহজে দেখা যায় না ।

লা ফার্নেসিনা নামে একটা ছোট প্রাসাদ আছে । শুনলাম সেখানে রাফেলের অনেক ছবি দেখা যায় । লা ফার্নেসিনা বন্ধ ছিল । সবসময় বন্ধই থাকে । গেটের কাছে একটা বাড়ি ছিল । সেখানে একজন লোক জল গরম করছিল । তাকে বললাম যে ভারতবর্ষ থেকে এসেছি রাফেলের কাজ না দেখতে পেলে খুবই দুঃখিত হব । লোকটি বলল, আচ্ছা চল তবে । এই বলে চাবির তাড়া নিয়ে এগিয়ে এল ।

ফার্নেসিনা দোতলা ছোট্ট প্রাসাদ । বাড়ির চারদিকে প্রশস্ত বাগান আছে কিন্তু অযত্নের জন্য বড় বড় ঘাস জন্মেছে । এত সুন্দর সুন্দর ছবি দেখলাম যে র্যাফেলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল । একজন নিখুঁত আর্টিস্ট । লোকটি দয়া করে খুলে না দিলে লা ফার্নেসিনা দেখা হত না এবং রোম পরিদর্শনে একটা খুঁত থেকে যেত ।

মুসোলিনি নিজের নাম অক্ষয় করবার জন্য একটা স্টেডিয়াম করলেন, তার নাম দিলেন ফোরো মুসোলিনি । ইতালির যত বিখ্যাত শহর আছে তাদের নামে একেকটি নয় ফুট লম্বা মর্মরমূর্তি দিয়ে বাঁধানো গ্যালারি সাজালেন । প্রত্যেক মূর্তির ভেতর দিয়ে ইতালির প্রত্যেকটি অঞ্চলের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছে । ফোরো মুসোলিনি এখন খেলার স্টেডিয়াম । মনে হয় সাত থেকে দশ হাজার লোক ধরে ।

রোম ছেড়ে লেগহর্নের পথ ধরলাম । তৃতীয়দিনে এই সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরে পৌঁছলাম । কাছেই পিসা, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম, লিনিং টাওয়ার অব পিসা দেখা আমার উদ্দেশ্য । একটি গোলাকৃতি নিখুঁত সুন্দর টাওয়ার যুগ যুগ ধরে হেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে । এমনিতেই টাওয়ারটি দেখার মতো । তার ওপর এক পাশে হেলে অত বড় ইমারত দাঁড়িয়ে রয়েছে এ এক আশ্চর্যের জিনিস । টাওয়ারটার ব্যাস হবে ২০ ফুট, উচ্চতায় ৭০-৮০ ফুট । টাওয়ারের চারদিকে বারান্দা, প্রত্যেক তলায় একটি গোল বারান্দা, নিখুঁত শ্বেত পাথরের কাজ ।

লর্ড বায়রন এখানে অনেকদিন বাস করেছিলেন । স্থানীয় লোকেরা বলে যে তিনি লেগহর্ন বন্দরের সামনে খুব সাঁতার কাটতেন ।

বন্দরে বড় একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল । সেটা বোঝাই করা হচ্ছিল বস্তা বস্তা সোডা অ্যাশ দিয়ে, এ দিয়ে কাচের বাসন তৈরি হয় । তাদের গন্তব্যস্থল ভারতবর্ষ । তখনই ইচ্ছা করল আমি যদি সোডা অ্যাশের বস্তা হয়ে একবার চট করে স্বদেশে ঘুরে আসতে পারতাম । একটা ইতালিয়ান রেস্তোরাঁতে গেলাম ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য । এক প্লেট স্পাঘেটি ও

মাংসের কিমা খেতে দিল । তখন কলকাতার বাড়ির কথা ও মা-বাবা ভাইবোনের কথা ভাবছিলাম অনেকদিন পরে ।

লেগহর্ন ছেড়ে উত্তরের পথ ধরলাম । রাত্রে একটা মস্ত পাহাড়ের নিচে, নাম না-জানা গ্রামে পৌঁছলাম । পাঁউরুটি, সসেজ ও কফি দিয়ে রাতের খাওয়া সারলাম ।

সকালে উঠে দেখি পাহাড়টার রং সাদা । এই সেই বিখ্যাত কারারা মার্বেল । পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ কাজ এই পাথরের তৈরি । এর বিশেষত্ব হল এই যে খুব মসৃণ এবং সাদার মধ্যে অন্য দাগ নেই । পাথরের গ্রেন্সও আরও সূক্ষ্ম মনে হয় । আমার ধারণা তাজমহল এবং অন্যান্য মর্মর প্রস্তরের তৈরি ইমারত কারারা থেকে সংগৃহীত পাথরেই হয়েছিল । পাথরের গায়ে হাত দিলে মনে হয় মাখন মাখানো ।

যেখানে পাথর কাটছে এমন একটা কোয়ারি দেখলাম । সে জায়গাটা ৪,০০০ ফুট উঁচু । উত্তরের পথ ছেড়ে এবার পুবে ফ্লোরেন্সের দিকে মুখ ঘোরালাম । ইতালিতে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত শহর ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য ভর্তি । তাদের মধ্যে রোম প্রথম । ফ্লোরেন্সের স্থান তার নিচেই । আর্ট, ইতিহাস, স্থাপত্য ও সাহিত্যে সব জায়গাই চিরস্মরণীয় । ইংরিজি পাঠকদের কাছে শেক্সপিয়ার তাঁর অনেক নাটকের পৃষ্ঠপট হিসাবে এ শহরকে অমর করেছেন ।

খুব সুন্দর শহর এই আর্নো নদীর ওপর । একটা দোতলা সেতু শহরের দুটো অংশকে যোগ করেছে । সেতুর ওপর দোকান আছে অনেক । লোকেরা দামি দামি জিনিসপত্র কেনাবেচা করে । হীরা মণি মুক্তো থেকে কাচের ফুলদানি, আলাবাস্টারের মূর্তি ইত্যাদি চারুকলার জিনিস পাওয়া যায় ।

ফ্লোরেন্সের নামের সঙ্গে ইতালির অনেক বিখ্যাত লোকের জীবন জড়িত । এইখানে দান্তে ও বিয়াত্রিচে, চেলিনি, মিকেল এঞ্জেলো, লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি, টিশিয়ান, রাফায়েল পায়ের ছাপ রেখেছেন । দুটো জগদ্বিখ্যাত চিত্রশালা পাশাপাশি রয়েছে । উফিক্সি ও পিটি । দুটোই অতুলনীয় । পালাৎসো ভেক্কিওর সামনে ডেভিডের মর্মর মূর্তি মিকেল এঞ্জেলোর তৈরি, বোধ হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিদর্শন ।

দুটো চিত্রশালা ভর্তি ইতালিয়ান শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টদের কাজ রয়েছে । আমার দুদিন লাগল সবগুলি পেন্টিং ভালো করে দেখতে ।

তারপর গির্জা দেখতে লাগলাম । স্থাপত্যে নিখুঁত । গির্জাটিতে অনেকে টালির ছাদ দেখে ক্ষুণ্ণ বোধ করেন । মনে হয় তাঁদের সৌন্দর্য বোধ কম । ইতালির অনেক গির্জা ও রাজপ্রাসাদ টালির ছাদের । মাকিয়াভেল্লির কবর এখানে ।

গির্জার সামনেই ব্যাপটিস্ট্রি । এখানে শিশু অবস্থায় খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয় । দুখানা বিশাল দরজায় নিখুঁত কাজ করা ব্রোঞ্জের ওপর মিকেল এঞ্জেলোর অক্ষয় কীর্তি ।

ফ্লোরেন্স শহর পাহাড়ের নিচেই বলে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা । এবার আমাকে ইতালির শিরদাঁড়া, আপেনাইন পাহাড়ে চড়তে হবে । ওপারে বোলোইনা শহর । দুদিন লাগল পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে বোলোইনা পৌঁছতে । রাস্তা ভালো, দক্ষিণ ইতালির বড় একটা সংযোগস্থল এটা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহরগুলিতে যাবার জন্য ।

বোলোইনা পুরনো শহর । শহরের মাঝখানে একটা চত্বর রয়েছে যেটি ভাষণদান ও বেড়াবার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করা হয় ।

বোলোইনাতে মাত্র একদিন থেকে পাদুয়ার পথ ধরলাম । মাঝে ইতালির অন্যতম বড় নদী, পো পেলাম । আমাদের দেশের গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে অবশ্য তুলনা করা উচিত নয় । এইসব নদী, কবিতা-গানে ও লেখায় বিখ্যাত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আসলে খুব অপরিসর, প্রায় একটা নালার মতো । বরফ গলা জল বলে কাচের মতো স্বচ্ছ ।

পাদুয়া ইউনিভার্সিটি দেখবার খুব ইচ্ছা ছিল । এটি একটি বহু পুরনো শিক্ষাকেন্দ্র । পাদুয়ায় পৌঁছলাম দুদিন পর । এখানে সারা বছর ধরে ট্যুরিস্টরা আসে যায়, তবু আমার পিছনে মস্ত একদল ছেলে-মেয়ে আঁটুলির মতো সঙ্গে লেগে রয়েছে । অনেকে কথা বলবার ইচ্ছায় আমাকে থামিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করে ।

ইউনিভার্সিটির এক কর্তাব্যক্তি, মিস্টার বার্টোরিনির অনুরোধ একদিন পরে একটা বক্তৃতা দিতে হবে আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে । ভদ্রলোক খুব উৎসাহী । আমাকে তাঁর বাড়িতে খাবার নেমন্তন্ন করলেন । ইতালিয়ান রান্না আমার খুব পছন্দ, রিসোট্রো, রাভিওলি ইত্যাদি আমার বিশেষ প্রিয় । মনে হয় একটু একটু প্রাচ্যের ছোঁয়াচ আছে তার মধ্যে ।

গৃহকর্ত্রী বেশ উচ্চশিক্ষিতা । কলেজে দর্শনশাস্ত্র পড়ান । নিজেই রেঁধেছেন এবং আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন । বার্টোরিনিদের একটি ছেলে আছে, সে আমেরিকাতে পড়াশুনো করে । ছেলে আমেরিকান এক ছাত্রীকে বিয়ে করতে চায় । ভদ্রমহিলা তাই উঠে পড়ে লেগেছেন ইংরিজি শিখতে ।

পরদিন সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে মিটিং হল । বিষয় ‘রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন’ । মিটিং শেষ হবার পর অনুরোধ পেলাম যে গান্ধীজির জীবন সম্বন্ধে বলতে, বিষয়: ‘গান্ধীজি ও স্বাধীনতা’ । স্বাধীনতা মানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা । দ্বিতীয় দিন যখন আমার ডাক পড়ল, আমার ধারণা হল যে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যা বলেছি তা ভালোই হয়েছে ।

গান্ধীজির কথায় সবাই মুগ্ধ । শেষে একজন প্রশ্ন করল যে গান্ধীজি সাধুপুরুষ না রাজনীতিবিদ? আমি বললাম তিনি একজন সত্যদ্রষ্টা, সত্যের ওপর রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন । তিনি অবশ্যই সাধু প্রকৃতির । তিনি নিজের ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য

ভুলে সমাজে যারা অবহেলিত ও পদদলিত, নিজেকে তাদেরই একজন বলে মনে করেন। জাতিভেদ প্রথার মূলে তিনি আঘাত হেনে তাকে নির্মূল করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

পাদুয়া ছেড়ে ভেনিসের পথ ধরলাম। রাস্তা খুব ভালো। শেষ হল একটা জলপথের সামনে। জলপথ পার হয়ে ভেনিস শহরে ঢুকলাম। সব শহরে যানবাহন ও মানুষ চলাচলের জন্য বড় ছোট সবরকম রাস্তা থাকে, আশ্চর্যের বিষয় যে ভেনিসে জলপথই রাজপথ। বাড়িগুলি একেবারে জলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যেতে হলে নৌকো বা গন্ডোলা নিতে হয়। দূরের জায়গার জন্য বড় বড় স্টিমার ক্যানালের ওপর এদিক ওদিক চলেছে।

কলকাতায় ভীষণ বৃষ্টির ফলে কখন কখনও রাস্তা জলে ভরে যায়। বাড়ির দরজা পর্যন্ত জল ওঠে। ভেনিসে এই অবস্থা সারা বছর। নৌকো অর্থাৎ গন্ডোলা বাঁধবার জন্য সব বাড়ির সামনে বড় বড় কাঠের খোঁটা পোতা আছে।

গন্ডোলার চালকরা দাঁড়িয়ে নৌকো চালায়। সাধারণত এরা খুব স্ফূর্তিবাজ লোক হয়।

শহরের ভেতরে ভেতরে গলি দিয়ে পাকা রাস্তা আছে। জলে যেমন সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া যায়, স্থলপথে সেখানে অনেক ঘুরতে হয় এবং দূরত্ব বেড়ে যায়। আমাদের দেশের বাসের মতো স্টিমার সব বড় বড় ক্যানাল দিয়ে যাতায়াত করে। বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় না।

পৃথিবীর মধ্যে এই রকম জলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা শহর আর দুটি নেই। এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

ভেনিস বেশ পুরনো শহর, যুগে যুগে সে ইতালির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। ইট পাথর কাঠ দিয়ে প্রথমে সার সার বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে। তারপর খাল কেটে সমুদ্রের জল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইগুলি এখন জলপথ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সানমার্কো চত্বরের এক কোণে জলের ওপর একটি হোটেলে উঠলাম। ভেনিসের বিশেষ দ্রষ্টব্য হচ্ছে সানমার্কো গির্জা, কাম্পানিল ও পাশেই ডোজের প্রাসাদ, গির্জার সামনে চত্বরটা বিরাট। চারদিকে এক ধরনের থামওয়ালা বাড়ি, একতলায় দোকান।

চত্বরের এক প্রান্তে মস্ত গির্জা। যেন একটি জুয়েলারি বাক্স। আদ্যোপান্ত পাথর ও কাচ দিয়ে ভেতর বাইরে মোজেক করা। এটি বাইজান্টাইন-স্থাপত্যের স্বাক্ষ্য দেয়। গির্জাটি সেন্ট মার্কের নামে উৎসর্গীকৃত।

যুগ যুগ ধরে ট্যুরিস্টরা তীর্থযাত্রীর মতো এখানে এসেছে হাজারে হাজারে এবং অবসর সময়ে গন্ডোলায় চড়ে গান শুনেছে অথবা চত্বরের অগণিত পায়রা খাইয়েছে। মানুষকে পায়রা ভয় পায় না। হাতে খাবার ঠুকরে তোলবার চেষ্টা করে। চমৎকার দৃশ্য।

কাম্পানিল ইটের গাঁথনি করা প্রকাণ্ড উঁচু চতুষ্কোণ ইমারত। পাশেই সমুদ্র এবং অদূরে সেন্ট জর্জ দ্বীপ স্পষ্ট দেখা যায়। সবচেয়ে বড় ক্যানালটাকে গ্র্যান্ড ক্যানাল বলা হয়।

গ্র্যান্ড ক্যানাল সমুদ্রে এসে মিশেছে। এখানটা খুব চওড়া, দূরে মার্বেল দিয়ে তৈরি সুন্দর গির্জা জলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। নাম মারিয়া দি লা সালুতে।

প্রায় সানমার্কো গির্জা ও কাম্পানিলের মাঝামাঝি ডোজদের প্রাসাদ, ডোজরা ভেনিসে রাজত্ব করতেন। কখনও কখনও তারা উত্তর ইতালি জয় করেছে এবং বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর প্রভুত্ব চালিয়েছে।

ডোজরা বড় একটা হলঘরের মাঝখানে বসে দেশ শাসন করত। যারা আইন লঙ্ঘন করেছে তাদের তারা শাস্তি দিত। বিচারের পর দুষ্কৃতকারীদের পাশের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হত। দুটো বাড়ির মাঝখানে একটা সেতু আছে জলপথের ওপরে। সেতুটির নাম ব্রিজ অব সাই। দণ্ডিত লোকেরা সেতুটির ওপর দিয়ে কারাগারে যাবার সময় বহির্জগতের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত, কেননা কবে যে কারাগার থেকে বেরোবে কে জানে।

ডোজদের বাড়ি এখন চিত্রশালা হয়েছে। পাশের প্রাসাদে এখন রয়্যাল দানিয়েলি হোটেল হয়েছে। ট্যুরিস্টদের রাজকীয় যত্নে থাকতে ও খেতে দেওয়া হয়।

জগদ্বিখ্যাত অনেক ইতালিয়ান চিত্রকরদের মাস্টারপিস আছে এই শহরের বিভিন্ন সংগ্রহশালায়।

ভেনিসের আরেক বৈশিষ্ট্য অতি পুরনো আমল থেকে কাচ ও কাচের যাবতীয় জিনিস, যেমন ঝাড়লণ্ঠন, আলোর ডোম, এখানকার শৌখিন জিনিসপত্র রাখবার নানা ধরনের আধার, প্লেট, বাটি ও গেলাস যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। খুব সুন্দর রং দিয়ে তৈরি হয়, অতি মনোরম দেখতে। সেই পুরনো কাচ প্রস্তুতকারকদের মধ্যে মুরানো আজও রয়েছে। এদের সুনাম খুব। মুরানোর কারখানা দেখতে গেলাম। আমার সামনে একটি কাচের কারুকার্য করা মালা তৈরি করে আমাকে উপহার দিল।

লর্ড বায়রন যে বাড়িতে থাকতেন সেটা দেখাল গন্ডোলাচালক। আমি খুব তারিফ করলাম। আমাদের দেশের কজন ঘোড়ার গাড়িচালক মাইকেলের নাম শুনেছে বা বিদ্যাসাগরের বাড়ি কোথায় জানে! ট্যুরিস্টদের কাছে বলা তো দূরের কথা।

ভেনিসে চারটি বড় চিত্রশালা, অনেকগুলি গির্জা ও দুটো প্যালেস দেখলাম। এই অদ্ভুত শহরটি দেখে খুব ভালো লাগল, আবার আসবার ইচ্ছা মনে পুষে রাখলাম।

ভেনিস ছেড়ে এবার পথ ধরলাম মিলানের।

প্রথম রাতে ভেরোনা শহরে থামলাম। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরনো শহর ঘরবাড়ি পথঘাট আরেককালের কথা বলে। পরদিন শহরটা ঘুরে দেখলাম।

ভেরোনা পার হয়ে পশ্চিমে এগোতে লাগলাম এবং কাছেই লাগো ডি গার্ডা পৌঁছলাম। বেশ বড় হ্রদ, বড় স্টিমারে যাত্রীদের নিয়ে একপ্রান্ত থেকে অন্য দিকে নিয়ে যায়। কাচের মতো পরিষ্কার জল। মাঝে একটা দ্বীপ আছে। এখানে কবি-সৈনিক দ্যানজিও থাকেন। কবি প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ট্রিয়েস্ত শহর দখল করেছিলেন।

মুসোলিনি তাঁকে পুরস্কারস্বরূপ দ্বীপটি দান করেন। দ্যানজিওকে দেখতে গেলাম। বাড়িঘর সব বন্ধ। চারদিকে কামান দিয়ে সাজানো, যেমন মিলিটারি হেড কোয়ার্টারে দেখা যায়। তিনদিন পর ব্রেসিয়া শহরে পৌঁছলাম। রাস্তা ভালো কিন্তু পাহাড়ের জন্য ওঠানামা করতে হচ্ছে। এদিকে দৃশ্য খুব সুন্দর। লম্বার্ডির একপ্রান্তে ব্রেসিয়া অন্যদিকে মিলান। পিছনে আল্পস মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

ব্রেসিয়া ছেড়ে পাঁচদিন পরে মিলান পৌঁছলাম। ইতালির অন্যতম বড় শহর বড় বড় কারখানা, বড় আকাশচুম্বী বাড়ি, রাস্তায় গাড়ির ভিড় দেখলে মনে হয় একটা ব্যস্তসমস্ত শহরে এসেছি।

ইতালির উত্তরাঞ্চলের লোকেদের মধ্যে অনেক ফ্লাকসে বা ফেয়ার হেয়ারের ছেলেমেয়ে দেখা যায়। সাধারণত লোকেরা খুব সুশ্রী। এখানে ফিয়াটের মস্ত কারখানা দেখতে গেলাম। স্বীকার করব যে ইতালিয়ানরা ছোট ছোট মেশিন ও নিত্যব্যবহারের জিনিসপত্র খুব নিখুঁতভাবে করতে পারে। ছোট গাড়ির মধ্যে ফিয়াট গাড়ির স্থান অনন্য। পৃথিবীর সর্বত্র তার চাহিদা বাড়ছে বই কমছে না।

মিলান শহর ইতালির মুক্তিযোদ্ধা মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির নামের সঙ্গে জড়িত।

সন্ধ্যাবেলায় সব অফিস কারখানা বন্ধ হল। স্ত্রী-পুরুষ ছুটেছে ট্রাম, বাস ও রেলওয়ে স্টেশনের দিকে।

মুসোলিনির আদেশে, মিলান রেলওয়ে স্টেশন ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। মার্বেল পাথরের বিরাট সৌধ দেখবার মতো। বড় রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকলাম। খুব ভালো খাবার পেলাম সস্তায়। খাবার পর আমি কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিচ্ছি এমন সময় একজন কালো শার্ট পরা লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি খাবার ঠিক পেয়েছি কি না, দাম দেবার পর রসিদ দিয়েছে কিনা ইত্যাদি। বুঝলাম, মুসোলিনির রাজত্বে নিয়মানুবর্তিতা শেখাবার খুব চেষ্টা হচ্ছে। এই সম্বন্ধে আমার মনে পড়ল, একটা গল্প শুনেছিলাম, এক ইংরেজ ভদ্রমহিলার হাতঘড়ি চুরি হয় হোটেল থেকে। কারও কাছে সদুত্তর না পেয়ে মহিলাটি একটি চিঠিতে ঘটনার বিবরণ দিয়ে মুসোলিনির কাছে সেই চিঠি পাঠালেন। পরদিনই

পুলিশের এক কর্তাব্যক্তি এসে হাজির । বলা বাহুল্য তিনদিনের মধ্যে ঘড়ি ফিরে পেলেন ইংরেজ ভদ্রমহিলা ।

মিলানের ৫০ মাইল দূরে লেক কোমো এবং কাছেই লেক মাজ্ঞিরে । অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য । লেকের সামনেই আল্পস ১২,০০০-১৫,০০০ ফুট উঁচু, আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে । বরফের ওপর দিয়ে রাস্তা এঁকেবেঁকে উঠেছে । কিছুটা বিপদের সম্ভাবনা আছে । পথ ছেড়ে পাহাড়ের নিচে সুড়ঙ্গপথে ওপারে সুইজারল্যান্ডে ব্রিগে পৌঁছলাম ।

১৩

রোন নদীর ধার দিয়ে রাস্তা নেমে গিয়েছে। আমার গন্তব্যস্থান জেনেভা। এদিকের দৃশ্য অপূর্ব। সামনে মঁ ব্লাঙ্ক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। নিচে পাহাড়ের গায়ে মন্ত্রো শহর। আরও কিছু এগোবার পর জেনেভা হ্রদের ধারে লসান শহরে পৌঁছলাম। লেকের ওপারে ফ্রান্স, দুটো ভিন্ন দেশ হলেও যাতায়াতের কোনও বাধা নেই। পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি কিছু নেই। ভদ্র দেশ, ভদ্র ব্যবহার পেলাম।

এখানে সবাই ফরাসি বলে। সুইজারল্যান্ডে ছেলেমেয়েদের ইংরিজি এবং আরও তিনটি ভাষা শিখতে হয়। উত্তরে জার্মান, জুরিখ শহরকে কেন্দ্র করে দক্ষিণে ইতালিয়ান এবং পশ্চিমে ফরাসি। প্রকৃতপক্ষে ওদের তিনটে মাতৃভাষা।

জেনেভাতে দ্রষ্টব্য অনেক জিনিস আছে, তার মধ্যে অন্যতম লিগ অব নেশন্সের বাড়ি। এখানেই রেডক্রসের আদি জন্মস্থান ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনেরও আস্তানা। এই শহরে ফরাসি কালচারের আধিপত্য বেশি। দৈনিক জীবনও ফরাসি ছাঁচের। ফুটপাথ জুড়ে আকাশের নিচে রেস্তোরাঁ সর্বত্র।

সুইজারল্যান্ডে যত শহর আছে তার মধ্যে জেনেভাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ট্যুরিস্টের ভিড়। সব রাস্তা হাজার হাজার ইলেক্ট্রিক আলো দিয়ে সাজানো। দিবারাত্রি যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। নানারকম ফুল দিয়ে সাজানো বাগান, কী সুন্দর ফুল দিয়ে একটি বারো ফুট ঘড়ি সাজিয়েছে। সেটি সময়ও দিচ্ছে ঠিক ঠিক।

জেনেভা শহর জগদ্বিখ্যাত ঘড়ির জন্য। সব নামকরা ঘড়ির জন্মস্থান এখানে। সব ট্যুরিস্ট ভালো ঘড়ি সস্তায় পাবে ভেবে ঘড়ি কেনে কত লক্ষ টাকার তার ইয়ত্তা নেই। সুইশ লোকেরা খুব সূক্ষ্ম কাজ ভালোভাবে করতে পারে। সুইশ ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, হোটেল-রক্ষকের জগৎজোড়া সুখ্যাতি। এই ছোট দেশটিতে সেরা গো-পালন এবং চাষবাস হয়। দেশের মাটির গুণ আছে সন্দেহ নেই।। চাষ করবার জন্য ধান ধুয়ে আকাশের দিকে বৃষ্টির আশায় এরা চেয়ে থাকে না আমার দেশের মতো, বরফে ছ মাস মাটি সরস রাখে, তারপর পাহাড়ের দেশে এখানে বৃষ্টি লেগেই আছে। তাছাড়া লোকেরা পরিশ্রমী এবং উন্নতিকামী।

এই দেশ ট্যুরিস্টদের স্বর্গ । উঁচু উঁচু পাহাড় জল গাছ মিলে সুন্দর দেখায়, চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তা, শহরেই হোক বা গ্রামাঞ্চলেই হোক । এই সুন্দর দেশে ছুটিতে দলে দলে ট্যুরিস্ট আসে । হোটেল ব্যবসা এত উন্নতমানের যে সব লোককে তৃপ্তি দিতে পারে । এটা এদের জাত-ব্যবসা বললে অত্যুক্তি হবে না । এদেশের সব ছেলেমেয়ে হোটেল শিক্ষানবিশি করে, তা তারা যত বড়লোকের ঘরের হোক না কেন ।

জেনেভা আসবার পথে বের্নিজ ওভারল্যান্ড আল্পসের বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়াগুলি আমাকে হাতছানি দিচ্ছিল । ইয়ংফ্রাউ, আইগার, ভেটারহর্ন ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে । ওই বরফের জগতে ঢুকতে খুব ইচ্ছা হয় কিন্তু মনে মনে ভয় আরোহণের পন্থা জানি না বলে ।

প্রথমে বার্নার ওভারল্যান্ডের দিকে রওনা হলাম । আমার গন্তব্যস্থান ওয়েটারহর্নের নিচে মাইরিনগেন গ্রাম । এখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল । একজন তরুণী, নাম হানি ইমার, লন্ডনে অ্যাডভান্স কোর্স ইন ইংলিশ ক্লাসে আমার সঙ্গে পড়ত । সেখানে অল্প আলাপ হয় । তার হঠাৎ দরকার পড়ল দেশে ফিরে যাবার, বাবার মৃত্যু-সংবাদে । হানির ভাই চার্লস এল লন্ডনে বেড়াতে, উদ্দেশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করবার । চার্লস লন্ডনে আমার ফ্ল্যাটে উঠেছিল, হ্যাম্পস্টেড হিথে, চার্লির স্বভাবটা ভালো । আমার কালো রং কাছ থেকে দেখে সে মুগ্ধ । সে সুইজারল্যান্ডে কান্টোনাল ব্যাঙ্কে চাকরি করে ।

চার্লি দেশে ফিরে আমার কথা তার বিধবা মার কাছে বলেছিল । চার্লি ও হানির অনুরোধে মিসেস ইমার আমাকে নেমন্তন্ন করেন, মাইরিনগেনে একবার বেড়াতে যাবার জন্য । ইমারদের পৈতৃক ব্যবসা হচ্ছে হোটেল চালানো । হোটেল বেয়ারের মালিক তিনি । মিসেস ইমার হোটেলের একাংশে থাকেন । আমাকে থাকবার জন্য তিনতলায় একটি ঘর দিলেন ।

এই অঞ্চলটাকে বার্নার ওভারল্যান্ড বলে । মাইরিনগেন গ্রামে শত শত ট্যুরিস্ট আসে রোন গ্লেসিয়ারের খুব কাছে বলে । তাছাড়া আরেস নদী পাহাড়ের বুক চিরে মাইরিনগেন গ্রামের ভেতর দিয়ে চলেছে । নদীর উৎপত্তি স্থান দেখবার সুবিধার জন্য পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা হয়েছে, এই নদী ইন্টারলাকেনে মিলেছে ।

আমি আগেই বলেছি হোটেল চালানো সুইশদের কাছে জাত-ব্যবসার মতো । পরদিন সকালে মুখ হাত ধুয়ে বাগানে একটু বেড়াতে গেলাম । হানি মস্ত ট্রে হাতে প্রাতরাশ নিয়ে উপস্থিত হল । ঠিক হল কেবল সুইশ ব্রেকফাস্ট খাব । সেইরকম রুটি, মাখন ও চেরি জ্যাম আর কোথাও খাইনি ।

আমার আর কোনও কাজ নেই । খাইদাই লোকজনদের দেখি, দলে দলে আসছে যাচ্ছে বাসে চড়ে । বিকালে টেনিস খেলতে গেলাম । অনেক যুবকের সঙ্গে আলাপ হল । দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, হানস হারি একজন চিত্রকর, অন্যজনটি রবার্ট ব্রুল, ছুরি, কাঁচি তৈরি করে খুব আধুনিক ধরনের । তার দেওয়া ছুরি আজও আমার কাছে রয়ে গেছে । এক ছুরিতে কাঁচি, বোতল খোলা, নরুন, সন্না, স্ক্রু-ড্রাইভার, করাত ইত্যাদিতে ভরা নানা কাজের জিনিস । যেমন দেখতে সুন্দর তেমনই কাজের অথচ ছোট্ট ।

হানি, চার্লি ও আমি প্রায়ই ওভারল্যান্ড পাহাড়ে উঠতাম । ওপর থেকে বরফ ঢাকা চুড়ো সুন্দর দেখায় ।

এই গ্রামে আরও তিনটি হোটেল আছে, তারা কিছুটা ছোট । সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ি লোকেরা বছরে একদিন সারারাত ধরে নাচ গান ও পান করে । এবার হোটেল বেয়ারে বাৎসরিক সম্মেলন হবে । সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া মিসেস ইমারের উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চয় । তিনি আমাকে ধরে নিয়ে মাতব্বরদের কাছে উপস্থিত করলেন । একজন জিজ্ঞাসা করল আমি yodelling করতে পারি কিনা । আমি বললাম, জানি না তবে শিখে নেব । আরেকজন বৃদ্ধ খুব খুশি মনে yodelling করে আমার হাত ধরে বলল, আমি তোমার হাতেখড়ি দিই । অন্যরা আমাকে পানীয় দিতে চাইল । আমি ধন্যবাদ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম । তারপর আরম্ভ হল, রাতভর নাচ, গান, yodelling । হানি ও তার দুজন বন্ধুর সঙ্গে নাচলাম । আজ পয়লা আগস্ট, সুইশদের জাতীয় দিবস । পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আগুন জ্বালানো এদের একটা প্রথা ।

মাইরিনগেন গ্রামে যে সব যুবকদের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, তারা আমাকে নেমন্তন্ন জানাল, সন্ধ্যারাত্রে আট মাইল দূরে ইন্টারলাকেন শহরে একটা গাড়িতে যাব । তারপর বাজি, খাওয়াদাওয়া, নাচগান ।

প্রায় লক্ষ টাকার বাজি পুড়ল । যখন শেষ হল তখন রাত আটটা । আমরা সাতজন একটা বড় টেবিল দখল করলাম, হানি, চার্লি, হানস, রবার্ট ও তাঁর স্ত্রী মারগ্রেট, আমি ও হানির ছোট ভাই, এরনেস্ট । ইন্টারলাকেনের সবচেয়ে বড় হলে নাচগানের ব্যবস্থা হয়েছিল । টাউন হলটা এত বড় যে অন্তত এক হাজার ছেলেমেয়ে নাচতে পারে ।

রবার্ট সবার জন্য স্যাম্পেন অর্ডার দিল এবং গ্লাস উঁচু করে বলল ভারত-সুইজারল্যান্ড মৈত্রী অক্ষয় হোক । বিরাট হলের দুই দিকে দুটো ব্যান্ড একসঙ্গে বেজে উঠল । হানি আমাকে বলল যে প্রথম নাচটা আমার সঙ্গে নাচবে । আমি তথাস্তু বলে উঠলাম । তখনও ভিড় হয়নি । সবাই স্ফূর্তি করতে ব্যস্ত । আমরা দুজন হলঘরের ভেতর এক রাউন্ড নেচে এলাম । তারপর মাঝামাঝি গিয়েছি, হঠাৎ একটা কাণ্ড হল ।

একজন ভদ্রলোক ভালো ইভনিং স্যুট পরা, হাতে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে হলে যেখানে সবাই নাচছিল সেখানে উপস্থিত। সেটা ইচ্ছাকৃত তা আমি লক্ষ করিনি। যখন হানির গায়ে ধাক্কা মারল, আমি ফরাসি ভাষায় মাপ করবেন বলে সরে গেলাম। ভদ্রলোক স্পষ্ট ইংরিজিতে বলল পার্ডন মি, মাই ফুট? আমাদের দুজনের মাঝখানে হানি দাঁড়িয়েছিল। সে যেই কিছু বলতে গিয়েছে তখনই লোকটি তার গায়ে থুতু ফেলবার চেষ্টা করল এবং বলতে লাগল তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। হানি অবাক। লজ্জার কোনও কাজ তো সে করেনি। আমি তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে নিলাম।

রাগে আমি ঝুঁকে পড়ে লোকটার শার্টের কলার ধরলাম এবং বললাম মাপ চাইতে হবে। হলের সমবেত জনমণ্ডলী কাণ্ডটা দেখে ভীষণ রেগে উঠেছিল, তারা এগিয়ে এল। ততক্ষণে আমার সঙ্গে রীতিমতো হাতাহাতি শুরু হয়েছে। অন্যরা দাঁড়িয়ে দেখছিল এবং আমাকে খুব উৎসাহ দিচ্ছিল। ওই অঞ্চলে ইমার পরিবার সুপরিচিত। হানির অপমানে সুইশরা অপমানিত এবং ইংরেজ পুঙ্গবকে শিক্ষা দিতে সবাই ইচ্ছুক।

ছেলেবেলায় বলাই চ্যাটার্জির সঙ্গে বক্সিং শিখেছিলাম। তখন আমি এত উত্তেজিত যে আমরা দুজন তেড়ে যাচ্ছি পরস্পরের প্রতি কিন্তু ফসকে গিয়ে দুজনেই কাঠের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছি। লজ্জা করছিল এমন অবস্থায়, তখন ঠিক করলাম পাউডার দেওয়া কাঠের জমির ওপর দিয়ে আমি তেড়ে যাব না বরং লোকটিকে দিলাম আমাকে আক্রমণ করতে। যেই কাছে এসেছে আমি প্রচণ্ড জোরে মুখে ঘুসি মারলাম। দেখি লোকটি কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ল, আমার হাতে তার দুটো দাঁত লেগে রয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে সমবেত লোকেরা আমাকে ঘিরে ফেলে অভিনন্দন জানাল ফরাসি প্রথায়। একজন সুইশ তরুণীকে অপমান করার শোধ নিতে পেরেছি সেজন্য সবাই করমর্দন করতে চায়। ওদিকে যে ধরাশায়ী হল সে মাটি থেকে উঠল না। তার মাথার নিচে রক্ত দেখে দু-চারজন লোক সাহায্য করতে গেল কিন্তু সে জ্ঞানশূন্য। স্ট্রেচার এল, তার ওপর শুইয়ে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছায় দুপা এগিয়েছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক নিজেকে প্রিফেকট অব পোলিস অর্থাৎ পুলিশের বড়কর্তা বলে পরিচয় দিলেন এবং আমার দিকে এগিয়ে বললেন যে তিনি নিজে সমস্ত ঘটনাটা দেখেছেন এবং আমার কোনও দোষ নেই সে বিষয় তিনি নিঃসন্দেহ। কিন্তু সুইশ আইন অনুসারে বললেন, যদি লোকটির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান না হয় তো আমার বিরুদ্ধে মানুষ খুনের চার্জ হবে।

আবার আমাকে ঘিরে ভিড় জমে গেল, এ কীরকম উল্টো বিচার! সমবেত লোকদের মধ্যে থেকে একজন মাঝবয়সী ইংরেজ এগিয়ে এসে তাঁর কার্ডখানা অফিসারের সামনে

ধরলেন। নাম ডি ম্যাকেঞ্জি এম পি, তিনি আইনজ্ঞ। যেহেতু আমি ভারতীয় আমার প্রতি তাঁর একটা কর্তব্য আছে বলে মনে করেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন যে তিনি তাঁর জায়গায় বসে সব ঘটনাটা দেখেছেন এবং তিনি নিশ্চিত বলতে পারেন যে আমার কোনও দোষ নেই।

মিঃ ম্যাকেঞ্জি আমাকে অনুরোধ করলেন যেন অন্তত তিনদিনের মধ্যে সুইজারল্যান্ড ছেড়ে অন্য দেশে চলে না যাই। আমি কথা দিলাম ও পাসপোর্ট জমা রাখতে প্রিফেকটের কাছে রাজি হলাম। সেসব দরকার হল না যখন চার্লি এগিয়ে এসে বলল যে আমি তাদের অতিথি এবং সুইজারল্যান্ড ছেড়ে এখনই কোথাও যাব না। চার্লি আমার জামিন।

মিস্টার ম্যাকেঞ্জি একজন ব্রিটিশ মেম্বার অব পার্লামেন্ট বলে তার খাতির খুব, সবাই সমীহ করে কথা বলতে আরম্ভ করল। প্রিফেকট অব পুলিশ আমার করমর্দন করে বললেন, তুমি দেশের মধ্যে যেখানে খুশি যেতে পার। তোমার কোনও দোষ নেই জানি। তুমি প্রার্থনা কর যেন লোকটির তিনদিনের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসে।

অ্যাম্বুলেন্সের দিকে স্ট্রেচারটা এগিয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলাম যে লোকটার দুটো সামনের দাঁত ভেঙে গিয়েছে এবং মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ছে অঝোরে যে জন্য মনে হচ্ছিল মাথা ফেটেছে। আমার একবার মনে হল যেন চোখ চেয়ে আমাকে কিছু বলতে চায়। সে সুযোগ হল না। স্ট্রেচারে নিস্পন্দ লোকটা সামনে দিয়ে চলে গেল।

মিঃ ম্যাকেঞ্জি আমাকে বললেন তিনি গ্র্যান্ড হোটেলে থাকেন এবং সবসময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ড্রিঙ্ক করবার নেমন্তন্ন করলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার সঙ্গে লোকটির কোথাও আলাপ হয়েছিল কি? অপমান করবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম কারণ, একজন ইংরেজ হয়ে লোকটি দেখতে প্রস্তুত ছিল না যে আমার মতো একজন কালা আদমির সঙ্গে সুইশ শ্বেতাঙ্গিনী তরুণী নাচছে।

মিঃ ম্যাকেঞ্জি আরেকবার করমর্দন করে বললেন, লোকেদের এমন সঙ্কীর্ণ মন!

আমি আমার বন্ধুদের দলে যোগ দিলাম। কত লোক আমাকে ড্রিঙ্ক এগিয়ে দিতে এল তার ঠিক নেই, এমন সময় দুটো ব্যান্ড বেজে উঠল, সুর ধরল হি ইজ এ জলি গুড ফেলো এবং সবাই দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে গ্লাস তুলে অভিনন্দন করল। আমিও স্বীকার করলাম। সে কী হৈ হৈ চিৎকার এবং উল্লাস যে একজন সুইশ মহিলার অপমানের যথেষ্ট শোধ নেওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সের মতো সুইজারল্যান্ডেও colour preudjice নেই। তারা পৃথিবীসুদ্ধ লোককে খাতির দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে। হানির মুখে একটা ব্যথিত দৃষ্টি। আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং চারটের সময় বাড়ি ফিরে শুতে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম কী

চমৎকারভাবে সুইশ জাতীয় দিবস আমার কাটল । আরেকটা কথা মনে পড়ল, এ পৃথিবীতে সব দেশে ভালোমন্দ লোক পাশাপাশি রয়েছে । একজন ইংরেজ মারামারি করল আরেকজন ইংরেজ নিজে জামিন দিতে এগিয়ে এল ।

কথা ছিল নটার সময় একসঙ্গে সবাই প্রাতরাশ খাব । সকালে বুঝলাম খবর কাগজের রিপোর্টাররা ছেঁকে ধরবে । আমি বন্ধুদের বললাম, চল আমরা পর্বতারোহণে বেরিয়ে পড়ি কয়েকদিনের জন্য, মেয়েরা কেউ গেল না । শেষপর্যন্ত আমরা দলে তিনজন রইলাম । চার্লি, হানস ও আমি । চার্লির মা গত রাত্রির ব্যাপারটা শুনলেন এবং আমাকে সমর্থন জানালেন । তিনি আমাকে বললেন, তাঁর স্বামী আমার মতো দেখতে ছিলেন । তাঁর অনেক পর্বতারোহণের কাপড়চোপড় ও লোহার জুতো ক্লেতারণ শ্যু অর্থাৎ পাহাড়ে চড়বার জুতো ও বাকি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস আছে যা আমি আরোহণে ব্যবহার করতে পারি ।

তখনই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল । বেলা দুটোর সময় আমরা রওনা হলাম । আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চারে হাত দিলাম । কোনও অভিজ্ঞতা নেই । শুধু এইটুকু বিশ্বাস ছিল যে অন্য দুজন যুবক যা করতে পারবে, আমিও তা পারব । রুকস্যাক ছাড়া আমার আর কোনও জিনিস নিজস্ব ছিল না । বাকি সব চার্লির বাবার । ট্রাউজারটা একটু ছোট হচ্ছিল । মনে মনে ভয় যে ট্রাউজারটা সম্পূর্ণ দুভাগ না হয়ে যায় । যতবার খুব উঁচুতে পা দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছি ততবার ভয় হচ্ছিল এবার গেল বুঝি । লাউতার ব্রুনেন সন্ধ্যার পর পৌঁছলাম ।

একটা হোটেলে উঠলাম । এইসব শহর থেকে দূরে হোটেলে সমস্ত খাবার জিনিস জোগাড় করা কষ্টসাধ্য তাই আমি প্রথমেই হোটেল মালিককে বললাম যে আমাদের বেশি দামের ঘর দিও না । মালিক তখনই ছুটে ঘরের ভেতর গেল এবং তরুণী ভার্যাকে নিয়ে উপস্থিত হল । আমি যা বলি তাইতেই রাজি, তাছাড়া দুজনের মুখে কেবলই হাসি, হাসি চাপতে পারছে না মনে হল । আমাদের আসলে হোটেলের সবচেয়ে বড় এবং ভালো ঘরটা যার নাম পিঙ্করুম কিংবা হনিমুন স্যুইটটা দিল । খুব আপত্তি জানালাম । মালিক হাসিমুখে বলল সব ঠিক আছে । ও নিয়ে ভাবতে হবে না ।

আমরা খুব আরামে স্নান করে বারান্দায় এসে বসলাম । যখন চার্লি বলল যে তার পেটে খিল ধরেছে । হানস বলল যে তাহলে তার কালই সকালে বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত । ওঠবার সময় পেটে খিল ধরে এবং সেটা আস্তে আস্তে কমে যায় যদি তখনই ওঠার কাজ আর না করে । কিন্তু কাল থেকে ওঠানামা এবং বিশেষ করে ওঠার কাজ অনেক বেশি হবে । পথে কোথাও থাকবার জায়গা নেই । তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক হল যে চার্লি ফিরে যাবে এবং আমরা দুজনে এগিয়ে যাব ।

হানস হারি একজন পাকা পর্বত আরোহক। চার্লি পাহাড়ের দেশে থাকে বটে কিন্তু কঠিন পর্বতারোহণ কখনও চেষ্টা করেনি। অথচ আমি চার্লির ভরসাতে ওয়েটার হর্ন চড়বার সাহস পেয়েছিলাম।

একটু পরে মালিক ও তার স্ত্রী আমাদের জন্য ড্রিঙ্কস দেবার হুকুম দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, রাত্রে আমরা কী খেতে চাই। আমি বললাম, খুব সাদাসিধে কম খরচায় ডিস অর্ডার দেব। হানস আমার কথার পুনরাবৃত্তি করল। কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে মালিকানি জিজ্ঞেস করলেন আমি শুয়োর খাই কিনা, হ্যাঁ বলাতে চলে গেলেন। পরদিন প্রাতরাশ খেয়ে চার্লি বাড়ি ফিরে যাবে আর আমাদের কঠিন পরীক্ষা আরম্ভ হবে।

রাত্রে খাবার টেবিলে গিয়ে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। এত সাজিয়েছে এবং চারদিকে আলো দিয়েছে দেখে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। কোথাও সাদাসিধে আড়ম্বরহীন রোস্ট পর্ক ও আলু চাইলাম, আর পেলাম সম্পূর্ণ অন্য জিনিস, ভিয়েনিজ স্নিৎশেল, আলুভাজা, রোস্টেড টম্যাটো, ক্রিম পুডিং ইত্যাদি। আমরা না চাইলেও নেপোলিয়ান ব্র্যান্ডি গ্লাসে ঢেলে দিল। ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছি না। চার্লিকে জিজ্ঞাসা করলাম তাদের দেশে হোটেলগুলো সব চলে কি এমনই ভাবে? বিল বাড়িয়েই চলেছে। আমরা দেখলাম যে হোটেলের মালিকদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছি না। যাহোক চর্বচোষ্য ভোজন ও পান করে, আমরা ধন্যবাদ জানালাম যে খাবার খুব স্বাদের হয়েছে।

সকাল হতেই দেখি চার্লি বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তৈরি। হানস ও আমিও রওনা হব ওপরে বরফের দেশের দিকে। আমাদের জন্য দুটো রোস্ট চিকেন তৈরি করে হোটেল মালিকের স্ত্রী আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যখন বিল চাইলাম। তখন দুজনে একগাল হেসে বলল, নো বিল, আমরা নাকি অতিথি হিসাবে ছিলাম। দুরাত আগে ইন্টারলাকেনে কুরশালে সমস্ত ব্যাপারটা ওরা দেখেছিল। এবং সুইশ মহিলার সম্মান আমি রক্ষা করতে পেরেছি বলে তারা আমার জন্য খুব গর্ববোধ করেছিল। মহিলাটি এগিয়ে এসে আমায় করমর্দন করল এবং সেইসঙ্গে হাতে স্তূপাকার খাবার ধরিয়ে দিল।

আমরা এতক্ষণে হেঁয়ালিটা বুঝলাম। হোটেলের মালিক ও তার স্ত্রীর ব্যবহারে আমরা অভিভূত। চার্লসকে ওরা চুপি চপি সব কথা বলেছিল। আমরা বিদায় নিয়ে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চড়াই উঠতে আরম্ভ করলাম।

দুঘণ্টা চড়াই উতরাই করবার পর আমরা গ্লেসিয়ারের সামনে পড়লাম। আমি গ্লেসিয়ারের ওপর কখনও আগে চলিনি। পা দেওয়া মাত্র আছাড় খেলাম। তখন হানস বলল, তোমার হয়তো গ্লেসিয়ারের ওপর চলার অভিজ্ঞতা নেই। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

পিক অ্যাক্সটা ঘুরিয়ে গ্লেসিয়ারের এক চাকলা বরফ উঠিয়ে দিল । তারপর সেই আঁচড় করা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আবার এক টুকরো বরফ উঠিয়ে ফেলল । এমন করে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল । এবং যতক্ষণ পারলাম বরফ কেটে কেটে গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলাম ।

আমাদের দেশে গ্লেসিয়ার দেখা যায় অনেক উঁচুতে ১২,০০০-২০,০০০ ফুট ওপরে, সুইজারল্যান্ডে গ্লেসিয়ার পেলাম সী লেভেলে অর্থাৎ সমুদ্রের সঙ্গে সমতল জমিতে ।

যখন মাউন্টেনিয়ারিংয়ের কথা প্রথম হল, আমি খুব উৎসাহ দেখিয়ে ছিলাম । তখন আমাকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল কত উঁচুতে উঠেছি । আমি বললাম ১০,০০০ ফুট । টাইগার হিল পর্যন্ত যে গাড়িতে উঠেছি সে কথা ঊহ্য রয়ে গেল । ইউরোপের সব শৃঙ্গ ১২,০০০-১৬,০০০ ফুটের মধ্যে, তার মধ্যে পর্বতারোহণের সব উদ্দীপনা, উৎসাহ, দুরূহতা- সবই টের পাওয়া যায় ।

আমি তখনও ভাবছি যে আমি সবরকম বিপদের সম্মুখীন হতে পারব আরোহণ করবার সময় । বাস্তবিক পক্ষে আমার কোনও ধারণা ছিল না যে কঠিন পর্বতে আরোহণ করতে হলে কী কী বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হতে হয় । হানস হারি ছেলে বয়স থেকে একটা বরফঢাকা শৃঙ্গ থেকে আরেকটায় আরোহণ করেছে । হানস ছাগলের মতো নিশ্চিত পদক্ষেপে উঁচু পাহাড়ে যেখানে কোনও পথ নেই তাতে চলে বেড়াতে পারে । হানসের বিপদের কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই । হয় পাথরের ওপর নয়তো বরফের ওপর চলতে হবে, দুটোতে সে সিদ্ধহস্ত ।

আমি চলেছি কোনও মতে । প্রাণপণ চেষ্টা করছি হানস না ধরে ফেলে যে আমি আনাড়ির মতো টলমল করতে করতে চলেছি । আমার সব কাজই গায়ের জোরে সারছিলাম । সী লেভেল থেকে ১০,০০০ ফুট উঁচুতে উঠেছি । আমাদের লক্ষ্য ছিল হাট বা কুটির । সেটা একটা পাহাড়ের মাথার ওপরে অবস্থিত । সন্ধ্যার দিকে মনে হচ্ছিল বাতাসে যেন অক্সিজেনের অভাব । খানিকক্ষণ ছোট সিঁড়িতে চুপচাপ বসে অস্তগামী সূর্য দেখলাম । বরফের ওপর লাল ও হলদে রঙের খেলা মনের ওপর দাগ কেটেছিল ।

কুটির সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার । পর্বতারোহণে যাতে অনেক লোক উৎসাহী বোধ করে, সেজন্য একটা বেসক্যাম্প ১০,০০০ ফুট উঁচুতে তৈরি করার কল্পনা হয় । সেটাতে বাস্তবিক রূপ দিতে তিলে তিলে কাঠকুটো নিয়ে কাঠবেড়ালির মতো আরোহীরা দশ হাজার ফুট উঁচুতে একটা কুটিরের বুনিয়াদ তৈরির মালমশলা জড়ো করেছিল । তারপর একদল উৎসাহী তরুণ-তরুণী একটা ঘর তৈরি করে । ঘরটা লম্বা ধরনের একফালি । আসবাবের মধ্যে কয়েক আঁটি পুরু খড় বিছানো রয়েছে । ঘরের দুধারে লম্বা সেলফ

লাগানো যাতে ভবিষ্যতের আরোহীরা তাদের উদ্বৃত্ত খাবারদাবার জিনিসপত্র সাজিয়ে রেখে যেতে পারে, যাতে তারও পরের আরোহীরা দরকার পড়লে সেসব ব্যবহার করতে পারে। কুটির বলতে এইরকম একটা নিঃস্বার্থভাবে গড়ে তোলা আশ্রয় সব পর্বতারোহীদের জন্য।

আমাদের সঙ্গে টিনের খাবার যথেষ্ট ছিল। কিছু রেখে যাব স্থির করলাম। একটা স্টোভ আছে বরফ গলিয়ে চা স্যুপ ইত্যাদি করবার জন্য।

ঘরের এক পাশে একটা বড় খাতা ছিল যেখানে সব আরোহীদের নাম ঠিকানার পর সই করতে হল এবং সেইসঙ্গে লিখতে হল কোথা থেকে আসা এবং গন্তব্য কোথায়। এই পথে ফিরলে নামের পাশে পাহাড়ের শৃঙ্গের নাম ও উচ্চতা এবং আরোহণ করার তারিখ ও মন্তব্য লিখতে হয়। আমি যদি ভেতার হর্নে উঠতে সক্ষম হই তো এই খাতায় রেকর্ড থাকবে।

সবাই যে এই পথে ফিরবে তার কোনও স্থিরতা নেই। অনেক বিপদ বা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কিছু আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। একজন ইংরেজ কুটির পর্যন্ত ওঠার পর শ্বাসকষ্টে দেহরক্ষা করেছে।

হোটেল থেকে খাবার অনেক দিয়েছিল, সন্ধ্যার মধ্যে খেয়ে শুতে গেলাম। ধড়াচূড়া জুতো সবই পরে খড়ের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। হানস হারি রাত দুটোর সময় ঘুম ভাঙিয়ে দিল। বলল, এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। পাহাড়ে উঁচু জায়গায় অনেক আগে দিনের আলো দেখতে পাওয়া যায়। তিনটেয় রওনা দিলাম।

দি হাট বা কুটির থেকে বেরিয়ে মচমচে বরফের ওপর পা ফেললাম। হানস বলল, আজ খুব সম্ভবত ভালো দিন পাব। আমার বুট জুতোর ওপর ক্লেতারণ শ্যু অর্থাৎ আরোহণ করবার লোহার জুতো- চারদিকে লোহার খোঁচা খোঁচা কাঁটা বা স্পাইক দেওয়া- পরে নিলাম। পায়ের নিচে এবং পাশে বড় বড় লোহার কাঁটা বরফের ওপর চলতে সাহায্য করে। একেই তো লোহার জুতো ভারি তার সঙ্গে ডেলা বরফ জমে আরও ভারি করেছিল। পা দুটো যেন জগদ্দল পাথর।

এখনও সূর্যের আলো দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সাদা বরফের জন্য সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। অনেক গর্তের ওপর বরফ পড়ে আস্তরণের মতো ঢেকে রাখে। ভুলে তার ওপর পা পড়লে গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। অনেক গর্ত খুব গভীর। তাদের ওপর পিক অ্যাক্স দিয়ে ঠুকে ঠুকে এগোতে হয়। গর্তের মধ্যে পড়লে মৃত্যুর সম্ভাবনা।

হানস আমার কোমরে শক্ত করে দড়ি বাঁধল, চল্লিশ হাতের মতো ব্যবধানে দড়ির অন্য অংশ নিজের কোমরে বাঁধল। একজনের পা ফসকে গেলে অন্যজন কী করবে তৎক্ষণাৎ তাও দেখিয়ে দিল। দড়িতে হঠাৎ টান পড়লেই বরফের ওপর পিক অ্যাক্সটা গেঁথে দড়ি

জড়াতে আরম্ভ করতে হবে । এই রকম করে খুব সহজেই যে লোক পড়ে যাচ্ছে তাকে ধরে ফেলা যায় । দল যদি বড় হয় তো প্রত্যেকের কোমরে দড়ি বাঁধতে হয় ।

পর্বতারোহণ এক বিপজ্জনক স্পোর্টস । পর্বতারোহণ স্কুলে বা ক্লাবে প্রশিক্ষণ নিতে হয়, বিপদ থেকে কেমন করে নিজেকে বাঁচাতে হয় এবং সঙ্গীদের রক্ষা করতে হয় । আরোহণ নানা প্রকারের হলেও মোটামুটি দুই রকম বলা যেতে পারে, পাথরে চড়া ও পিচ্ছিল বরফের ওপর চড়া ।

সামনে দূর বিস্তৃত বরফের স্তূপ । ধীর সুনিশ্চিত পদক্ষেপে এগোতে লাগলাম । কতবার নামলাম ও উঠলাম তার ইয়ত্তা নেই ।

হানস বলল যে এই পাহাড়টা পাশের পাহাড়ের গায়ে যদি যুক্ত হয় বরফের ব্রিজ দিয়ে,তাহলে আমরা তিন মাইল হাঁটা থেকে বেঁচে যাব এবং ভেতার হর্ন সোজা হবে ।

বরফের ব্রিজ কী তা না জেনে আমি বললাম, এস চেষ্টা করা যাক ।

অল্পক্ষণের মধ্যে বরফের ব্রিজের সামনে উপস্থিত হলাম । একে বরফের ব্রিজ না বলে মরবার ফাঁদ বললে ভালো হয় । দুই পাহাড় থেকে বরফের আইসিকল একদিকের সঙ্গে অন্যদিকের হাত মিলিয়েছে । ফলে একটা সরু বরফের সংযোগ হয়েছে- তারই নাম ব্রিজ ।

যখন হানস বলল, এস আমরা ওপারে যাই বলে সন্তর্পণে ব্রিজের ওপর দিয়ে চলতে আরম্ভ করল, আমাকে বলল পিক অ্যাক্স গেঁথে দড়িটা শক্ত করে জড়িয়ে দেহের চাপ দিয়ে পিক অ্যাক্স ধরে থাকতে হবে ।

বরফের ব্রিজের মুখের কাছে এসে আমি পিক অ্যাক্স গেঁথে বসলাম ।

হানস হারি চলতে আরম্ভ করল । বরফের সরু একফালি ব্রিজের থেকে জমি ৫,০০০-৬,০০০ ফুট নিচে । পা ফসকালে কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না ।

নিচের দৃশ্য দেখে আমার মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম । এবার আমার পালা ওপারে যেতে হবে । কিন্তু রীতিমতো দ্বিধা ও চিন্তা এসেছে, ভাববার জন্য বুট জুতোর ফিতা খুললাম, বাঁধলাম বারবার । কী চিন্তা তখন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল সেই কথা লিখছি । অ্যাডভেঞ্চার করতে এসে যখন জীবনমরণ সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছি । কত আর জুতোর ফিতে বাঁধি! মনে মনে ঠিক করলাম ওপারে যেতেই হবে । হানস কী ভাবছে? হিমালয়ের হিরো এখন আল্পসের হিরোর কাছে হারতে বসেছে । মনে মনে ঠিক করলাম যে বরফের ব্রিজের ওপর দিয়ে যাবার সময় কোনও দিকে চাইব না পথটুকু ছাড়া, অথচ পথের দিকে চাইলেই তো যত গোলমাল! নিচের গ্রামটার আবছা ছবি তখনই হাতছানি দেবে ।

মনস্থির করে প্রথম পদক্ষেপ ফেললাম বরফের ব্রিজের ওপর । হঠাৎ পাহাড়ের মেঘ নিচু থেকে ওপরে উঠে আমাকে ঘিরে ফেলল । হানসকে দেখতে পেলাম না । ব্রিজের নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে না । আমি আর এদিক ওদিক না চেয়ে সোজা দৃঢ় পদক্ষেপে ব্রিজের অন্য দিকে যেখানে হানস অপেক্ষা করছিল তার সামনে উপস্থিত হলাম । মনের গভীরে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম, সেদিন পাহাড়ে মেঘ ঠিক সময়ে উপস্থিত না হলে কী করতাম ভেবে পেলাম না । হয়তো পার হয়ে যেতাম, সেই সম্ভাবনাই বেশি ছিল । ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার সঙ্গে নাড়ির যোগ রয়েছে হানসের দড়ি দিয়ে । সে পিক অ্যাক্সে দড়ি পাকিয়ে চেপে ধরে বসে আছে যদি আমি পা ফসকাই ।

চড়াই-উতরাই করতে করতে আমরা ভেতার হর্ন শৃঙ্গের পাদদেশে পৌঁছেছি । এক হাজার ফুট বরফের উঁচু থাম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে । হানস একটা প্ল্যান করে ফেলল । সে এগিয়ে যাবে আমি দড়ি ধরে বসে থাকব । তারপর আমার পালা । এই রকমভাবে ৪০ ফুট একেক বারে এগোতে লাগলাম ।

কী ভীষণ রকম পিছল পাহাড়ের চিরতুষারাবৃত গা । প্রত্যেক পদক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছিল, বুট জুতোর মাথায় দুটো কাঁটা দিয়ে বরফের গায়ে ঠুকরে এবং সেইসঙ্গে পিক অ্যাক্স দিয়ে ওপরে একটা গর্তে শক্ত করে ধরে নিজেকে টেনে তুলে । ৪০ ফুট ওঠবার পর বিশ্রাম এবং অন্য আরোহীর জন্য পিক অ্যাক্স গেঁথে বসে থাকা । এই এক হাজার ফুট বরফের থামকে বিপজ্জনক বলা হয় । তার মানে আরোহী বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং খুব সাবধানে এগোবে । থামের অন্য দিকে পা ফসকালে ৮,০০০-১০,০০০ ফুট নিচে পতন । আজ কিছু আগে ভাবছিলাম বরফের ব্রিজ পার হব । এখন দেখছি বরফের থামের গা বেয়ে ওঠা তার চেয়ে অনেক কঠিন । ভয় ও বিপদের আশঙ্কা আপেক্ষিক মনে হয় । কাল যা অসম্ভব আমার মনে হয়েছিল, আজ তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ করতে পারছি ।

দুজনে প্রাণপণে চেষ্টা করে ভেতার হর্ন চূড়ায় উঠলাম । ১৪,০০০ ফুট উঁচু, কী অপূর্ব দৃশ্য । দুজনে দুজনের করমর্দন করলাম । আমি হানসের একটা ছবি তুললাম । হানস আমার একটি ছবি তুলল, শৃঙ্গের ওপর বিজয়ী বীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি । অন্যান্য শৃঙ্গের ও পর্বতমালার ছবিও তুললাম । যেদিকে চাই দূর, বহুদূর দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল । এদিকে ফ্রান্স, অন্যদিকে জার্মানি । দক্ষিণে ইতালি ছবির মতো ভাসছে । বেশিক্ষণ যে বসে বসে সৌন্দর্য উপভোগ করব সে উপায় নেই, কনকনে ঠান্ডা হাওয়া অস্বস্তির সৃষ্টি করছিল ।

এবার নামবার পালা । আমি প্রথম বরফে পা দিয়ে খোঁচা মেরে এক ধাপ নামলাম হানস পিক অ্যাক্স চেপে বসে রইল । এমনিভাবে দুজনে পালা করে খুব সাবধানে নামতে

নামতে ভেতার হর্ন শৃঙ্গের পাদদেশে এসে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম ।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দুকাপ কফি ও সেদ্ধ ডিম খেলাম । তারপর দুজনে পরামর্শ করলাম যে আরও দুটো শৃঙ্গ চড়তে হবে । রোদ উঠে গেছে । অল্পদূর নামবার পর পায়ের নিচে বরফ তখন আইসক্রিমের মতো নরম হয়ে গেছে । হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছিল বরফের মধ্যে । এ আরেক মুশকিল । অনেক চেষ্টার ফলে অল্প অগ্রগতি হচ্ছিল । আইসক্রিমের ওপর বসা যায় না । বিশ্রামের কোনও প্রশ্নই নেই । বিকালের দিকে পাহাড়ের আড়ালে বরফ শক্ত হয়ে গিয়েছিল । আমরা তার ওপর অপেক্ষাকৃত অনায়াসে চলতে লাগলাম । ক্রমে ক্রমে অন্ধকার নেমে এল । কাছেই একটা গুহা দেখে হানস বলল, আমরা গুহাতে রাত কাটাব । তথাস্তু বলে আমি হ্যাভারস্যাক নামালাম ।

কাল রাত তিনটে থেকে বেশিরভাগ সময় এই ভারি বোঝাটা সারাদিন বয়েছি । ক্লান্তি লাগছিল । গুহার ভেতর ঢুকলাম । বরফ পড়ে যদি গুহার মুখ বন্ধ না হয়ে যায় তো রাত্রিযাপন বেশ চলবে । গুহাটা পাহাড়ের গায়ে অল্প ঢালু । মাঝে মাঝে মেঘ ডাকার মতো শব্দ হচ্ছে, তখন বরফের অ্যাভালাঞ্চ দেখি দূরে দূরে ।

হানস তার ঝুলি থেকে একটা ছোট ফ্লাক্স বের করে বলল এই নাও, এস এবার আমরা আনন্দ করি । ব্র্যান্ডি একটু খেলাম । শরীরটা গরম লাগল । হানস বলল, এবার তুমি একজন মাউন্টেনিয়ার বলে স্বীকৃত হলে । পরের যে দুটো শৃঙ্গ আরোহণ করব, সেগুলোয় পাথরের গায়ে বরফ জড়িয়ে নেই । সাবধান হলে পড়বার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম ।

দেখতে দেখতে সামনের পাহাড়টার আড়ালে দিনের আলো নিভে এল । রোস্ট মুরগি, রুটি, মাখন ও আলুসেদ্ধ পেট ভরে খেলাম । বরফ গলিয়ে জল গরম করলাম এবং দুজনে দুকাপ কোকো খেলাম অনেকগুলো চিনির ডেলা দিয়ে ।

আমার মতো পেটুক ছেলের সেদিন খাবারের কোনও লোভ ছিল না । কেবলই উপভোগ করছিলাম শৃঙ্গে উঠতে পারার উচ্ছ্বাস ও আনন্দ, আমার জীবন যেন সার্থক হয়েছে । আর কখনও এই কথাটি মনে হয়নি আজ সকালে শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে যেমন বারবার মনে হচ্ছিল যে ওই দূরে পৃথিবী পায়ের নিচে দুঃখ কষ্ট আনন্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে । আজ আমি আকাশের অনেক কাছে পৌঁছেছি । আমাদের মধ্যে শ্বেতশুভ্র ও পবিত্র বরফের ব্যবধান ।

এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসছিল না । দুজনে গল্প করছিলাম যতক্ষণ না চাঁদের আলো আবার আলোকিত করল । আলোর এত জোর যে ভুল হয় দিনের আলো বুঝি । চারদিক নিস্তব্ধ । মাঝে মাঝে দূর আকাশে গুড়গুড় শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে যে অ্যাভালাঞ্চ হচ্ছে । রাত্রে

অ্যাভালাঞ্চ হয় যদি খুব বেশি বরফ পড়ে এবং পাহাড়ের জায়গা বিশেষে যদি এক জায়গায় খুব বেশি বরফ জমে যায় । দিনেরবেলায় হয় অন্য কারণে । কড়া রোদ্দুর হলে বরফের চাঁই সরতে আরম্ভ করে এবং স্থানচ্যুত হওয়া খুব স্বাভাবিক । অ্যাভালাঞ্চের সময় এত শব্দ করে বরফ গুঁড়িয়ে পড়ে যে মনে হয় বজ্রপাত হচ্ছে বুঝি । অ্যাভালাঞ্চে যদি মানুষ পড়ে তো মৃত্যু অনিবার্য ।

এইসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি এই প্রার্থনা করে যে আমাদের গুহার মুখে বড় রকমের অ্যাভালাঞ্চ যেন না হয় ।

রাত আড়াইটার সময় ঘুম ভেঙে গেল । তখনও স্ফূর্তি স্ফূর্তি ভাব, কারণ পর্বতারোহণের এক কঠিন অধ্যায় প্রথমেই সাফল্যের সঙ্গে পার হয়েছি । হানস সারা জীবন চেষ্টা করেও আগে ভেতার হর্ন উঠতে সক্ষম হয়নি নানা কারণে । পরের দুটি শৃঙ্গ চড়েছে । তার অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক । বরফের ওপর দিয়ে আমি চলেছি এই প্রথমবার ।

ভোর রাত তিনটেয় রওনা হলাম । ধীরে ধীরে উঠছি । বরফ পার হয়ে পাথরের ওপর দিয়ে চলছি । স্রেক হর্নের শৃঙ্গে উঠলাম (১৩,০০০ ফুট), বেলা নটার সময় নেমেই বিশ্রাম না করে অ্যাঙ্গেল হর্নে উঠতে চললাম । স্রেক হর্নের শৃঙ্গে কখন উঠলাম টের পাইনি, অ্যাঙ্গেল হর্ন তেমন নয় । পাথরের থাম পাহাড়ের গা থেকে সোজা উঠে গিয়েছে ।

দুজনের গাঁটছড়া ভালো করে বেঁধে এক পা, এক পা করে এগোচ্ছি । বেলা বারোটার সময় অ্যাঙ্গেল হর্নের (১২,০০০ ফুট) শৃঙ্গে উঠলাম । বেশি সময় নষ্ট না করে আমরা নামতে শুরু করলাম বার্নার ওভারল্যান্ডের দিকে । ৪,০০০ ফুট নামবার পর পাহাড়ে সরু পথ পেলাম ।

আমি সাহস করে কালো ঠুলির চশমা সব সময় ব্যবহার করিনি যার ফলে আমার দৃষ্টিশক্তিতে গোলমাল দেখা দিল । খুব তাড়াতাড়ি করে দুজনে মাইরিনগেনের পথে নামছিলাম । ৬,৫০০ ফুট উঁচু থেকে অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তা পেলাম । গাড়ি, ঘোড়া বা লোকজন যাতায়াত করে না । রাস্তায় তাই আলগা পাথর সর্বত্র পড়ে রয়েছে । রাখাল ছেলেরা এত উঁচুতেও গরু ভেড়া চরাতে নিয়ে যায় ।

অন্ধকার হবার অনেক আগেই আমি দুই চোখে অন্ধকার দেখতে আরম্ভ করলাম । কেবলই মনে হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাব কিংবা নিচে পড়ে যাব ।

চারদিকে সন্ধ্যার আলো জ্বলবার আগেই মাইরিনগেন পৌঁছে গেলাম । হানি ও চার্লস এবং তাদের মা, রবার্ট ও তার স্ত্রী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল ।

আমরা দুজনে ভেতার হর্নের চূড়ায় যখন উঠছিলাম তখন মাইরিনগেন থেকে টেলিস্কোপে অনেকে দেখেছ এবং আমরা নামবার পর আনন্দ করছে । হানির মার এত স্ফূর্তি যে বলবার নয় । তাঁর স্বামীর বুট জুতো এবং আরোহণের সব জিনিস পরেছিলাম বলেই যেন আমরা সফলকাম হলাম । হানি আমাদের সুখবরটা দিল যে মিস্টার রিচার্ডসন হাসপাতালে ভালো আছে । আমি বুঝতেই পারছিলাম না রিচার্ডসন আবার কে? আমি একেবারে অন্য জগতে গিয়েছিলাম । মনে পড়ল মারামারির কথা, মনে পড়ল আমার হাতে দুটো দাঁত আটকে থাকার কথা । শুনে আশ্বস্ত হলাম যে মিঃ ম্যাকেঞ্জি টেলিফোনে হানিকে বলেছেন যে দুষ্কৃতকারীর নাম রিচার্ডসন, তার মাথায় সেলাই দেবার পর সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ । আমার সঙ্গে যথাশীঘ্র দেখা করতে চায় ।

রাত্রে হানির মা আমাদের দুজনের জন্য মস্ত পার্টি দিলেন । আমি হানস হারির খুব প্রশংসা করে বললাম যে সে আমার সঙ্গে প্রাণপণ সহযোগিতা না করলে আমি আজ ভেতার হর্ন চড়ার গর্ব করতে পারতাম না । ওদিকে হানস হারি বিনয় করে উল্টো গাইল । বলল যে আমার জন্য পথে রাজার হালে ছিল এবং খাবারের স্তূপ উপহার পেয়েছিল । কষ্ট পাওয়া তো দূরের কথা, সে আমাকে সঙ্গী পেয়ে খুবই আনন্দিত । আমার মনে পড়ল বরফের ব্রিজ পার হবার বিড়ম্বনা ।

আমার আংশিক স্নো ব্লাইন্ডনেস হয়েছে । চোখের ওপর কাঁচা দুধ ঢেলে দেওয়ার ফলে অনেক আরাম বোধ করছিলাম । মাঝে মাঝে চায়ের জল ঠান্ডা বা অল্প গরম, চোখে দিতে হল ।

পরদিন রবার্টের গাড়ি চড়ে ইন্টারলোকেন হাসপাতালে গেলাম । তার আগে গ্র্যান্ড হোটেল থেকে মিঃ ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও সঙ্গে নিলাম । ম্যাকেঞ্জি আসল কথাটা আমাকে জানালেন । আততায়ীর নাম রিচার্ডসন, সেদিন সন্ধ্যায় পানে বেশ মাত্রাধিক্য হয়েছিল । এমন সময় কালা আদমিকে ধলা মেয়ের হাত ধরে নাচতে দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল । ভারতবর্ষে সে বিশ বছর কাটিয়েছে কিন্তু কখনও এমন ব্যাপার কোথাও দেখেনি । তাই ঠিক করল হানিকে অপমান করবেই, শেম অন ইউ বলবেই ।

তারপর বাকি সব আমার অজানা নেই । বরং যা জানি না সেটা হচ্ছে এই রিচার্ডসন সত্যিই অনুতপ্ত এবং আমার কাছে মাপ চাইবে ।

বেশ মজার ব্যাপার । আমি ভাবছিলাম বলব, আমি দুঃখিত আর ওদিকে রিচার্ডসন আশা করে আছে যে সে ক্ষমা চাইবে এবং আমি ক্ষমা করব । রিচার্ডসনের এইরকম

মনোভাবের কারণ হচ্ছে যে সব সুইশরাই এইরকম ব্যবহারের নিন্দা করেছে, বিশেষত মিঃ ম্যাকেঞ্জিও তাতে যোগ দিয়েছেন ।

সদলবলে হাসপাতালে গেলাম । আমার কফি রং দেখে রিচার্ডসন চিনতে পেরেছিল কিন্তু আমি মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা হাসপাতালের জামাকাপড় পরা লোকটিকে চিনতে পারিনি । সে প্রথমেই বলল, সেদিন আমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছিল । যাক আমার খুব শিক্ষা হয়েছে । আমি ক্ষমা চাইছি । অন্যপক্ষে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যখন শুনলাম যে আমার বিরুদ্ধে পুলিশের কোনও অভিযোগ নেই । বরং রিচার্ডসনের নামে চার্জ এসেছে যে সে সবার সামনে এক সুইশ ভদ্রমহিলাকে অকারণে অপমানিত করেছে ।

অল্পক্ষণের মধ্যে পুলিশের কর্তা এলেন । তাঁর সামনে আমার কাছে রিচার্ডসন মাপ চাইল । আমি বললাম মিস হানি ইমারের কোনও ইচ্ছা নেই রিচার্ডসনের বিরুদ্ধে কেস করার । তিনি ক্ষমা করেছেন । তারপর দুই পার্টির করমর্দন ও মিষ্টান্ন পর্ব ।

এই ঘটনাটা আমরা কয়েকজন কখনও ভুলব না । আঠারো বছর পরে আমি সপুত্র পরিবার আবার মাইরিনগেনে গিয়েছিলাম । দু-চার কথা বলার পরেই চার্লস বলল, বিমল, মনে আছে ইন্টারলাকেন কুরশালে মারামারির কথা? হানি বার্ন শহরের ডাক্তার লুইথিকে বিয়ে করেছে । সেও প্রথমেই বলল সুইশ জাতীয় উৎসবে সে রাত্রের কথা মনে আছে?

মারামারির মধ্যে সূত্রপাত হলেও তার মধ্যে একটা ভালো জিনিসের ইঙ্গিত নিহিত ছিল । পর্বতারোহণে যেতেই হবে, অল্প সময়ের নোটিশে এটা সম্ভব হত না । মানুষ খুনের চার্জে পড়ে মাউন্টেনিয়ার তৈরি হলাম । আমি বোধহয় প্রথম ভারতীয় বিদেশে কিংবা স্বদেশে পর্বতচূড়ায় আরোহণ করলাম । মনে মনে সংকল্প করলাম যে দেশে ফিরে আরও অনেক অনুশীলন করব যাতে মাউন্ট এভারেস্ট চড়বার উপযুক্ত হই ।

পর্বতশৃঙ্গে চড়লে মনটা একটা আনন্দময় অনুভূতিতে ভরে যায় । সে অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না । ধরে থাকতে ইচ্ছা হয় । কিন্তু যেমন সব ভালো জিনিস মাত্রার চাইতে বেশি নেওয়ার চেষ্টা উচিত নয়, এখানেও তাই । ভালো লাগছে বলে একটু বেশিক্ষণ বসে থাকলে কনকনে হাওয়া এবং শীতে জমে যেতে হবে ।

যা হোক অভিজ্ঞতা হল এবং পরে এভারেস্ট চড়তে যাব, এ হল কল্পনার প্রথম ধাপ । সেটা ছিল ১৯২৯ সাল ।

ইমার পরিবারের কাছে বিদায় নিলাম ।

আমি বার্নার ওভারল্যান্ডে বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়াগুলো দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম । আইগার, ময়েনখ, ইউংফ্রাউ পিছন দিক থেকে দেখেছিলাম । এবার মতলব করলাম

সামনের দিক থেকে উপত্যকার ওপারে দাঁড়িয়ে দেখব । উপত্যকা অপরিসর বলে মনে হয় হাত বাড়ালে চূড়াগুলির বরফে হাত দিতে পারব ।

পাহাড়ের গায়ে চেন টানা ট্রেন চড়ে ম্যুরেন পৌঁছলাম । ৭,০০০ ফুট উঁচু । মিসেস ইমারের এক বোন সেখানে একটা হোটেলের মালিক । তাঁর নাম আন্ট বেচর্লি । বয়স অনেক হয়েছে । মাথার চুল সব সাদা । তিনি অবিবাহিতা, হোটেলের নাম শলে আপ্লেনরুহে । একেবারে পাহাড়ের ধারে বলে মনে হয় যেন হোটেলটা গলার হারের মতো ঝুলছে । ম্যুরেন বিখ্যাত শীতের বরফে স্কেটিং করবার জন্য । স্কিয়িংয়ের একটা মস্ত ঘাঁটি । আপ্লেনরুহের সব ঘরের জানলার বাইরে চাইলে মনে হয় এক অবাস্তব জগতের অপরূপ ছবি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে । সে এক আশ্চর্য দৃশ্য ।

হিমালয়ের তুষারাবৃত সব শৃঙ্গ দেখা যায় ৩০০ মাইল দূর থেকে । এখানে এক মাইল মাত্র দূরে । ভীষণ বড় বড় দেখায় । হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গরাশি দেখলে যেমন দূরত্ব বোধ হয় এখানে তার বিপরীত । দুটো দৃশ্যের সৌন্দর্য দুরকম ।

আন্ট বেচর্লির সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল । তিনি একজন মস্ত বড় স্পোর্টস উওম্যান । বরফের ওপর দিয়ে স্কি করে যখন আন্ট চলে যান, তাঁর দীর্ঘ ঋজু দেহ সহজ আয়াসে ভেসে বেড়ায় । বার্ধক্যের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না, যদি মাথায় টুপি পরা থাকে ।

ম্যুরেন থেকে আরও উঁচুতে ওঠবার জন্য রোপওয়ে আছে । মেয়েরা একজোড়া স্কি হাতে নিয়ে ওপরে উঠে যায় । তারপর বরফের ওপর স্কি পেতে তাড়াতাড়ি নিচে চলে যায় ।

ম্যুরেন থেকে নেমে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহরে গেলাম । পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত । নিচে নদী বয়ে যাচ্ছে । সুন্দর শহরের দৃশ্য । রাজধানীতে দেশের প্রেসিডেন্ট থাকেন । সুইজারল্যান্ড দেশ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী । একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন প্রধানমন্ত্রী আছে । কিন্তু কোনও লোক তার ধার ধারে না । এমনকী কী নাম তাও কারও খেয়াল নেই ।

বার্ন শহর ছেড়ে জুরিখ শহরের দিকে রওনা হলাম । উঁচু নিচু রাস্তা কিন্তু রাস্তার অবস্থা খুব ভালো ।

লন্ডনে যখন আমি ব্যাঙ্কিং পড়তাম তখন আমার সঙ্গে একটি সুইশ ছেলে (নাম এরনেস্ট ইরনিগার) পড়ত । সে ও তার স্ত্রী এলিসের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল । তাদের নিমন্ত্রণে জুরিখ বেড়াতে যাচ্ছি ।

এরনেস্টকে টেলিফোনে আমার আসার খবরটা দিয়েছিলাম । দুজনে দেখা হল এবং এরনেস্ট আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল । এরনেস্টের মা ও বাবা ছেলের ভারতীয় বন্ধুকে নিজেদের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন । আমাকে দুজন সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন । আমার বুঝতে দেরি হল না যে ইরনিগাররা ভীষণ বড়লোক । এরনেস্টের বাবা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব সুইজারল্যান্ডের কর্ণধার ।

আমাকে বড় এবং ভালো গেস্টরুম দিলেন । আমার ঘর থেকে জুরিখ লেক খুব কাছেই । দৃশ্যও তেমনই মনোরম । চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা, নিচে কাচের মতো পরিষ্কার হ্রদের জল । কিনারে ছেলেমেয়েরা স্নান করতে বা সান বেদিং করতে ব্যস্ত ।

এক সপ্তাহ আমি এরনেস্টের আতিথ্যে বন্দী । ক্লিম বলে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর এরনেস্টের একটা কটেজ ছিল । নিয়ে গেল সেখানে । তারপর সুইজারল্যান্ড তোলপাড় করে ঘুরলাম এরনেস্ট ও এলিসের সঙ্গে । লুসার্ন শহরটা খুব সুন্দর লাগল । লেক লুসার্ন আরও সুন্দর ।

জুরিখে ফিরলাম ।

এরনেস্টদের কাছে বিদায় নিয়ে বাল-এর পথ ধরলাম । এই বাল বা বাসল শহরে ভারতীয় মিনিয়েচারের প্রদর্শনী দেখলাম । সহজেই বোঝা যায় কী বিচক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে ভালো ভালো মিনিয়েচারগুলি সংগৃহীত হয়েছে । সংগ্রহকারী এলিশ বোনার । প্রদর্শনী দেখে খুব ভালো লাগল ।

বাল শহর ছেড়েই রাইন নদীর ওপারে আমি ব্ল্যাক ফরেস্ট দেখতে গেলাম । এরকম সুন্দর অরণ্য পৃথিবীতে কমই আছে ।

আমি গতি ফিরিয়ে দক্ষিণ মুখে নয়সাতেল হয়ে জেনেভার দিকে চলতে আরম্ভ করলাম ।

জেনেভাতে একরাত কাটিয়ে পরদিন সুইজারল্যান্ড ছেড়ে ফরাসি দেশে রোন নদীর উপত্যকা ধরলাম । রোন নদী পাহাড়ি পথে নেমে গিয়েছে সমুদ্রের দিকে । সেই জল থেকে বারবার বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছে । ফলে সস্তায় সর্বত্র বিদ্যুৎ পাওয়া যায় । ছোট বড় গ্রামে অপর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে নানারকম কারখানা চালায় ।

লোকেরা অবস্থাপন্ন এবং আমার প্রতি খুব ভালো ব্যবহার করত ।

ঢালু পাহাড় ধরে চারদিন পর লিঁয় শহরে পৌঁছলাম । লিঁয় শহর তাঁতশিল্পের মস্ত ঘাঁটি । যাকে বলে ফ্রান্সের ম্যানচেস্টার । আমি একটা সুতোর কারখানা দেখতে গেলাম । তিন হাজার লোক কাজ করে । ছেলে ও মেয়ে কর্মীরা কারখানা চালায় । একজন মেয়ে গাইড আমাকে নিয়ে তাঁতের সাহায্যে তারা কেমন ভাবে সূক্ষ্ম কাজ করে দেখাল ।

লিঁয় শহরে চার্লস ইমারের এক মাসি, মিসেস মাসারের বাড়িতে আমার যাবার নেমন্তন্ন ছিল । সেখানে উঠলাম । এই ভদ্রমহিলাকে আগে আমি আন্ট বেটা বলে ডেকেছি যখন তিনি মাইরিনগেন, সুইজারল্যান্ডে তাঁর দিদির বাড়িতে আমার থাকার সময়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন । তিনি ও তাঁর দুই ছেলে আমাকে পেয়ে খুব খুশি । দুদিন এই পরিবারে কাটিয়ে দক্ষিণে মার্সেলসের পথে রওনা হলাম ।

শীতের প্রচণ্ডতা অনেক কমে গিয়েছে । মার্সেলস বিরাট বন্দর ও বড় শহর । প্রথম দিনেই দেখা হল হারীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে । লন্ডনে এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল । খুব বুদ্ধিমান ও আমুদে লোক । আমাকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করবার পরমুহূর্তেই বলল যে তার স্ত্রী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে । হারীনের চোখে জল । আমাকে টানতে টানতে একটা বারে নিয়ে গেল । দুজনে অনেক বিয়ার খেলাম । হারীন বিয়ার দিয়ে নিজের দুঃখ ঢাকবার চেষ্টা করছিল । কী আর করি, একটু সহানুভূতি দেখালাম ।

আমাকে আশ্চর্য আধুনিক স্থাপত্য দেখাবার জন্য করবুসিয়েরের তৈরি দি মার্কেট দেখাতে নিয়ে গেল । একটা প্রকাণ্ড বাড়ি । সব জিনিস পাওয়া যায় তার মধ্যে- সিনেমা, ডাক্তারখানা, হোটেল, বাজার ইত্যাদি । এই স্থাপত্যবিদ পরে চণ্ডিগড় শহর তৈরিতে সহায়তা করার ফলে আমাদের দেশেও তিনি কীর্তি অর্জন করেছেন ।

ইউরোপের মধ্যে ফরাসি খাবার আমার সবচেয়ে ভালো লাগে । বুইয়াবেশ নামে একটি অতি মুখরোচক খাবার খেলাম । এই ডিশ তৈরি হয় নানা রকম চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদি মিলিয়ে । জাফরান ব্যবহার করা হয় বলে আমার মতো ভারতীয়দের খুব ভালো লাগে । ফরাসিরাও বুইয়াবেশ খুব আগ্রহের সঙ্গে খায় ।

এখানে অনেক উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী যেমন মরোক্কান, আলজিরিয়ান ও টিউনিসিয়ান লোক সর্বত্র দেখলাম । ভূমধ্যসাগরের ওপারে উত্তর আফ্রিকা এপারে ফ্রান্স ।

হঠাৎ আমার বন্ধু রঞ্জিত সেনের সঙ্গে আবার দেখা হল ওখানে । টুলু মার্সেলস থেকে জাহাজ নিয়ে বার্সিলোনা বেড়াতে যাচ্ছে । আমাকে খুব লোভ দেখাল স্পেনে যাবার জন্য । শেষ পর্যন্ত জাহাজে উঠলাম বিকালে । পরদিন সকালে বার্সিলোনা বন্দরে পৌঁছলাম ।

১৪

স্পেনে রোদ খটখট করছে। সুন্দর দিন। এই দেশে আমার যাবার অনেক দিনের শখ। কোথা দিয়ে কেমন করে যাব স্থির করে উঠতে পারিনি। ইচ্ছা ছিল পিরেনিশ পাহাড় পার হয়ে স্পেনে যাব। কিন্তু পিরেনিশ পর্বতমালা বরফে ঢাকা। এক মানুষের বেশি উঁচু বরফ ঠেলে সাইকেল টানতে আর শখ নেই। ঠান্ডা ও বরফের প্রচণ্ড প্রকোপ সহ্য করেছি নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আল্পসের উঁচু পাহাড়ি পথে। যথেষ্ট হয়েছে আর নয়।

বার্সিলোনা শহরে আমরা দুই বন্ধু একটা বুল ফাইট দেখতে গেলাম। মস্ত বড় স্টেডিয়াম, প্রায় চল্লিশ হাজার ছেলে, মেয়ে, যুবক, যুবতী দেখতে গিয়েছে। তারা রক্তাক্ত অবস্থায় ষাঁড়কে রক্ত বমি করতে করতে মরতে দেখল এবং ভীষণ উল্লাসে ম্যাটাডরকে, যে লাল কাপড় ও তলোয়ার নিয়ে লড়তে নেমেছিল, সবাই তাকে হর্ষধ্বনি করে অভিবাদন জানাল।

বুল ফাইট কী সাংঘাতিক রকম হৃদয়হীন খেলা তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। স্বীকার করি অসীম সাহস ও ধৈর্য লাগে লড়াই করতে। একজন যুবক একখানা লাল কাপড়ের টুকরো ও একটা তলোয়ার নিয়ে রিঙের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের জন্য অপেক্ষা করছিল! ষাঁড়কে রিঙের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল, ম্যাটাডর মাঝখান থেকে লাল কাপড়টা দেখিয়ে ষাঁড়কে খেপাচ্ছিল। লালের ওপর নজর পড়তেই, তীব্র বেগে ষাঁড় ছুটে গেল শিং খাড়া করে গুঁতিয়ে দেবার জন্য। ম্যাটাডর প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অচল অটল। নিজের জায়গা থেকে অল্প পরিসরের মধ্যে ষাঁড়কে নাস্তানাবুদ করে তাকে ভীষণ উত্তেজিত করে তুলল। এই জাতীয় ষাঁড় তৈরি করা হয় আন্দলুসিয়া অঞ্চলে। তারা সহজেই ক্ষেপে যায় এবং মানুষের সঙ্গে লড়তে এগোয়।

ষাঁড় যখন লাল কাপড়টা ছিঁড়তে অক্ষম হয়ে খুব হয়রান হয়, তখন ম্যাটাডর তলোয়ারটা তার কাঁধের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। এই রকমভাবে কয়েকটা তলোয়ার হতভাগ্য জানোয়ারের পিঠে ঠেলে দেওয়া হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে তলোয়ার পিঠের হাড় ভেদ করে হার্ট পর্যন্ত পৌঁছয়। ফলে রক্তের ফোয়ারা বইতে লাগল। তরুণ-তরুণী যারা দেখছে তাদের উৎসাহ ও উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। তারা এই চরম দৃশ্য দেখে তৃপ্তি কেমন করে পায় জানি না। আমার খারাপ লাগছিল, অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল এই খেলা।

ষাঁড়ের চেয়ে মানুষের বুদ্ধি বেশি একথা প্রমাণ দেওয়া যদি উদ্দেশ্য হয় তবে অন্য অনেক উপায়ে তা প্রমাণ করা যায় । একটা জানোয়ার যদি লাল কাপড় দেখলেই ক্ষেপে যায় এবং সেটাকে ছিঁড়ে ফেলতে না পারার জন্য যদি তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তবে তাকে প্রাণ বলি দেবার ব্যবস্থা মানুষ কেন করল জানি না । ম্যাটাডর হতে খুব সাহস লাগে সন্দেহ নেই । আমি তার বেশি বাহাদুরি দিতে রাজি নই ।

টুলু ও আমি যেখানে বসে দেখছি আমার পাশেই এক ভদ্রলোক স্কেচ করছিলেন । একেকটি বিশেষ ঘটনা কাগজে ধরে ফেলবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখলাম । ইন্টারভ্যালের সময় ভদ্রলোক একটা সিগারেট খাবার জন্য থামলেন । আমি অবাক হয়ে দেখছি তাঁর কাজ । লোকটি আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর কাজ কেমন লাগছে । আমি খুব প্রশংসা করলাম । তারপর হল আমাদের পরস্পরের পরিচয় ।

ভদ্রলোকের নাম গগ্যাঁ শুনে আমি বললাম যে আমি একজন বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকর জানি ওই নামে । হাসি মুখে তিনি তখন বললেন যে সেই গগ্যাঁ তাঁর বাবা । তিনিও কলা চর্চা করেন তবে চিত্রে নয় পোর্সিলেনের নানা জিনিস তৈরি করে । তিনি যে স্কেচ করছেন সেটা এক বিখ্যাত পোর্সেলিন কোম্পানির অর্ডারে । কোপেনহাগেন শহরে যাবার পর বুল ফাইট সিরিজ পোর্সেলিনে তৈরি হবে ।

ছেলে তার বাবার গুণ পেয়েছে । এত সুন্দর স্কেচ করছিল বুল-ফাইটের যে সেগুলো সত্যিই দেখবার মতো ।

টুলু সেনকে ছেড়ে আমি সাইকেলে চড়লাম । কথা রইল যে সম্ভব হলে সে মাদ্রিদ শহরে ওয়াই এম সি এতে আবার দেখা করবে । কিন্তু তা আর হয়নি ।

সুন্দর রোদমাখা দিন । রাতটা ঠান্ডা । ছয়দিন পরে মাদ্রিদ পৌঁছলাম । সেদিন সন্ধ্যায় রেডিওতে একটা ইন্টারভিউ দেবার পর ডাক পড়ল । বড় সুন্দর ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর, দেখার ইচ্ছা তো ছিলই । তাছাড়া স্পেনের রাজা আলফনসো আমায় বলেছিলেন যে মাদ্রিদ না দেখলে আমার পৃথিবী ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । আমার আসার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল এল প্রাডো চিত্রশালা দেখার । পৃথিবীতে যে কটি শ্রেষ্ঠ চিত্রশালা আছে প্রাডো তাদের মধ্যে অন্যতম । গ্রেকো, গয়া এবং ভেলাস্কের শত শ্রেষ্ঠ কাজের সঙ্গে পরিচয় করতে হলে এখানে আসতেই হবে । অন্য চিত্রশালাতে স্প্যানিশ চিত্রকরদের এক আধখানা ছবি দেখা যায় । প্রাডোতে ডজন ডজন তিন জগদ্বিখ্যাত আর্টিস্টের ছবি দেখলাম । মনটা খুশিতে ভরে গেল । স্পেনে আসা আমার সার্থক হল ।

পরদিন ওয়াই এম সি এ হলে আমার ভ্রমণকাহিনী বলবার আমন্ত্রণ পেলাম ।

মাদ্রিদ ছেড়ে সারগোসার পথে আবার বার্সিলোনাতে ফিরে এলাম । সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ পেলাম, মার্সেলস বন্দরে যাবার । বিকালে ওই শহরে পৌঁছলাম । সব পরিচিত মনে হচ্ছিল এবার ।

মার্সেলস ছেড়ে টুলুস-এর পথ ধরলাম । পাঁচদিন পর টুলুস শহরে পৌঁছে এক বিখ্যাত পেন্টারের বাড়ি (টুলুসলোট্রেক) দেখতে গেলাম । পথে গাড়ি কম । বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা দিন, তাতে শীতের আমেজ আছে । টুলুস শহরটা পিরেনিশ পর্বতমালার ঠিক উত্তরে । খুব পরিষ্কার দিনে বরফ ঢাকা পাহাড় সব দক্ষিণে দেখা যায় । এ দিকটাকে গ্যাসকাইন বলে । চারদিক খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । একটা হোটেলে উঠলাম । রাত্রে সেখানে খুব নাচ হচ্ছিল । আমি তাতে যোগ দিলাম এবং যথেষ্ট আনন্দ পেলাম ।

টুলুসের পর আমার গন্তব্যস্থান বোর্দো । মাঝে আঙুরের খেত কত শত বর্গ মাইল জুড়ে বলতে পারব না । যতদূর দেখা যায় বড় বড় আঙুরের গাছ, ফল পেড়ে নিয়েছে এবং তা থেকে বোর্দো- লাল মদ তৈরি হয়েছে । দেশসুদ্ধ লোক দিনে দুবার খাবারের সঙ্গে দুই ছোট বোতল এই মদ খায় । দাম সস্তা লেমনেডের সঙ্গে সমান, দুই আনা ।

ফ্রান্সের এই দিকটাকে দর্দইন কান্ট্রি বলা হয় । যেমন শস্যশ্যামল তেমনই নানা রকম চাষবাসে ও ডেয়ারিজাত পণ্যে সমৃদ্ধ । বোর্দোর কাছেই দুটি বড় নদী একটার নাম গারোন, অন্যটি দর্দইন ।

আমি একরকম লাল মদ খেলাম যাতে অ্যালকোহল নেই বললেই চলে । বেশ মিষ্টি মিষ্টি, আঙুরের নির্যাস যাকে বলে । এই মদ অল্পদিন বাজারে বিক্রি হয় প্রতি বছর । ইউরোপের আঙুর-প্রধান সব দেশেই এই রকম আধা মদ পাওয়া যায় ।

বোর্দোয়ে দুদিন বিশ্রাম করে জামাকাপড় ভালো করে কেচে নিলাম ।

এবার উত্তরে টুরস যাচ্ছি । বেশ সমতল দেশ । রাস্তাও খুব ভালো । তবু এমন ঠান্ডা হাওয়া বইছিল যে আমার আটদিন লাগল পৌঁছতে । টুরসে একটা ইউথ হস্টেলে উঠলাম । হস্টেলটা ফ্রান্সের অন্যতম বড় নদী লয়ারের ধারেই । এখানে খাবার যেমন সস্তা, তেমনই সুস্বাদু ।

সন্ধ্যার সময় একটা কাসিনোতে গেলাম । একপাশে একা বসে এক গ্লাস নির্যাস খাচ্ছি, হঠাৎ একদল ছেলেমেয়ে হলের ভেতর এল এবং আমাকে দেখে খুব উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল । কেউ কেউ তাদের গ্লাস আমার গ্লাসে ঠেকিয়ে টুর দু মন্ড বলতে লাগল । আমি যে একজন বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছি সেটা আমার সাইকেল ও সরঞ্জাম দেখে বুঝেছে, তাদের ইচ্ছা আমাকে উৎসাহ দেওয়া ।

ফরাসিরা খুব আমুদে হয় । দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলবার সময় ছোট ছোট পিয়ানো একর্ডিয়ানের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে যায় । কখনও এই সব দলের মধ্যে পড়েছি । কথা নেই বার্তা নেই আমাকে ঘিরে রাস্তার ওপর নাচতে আরম্ভ করেছে ।

পথে টুরস শহর পড়ল । অনেক কালের অস্তিত্ব এর । দুই হাজার বছর আগে রোমানরা রাজত্ব করেছে এই অঞ্চলে । আজও বড় বড় রোমান পয়ঃপ্রণালী শহরের মধ্যে জল সরবরাহ করে ।

এক ফরাসি পরিবারে থাকবার নিমন্ত্রণ ছিল । তাঁদের খুঁজে বের করলাম । এতদিনে কাজ চালানোর মতো ফরাসি ভাষা শিখে ফেলেছি । পরিবারের নাম রোজ । স্বামী-স্ত্রী এবং একটি ছেলে । স্বামীর সঙ্গে বোর্দোতে আলাপ হয়েছিল । রোজ ও তাঁর স্ত্রী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । ছেলে আমার বয়সী । আমাকে দেখিয়ে ছেলেকে উৎসাহ দেওয়া বোধহয় নেমন্তন্ন করার উদ্দেশ্য ছিল । ছেলেটি ভালো ।

রাত্রে ঘটা করে এক মস্ত বড় ডিনারের বন্দোবস্ত হল । রোজের আত্মীয় এবং কয়েকজন বন্ধু নিমন্ত্রিত ছিলেন । মাদাম অদ্ভুত ভালো রাঁধিয়ে । এত লোকের রান্না একাই করলেন । খাবার টেবিলে আঠারোজন স্ত্রী-পুরুষের জন্য আঠারো বোতল দামি মদ রেখেছিলেন ।

একটি পরিবার রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরিজিতে পড়েছে । তাদের কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভারতবর্ষের । আমি গর্ব অনুভব করলাম এই কথা ভেবে যে আমি সেই দেশের প্রতিনিধি ।

এবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের দিকে যাচ্ছি । সমতল জায়গা, রাস্তা চওড়া এবং খুব ভালো, গাড়ি ঘোড়া অনেক বেড়ে গিয়েছে । পথে কোথাও কোথাও অনেক লোক লেগেছে রাস্তা ঠিক করতে । যারা রাস্তা সারাচ্ছে তাদের মোটর গাড়ি একপাশে রেখেছে । দুপুরবেলায় লাঞ্চ খেয়ে রাস্তার ধারে নালায় বসে কিংবা শুয়ে বিশ্রাম করছে শ্রমিক দল । এক ঘণ্টা পরে যে যার কাজে পুরোদমে মন দিল ।

সাতদিন পরে প্যারিসের কাছাকাছি পৌঁছলাম । জিনিসপত্রের, বিশেষ করে খাবারের দাম বাড়ছে যতই রাজধানীর দিকে এগোচ্ছি । মোটর গাড়ি এত জোরে চলে যে ভয় হয় ঢিমে-তেতালা চালের বাইসাইকেল কখন ছিটকে চলে যাবে । যা হোক খুব সাবধানে একপাশ দিয়ে চলেছি ।

আমার স্বপ্নের শহর প্যারিস আগত-প্রায় । পথের ধারে প্রথমে ভেলোড্রোম বা সাইকেল রেসের স্টেডিয়াম পেলাম । সন্ধ্যা হয়েছে । কাছেই লে ফ্লয়ের নামে একটা হোটেলে উঠলাম ।

আমার এক ফরাসি বন্ধু, জাঁ দ্য গিভ্রির বাড়িতে ওঠবার কথা। কিন্তু রাত্রে বাড়ি খুঁজে পাব না, এই আশঙ্কায় তাকে টেলিফোন করলাম। আধঘণ্টার মধ্যে জাঁ চলে এল। ঠিক হল কি দ্য অতোই রাস্তার ধারে পরদিন সকালে এক নির্দিষ্ট সময়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

জাঁ চলে যাবার পর হোটেলের ওপারে ভেলোড্রোমে গেলাম সাইকেল রেস দেখতে। আমাদের দেশে সাইকেল ট্র্যাক নেই। এখানে ঢালু ট্র্যাক নিচে থেকে ওপরে উঠে গেছে। কাঠের পাটাতন দিয়ে মেঝে তৈরি হয়েছে। খুব চমৎকার রেস দেখলাম। মনে হচ্ছিল আমি ভালোভাবেই এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিততে পারি।

রাত্রে হোটেলে বিশ্রাম করে পরদিন জাঁর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। জাঁ অবিবাহিত। মার সঙ্গে থাকে। সে আধুনিক চিত্রকর বলে নিজেকে। ঘোড়া আঁকা তার বিশেষত্ব। একদিন বললাম, চল লুভ্যর মিউজিয়ামে শ্রেষ্ঠ পেন্টিং সব দেখে আসি। জাঁ উদাসীন, আগেকার লোকেরা আঁকতে জানত না, এই হচ্ছে তার মত। ইমপ্রেসনিস্ট স্কুলের অনেকের জীবনী পড়েছি, তাঁদের কাজের সঙ্গে এবার পরিচয় হবে। জাঁ এদের পেন্টিং আমাকে দেখাতে রাজি ছিল।

দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। আগেকার পুরনো বড় জগদ্বিখ্যাত আর্টিস্টদের কাজ পড়ে রইল, আমরা আরম্ভ করলাম সেজান, ভ্যান গগ, গঁগ্যা, দেগা ইত্যাদি দিয়ে। শেষ দিয়ে শুরু করলাম। জাঁ এদের কাজ এত ভালো জানত যে তার জ্ঞানের কিছুটা আমি ভাগ পেলাম। প্রত্যেকটি ছবির সামনে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আমাকে বোঝাল। ফলে আমার একটা বিশেষ লাভ হল- ইমপ্রেসনিস্ট আর্টিস্টদের চিনতে জাঁ খুব সাহায্য করেছিল।

শেষকালে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং আমার অনুরোধ রাখতে জাঁ রাজি হল অন্য সব ছবি আমার সঙ্গে দেখতে। তার মতামতের সঙ্গে আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অমত হলাম যখন ওল্ড মাস্টারদের ছবি দেখলাম। জাঁ বলল যে লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসার মধ্যে লোকে কী দেখে তার ঠিক নেই। সব রথী মহারথীর ছবির প্রতিই তার বক্র কটাক্ষ। তবু সে পেন্টিং বুঝতে এবং তারিফ করতে আমায় খুব সাহায্য করেছিল। সারাদিন কাটিয়ে বিকালে আবার আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালাম। সামনে টুইলারি গার্ডেনসে অপূর্ব ফুলের সমাবেশ এই অসময়েও।

দুজনে ফুটপাথের ওপর রেস্তোরাঁয় ঢুকে কফি ও কেক খেলাম।

পরদিন গিমে মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। এখানে আমি জাঁর গাইড হলাম। অনেক প্রাচ্যের জিনিসে ঠাসা এই মিউজিয়াম। তাদের মধ্যে অনেক জিনিসের সঙ্গে আমি পরিচিত। জাঁ পুরনো চিত্রকলার কোনও জিনিসের মূল্য দেয় না কিন্তু ভারতীয় পুরাতত্ত্বের

নিদর্শন দেখে সে মুগ্ধ। ভারতীয় কলা এবং কারুকার্যের সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করল। আরও আকৃষ্ট করল ভারতীয় ভাস্কর্য। যারা ভাস্কর্য করেছে তাদের নাম জানতে চাইল। আমি বললাম, ওইখানেই ভারতবর্ষের বাহাদুরি। কে করেছে কেউ তাদের নাম জানে না। দেশ জুড়ে ভাস্কর্যের কাজ হাজার হাজার আছে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। অনেকের সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলো, প্র্যাক্সিটেলিশ ও মাইরোনের তুলনা করা চলে, কিন্তু আমাদের দেশে নামটা বড় ছিল না, তাই নাম নেই। যেন সৃষ্টির আনন্দে ভাস্কর কাজ করে গেছে। ভবিষ্যতে লোকেরা তার নাম জানবে কিনা তার কোনও ব্যবস্থা করেনি।

জাঁ পাশ্চাত্য দেশের লোক হয়ে এই কথাটা ভাবতে পারে না। এখানে সবার লক্ষ্য নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা এমনভাবে যে আগামী যুগের লোকেরাও তাকে স্মরণ করবে, বাহবা দেবে।

আমি জাঁকে ইলোরার ভাস্কর্যের কথা বিশেষ করে বললাম। বললাম, ভারতবর্ষে গেলে অজন্তাও যেন সে অবশ্যই দেখে।

বাড়ি ফিরে জাঁ বলল, আমাদের দেশে কী-কী দ্রষ্টব্য আছে তার লিস্ট তৈরি করতে। আমি বলেছিলাম আমি তার গাইড হব। সেকথা রাখতে পারিনি। আমার এক যুগ লেগে গেল ভারতবর্ষে ফিরতে। ইতিমধ্যে জাঁ আমাদের দেশ ঘুরে যা দেখার দেখে চলে গেল।

ঠিক করলাম পরদিন সকালে প্রাতরাশ খেয়ে বাস্তিল দেখতে যাব। জেলখানা দেখে আমরা খানিকক্ষণ প্যারিসের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একটা ফুটপাথের ওপর রেস্তোরাঁয় কফি খেতে বসলাম। মাঝে মাঝে চা খেতে ইচ্ছা করত কিন্তু এদেশে তা দুষ্প্রাপ্য। যা পাওয়া যায় তার মধ্যে স্বাদ ও গন্ধ কিছুই থাকে না।

জাঁ একটা সাইকেল জোগাড় করেছিল। পরদিন শহরের বাইরে আমরা দুজনে ভেরসাই প্রাসাদ ও বাগান দেখতে গেলাম। কয়েক ঘণ্টা প্রশস্ত ও সুন্দর বাগান ঘুরে প্যালেসের ভেতরে মিউজিয়াম দেখতে পেলাম।

দেওয়ালে ঝুলছিল কয়েকখানি বহুমূল্য গোবেঁল্যা। কার্পেট যেমন মাটিতে পাতে গোবেঁল্যা তেমনই অতি সূক্ষ্ম কার্পেটের মতো, দেওয়ালে ঝোলায় ছবির বদলে, ভালো জাতের গোবেঁল্যার দাম অনেক লক্ষ টাকা হতে পারে। ইউরোপের বেশিরভাগ বড়লোকের বাড়িতে প্রায়ই দেখা যায়। এটা তাদের আর্থিক অবস্থার একটি পরিচয়।

প্যারিস থেকে ভেরসাই প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। ট্রামে যাতায়াত করা যায়। সকালে প্যারিস থেকে দলে দলে লোকেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে এখানে বেড়াতে আসে। সঙ্গে থাকে দুপুরের খাবার। বাগানের ঘাসের ওপর শুয়ে বসে বিশ্রাম করে বড়রা। ছোটরা ছোটাছুটি ও নানারকম খেলায় ব্যস্ত। দুটো জিনিস লক্ষ করবার মতো। কেউ ফুল ছিঁড়ল

না কিংবা যেখানে সেখানে কাগজের টুকরো বা দেশলাইয়ের কাঠি বা সিগারেটের ভগ্নাংশ ফেলল না। একটু পর পর তারের বাক্স আছে। সবাই ময়লা সেখানে ফেলছিল। তাই সমস্ত বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব সময়েই।

রবিবার দেখে আমরা দুজন ফঁতেনব্লু বেড়াতে গেলাম। এখানে নেপোলিয়ানের মিউজিয়াম আছে। ফঁতেনব্লু প্যালেসের চারপাশে প্রশস্ত জমি ও উপবন আছে। বড় বড় ঘাস হয়েছে সেখানে। সবাই স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে। বড় বড় গাছ আরও সুন্দর দেখায়।

সন্ধ্যার আগে প্যারিস ফিরলাম। জাঁ বলল, ওর সঙ্গে একটা ক্যাবারে দেখতে যেতে। তার নাম ফোলি ব্যার্জার। ফরাসিরা দিনেরবেলায় খাটে আর সন্ধ্যা হলেই মদ পান করে এবং আর্থিক অবস্থানুসারে ছোট, বড় ক্যাবারে দেখতে যায়।

ফোলি ব্যার্জার আমার ভালো লাগল। খুব আর্টিস্টিক এবং রুচিসম্মত প্রোগ্রাম ছিল। ফিনফিনে কাপড়-জামার বাহুল্য। মেয়েরা স্বল্পবসনা।

নিমন্ত্রিত হয়ে আরও দুটো ক্যাবারে দেখেছি। একটার নাম মূলাঁ রুজ, অন্যটি বাল তাবারাঁ।

সোমবার থেকে জাঁ কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকবে। আমি আবার ল্যুভর চিত্রশালা দেখতে গেলাম। আমার ভালো লাগত বলে পর পর আরও তিনদিন ছবি দেখে এবং আর্টিস্টদের জীবনী পড়ে কাটালাম।

ফ্রান্সের যতখানি দেখলাম এবং যা শুনলাম তাতে মনে হয় সে শিক্ষায়, সভ্যতায় গ্রিসের উত্তরাধিকারী। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে সে এক মহা সম্মানের স্থান অধিকার করেছে ইউরোপের মধ্যে। আমার সব চেয়ে ভালো লাগে এই কারণে যে সেখানে বর্ণবৈষম্য কোথাও দেখিনি।

বিরাট আইফেল টাওয়ারও দেখতে গেলাম। ওপর থেকে মনে হল সমস্ত প্যারিস শহর আমার পায়ের নিচে। শহরের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য বাড়িগুলি স্পষ্ট দেখা গেল কিন্তু অনেক ছোট আকারে। লিফটে করে এক হাজার ফুটের চেয়ে বেশি উঁচুতে উঠেছি। এই বাড়িতে রেডিও ট্রান্সমিটিং সেন্টার আছে। একতলায় একটা বড় রেস্তোরাঁ আছে। খেতে খেতে সব শহরটা দেখা যায়।

জাঁ-র সঙ্গে একদিন হুগো মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। বিখ্যাত সব বইয়ের পাণ্ডুলিপি যত্ন করে রাখা রয়েছে এখানে। একটা সুন্দর প্রস্তরমূর্তি দেখলাম ভিক্টর হুগোর। রোঁদ্যার ভাস্কর্যের মিউজিয়াম দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

অপেরায় দি বার্বার অব সেভিল শুনতে গেলাম । ভারি চমৎকার মিউজিক । মজারও বটে । অপেরা শেষ হবার পর হাঁটতে হাঁটতে প্লাস দ্য লা কনকর্ড থেকে এক বিস্তীর্ণ চওড়া রাস্তা সাঁ-জে-লিজে ধরে অন্য প্রান্তে আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ভ পর্যন্ত দেখতে দেখতে গেলাম ।

এক ফুটপাথের ওপর রেস্তোরাঁতে বসে খেয়ে নিলাম । মোটর গাড়িগুলো প্রচণ্ড জোরে চলেছে, যেন সবাই প্রতিযোগিতা করছে । আর্কের নিচে নিত্যকালের জন্য একটা আগুন জ্বেলে রেখেছে, যারা যুদ্ধে মারা গেছে তাদের স্মরণার্থে । আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ভের ওপর একদিন উঠেছিলাম । সেখানে একটা যুদ্ধ-বিষয়ক মিউজিয়াম আছে । চারদিকের দৃশ্য খুব সুন্দর ।

সোরবন ইউনিভার্সিটি থেকে জাঁ আমার জন্য এক নেমন্তন্ন এনেছে । দুদিন পরে ধড়াচূড়া পরে সাইকেল নিয়ে স্টুডেন্টস ইনস্টিটিউটে উপস্থিত হলাম । জাঁ তার সাইকেলে এসেছিল । সাইকেল দুটো দারোয়ানের হাতে দিয়ে ভেতরে গেলাম । জাঁ দো-ভাষীর কাজ করল । আমার ভ্রমণের পথ ও অভিজ্ঞতা বললাম । ফ্রেঞ্চ ফরেন লিজিয়নেয়ারদের সঙ্গে থেকেছি শুনে সবার খুব উৎসাহ ।

বক্তৃতা শেষ হলে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হল । অনেকে ইচ্ছা প্রকাশ করল আমাদের দেশে যাবার ।

জাঁ বন্দোবস্ত করেছিল আমার জন্য রেডিওতে একটা বক্তৃতার । সেখানে প্রোগ্রাম হল জাঁ ও আমার কথাবার্তা দিয়ে ।

বেশ কিছু টাকা পকেটে এল । একদিন জাঁ-কে ভালো করে একটা রেস্তোরাঁতে খাইয়ে দিলাম । রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর রেস্তোরাঁ প্যারিসে সর্বত্র । এ দেশে এই প্রশস্ত নিয়ম চালু । টেবিল চেয়ার পাতা আছে । বসা মাত্র লোক এসে অর্ডার নিয়ে যাবে । একটি কফি কিংবা একপাত্র মদ সামনে রেখে সারাদিন কাটিয়ে দিলেও আপত্তি নেই ।

প্যারিসে এ যুগের সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য কলোনিয়াল এগজিবিশন তখন শহরের বাইরে এক বিরাট ভূখণ্ড নিয়ে তৈরি হচ্ছিল । জায়গাটার নাম ভ্যাসেন, সেখানে পরে হ্রদ তৈরি হয়েছে ।

প্রদর্শনীর ভেতরে নানা দেশের থিয়েটার, নাচ দেখানো হচ্ছিল । তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উদয়শঙ্করের নাচ ।

সেই সময় উদয়শঙ্কর আর এলিসের সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ।

কিছুকাল পরে আমি লন্ডনে থাকাকালীন উদয়ের দল কন্টিনেন্টে নাচ সেরে লন্ডনে এল এবং লন্ডনবাসীদের মুগ্ধ করল তাদের কৃতিত্ব দেখিয়ে । ডার্টিংটন হল থেকে নেমন্তন্ন এল এলমহাস্টের বাড়িতে থাকবার । উদয় ডার্টিংটন হলে নাচল । অমন নাচ কেউ কখনও আগে দেখেনি ।

একদিন সন্ধ্যায় ডার্টিংটন হলের প্রশস্ত মাঠে আমি আর উদয়শঙ্কর গল্প করছিলাম। উদয় বলল যে তার বিশ্রাম দরকার। গত তিন বছর ধরে প্রত্যহ ছয় থেকে আট ঘণ্টা ইউরোপের অপেরা হাউসে, থিয়েটারে নেচেছে এবং সঙ্গীদের নাচ শিখিয়েছে।

বিশ্রাম নেওয়ার আরও প্রয়োজন, নতুন নতুন নাচ তৈরি করতে হবে। আমি যদি ওর সঙ্গে দূরে পাহাড়ের ওপর অস্ট্রিয়ায় যাই তাহলে ভালো হয়। আমি রাজি হলাম। এত বড় একজন আর্টিস্টের সান্নিধ্য পাব একান্ত নির্জনে, এই কথা ভেবে।

আমার মতে উদয়শঙ্কর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাচিয়ে কিন্তু তার চেয়ে সে অনেক অনেক বড় নৃত্যশিক্ষক। আমি ঠাট্টা করে বলতাম, তুমি গাধাকে ঘোড়া বানাতে পার। যার মধ্যে নাচবার কোনও ক্ষমতা নেই তাকেও স্বচ্ছন্দে নাচাতে পার। উদয় হেসে বলত এস, আমার দলে যোগ দাও, দেখো কেমন নাচিয়ে বানিয়ে ছাড়ি। তোমার উপযুক্ত কত নাচ আমার মাথার মধ্যে খেলছে।

উদয় পরিষ্কার ফরাসি বলতে পারত।

আমরা প্রথমে কয়েকদিন ভেনিসে কাটিয়ে বলজানো শহরে গেলাম।

আমার কোনও কাজ নেই- খাওয়া এবং উদয়ের সঙ্গে গল্প করা ছাড়া। 'কল্পনা' ফিল্ম করার কথা এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত ঘটনা, এই সময় উদয়ের চিন্তার অনেক অংশ জুড়ে ছিল।

আরেকটা কাজ জুটেছিল আমাদের দুজনের। নিত্য নতুন পাহাড়ের ওপর চড়া, পাহাড়ি পথ ধরে। মেরানোর ওপর পৌঁছলাম। ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের ওপর দুজন বহুক্ষণ পাশাপাশি শুয়ে গল্প করলাম। তখন আকাশে একটি একটি করে অনেক তারা ফুটেছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! পাহাড়ের চূড়ার কাছেই একটা হোটেল ছিল। আমরা সেখানে খাবারের জন্য গেলাম।

উদয়শঙ্কর খুব লম্বা নয় কিন্তু স্টেজের ওপর তার দাঁড়াবার, চলবার ভঙ্গিমা দেখবার মতো। মনে হয় এক বিরাট পুরুষ, স্টেজ-জমানো আকৃতি যাকে বলে। অনেক গুণের মধ্যে সে একটি বিশেষ গুণের অধিকারী ছিল, সেটা হচ্ছে সময়-জ্ঞান। যখন শো আরম্ভ করবার কথা ঠিক সেই সময় সে শুরু করবেই। তাকে দেখবার বা শোনবার জন্য একজন লোকও না থাকে তাতে তার কিছু আসে যায় না। আমি কোনও ভারতীয়কে উদয়ের মতো এই দিকে এত সচেতন হতে দেখিনি।

বলজানোতে পরিচিত জায়গায় ফিরেছি। আমাদের ছুটি ফুরোতে মাত্র পাঁচদিন বাকি। আমি রোজই তাগিদ দিতাম যে নতুন নাচ তৈরি করার কাজ একটুও এগোয়নি। আমি যেন উদয়ের গার্জেন হয়ে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলায় একটা পাহাড়ি নদীর কাঠের সেতুর ওপর

আমরা বসে আছি। অল্প চাঁদের আলো উঠেছে। অস্ট্রিয়ান চাষী দিনের শেষে গরুর গাড়ি চালিয়ে বাড়ি চলে গেল। এমন সময় উদয় দাঁড়িয়ে বলল যে তিনটে প্লট তার মাথায় এসেছে। প্রথমে প্লটের গল্প বলল। তারপর যারা নাচবে তাদের বেশভূষা কীরকম হবে, কেমন মিউজিক হবে, আলোর ব্যবস্থার কথা বিশদভাবে বলে নাচতে শুরু করল। তখন দলের সঙ্গীদের পার্টও সঙ্গে সঙ্গে নেচে দেখাল। খুব সুন্দর হয়েছে বললাম।

মনে রাখবার জন্য উদয় দ্বিতীয়বার নেচে দেখাল। গল্পের নাম দিল নিরাশ। নিরাশ পরে পৃথিবীর নানা জায়গায় নেচে দেখিয়েছে।

পরদিন সন্ধ্যায় আরেকটি নাচের থিম সম্বন্ধে কিছু বলে উদয় নাচতে আরম্ভ করল। গল্পের নাম 'ইন্দ্র'। তার একক নাচ- খুব সুন্দর। তৃতীয়টি চাষীর নাচ। এমনিভাবে তিনদিনে তিনটে নাচ তৈরি করতে পারল।

আমি ও এলিস বোনার প্রায়ই প্রথম সারিতে বসে উদয়ের নাচ দেখতাম। একদিন এক সৌম্যদর্শন, লম্বা, বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন ডেনিশ আর্টিস্ট বলে। তিনি ভেবেছিলেন আমি বুঝি উদয়ের নাচের দলের একজন। তখন আমি আমার পরিচয় দিলাম পৃথিবী-পর্যটক বলে।

ভদ্রলোকের নাম আক্সেল ইয়ার্ল। তিনি আমাকে ডেনমার্ক যাবার নেমন্তন্ন করলেন এবং তাঁর বাড়িতে থাকবার কথা বারবার বললেন। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ঘুরেছি অথচ স্কান্ডিনেভিয়ান সভ্যতার উৎসস্থান ডেনমার্ক দেখিনি, এটা হতে পারে না। এলিসকেও নেমন্তন্ন করলেন।

১৫

শীতের মুখে ইউরোপের উত্তর-প্রধান দেশে যাবার ইচ্ছা ছিল না, তবু তার আমন্ত্রণ এড়ানো গেল না। কথা রইল এক সপ্তাহকাল অন্তত ইয়ার্লের বাড়িতে থাকব। আমার থাকাকালীন এলিসও সেখানে গিয়েছিল, বিশেষ করে কাই নিলশেনের ভাস্কর্য দেখবার জন্য। অপূর্ব তার কাজ! লোকে তাঁকে বলে মিকেল অ্যাঞ্জেলো অব দি নর্থ। বেলজিয়াম হয়ে আমি ডুসেলডর্ফ ও ব্রেমেন ছেড়ে ল্যুবেক থেকে জাহাজ নিয়ে ডেনমার্কের কোপেনহাগেন শহরে পৌঁছলাম।

টেলিফোন যোগে আক্সেল ইয়ার্লকে আমার পৌঁছনোর খবর জানালাম। তারপর রাত প্রায় দশটায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে হিলেরয়েড শহরে গেলাম। সেখান থেকে চার মাইল দূরে স্ট্রয়েডামে যখন হাজির হলাম দেখি মিঃ ইয়ার্ল বাড়ির সব আলো জ্বেলে আমার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। আমাকে পুরনো বন্ধুর মতো সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

ডিনার শেষ করে দোতলার একটি প্রশস্ত ঘরে থাকবার জায়গা পেলাম। ইয়ার্ল সকাল সাড়ে ছটার সময় আমাকে প্রস্তুত থাকতে বললেন। প্রাতরাশ সেরে সোফিনবার্গে ডেয়ারি ফার্ম দেখতে যাবার কথা ঠিক হল।

স্ট্রয়েডাম বাড়িটার নাম। শত শত একর জঙ্গল, মাঠ, জলাশয় ইত্যাদি ঘেরা। বাড়ির সংলগ্ন বাগান দেখবার মতো। স্ট্রয়েডাম দেখলে মনে হয় ভূস্বর্গ। বাড়িটা বিরাট। জানলার বাইরের দৃশ্য অপূর্ব।

প্রথম রাত্রে স্ট্রয়েডামে আমার যা অভিজ্ঞতা হয় তা কখনও ভুলব না। প্রকাণ্ড বড় বসবার ঘরে ঢুকেই সামনের দেওয়ালে অজন্তার পদ্ম হাতে নারীর ছবিটি জীবন্তের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার ওপর অজন্তার গন্ধর্ব যাত্রা বেশ বড় করে আঁকা রয়েছে। এই দুটো কাজই অসাধারণ সুন্দর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি অবাক হয়ে দেখছি দেখে ইয়ার্ল হাসলেন। তারপর সুদূর ডেনমার্কের নিভৃত স্ট্রয়েডামে কেমন করে কোথা থেকে এল জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কাল সব কথা হবে। এখন হাত ধুয়ে নাও, খাবার তৈরি। খাবার ঘরে ঢুকে আরেকবার আশ্চর্য হলাম। দেওয়াল জোড়া তাজমহল, চাঁদনি

রাতে আঁকা। আরও ভারতবর্ষের নানা বিষয়ের পেন্টিং দেওয়ালে ঝুলছে। আমার কাছে মস্ত একটা হেঁয়ালি মনে হল।

ইয়ার্ল বললেন, আমি বুঝতে পারছি তোমার আমার মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হবে! আজ থেকে আমি তোমাকে বিমল বলে ডাকব, তুমি আমাকে আকসেল বলে ডাকবে। প্রথমটা আমার সঙ্কোচ লাগত। আমার বয়স ২৭, আকসেলের বয়স ৬০। পরে অভ্যাস হয়ে গেল এবং যে গভীর বন্ধুত্বের ইঙ্গিত শুনেছিলাম তা গভীরতম আত্মীয়তায় পৌঁছেছিল। অনেক রাত হয়েছিল বলে প্রথম দিনই মিসেস ইয়ার্লের সঙ্গে পরিচয় হল না। আমার মনে হয় তিনি অপেক্ষা করছিলেন আমার সম্বন্ধে তাঁর স্বামীর মন্তব্য জানবার জন্য।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খাবার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল। মিসেস ইয়ার্ল আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বৃদ্ধার চেহারা রানির মতো, দেখলে ভয় ও ভক্তি দুইই হয়। তিনি প্রথমেই বললেন, আকসেলের সঙ্গে যেমন নাম ধরে ডাকবার সম্পর্ক পাতিয়েছি, তাঁর সঙ্গেও তেমনই হবে। অর্থাৎ তাঁকে ইয়ুটা বলে ডাকতে হবে। শুধু এইটুকুই এখন বলব যে ইয়ুটা আমার নিকটতম বন্ধু, মা ও বোনের স্থান অধিকার করেছিল,গভীর ভালোবাসা এবং যত্ন দিয়ে।

পরদিন সাতটার সময় আকসেল ও আমি রওনা হলাম বাড়ির পিছনেই উপবনের ভেতর দিয়ে সোফিনবর্গ ডেয়ারি ফার্মের দিকে। সমস্ত পথটা, বড় বড় গাছের গা ঘেঁষে, কখনও ছোট বড় পুকুরের পাড় দিয়ে।

সোফিনবর্গে গিয়ে দেখি আকসেলের বিরাট জমিদারি। সেখানে চারশো সব চেয়ে ভালো জাতের গরু আছে। বারোটা বড় বড় ঘোড়া, অসংখ্য শুয়োর, কয়েক হাজার মুরগি বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে। আকসেলের কাজ হল সমস্ত ফার্মটা পরিক্রমা করা এবং লোকেদের সব কাজ যথাযথ বুঝিয়ে দেওয়া। ফার্মে চারটে অতিকায় ষাঁড় ছিল। তাদের নাম রেখেছিল জুলিয়াস, ব্রুটাশ, কায়াস ও সীজার। একেকটা ষাঁড়ের দাম ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা। এদের আলাদা একটা বাড়িতে রাখা হয়। ফার্মের চারদিকে ঘাস খাবার মাঠ আছে ভাগ ভাগ করা। কোনওটায় গরু, কোনওটায় ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদি ছাড়া হয় দিনেরবেলায়। তাছাড়া ছিল চাষের জন্য বড় বড় জমিতে লাঙল দেবার ব্যবস্থা। বাড়ি ও ফার্ম মিলে ১২০০ একর।

আমাদের দেশে বলদে লাঙল দেয়। ইউরোপে বড় বড় ঘোড়া এই কাজটা করে। ফার্মের জীবজন্তুর জন্য যাবতীয় খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করে। ডেয়ারি ফার্ম মানে কেবলমাত্র একটা বড় শেড ও একপাল গরু নয়। সব ফার্মের সঙ্গে অনেক জমিও আছে।

গ্রীষ্মকালে গরু ঘোড়াকে মাঠে ঘাস খেতে ছেড়ে দিলেই যথেষ্ট । শীতের সময় মাঠের ওপর সাদা বরফ প্রায়ই জমে থাকে । তখন মাটি খুঁড়ে বীট ও সব্জি বের করে জন্তুদের খেতে দেয় । আমরা গরুকে খড় খেতে দিই শুনে সবাই হাসে । বলে ওতে সার পদার্থ কতটুকু?

আমাদের দেশে কত গরু আঁস্তাকুড় থেকে কাগজ, চট, সব্জির খোসা ইত্যাদি খেয়ে দিন কাটায়, সে কথা না বলাই ভালো মনে করে চুপ করে গেলাম । আমরা গরুকে পুজো করি কিন্তু তার প্রতি কোনও যত্ন নিই না ।

শুয়োরের ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । ছোট বয়স থেকে শুয়োরকে শেখানো হয় যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় সে ময়লা করতে পারে । ডেনমার্কে শুয়োর কী খায় সেটা জানা ভালো । মাখন তুলে নেবার পর ঘোলটা শুয়োরকে খাওয়ানো হয় । সেই সঙ্গে আলু ও গম ভাঙা মেখে দিলে শুয়োর ভালোবেসে খায় এবং সে স্বাস্থ্যবান রোগমুক্ত জীব হয় । বেকন বা হ্যাম তৈরি করার আগে ল্যাবরেটরিতে দেখা হয় সে শুয়োর সম্পূর্ণ নীরোগ কিনা । শুয়োরকে মাঝে মাঝে পরিষ্কার কাদা মাটিতে খেলতে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে । এই কারণে পাশ্চাত্য দেশে শুয়োরের মাংস খাওয়ার প্রচলন খুব বেশি । অন্য মাংসের চেয়ে সুস্বাদু তো বটেই ।

দুদিন পরে, আকসেলের শরীর অল্প অসুস্থ হল । আমার ওপর অনুরোধ হল যে সোফিনবর্গ ফার্মে গিয়ে সব জীবজন্তুর ও কর্মীদের খবর আনতে হবে । আমি একাই গেলাম এবং সব দেখে শুনে মন্তব্য লিখে দিলাম । আকসেল মহা খুশি । আমাকে উৎসাহিত করবার জন্য বলল, এবার থেকে তুমি রোজ রিপোর্ট দেবে । খুব ভালো হয়েছে ।

আকসেল সেরে উঠল দুদিন পরে, কিন্তু আমি অসুস্থ হলাম । কেন জানি না পেটে ব্যথা অনুভব করছিলাম । ডাক্তার এসে বললেন যে গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়েছে, সময়ে না খাওয়ার জন্য বা অনেকদিন ধরে অনিয়ম করার জন্য । ডাক্তারের পরামর্শ হল যে ঠিক নিয়মমতো রোজ খুব সাদাসিধে খাবার ও দুধ খেতে হবে, সেই সঙ্গে ওষুধ । ব্যথা বাড়লে অন্ত্র ফুটো হবে এবং জীবন সংশয় হবার সম্ভাবনা । তখন অপারেশন অনিবার্য ।

এই খবরটাতে আমার মন যত খারাপ হল, ইয়ার্ল পরিবার ততই খুশি, যে আমাকে আটকাতে পারা যাবে । অল্পদিনের মধ্যে এঁরা আমাকে এত ভালোবেসেছিলেন যে মনে হয় যেন সে গল্পের কথা ।

ইয়ুটা সমানে বড় বড় আর্টিস্ট, বৈজ্ঞানিক, স্থাপত্য বিশারদ, কবি ইত্যাদিকে ডিনারে নেমন্তন্ন করে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন । এই বাড়িতে আমার ভাব হয়

অনেকের সঙ্গে যেমন নীলস বোর (পরমাণু-বৈজ্ঞানিক), মেরিয়ান অ্যান্ডারসন (নিগ্রো জগদ্বিখ্যাত গায়িকা) এবং ডেনিশ রাজকবি হান্স হাটুয়িগ শেডর্ফ, পরিবার সহ এঁরা প্রায়ই আসতেন ।

আমার পেটের ব্যথা কিন্তু না কমে বাড়তেই লাগল । তখন সবচেয়ে বড় ডাক্তার গ্রামকে ডাকা হল । তিনিও বললেন, সাবধানে, সুনিয়মে থাকার প্রয়োজন । সারতে অনেক সময় লাগবে । আমার মাথায় বজ্রপাত হল । শেষকালে ডেনমার্কে এসে কি আমার পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করব?

দু-চারদিন শুয়ে থাকার পর আবার সোফিনবর্গে যেতে আরম্ভ করলাম । আমি যখন আটকা পড়েছি তখন আমি আকসেলকে জানালাম যে সোফিনবর্গে গো-পালন শিখব এবং সেখানেই থাকব । ইয়ার্ল পরিবার তাতে খুব খুশি কারণ আমি তখনই না বেরিয়ে কাজে মন দেব । একটি শর্ত করলেন, আমি যেখানে আছি সেইখানেই থাকব এবং খাব ।

আকসেল প্যারিসে বিশ বছর পেন্টিং করেছে, তবু তার মন ভরেনি । ভারতবর্ষ তাকে টানল এবং সে এদেশের শিল্প সম্পদ দেখে মুগ্ধ । হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত ঘুরে সে নানা বিষয়ের পেন্টিং করে ।

আকসেলের সঙ্গে এদেশের বহু গণ্যমান্য আর্ট-উৎসাহীদের সঙ্গে আলাপ হয় । সাঁচি, তাজ, অজন্তা, ইলোরা ইত্যাদি দেখে সে আমার দেশকে ভালোবেসে ফেলে । স্যার জন মারশাল, হ্যাভেল, স্যার আকবর হায়দরি (যিনি নিজামের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) ইত্যাদির সঙ্গে অনেক পরামর্শ হয় । বিষয়টা হচ্ছে কেন ভারতীয় ছেলেরা ফ্রান্সে ও ইতালিতে যায় শিল্প শিখতে যখন তার নিজের দেশে অমূল্য এবং অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে । ফলে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আর্টস প্রথম কলকাতায় জন্মগ্রহণ করল । আকসেল মনে করত একমাত্র বড় ভারতীয় আর্টিস্ট যিনি ঠিক পথে চলে সব চেয়ে উন্নতমানের পেন্টিং করেছেন, তিনি হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

আকসেল ১৯০৩ ও ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দুবার এদেশে অনেক দিনের জন্য আসে । যে সব অরিজিনাল ভারতীয় পেন্টিং দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলি আকসেলের আঁকা । বাড়িতে অন্যান্য ঘরে আরও পেন্টিং ছিল । বেশিরভাগ একটা অন্য বাড়িতে রাখা ছিল । সব ছবি উঁচু মানের । আকসেল ফরাসি দেশে দীর্ঘদিন ধরে পেন্টিং করে টেকনিকটা খুব ভালো রপ্ত করেছিল আর তার সঙ্গে ভারতীয় বিষয়বস্তুর প্রতি গভীর অনুরাগ, এই দুই সমন্বয়ের ফলে তার পেন্টিং সত্যিই অপূর্ব ।

অত উঁচু মানের পেন্টিং কিন্তু কখনও কোনও প্রদর্শনীতে আকসেল দেখায়নি । আকসেল বলে তার নিজের আনন্দের জন্য এঁকেছেন এবং তাইতে সে খুশি ।

ছবির বাড়ির চাবি জোগাড় করে খুলে অমূল্য ভারতীয় পেন্টিংয়ের সমারোহ দেখেছি । ছবির সম্বন্ধে আলোচনা করতেও আকসেল নারাজ, যে ছবি স্ট্রয়েডামে টাঙানো আছে তাদের সম্বন্ধে একবার দু-চার কথার মন্তব্য শুনেছিলাম । যেমন 'তাজমহল' ছবিটা চাঁদনি রাতে আঁকা, এটা বৌদ্ধ ভিক্ষুর অনুরাধাপুরে আঁকা, ওটা স্যার আকবরের পুত্রবধূকে আঁকা, সেটা গুরুদাসপুর 'গুরদোয়ারা', এমনই এক কথায় তার বক্তব্য সে শেষ করত ।

ভারতীয় জিনিসের প্রতি সৌন্দর্যবোধ যেমন পাশ্চাত্য দেশবাসীর মনে সহজে জাগে, আমাদের তেমন হয় না । হয়তো সারাক্ষণ দেখি বলে । কলাগাছের বিরাট বড় পাতা ইউরোপের কোনও গাছের হয় না । কলার ঝাড়ের পিছনে সূর্যাস্ত হচ্ছে, সেটা পেন্টিংয়ের একটা ভালো বিষয়বস্তু হতে পারে, আমাদের দেশের লোকেরা ভাবে না । যতবার ছবিখানি দেখেছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ততবার আকসেলের মনে পড়ে কলাগাছের বড় পাতা, সেইসঙ্গে অস্তরবির বিচিত্র রং ।

আকসেল এত বড় একজন দিগগজ মানুষ যে তার সম্বন্ধে লিখে কয়েকটা বইয়ের পাতা ভরানো যায় । আমি অল্প কিছু লিখছি, এই ভারতপ্রেমিককে জগতের কাছে জানাবার জন্য । একজন মানুষ একটা জীবনে কত বিষয় আয়ত্ত করতে পারে আকসেল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । সে একজন ভাষাবিদ এবং লেখক । ভিশনে ব্লাডে বা ঝরাপাতা বইটা তার বহু আদৃত হয়েছে বিদ্বজ্জন সমাজে । ভাস্কর্যে তার হাত পাকা । কোপেনহেগেনের আর্ট গ্যালারিতে আকসেলের তৈরি স্ট্যাচু দেখা যায় । আমার একটা বাস্ট করেছিল । সেটা মনে হয় জীবন্ত ।

পাখির সম্বন্ধে তার জ্ঞান সুগভীর । একদিন বাগানে বসে চা খাচ্ছি, একটা পাখির ডাক শুনে আকসেল বলল এ ডাক তো শুনিনি । বিমল তুমি চট করে লাইব্রেরিতে গিয়ে অরনিথলজির বইটা ও বাইনোকুলার নিয়ে এস । আমি বইটা এনে সামনে দাঁড়ালাম । আকসেল বলল, খোল ২৬৫ পাতা, দেখ তো এই সব কথার বিবরণ দেওয়া আছে কিনা পাখিটার সম্বন্ধে । এই কথা বলে বাইনোকুলার দিল আমার হাতে । আমি দেখলাম আকসেল যা বলল সেখানেও তাই । বইটায় আরও লেখা আছে যে এই পাখি ডেনমার্কে (জাটল্যান্ডে) অনেকদিন আগে একবার এসেছিল ।

আকসেলের বাগানে এবং উপবনে সব গাছের সঙ্গে পাখির বাসা লাগানো আছে, তাদের ডিম পাড়তে উৎসাহিত করার জন্য । গরমের দিনে কত পাখি দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই । রাত্রে নাইটিংগেল পাখির গান শুনেছি । দিনেরবেলায় মাঠে লাঙল চালাবার সময় লার্কের ডাক শুনেছি এবং সে পাখি দেখেছিও ।

শীতকালে বরফ পড়বার আগেই পাখিরা সব দক্ষিণে গরম দেশে চলে যায় ।

যে সব পাখি স্ট্রয়েডামে জন্মায়, তাদের পায়ে রিং পরিয়ে দেওয়া হয় । সেই রিঙের গায়ে লেখা থাকে জন্মমাস ও ঠিকানা । পরে অনেক দূর দূর দেশে এমনকী আফ্রিকায় এইসব পাখির সন্ধান পাওয়া যায় । পক্ষিবিদরা গতিবিধি লক্ষ করে লিখে রেখেছেন এবং তা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয় ।

সোফিনবর্গ ফার্মের বার্ন হাউসের ওপর সারস পাখির জন্য বাসা করা আছে । শীতান্তে ভিক্টোরিয়া নায়ানজা হ্রদের কাছ থেকে অসংখ্য সারস পাখি উত্তর ইউরোপে এসে থাকে । সেখানে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চাদের বড় করে, যতদিন না তারা আফ্রিকায় উড়ে যেতে সক্ষম হয় ।

একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা হল । বার্ন হাউসের কাছ দিয়ে আমি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম মা সারস পাখি তিনটে বাচ্চার মধ্যে একটার ঘাড় মটকে ছুড়ে ফেলে দিল । আমি ভাবলাম হয়তো বাসা থেকে পড়ে গেল তাই বাচ্চাটাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে সেই উঁচু বার্ন হাউসের ওপর উঠলাম এবং বাসায় বাচ্চাটাকে রাখলাম, যেখানে অন্য দুটি বাচ্চা ছিল ।

আমি ওপর থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে মা বাসায় ফিরে এল এবং সজোরে বাচ্চাটাকে নির্যাতন শুরু করল, যেন মেরে ফেলাই উদ্দেশ্য । তারপর ঘাড় বারবার মুচকে ছুড়ে ফেলল আবার ।

বাচ্চাটা প্রায় জীবন্মৃত । তখনও প্রাণ আছে দেখে তুলে নিলাম এবং স্ট্রয়েডামে নিয়ে গেলাম ঘোড়ার পিঠে বসে ।

হেমন্তে যখন সব পাখি দক্ষিণে উড়ে চলে গেল, সেই বাচ্চা আমার কাছে রয়ে গেল । পরে তিন ফুট বড় হল এবং ঘর থেকে ঘর ঘুরে বেড়াত ।

একজন পক্ষিবিদ ঘটনাটি শুনে বললেন যে সারস দুটির বেশি তিনটি বাচ্চা পুষতে চায় না । খাবার জোগাড় কঠিনতর হয় । তাছাড়া বাসায় জায়গা হয় না । এই সব কারণে যে বাচ্চা দুর্বল, সে হয়তো আফ্রিকায় দূর পথে যেতে পারবে না, তাই তাকে মা মেরে ফেলে । পক্ষী জগতের নিয়ম নাকি এই ।

আমার পোষা বাচ্চার নাম দিলাম ভাইকিং । সে মস্ত বড় এবং সুস্থ দেহ নিয়ে বিজ্ঞ মানুষের মতো আমার পিছনে পিছনে চলত ।

পরের বছর বার্ন হাউসের ওপর বাসায় ভাইকিংকে বসিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম । ফিরে দেখি আমার আগে ভাইকিং বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে । কয়েকদিন আমাকে বেশ বেগ পেতে হল বোঝাতে যে তাকে আমি বিশ্ব ভ্রমণে নিয়ে যেতে পারব না । তার স্থান

অন্য পাখিদের সঙ্গে। আমিও এক সারস পাখির মতো কিছুদিন পরে দূরে চলে যাব তখন কে ওকে দেখবে?

আমি একটা বড় পেঁচা ও খেঁকশিয়াল পুষেছিলাম, পেঁচাটার খিদে পেলে মোটা গলায় 'হু' বলে ডাকত। খেঁকশিয়ালটা ডাকত না কিন্তু আমার কোলে পিঠে চড়ত।

স্ট্রয়েডামের এস্টেটের মধ্যে অনেক হরিণ ছিল। তারা যেখানে খুশি চলে বেড়াত। বাইরের জঙ্গলে চলে যাবার সম্ভাবনা ছিল না বললেও হয়, চারদিক অনেক মাইল উঁচু তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। রাত্রে বাড়ির বারান্দার ওপর হরিণ উঠে আসত মুখরোচক খাবারের খোঁজে।

দিনেরবেলায় জানলার বাইরে চাইলে সবুজ ঘাসের ওপর হরিণদের দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ভারি সুন্দর দেখায়। একটা সিক্কা (এক রকম আফ্রিকান হরিণ) হরিণের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। প্রায় রোজ আমার হাত থেকে গাছের এক রকম শেকড় খেত। একদিন কী দুর্মতি হল জানি না, সে শেকড় না ঘেয়ে শিং দিয়ে মারবার জন্য ছুটে এল। অতি কষ্টে ধ্বস্তাধস্তি করে তার শিং ধরে ফেললাম। তারপর অপ্রীতিকর ঘটনা শুরু হল। যতই শাস্তি দিই না কেন, সে পরমুহূর্তে উঠেই আবার শিং নিয়ে তেড়ে আসে। শেষকালে হরিণের শিং ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে লোহার তারের জালের মধ্যে মাথাটা আটকে দিলাম।

জাল টপকে, দুই রক্তাক্ত হাত নিয়ে আকসেলকে সব ঘটনা বললাম। সে বলল যে সিক্কা হরিণ ঠিক পোষ মানতে চায় না,তাছাড়া মেটিং সিজনে ওদের মাথা খারাপ হয়। আকসেল তৎক্ষণাৎ তার শিকারি কর্মচারীকে হুকুম দিল সিক্কাকে গুলি করে মেরে ফেলবার জন্য।

আরেকবার একদিন সোফিনবর্গ ফার্ম থেকে মাঠের ওপর দিয়ে স্ট্রয়েডামে আকসেল ও আমি লাঞ্চ খেতে আসছিলাম। এমন সময় কালান্তক যমের মতো সীজার নামের ষাঁড় কোথা থেকে তেড়ে এল আকসেলকে গুঁতো মারবার জন্য। আমি শেষ মুহূর্তে আমার বুটসুদ্ধ একটা লাথি মারলাম সীজারের চোখে, খানিকক্ষণ বোধ হয় ভালো দেখতে পাচ্ছিল না এই অবসরে আকসেল মাটি থেকে উঠে বেড়ার দিকে ছুটতে লাগল আমি তখনই গিয়ে আবার চোখে লাথি মারলাম। সীজার ইতস্তত করছে, বুঝতে পারছে না কাকে তাড়া করবে। ইতিমধ্যে আকসেল গেট পার হয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছল, আমিও সুবিধা পেয়ে তারের জালের ওপর চড়ে বসলাম যাতে নাগাল না পায়। সীজার এমন ক্ষেপে গেছে যে মনে হচ্ছে যাকে দেখবে তাকেই শেষ করে দেবে।

আকসেল তখনও হাঁপাচ্ছিল। দুজনে আস্তে আস্তে বাড়ি গেলাম। শিকারির ডাক পড়ল, এবার সীজারের পালা। কিছুক্ষণ পরেই তার দেহ মাটির ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে। যার দাম ছিল ষাঁড় হিসাবে ১৫,০০০ টাকা সে মাংস হিসাবে বিক্রি হবে ৬০০ টাকায়। যখনই কোনও জন্তু হিংস্র হয়ে যায় তখনই তাকে মেরে ফেলা এদেশের নিয়ম। না হলে অন্য মানুষের জীবন সংশয় হবে।

ভারতবর্ষ থেকে একটা কলা গাছ, খেজুর গাছ ও বুগেনভিলিয়া আকসেল নিয়ে গিয়েছিল ডেনমার্কে। সবাইকে যত্ন করে সে হট হাউস (সারা বছর নব্বই ডিগ্রি উত্তাপের মধ্যে রাখত) দেখাত।

ফুলে ভরে বুগেনভিলিয়া মস্ত বড় হল কিন্তু কলা ও খেজুর গাছ তেমন বাড়ল না যদিও বেঁচে থাকল ভালোভাবেই। ফল ফুল কিছুই হল না এই দুটো গাছে। আকসেল তাদের সামনে গিয়ে নমস্কার জানায় এবং বিড় বিড় করে বলে,ভারতবর্ষের সঙ্গে তুমি আমার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। বেঁচে থাক, তাহলেই আমার আনন্দ।

আকসেলের লাইব্রেরিতে ৫,০০০ বই আছে নানা ভাষার- তার মধ্যে ভারতীয় বিষয়ে লেখা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও পেন্টিং সম্বন্ধে অনেক বই। দেখলাম ও সি গাঙ্গুলির লেখা বই আকসেলের খুব পছন্দ। নিয়মিতভাবে আমার দেশ থেকে তার কাছে বই পাঠানো হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা দুর্মূল্য বই লাইব্রেরিতে রয়েছে। সময় পেলে সে সব বই যথাসাধ্য দেখেছি।

আকসেল এক কালে ভারতবর্ষে গিয়েছিল বলেই যে আমার দেশকে ভালোবাসত, এমন নয়। আকসেলের ভারতপ্রেম নিত্য, শাশ্বত সদাজাগ্রত রূপ নিয়েছে। আমার সঙ্গে আলাপ তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। আমি ভারতবর্ষের এক জীবন্ত মানুষ। আমাকে পেয়ে সে যেন নতুন করে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করল।

আকসেলের একটা রেসের ঘোড়া ছিল। একদিন বলল, এই ঘোড়া তোমাকে দিলাম। একে ভালোবেসো, যত্ন কর। ঘোড়াটির নাম প্রিন্স। কিং নাম যেন তাকে আরও বেশি মানাত। যেমন বড়সড় তেমনই সুন্দর দেখতে। বড় বড় চোখ দিয়ে আমার মুখের দিকে দেখত। খালি হাত দেখলে আমার ব্রীচেসের পকেটে নরম মুখটা দিয়ে ঘষত আর খুঁজত এক টুকরো চিনি। সে ভীষণ চিনি ভালোবাসত। আমি রোজ একটি কিউব তাকে খাওয়াতাম। এমনিভাবে আমাদের দুজনের মধ্যে গভীর বোঝাপড়া ও ভালোবাসা জন্মাল।

যখন বাড়ির সবাই ঘুমোত, আমি তখন প্রিন্সের ওপর স্যাডেল চাপিয়ে চড়তাম এবং রাস্তার ওপারে গ্রিপস্কভ জঙ্গল ও ছোট বড় টিলার ওপর প্রিন্স উদ্দাম ছোটাছুটি করত। একদিন ভোরবেলায় দেখি এক তরুণী ঘোড়া ছুটিয়ে আমার পিছু পিছু চলেছে। জঙ্গল

যেখানে শেষ হল সেখানে থামলাম। পাশেই তরুণীও থামল, আমি গুড মর্নিং বললাম, নিজের নাম ও পরিচয় দিলাম। তরুণী বলল, তার নাম মিস স্কাউ অর্থাৎ মিস জঙ্গল। সে হেসে বলল যে প্রিন্সকে ভালোরকম চেনে, ইয়ার্লের প্রিয় ঘোড়া। আমি বললাম, প্রিন্স এখন আমার হয়ে গেছে।

আমি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরলাম এবং মিস স্কাউয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আকসেলকে বললাম। সে বলল যে মিস স্কাউয়ের তিনকুলে কেউ নেই। ওর মা বাবা মারা যাবার পর ওদের একটা বড় আস্তাবল ও দশটি রাইডিং ঘোড়া নিয়ে এক ট্রেনিং স্কুল খোলে। সারাদিন ঘোড়ার ওপরই থাকে। ভালো টিচার। যথেষ্ট রোজগার হয়। স্টেবলের একাংশে মিস স্কাউয়ের থাকবার জায়গা। সে দশটি ঘোড়াকে দেখাশোনা করে ও চোখে চোখে রাখে। নিজের রান্নাবাড়া করে, মনে হয় সুখেই আছে।

পরের দিন মিস স্কাউয়ের সঙ্গে আবার দেখা জঙ্গলের ভেতর। সেদিন অনেক দূর গেলাম। এই প্রকাণ্ড গ্রিপস্কভ জঙ্গলের সবটা তার নখদর্পণে। জঙ্গলে কোথাও পথ ছিল না, বার্চ ও পাইন গাছে ঠাসা। শত শত বছর ধরে পাইন পাতা পড়ে নিচেটা ঘোড়া চালাবার পক্ষে চমৎকার হয়েছিল। আমার কেবলই মনে হত একা গেলে হারিয়ে যাব গাছের মধ্যে। আগে বেশি দূর যাবার সাহস হত না।

রাইডিং সেরে মিস ফরেস্টের স্টেবল দেখতে গেলাম। আমি তাকে ফরেস্ট বলে ডাকতাম। দেখতে সে সুশ্রী, বয়স ২৪-২৫ হবে। আমাদের দেশে ভাবা যায় না যে একটি তরুণী একা ঘোড়ার স্টেবলে বাসা বেঁধে ঘোড়ার সঙ্গে জীবন কাটায় এবং রাইডিং লেসন্স দেয় ছেলেমেয়েদের, সে নির্ভয়ে থাকে এবং সবার সম্মানের পাত্রী।

যারা ঘোড়া নিয়ে চড়তে গিয়েছিল তারা একে একে স্টেবলে ফিরল। মিস ফরেস্ট প্রত্যেক ঘোড়ার গায়ে হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে আদর জানাল, তারপর স্টেবলে যথাস্থানে ঘোড়াকে ছেড়ে দিল। সে একাই সমস্ত ঘোড়ার পরিচর্যা করত। ফরেস্টের নিজস্ব ঘোড়াটি খুব সুন্দর। সোনালি রং, ঘাড় ও ল্যাজের চুল সাদা সিল্কের মতো। তার নাম সীতা, আমার দেওয়া।

এয়ারফোর্সের একজন অফিসার, লেফটেন্যান্ট ইয়েনসনের সঙ্গে মিস ফরেস্টের স্টেবলে আলাপ হল। ইয়েনসন সবেমাত্র বিয়ে করেছে। তার বাড়িতে হিলেরয়েডে আমাকে চা খাবার নেমন্তন্ন করল।

আমি একটা রাইডিং ক্লাবে ভর্তি হলাম। প্রতি রবিবার স্ত্রী পুরুষ দল বেঁধে দূরে কোথাও যাওয়া এবং কফি খাওয়া আমাদের কাজ ছিল। অন্যদিন ভোরে গ্রিপস্কভ জঙ্গলে অনেকে রাইডিং করত। দলে সভ্য ছিল বাইশ জন। তাদের মধ্যে আমার খুব খাতির

ছিল । অনেকদিন ক্যামেরা নিয়ে যেতাম, সুন্দর জায়গা দেখে ছবি তুলতাম । বাইশটি ঘোড়ার মধ্যে প্রিন্স সবচেয়ে বড় ও সুন্দর দেখতে ছিল । তার স্বভাবটাও ছিল চঞ্চল । ঘোড়ার ওপরে উঠে যত দূরে যাও যত উঁচু খড়ের ঢিবি লাফাও, কিছুতেই দ্বিরুক্তি নেই, কেবল দাঁড় করিয়ে রেখ না । মনে হত আমরা যাত্রাশেষে সদস্যরা মিলে যখন গল্প করতাম তখন প্রিন্সও গল্প করতে চাইত এবং পারত না বলে চটে যেত । সবাই প্রিন্সকে ভালোবাসত ।

আমার দুদিন রাইডিং অ্যাকসিডেন্ট হয় । প্রথমবার স্যাডলের পেটের চামড়া ছিঁড়ে যাওয়াতে আমি মাটিতে পড়লাম । প্রিন্স বুঝতে পারল না, আমার কী হল । লাফালাফি শুরু করল আমার দেহের চারপাশে কিন্তু এখন সাবধানে তোলপাড় করল যে আমার আঁচড়টি লাগেনি । আরেকদিন জঙ্গলে দেখলাম গাছ পড়ে আছে এক জায়গায় অনেক । প্রিন্সের স্বভাব ছিল তাদের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যাওয়া । দুটো গাছ এত কাছাকাছি পড়ে ছিল যে কেমন করে লাফাব আমি ভাবছি, এমন সময় প্রিন্স খুব জোরে ছুটে প্রথম গাছটি পার হল এবং পরমুহূর্তেই জাম্প করল দ্বিতীয় গাছটি পার হবার জন্য । আমি টাল সামলাতে না পেরে প্রিন্সের মাথার ওপর দিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লাম ।

এমন বেকায়দায় হাতের একটা বুড়ো আঙুলের ওপর চাপ দিয়ে পড়লাম যে আমার হাত অবশ হয়ে গেল । কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালাম । ঘামে প্রিন্সের সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিল, সে কাছে এসে কাঁধের ওপর মাথা রেখে দাঁড়াল । ভাবটা এই, আহা তোমার কি খুব লেগেছে?

অবশ হাত নিয়ে অনেকক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে হাঁটলাম, তারপর আস্তে আস্তে যখন একটু সহ্য করবার অবস্থা হল, প্রিন্সের ওপর কোনওমতে চড়লাম এবং বাড়ি পৌঁছলাম । বন্ধুরা দেখতে এল এবং সবাই বলল যে সাতবার না পড়লে কিংবা কলার বোন না ভাঙলে ভালো রাইডার হওয়া যায় না ।

ইয়ুটা ডাক্তার ডেকে গরম জলের সেঁক দিয়ে এমন একটা হুলুস্থূল কাণ্ড বাধাল যে সবার প্রাণান্ত । ডাক্তার বললেন, হাড় ভাঙেনি তবে মচকে গেছে । ডাক্তারও একজন রাইডিং ক্লাবের সদস্য । অনবরত ডেনিশ শুনতে শুনতে আমার কান অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল । আমি অল্প অল্প বলতেও আরম্ভ করলাম ।

পেটের ব্যথার চিকিৎসা চলছে, অনেক কমেছে তবে সারতে দেরি আছে । খাওয়াদাওয়া খুব নিয়মিত এবং পরিমিত । আগে ছিল আমার উটের জীবন । যেখানে খাবার পেয়েছি, প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি খেয়েছি দুর্দিনের কথা ভেবে । আবার না খেয়েও অনেক

দিন নিরম্বু উপবাসে কাটিয়েছি । পেটে খাবার পড়ছে না অথচ প্রাণপাত পরিশ্রম করছি, এইটেই আমার ডেওডেনাল আলসার হবার কারণ ।

দেড় মাস হয়ে গেল অথচ আমার আলসার সারেনি জেনে ইয়ুটা ও আকসেলের কী আনন্দ, তাহলে আমি বেশ আটকা পড়লাম । ডাক্তার বলছেন, ভ্রমণে বেরোলে মৃত্যু অনিবার্য ।

আকসেল বলেছিল, সোফিনবর্গ ফার্মে কাজ করার জন্য হাত খরচ পাব । আমার পক্ষে অনেক টাকা, কেননা থাকার, খাওয়ার কোনও খরচ ছিল না । ট্যুরের জন্য টাকা জমাতে আরম্ভ করলাম ।

রোজ সকালে সোফিনবর্গে গিয়ে ঘোড়ার সাহায্যে লাঙল চালানো থেকে ফার্মিংয়ের জন্য কাজ, মুরগি, শুয়োর, ঘোড়া ও গো-পালন আমার ভালোই লাগত ।

আকসেল আমার জন্মদিনে একটা বড়, দুজন বসবার উপযুক্ত মোটরগাড়ি উপহার দিল । তার পেট্রোলের খরচ আমার লাগত না । আমার সম্পত্তি বাড়ছে দেখে আমি আতঙ্কিত হলাম ।

একদিন সবচেয়ে বড় দর্জির ডাক পড়ল । সে এসে আমার মাপ নিয়ে গেল এবং দশদিন পরে ছটা দামি কাপড়ের স্যুট বানিয়ে নিয়ে এল । বড় বড় পার্টিতে যেতে হবে সেজন্য টেল কোট এবং সাধারণ ইভনিং ওয়্যার বা ড্রেস স্যুটও এল । আনুষঙ্গিক শার্ট, রুমাল ইত্যাদি কিছুই বাকি থাকল না ।

ইয়ার্লদের কৃপায় অনেক বড় ও মাঝারি পরিবার থেকে আমি নিমন্ত্রণ পেলাম । চেনাশোনার পরিধি বেড়েই চলেছে । ডেনিশরা রীতিমতো ভদ্র ও শিক্ষিত জাতি । তারা দুটো জিনিস বিশেষ ভালোবাসে । মোমবাতি জ্বেলে ডিনার খাওয়া এবং সবরকম শিল্পকলায় আগ্রহ দেখানো । কেউ মিথ্যা কথা বলে না, চৌর্যবৃত্তি নেই বললেই চলে ।

কয়েকটা ঘটনা মনে পড়ে যা থেকে ডেনিশদের সাধুতা ও সংস্কৃতি কত উচ্চমানের বোঝা যায় । একদিন আমি ঘোড়ায় চড়ে গ্রামের পথে চলেছি । একটা পাথরের ওপর ইট চাপা দেওয়া কাগজ ও টাকা ভরা খাম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল । ঘোড়া থেকে নামলাম ও দেখলাম একটা ছোট্ট চিঠি লেখা রয়েছে, এই সংলগ্ন খামটি পোস্ট অফিসে দয়া করে জমা দিও ।

তিন মাইল দূরে আমি পোস্ট অফিসে গিয়ে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে খামটা দিলাম । ব্যাপারটা জানবার জন্য অপেক্ষা করলাম । খামখানি খুলে পোস্টমাস্টার বললেন, এতে ত্রিশ টাকা আছে মানি অর্ডার করবার জন্য । এক বৃদ্ধা গ্যাদেভাং গ্রামে থাকে । আমরা প্রতি মাসে এই রকম পাই এবং যথাস্থানে পাঠাই ।

ডেনমার্কে প্রচুর মাখন তৈরি হয়। সব ডেয়ারি থেকে বড় বড় টিনভর্তি দুধ নিয়ে মায়ারিতে কো-অপারেটিভ মাখন প্রস্তুত হয়। সেখানেই বেকন, হ্যাম তৈরি করবারও জায়গা। দুধে জল দেওয়ার কথা এদেশের মানুষের চিন্তার বাইরে। দুধ কত কত ঢালছে তা মাপবার লোকও নেই। যার দুধ সে লিখে দেয় এবং টিনভর্তি করে নিয়ে যায়। মাসের শেষে হিসাব হয় এবং ডেয়ারিকে সব প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেয়।

একবার এক দুর্মতিপরায়ণ চাষী জল মিশিয়ে মায়ারিতে দুধ ঢালতে লাগল। কিছুদিন পরে দেখা গেল মাখন কম হচ্ছে। মায়ারির লোকেরা অগোচরে প্রত্যেকের দুধ পরীক্ষা করতে করতে সেই ফার্মারকে বের করে ফেলল যে দুধে জল মেশাত। এটা এত বড় অন্যায় যে মায়ারির লোকেরা এবং কয়েকজন গভর্নমেন্ট অফিসার ফার্ম ইনস্পেকশনে গেল। প্রথমেই কত গরু আছে এবং তারা মোট কত দুধ দেয় তার হিসেব করে সবাই দেখল যে প্রত্যেক দিন ফার্ম থেকে অনেক বেশি দুধ মায়ারিতে সাপ্লাই হয়। অর্থাৎ জল মেশানো হয়।

ফার্মের মালিককে ডেকে একজন মায়ারির ইনস্পেক্টর তাকে জলের টিপকলের সামনে নিয়ে গেলেন এবং টিপকলের মুখে একটা বীট (গরুর প্রিয় খাদ্য) ঢোকাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মালিক জিজ্ঞেস করল এটা কী হচ্ছে? ইনস্পেক্টর বললেন, তোমার যে গরু সবচেয়ে বেশি দুধ দেয় তাকে আদর করে বীট খাওয়াচ্ছি।

এই ঘটনা বিরল। সব ফার্মের লোকেরা মনে রেখেছে যে দুধে জল মেশানোয় দেশের ক্ষতি এবং আবালবৃদ্ধবনিতার ক্ষতি।

আমি এক চাষীর বাড়ি বেড়াতে গেলাম। সে খুব সমীহ করে তার বাড়ি দেখাল ও সবার সঙ্গে ডেকে আলাপ করাল। চাষী অবসর সময়ে ছবি আঁকে। ছবি খুব উঁচু দরের, আমি তার একটা ছবি আমার বাড়িতে টাঙাতে পারলে গর্ববোধ করতাম। চাষীর নাম ওলসন। সে ফরাসি ধরনে হাল্কা রঙের ছবি আঁকত।

আমাদের দেশের তুলনায় এদেশে জীবনযাত্রা অনেক উন্নতমানের। পোকামাকড়, আরশোলা, মাছি এবং মশার উপদ্রব নেই বলে দৈনিক জীবন অনেক আরামের।

একজন নিগ্রো মহিলা গায়িকা, মিস মেরিয়ন অ্যান্ডারসনের গান একদিন শুনতে গেলাম কোপেনহাগেন শহরে। সবাই তার গান শুনে মুগ্ধ। সাধারণত মেয়েরা সরু গলায় গান গায়। কিন্তু ক্বচিৎ কখনও এমন গায়িকা দেখা যায় যারা সরু থেকে মোটা স্বর গাইতে পারে। তাদের কলোরাটুরা বলা হয়। মেরিয়ন অ্যান্ডারসন এই শ্রেণীর গায়িকা। মেরিয়ন যখন নিগ্রো স্পিরিচুয়াল গাইত তখন মনে হত একজন ছেলে গাইছে। তার আসল গলা, মেৎসো সোপ্রানো এবং সেটা খুবই শ্রুতিমধুর।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে পল রোবসন যেমন পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মেরিয়ন অ্যান্ডারসন তেমনই স্ত্রীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ । আর দুজনেই নিগ্রো এবং আমার সৌভাগ্য যে দুজনের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছিল । মেরিন ও ইয়ুটা দুই বন্ধু । সে থাকতে এল স্ট্রয়েডামে এবং একটা গেস্টরুম তাকে দেওয়া হল । সারাদিন মেরিয়ন ও আমি কখনও বাড়ির সংলগ্ন বনে কিংবা বাগানে বেড়াতে যেতাম । কখনও তাকে পিয়ানোয় গান চর্চা করতে শুনেছি । অনেক সময় আমরা গল্প করে সময় কাটিয়েছি ।

মেরিয়ন তার দেশে মা, বাবা আর বয় ফ্রেন্ডের গল্প করত । অনেকদিন দেশ ছাড়া । কয়েক বছর ধরে ইতালি, জার্মানি ও ফ্রান্সে সঙ্গীতচর্চা করছে । তারপর একদিন তার শিক্ষক পরামর্শ দিলেন এক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করতে কোপেনহাগেন শহরে । সেই প্রথম অনুষ্ঠানে ৫,০০০ লোক শুনতে এসেছিল এবং সেই রাত্রেই মেরিয়ান অ্যান্ডারসন পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়িকা রূপে সর্বজন-স্বীকৃতি পেল ।

লেফটেন্যান্ট ইয়েনসেনকে আমি এরোপ্লেন চালানো শেখবার কথা বলেছিলাম । তারপর দুজনে কোপেনহাগেন শহরের কাছে কাস্ট্রুপ এরোড্রোমে গিয়ে প্লেন চালানো শিখতে আরম্ভ করলাম ও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লাইসেন্স পেলাম । একদিন প্লেনটা নিয়ে সোফিনবর্গের একটা মাঠে নামলাম । গম চাষের মাঠ, আল নেই, তাছাড়া খুব এবড়োখেবড়ো নয় । আমি প্লেন থেকে নামবার পর আকসেল প্রথমেই এগিয়ে এসে কনগ্র্যাচুলেশন জানাল । তাকে প্লেনের ওপর উঠতে বললাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যে এস্টেটের ওপর প্লেন উড়িয়ে ঘুরতে অরাম্ভ করলাম ।

মাটিতে এসে নামবার পর আকসেলের এত স্ফূর্তি হল দেখে আমি খুব উৎসাহিত বোধ করলাম ।

ডেয়ারি ফার্মে যাদের সঙ্গে কাজ করি তাদের একে একে সবাইকে ওপরে ঘুরিয়ে আনলাম ।

সোফিনবর্গ ফার্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমার খুব সমাদর ছিল । তারা প্রায়ই নানা বিষয় বলবার জন্য আমাকে অনুরোধ করত । আমি ল্যান্টর্ন স্লাইড দেখিয়ে দেশ-বিদেশের গল্প বলতাম ।

যেসব ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে করতে কোনও কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে তারা যাতে শিক্ষার গুণ লাভ করতে পারে, তাদের জন্য ডেনমার্কে ইন্টারন্যাশনাল হাই স্কুলে পড়ার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । শিক্ষালাভ করবার একমাত্র উপায় আমরা জানি বই পড়া এবং লেখা । হাই স্কুলের টিচাররা এখন এমনভাবে পড়ান যে বই খাতার প্রয়োজন কম । একুশ বছর না হলে ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হয় না । নানারকম বিষয়বস্তুতে যাতে

ছেলেমেয়েরা আগ্রহ দেখায় তেমনভাবেই পড়ানো হয় । হেডমাস্টারের নাম ক্রিস্টিয়ানসেন । তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং পঠনপদ্ধতি তাঁকে একজন বিখ্যাত লোক করেছে ।

পৃথিবীর নানা দেশে এই হাই স্কুলে পড়াবার রীতি অনুকরণ করবার চেষ্টা হচ্ছে ।

কোনও কারণে লেখাপড়া ছাড়লে কোনও লোক যাতে মূর্খ হয়ে না থাকে, যাতে সে উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাদ পেতে পারে, তার জন্য এই স্কুলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে ।

ক্রিস্টিয়ানসেনের সঙ্গে দেখা করে হাই স্কুল সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ দেখালাম । তিনি রাজি হলেন এক শর্তে যে আমি ইংরিজি পড়াব এবং দেশ-বিদেশের গল্প বলব নানা বিষয়ে ।

স্কুলটা হিলেরয়েডের কাছেই । আমি সোফিনবর্গ ফার্ম থেকে ছুটি নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল হাই স্কুলে থাকতে গেলাম । টিচারদের সঙ্গে আমার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল । সবার কাছে খুব ভদ্র ব্যবহার পেয়েছি । ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমার সময় ভালোই কাটত ।

এক শনিবার বিকেলে আমি স্ট্রয়েডামে উইক-এন্ড কাটাতে গেলাম । হঠাৎ ইন্টারন্যাশনাল হাই স্কুল থেকে টেলিফোন এল যে একজন ভারতীয় ইন্টারন্যাশনাল হাই স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়ে দেখতে এসেছেন । নাম কী জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তর পেলাম, মিঃ দূত । আমি আরও জানলাম তিনি কলকাতা থেকে আসছেন ।

গাড়িটা নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল হাই স্কুলে ফিরে গেলাম, ভাবলাম মিঃ দূতকে একবার দেখে আসি ।

দরজা খুলে দেখি গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বসে কী লিখছেন । আমাকে দেখে বললেন, আরে বিমল, তুমি এখানে পড়াও, আমি একবারও ভাবিনি । আমি বললাম, আমিও একবারও ভাবিনি দূত মানে আপনি । গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে পেয়ে আমি খুব খুশি । তাঁর ছেলের বয়স আমার চেয়ে কিছু ছোট হলেও দুজনের বন্ধুত্ব ছিল । এই সূত্রে তিনি আমাকে চিনতেন ও স্নেহ করতেন ।

আমি ক্রিস্টিয়ানসেনের অনুমতি নিয়ে গুরুসদয় দত্ত মহাশয়কে বললাম, আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠতে স্ট্রয়েডামে যাবার জন্য । কথা রইল দুদিন পরের সোমবার দত্ত মশায় ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভারতবর্ষের গল্প বলবেন ।

আকসেল ও ইয়ুটার সঙ্গে দত্ত মহাশয়ের আলাপ করিয়ে দিলাম । তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । বাড়ির যে অংশে আমি থাকতাম সেখানে পাশেই আরেকটা শোবার ঘর ছিল । সেখানে সুটকেস নিয়ে গিয়ে রাখলাম । দত্ত মহাশয় মুখ হাত ধুয়ে নিলেন এবং সন্ধ্যা ছটার সময় নিচে একতলায় বসবার ঘরে উপস্থিত হলেন । তিনি তাঁর প্রিয় ব্রতচারী

নাচের কথা বললেন । এই নাচের ভেতর দিয়ে স্বাস্থ্য লাভ হবে এবং সেই সঙ্গে দেশত্ববোধও জাগবে । প্রশস্ত বসবার ঘরে ম্যান্টেলপিস ছিল একধারে । সেখানে ফায়ার প্লেসে কাঠের আগুন জ্বলছিল ধীরে ধীরে । সামনে একটা অতিকায় সাদা ভাল্লুকের বরফের মতো শুভ্র চামড়া পাতা ছিল । নভেম্বর মাস । মাঝে মাঝে বাইরে বরফ পড়ছিল । বেশ কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছিল, চারটের সময় বিকালে সূর্যাস্ত হবার পর থেকে । দারুণ শীতের আশঙ্কা করে দত্ত মশায় অনেকগুলি গরম জামা পরেছিলেন ।

আমরা সবাই মিলে যখন বসবার ঘরে একত্র হলাম । আমি দত্ত মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় দিয়ে বললাম যে তিনি একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে ভারতীয়, আমাদেরই একজন । ব্রতচারী নাচের কথা বললাম ।

গুরুসদয় দত্ত মশায় সেদিন খুব খুশি মনে ছিলেন । তিনি কয়েকটি নাচের অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে নাচ আরম্ভ করলেন । একটার পর একটা নাচছেন এবং একটা একটা করে গরম জামা খুলে ফেলতে লাগলেন । জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়িটা থেকে আগুন ঘরটাকে গরম করে তুলেছিল, তার ওপর রাইবেঁশের তাণ্ডব নৃত্যে দত্ত মশায়ের গরম লাগছিল । তিনি পেঁয়াজের খোসার মতো জামাগুলি খুলে আরাম করে বসলেন ।

আকসেলের সঙ্গে খাবার পর অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল কেমন করে লিগ অব নেশনসের মাধ্যমে পৃথিবীর সব দেশে ব্রতচারী নাচ চালু করা যেতে পারে । দত্ত মশায়ের তখন বেশ বয়স হয়েছে । অতক্ষণ ধরে কেমন করে নাচলেন সেকথা আজও আমি ভাবি । ডেনমার্ক ছেড়ে তিনি জেনেভা যাচ্ছেন ব্রতচারীর কথা জানাতে ও নাচ দেখাতে ।

দুদিন গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে নানা বিষয় গল্প ও আলোচনা করে কাটালাম । খুব ভালো লাগল ।

সোমবার ইন্টারন্যাশনাল হাই স্কুলে দত্ত মহাশয়কে এক অভ্যর্থনা জানালেন ক্রিস্টিয়ানসেন । পাঁচশো ছাত্রছাত্রী উপস্থিত সেই হলে । তিনি অতিথির পরচিয় দিতে গিয়ে গৌরবময় ভারতবর্ষে অতীতের কথা তুললেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যানটি বললেন । ক্রিস্টিয়ানসেন খুব সুন্দর করে গল্পের তাৎপর্য বোঝালেন ডেনিশ ভাষায় । তাঁর শেষ হবার পরেই গুরুসদয় দত্ত মহাশয় দাঁড়িয়ে উঠে ইংরিজিতে বললেন, এই রকম সাবিত্রী আমার জীবনে পেয়েছিলাম । সরোজনলিনীর কথা বললেন এবং তাঁর স্মরণার্থে সে প্রতিষ্ঠান গড়েছেন তার কথাও । সঙ্গে সঙ্গে ব্রতচারীর জন্মকথা বললেন । নাচবার আগে গানের অর্থ বুঝিয়ে দিয়ে নাচতে আরম্ভ করলেন । আমি দোভাষীর কাজ করলাম । ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখলাম খুব উৎসাহ ।

জাটল্যান্ড বা ডেনমার্কের মেনল্যান্ডে বেড়াতে গেলাম । কোপেনহাগেন ও হিলেরডে একটা দ্বীপের ওপর । আরও কয়েকটি দ্বীপ ও মেনল্যান্ড মিলিয়ে ডেনমার্ক দেশ । মাত্র ৪০ লক্ষ লোকের বাস । কিন্তু এদের সভ্যতা ও কৃষ্টি এত উঁচু পর্যায়ের যে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।

মেনল্যান্ড ও দ্বীপগুলির মধ্যে সারাক্ষণ মোটরগাড়ি, বাস, সাইকেল চলাফেরা করে, এমনকী কয়েকটি ট্রেনও আসে যায় জাহাজের মাধ্যমে । ঘাটে জাহাজ থামা মাত্র মোটরগাড়ি নামল উঠল এবং যাত্রীসুদ্ধ ট্রেনও গেল ও এল । সমস্ত ব্যাপারটা এত চটপট হয় যে আশ্চর্য হতে হয় । জাহাজ যেখানে থামল তার সামনে রেললাইন পাতা আছে । এগুলি বাইরের লাইনে মিশে যায় । সহজেই ট্রেন থেকে না নেমে যাত্রীরা বসে থাকতে পারে । ইচ্ছা করলে জাহাজের রেস্তোরাঁতে বসে কফি, খাবার ও বিয়ার খেয়ে যথাস্থানে পৌঁছে যেতে পারে । ইউরোপের ভ্রমণকারীদের খুব সুবিধা । কী খাব, কোথায় যাব এই সব ভাববার কোনও প্রয়োজন নেই । মুখরোচক, সস্তা ও স্বাস্থ্যকর খাবার সর্বত্র পাওয়া যায় । পকেটে পয়সা থাকলেই হল ।

জাটল্যান্ডকে ডেনিশরা ইয়ুল্যান্ড বলে । উত্তর জাটল্যান্ড তেমন উর্বর নয় । জমির তিন দিকে সমুদ্রের লোনা হাওয়া ফসল নষ্ট করে । গভর্নমেন্ট থেকে প্রত্যেক ডেনিশকে (যে চাষ করতে চায়) বিনামূল্যে দুই বিঘা জমি, গরু, ঘোড়া ও কিছু টাকা দেওয়া হয় । এগুলি তার জন্মগত অধিকার । দেশটা ছোট অথচ জমি সবাইকে দিতে গভর্নমেন্ট স্বীকৃত । জাটল্যান্ডে সবাই যেতে চায় না । সেজন্য অন্যত্র বড় বড় জমিদারকে প্রায়ই গভর্নমেন্ট থেকে লেখে জমি ছেড়ে দেবার জন্য ।

আকসেলের কাছে এই রকম চিঠি এল । সে তৎক্ষণাৎ তার জমির একাংশ ছেড়ে দিল, যারা নতুন চাষী হতে চায় তাদের জন্য । শুনলাম যে কয়েকবার গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আকসেল অনুরোধ পেয়েছে এবং প্রত্যেক বারই সে জমি ছেড়ে দিয়েছে খুশি মনে । আকসেল মনে করে যে সমাজতান্ত্রিক দেশে অন্যদের সঙ্গে তার সৌভাগ্য বণ্টন করে নিতে হবে । অন্য জমিদারও জমি ছেড়ে দেয়, তবে খুশি মনে দেয় কিনা জানি না । আমাদের দেশে জমিদার জমি গ্রাস করে, স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দিয়েছে বলে কখনও শুনিনি ।

আকসেল তো সোশালিস্ট বটেই, এমনকী বলতে পারি যে কমিউনিজমের সাম্যবাদ তার প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল । আমি রাশিয়া ভ্রমণ করে এসেছি বলে নানা বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করত এবং মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করত । আমি যেটুকু দেখেছি সেইটুকুই বলতে পারতাম । রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতাম না বলে কমিউনিজমের আসল কথাটা ঊহ্য রয়ে যেত ।

কোপেনহাগেন ইউনিভার্সিটি থেকে দক্ষিণ ভারতের মন্দির সম্বন্ধে বলবার আমন্ত্রণ পেলাম । আকসেল আমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে গেল । তাঞ্জোরের মন্দির সম্বন্ধে আমি একটা ভুল খবর দিলাম স্লাইড দেখাবার সময় । ভুল যে করেছি তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল । কিন্তু সংশোধন করবার তখন আর সময় নেই । আমি পরের মন্দিরটির বিশেষ স্থাপত্য সম্বন্ধে কী বলব সেই কথা ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়ে গেল । ভুল রয়ে গেলে ।

আমার বলবার সময় পার হয়ে এল । আমি ভাবলাম ওই ভুলটি কে লক্ষ করবে আর কেই বা বৈষ্ণব ও শাক্তর পার্থক্য বুঝে উঠবে ।

মিটিং শেষ হয়ে গেল । আকসেলের সঙ্গে দেখা হতে প্রথমেই সে বলল, তুমি ভালোই বলছ কিন্তু একটা ভুল তোমার দৃষ্টি এড়িয়েছে । আর বেশিদূর বলবার আগেই আমি বললাম যে আমি জানি যে আমি ভুল করেছি কিন্তু সে বিষয় যখন সচেতন হলাম তখন ফেরবার রাস্তা আমার ছিল না । আকসেল খুশি হয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে গাড়িতে গিয়ে উঠল ।

সোফিনবর্গ ফার্মে কুড়িজন অ্যাপ্রেন্টিস ছেলেমেয়ে ছিল যারা ডেয়ারি ফার্মিং শিখত । আমিও তাদের দলের একজন । আমাদের নানারকম পরীক্ষা হল সব রকম শেখার পর । আমি পাশ করার সার্টিফিকেট পেলাম ।

ডেনমার্কে অনেক ডেয়ারি ফার্ম দেখেছি যার ফলে বুঝলাম আকসেলের ডেয়ারি ফার্ম সবচেয়ে উন্নত ধরনের, আর অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চালানো হয় । লাভের দিকে আকসেলের মোটেই দৃষ্টি ছিল না । তবু তার খুব লাভ হল স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত উপায়ে ফার্ম চালাবার ফলে ।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে থাকবার সময় আকসেল একটা ছবি দেখেছিল যাতে শ্রীকৃষ্ণ ছোট গোপালের বেশে একটা গরুর বাঁট থেকে দুধ খাচ্ছে । সে অবধি তার ইচ্ছা হয় যে এত ভালো খাঁটি দুধ তৈরি করবে যা না ফুটিয়ে শিশুকে দেওয়া যাবে । অনেকদিন পরীক্ষা করেছে কিন্তু তেমন ফল পায়নি । একদিন আমাকে তার মনের কথা বলল এবং আবার একবার জীবাণুশূন্য দুধ তৈরি করবার চেষ্টা করবে জানাল ।

জীবাণুর প্রধান কারণ হল, গরুর গলার দড়ি, দেহের ময়লা, গোয়ালের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যারা দুধ দুইবে তাদের হাতের ও বালতির নোংরা ।

প্রথমেই দুধ পরীক্ষা করবার জন্য আকসেল একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করল । তারপর ব্যবস্থা হল গরু দড়ি ছাড়া লোহার ফ্রেমের মধ্যে থাকবে অথচ যথেচ্ছ বসতে দাঁড়াতে ফিরতে পারবে । তৃতীয় ব্যবস্থা হল দুটো বড় নতুন ঘরের । গরুর দুধ দুইবার আগে

তাকে ভালো করে স্নান করিয়ে দেওয়া হয় অল্প গরম জলে । তারপর ড্রাই চেম্বারের ভেতর দিয়ে জীবাণুমুক্ত হয়ে যাবে অন্য ঘরে, সেখানে সাদা টালি দেওয়া দেওয়াল ও মেঝে । ছেলেমেয়েরা জীবাণুমুক্ত ওভার অল পরে বালতি হাতে অপেক্ষা করে দুধ দুইবার জন্য । অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল (ম্যাডসন ইনস্টিটিউট থেকে রিপোর্ট) যে দুধ যতদূর জীবাণুমুক্ত হতে পারে ততখানি সোফিনবর্গ ফার্মের দুধ হয়েছে ।

আকসেল এত খুশি হল তার অসামান্য সাফল্যে যে সে একটা মস্ত মেশিনের অর্ডার দিল । সেটা দুদিনের মধ্যে এসে গেল । এই মেশিনের বিশেষত্ব হল যে দুধ ঢেলে দেবার পর আর মানুষের হাত লাগবে না অথচ দুধ কার্ডবোর্ডের বোতল ভর্তি হয়ে বেরিয়ে আসবে ।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে জীবাণুমুক্ত দুধ তৈরি করতে গিয়ে অ্যাকসেল একটা অমূল্য জিনিস আবিষ্কার করে ফেলল । গরু জীবাণুমুক্ত হলে তাদের প্রত্যেকের আয়ু চার-পাঁচ বছর বেড়ে যায় । ব্যবসার দিক দিয়ে এটা কম লাভের কথা নয় ।

আকসেল যখন এই চেষ্টা শুরু করল যে শিশু গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে জীবাণুমুক্ত দুধ খেতে পারবে, তখন ডেনমার্কের মতো চারদিকে ডেয়ারি ফার্মের দেশে সবাই ঠাট্টা আরম্ভ করল যে মিলিওনেয়ার ফার্মার হলে এই রকমই হয় । সাতকাণ্ড রামায়ণের শেষে দেখা যাবে দুধের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেছে । কিন্তু তা হল না তার কারণ দেখা গেল যে গরু আরামে থাকার ফলে বেশি পরিমাণ দুধ দিতে লাগল, সাধারণ দুধের দামেই সোফিনবর্গের দুধ বিক্রি হতে লাগল । তখন সমালোচকদের মুখ বন্ধ হল । অ্যাকসেল মনে করল তার জীবন সার্থক হয়েছে ।

এক সপ্তাহ পরে আকসেল একটা কাণ্ড করে বসল । লাইব্রেরি ঘরে আমার ডাক পড়ল । আমাকে দেখে স্বামী-স্ত্রী দুজনে হাসি চাপতে পারছে না । একটা কাগজ দিয়ে আকসেল বলল, এইখানে তোমার নাম সই করে দাও । কী ব্যাপার, কোনও উত্তর নেই । সই করবার পর ইয়ুটা বলল, তোমার যে রকম অ্যাডভেঞ্চারাস স্পিরিট, তাতে আমরা ভাবলাম যে তোমাকে একটা এরোপ্লেন উপহার দেব । আমাদের মাঝে মাঝে চড়িও । এই কথা বলে আমার হাতে দ্য হাভিলান্ড কোম্পানির তৈরি একটা টাইগারমর্থ প্লেনের কাগজপত্র দিল । আমার এমন অভিভূত অবস্থা যে গলা দিয়ে স্বর বেরল না । মনে মনে ভীষণ খুশি হলাম কিন্তু আবার মনে হল আকসেল ও ইয়ুটা আমরা পায়ে শিকল দিয়ে বাঁধতে চায় । মুহূর্তে আমার আনন্দ উবে গেল ভ্রমণে কবে বেরোতে পারব এই কথা ভেবে ।

লেফটেন্যান্ট ইয়েনসেনের সঙ্গে পরামর্শ করলাম কেমন করে এরোপ্লেনটা খাটিয়ে টাকা রোজগার করা যেতে পারে । দুটো পথ বেরোল । একটা হচ্ছে এরিয়াল সার্ভে এবং অন্যটি

প্রত্যেক ডেয়ারি ফার্মের ওপর থেকে ছবি তুলে বিক্রি করা। দুটোই খুব লাভবান কাজে হাত দিলাম।

এরোপ্লেন থেকে অনেক ছবি তুললাম। তারপর সেগুলো বড় করে হিলেরয়েডে এক ফটোগ্রাফারের দোকানে দেখবার জন্য কাগজে আমন্ত্রণ জানালাম। অর্ডার বুক করলাম অনেক, যথাসময়ে। এমনই করে সারা ডেনমার্কে যেখানে যত ডেয়ারি ফার্ম আছে সেগুলির বেশিরভাগের ছবি তুললাম। আমাদের একজন এজেন্ট জুটে গেল সে বিক্রি করার সব ভার নিল।

সমুদ্রের ধারে প্লেন নিয়ে গেলে লোকেরা অস্থির করে তুলত উড়িয়ে আনার জন্য। আমরা দুজন প্যাসেঞ্জার একসঙ্গে নিতাম। মাত্র দশ টাকা চার্জ। সারাদিন উড়লেও লোকেদের উৎসাহ কমত না।

কাস্ট্রপ এরোড্রোমটা একেবারে সমুদ্রের ধারে। একদিন কাস্ট্রপ থেকে সমুদ্রের ওপর বেশিদূর যাইনি, একটা এলবাট্রস পাখির সঙ্গে এরোপ্লেনের প্রোপেলার ব্লেডের সংঘর্ষ লাগল। তারপরই প্লেন সামলানো দায় হল। আমি তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে কাস্ট্রপ রানওয়ে যে দিকে সেই দিকে নামতে আরম্ভ করলাম ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে। একেবারে কুলে এসে জলে পড়লাম।

আর মাত্র কুড়ি হাত যেতে পারলে এরোড্রোমে নামতে পারতাম। তাড়াতাড়ি বেল্ট খুলে এরোপ্লেনের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে, যারা কাছেই সান বেদিং করছিল তাদের সাহায্য চাইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে দুটো দড়ি নিয়ে বোট এল এবং টানতে টানতে প্লেনটাকে এরোড্রোম পর্যন্ত পৌঁছে দিল। আমার চামড়ার পোশাক জলে ভিজে মনে হচ্ছিল কয়েক মন ভারি হয়ে গিয়েছে।

এরোপ্লেনের কোনও ক্ষতি হয়নি প্রপেলার ব্লেড ছাড়া। ইনশিওরেন্স কোম্পানি নতুন করে আরেকটা ব্লেড কিনে দিল।

একজন অ্যাডভেঞ্চারাস ইয়ং স্পোর্টসম্যান যা কামনা করে সবই আমার হাতে এল। স্বপ্ন বাস্তব হল। কেবল একটি জিনিসের অভিজ্ঞতা হয়নি। তাও শীঘ্রই হল। একটা ইয়ট (পালতোলা রেসিং নৌকো) চালানো।

ইয়ুটার এক বিশেষ বান্ধবীর মেয়ে সনিয়া হার্টুং স্ট্রয়েডামে প্রায়ই আসত, বিশেষ করে সপ্তাহান্তে। সনিয়ার বাবা কমান্ডার হার্টুং (ডেনিশ নেভির কর্ণধার) একটা ইয়টের মালিক ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে ও সনিয়াকে নিয়ে ক্যাটেগাট সমুদ্রে ইয়টে পাড়ি দিতেন। আমি এক নতুন থ্রিল পেতাম।

স্ট্রয়েডামে জন্মদিন হত খুব ঘটা করে । আকসেল কিংবা ইয়ুটার জন্মদিনে ওরা আমাকে এত প্রেজেন্ট দিত যেন আমারই জন্মদিন । বছরে তিনবার করে আমার জন্মদিন পালন হত । যে দিনটায় আমার সঙ্গে আকসেল ও ইয়ুটার দেখা হয় সেটা হচ্ছে প্রথম । আসল জন্মদিন হচ্ছে দ্বিতীয় এবং আরও একটা জন্মদিন ছিল- পাসপোর্টের তারিখ অনুসারে । যেটাই আসল হোক, তিনবার হৈ চৈ করে বিরাট ভোজ ও প্রেজেন্ট দিয়ে বুড়োবুড়ি খুশি । নিত্য নতুন ফন্দি করে আর কী করলে আমার মতো বনের পাখিকে ধরে রাখা যায় ।

আমি কী চাই জিজ্ঞাসা করলে বলি আমার ভ্রমণ সম্পূর্ণ করতে চাই । আমার উত্তর শুনে দুজনেই জিজ্ঞেস করে আমার কি অসুবিধা হচ্ছে- কিছুর অভাব আছে কি? আমি কেমন করে বোঝাই যে যেদিন ডাক্তার আমাকে ফিট বলবে তার পরদিন আমি আবার আমার চলার পথে বেরিয়ে পড়ব ।

আকসেল ও ইয়ুটার ধারণা হল আমি ক্রমাগত বুড়োবুড়ির সঙ্গ লাভে একেবারে বিরক্ত ও উত্যক্ত । আমার সৌভাগ্য কোনওদিন তারা কারও সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে আটকে রাখবার চেষ্টা করেনি ।

ইয়ুটার জন্মদিন এল । সকালবেলায় আমার ছুটি । প্রাতরাশ খেয়ে ভেতর দিকের বাগানের একটা বেঞ্চে বসে আছি, এমন সময় আকসেল ও ইয়ুটা আমাকে ডাকল ওদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য । স্ট্রয়েডামে পৌঁছবার আগে বার্চের অ্যাভেনিউ ছিল । সেটা ধরে আমরা অল্পদূর যাবার পর ছোট টিলার ওপর রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট খুব সুন্দর বাড়ির সামনে ওরা থামল । ইয়ুটা হ্যান্ডব্যাগ থেকে এক তাড়া চাবি বের করে আমার হাতে দিল । মনে হল বাড়ির চাবি দিয়ে আমাকে দরজা খুলতে ইঙ্গিত করল । আমি বাড়ির দরজা খুলে চাবি ফেরৎ দিতে গেলাম । কিন্তু ওরা বলল, চাবি এখন থেকে আমার কাছে থাকবে । তখন অভিসন্ধি ঠিক ধরতে পারলাম ।

বাড়িটায় তিনখানা বড় সাজানো ঘর তা ছাড়া দুটো বাথরুম, কিচেন ইত্যাদি ছিল । কাচের জানলার পর্দা সরালে সব ঘর থেকে অপূর্ব বাইরের দৃশ্য । অদূরে পাইন গাছের মাথার ওপরে ‘স্ট্রয়েডাম’ বাড়িটা ছবির মতো দেখায় ।

সব বাড়িটা ঘুরে দেখবার পর দুজনেই খুব আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করল বাড়ি আমার কেমন লাগল । আমি বললাম খুব চমৎকার বাড়ি কিন্তু কার জন্য? ইয়ুটা বলে ফেলল যে আমার জন্য । আমি অনেক কষ্টে নিজের দুঃখ চেপে মাথা নাড়লাম, না আমার জন্য হতেই পারে না?

আমাকে স্থিতিবান করবার চেষ্টা এভাবে বিফল হল দেখে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই খুব মুষড়ে পড়ল । আমি খুশি করবার জন্য বললাম, আমার স্ট্রয়েডামে বাড়ি তো রয়েছে । আকসেল তখন বলল, হ্যাঁ তুমি চিরকাল স্ট্রয়েডামে থাকতে পার এমন ব্যবস্থা করে দেব । এখন আমরা স্বামী-স্ত্রী ঠিক করলাম যে তুমি বুড়োবুড়ির মধ্যে থেকে হয়তো হাঁপিয়ে উঠবে, তখন নিজের বাড়িতে কিছুদিন থাকলে আমাদের প্রতি তোমার ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ থাকবে ।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরেই শুনলাম যে সলিসিটর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন । স্ট্রয়েডামে সম্পত্তি দেখাশোনা করা অ্যাটর্নির কাজ । তাঁর নাম ওলেসেন । তিনি কাগজপত্র তৈরি করে এসেছেন যাতে আমার ও আকসেলের সই পড়লে তবে বাড়ির মালিক হব আমি ।

আমি যখন কোনও কাগজেই সই করলাম না, অ্যাটর্নি এত অবাক হয়ে গেলেন যে বড় বড় চোখ তুলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী? আমি হেসে বললাম, এর প্রয়োজন হবে না, আসুন এখন কড়া এক কাপ কফি খাওয়া যাক । চার কাপ কফির অর্ডার দিলাম ।

এমন সময় আকসেলের পুত্র, ইয়েনস ইয়ার্ল তার দুটি মেয়ে নিয়ে বেড়াতে এল । ইয়েনস একজন ইঞ্জিনিয়ার আমার থেকে বয়সে অল্প বড় । বিয়ের পর আকসেল ও ইয়ুটা তার জন্য একটা খুব সুন্দর বাড়ি ও বাগান তৈরি করে দিয়েছে সমুদ্রের কাছে । সেখানে অনেকবার উইক-এন্ড কাটাতে গিয়েছি, ইয়েনস ও তার স্ত্রীর নিমন্ত্রণে ।

মেয়ে দুটির বয়েস মাত্র তিন চার । বড়টির নাম পুটে ও ছোটটির নাম ইয়ুটে । বোধ হয় আমার ব্রাউন রং দেখে দুই বোনই মুগ্ধ এবং তারা আমার সঙ্গ ছাড়ে না ।

দীর্ঘ আঠারো বছর পরে আবার স্ট্রয়েডামে সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলাম । তখন পুটের বিয়ে হয়ে স্বামীর সঙ্গে অন্য দেশে থাকতে গিয়েছে । ইয়ুটের বয়স একুশ । প্রচণ্ড লম্বা ডানপিটে মেয়ে । আমার প্রতি তাদের ছেলেবেলার ভালোবাসা তখনও অটুট ।

আমি দুই বোনকে নিয়ে সোফিনবর্গ ফার্ম দেখাতে গেলাম । ইয়ুটের ভয়-ডর বলে কিছু নেই । বিরাট ঘোড়ার নিচ দিয়ে লুকোচুরি খেলতে আরম্ভ করল, তাদের গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিল । আমি ভাবলাম যদি একটা ঘোড়া অসাবধানে পা ফেলে তো ইয়ুটে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে ।

যেখানে অতিকায় চারটে ষাঁড় ছিল সেখানে ইয়ুটে নির্ভয়ে তাদের গলা জড়িয়ে ধরতে যেত । পুটে আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম পুচকে মেয়ের অসীম সাহসিকতা । তার জীবজন্তুর প্রতি অশেষ ভালোবাসা । শুয়োরের ঘরে বাচ্চাগুলো ধরে তাদের কোলে তুলে

নেবেই । মুরগির ঘরে মুরগি ধরে আদর করবে-এমন ছিল ইয়ুটের স্বভাব । আশ্চর্যের বিষয়, সব পশুপাখিই ইয়ুটেকে ভালোবাসত, ভয় পাওয়া তো দূরের কথা ।

আকসেল ও ইয়ুটার সঙ্গে কোপেনহাগেন শহরে প্রায়ই থিয়েটার কিংবা কনসার্ট শুনতে যেতাম । ডেনিশ ভাষা বেশ শ্রুতিকটু এবং কঠিন তো বটেই কিন্তু আমার কাছে সরল মনে হত । জার্মান জানার জন্য বোধ হয় সহজ ঠেকেছিল । থিয়েটার আমি বেশ উপভোগ করতাম । সোফিনবর্গ ফার্মে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সারাক্ষণ ডেনিশ ভাষায় কথা বলতে বা শুনতে হত । সে জন্য ওই ভাষা আমার ভালোই লাগত ।

একদিন ভিগো আনসেন নামে মালির বাড়িতে ডিনারের নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম । ভিগোর স্ত্রীর নাম গুদ্রুন । দুজনেই বাইশ-তেইশ বছরের হবে । কী পরিপাটি সংসার । সব পরিষ্কার ঝকঝকে এবং সুন্দর করে সাজানো । দেখলে চোখ জুড়ায় । বাড়ি এমনই তৃপ্তির জায়গা হওয়া উচিত । বসবার ঘরে একটা টেবিলের ওপর ল্যাম্প এবং কয়েকটি বই গোছানো রয়েছে । তাদের মধ্যে হর্টিকালচার সম্বন্ধে তিনখানা বই । একখানা হান্স হার্টউইগ সেডর্ফের কবিতার বই । অনেকগুলি কবিতা, আমাদের পাশের দেশ সিংহল দ্বীপের ওপর । সেখানে সেডর্ফ (পোয়েট লরিয়েট অব ডেনমার্ক) বেড়াতে গিয়েছিলেন । অনুরাধাপুর দেখে মুগ্ধ হয়ে একটি কবিতা লেখেন । আমার বেশ ভালো লাগল । খুব দরদ দিয়ে লেখা ।

সৌভাগ্যক্রমে কয়েকদিন পরেই ইয়ার্লদের বাড়িতে সেডর্ফ সপরিবারে নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন । আমি তাঁর কবিতার প্রশংসা করাতে তিনি একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি একজন ভারতীয় হয়ে সেডর্ফের কবিতা জানলাম কেমন করে । মোট কথা সের্ডফ ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল । অনেকদিন তাঁদের বাড়িতে গিয়েছি ।

ইয়েনশের বাড়ি আমাদের তিনজনের নেমন্তন্ন ছিল । বাড়িটা ভারি সুন্দর । অতি আধুনিক ছাঁদে তৈরি । বারান্দা থেকে সমুদ্রের নীলজল দেখা যায় । আকসেলের স্থাপত্যবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায় বাড়িটা দেখলে । খাবার সময় দুটো মোমবাতির বাতিদান জ্বালা হল এবং অন্য সব আলো নিভিয়ে দিল । এটা একটা ডেনিশ প্রথা । বলা উচিত, স্কানডিনেভিয়ান প্রথা ।

দেখতে দেখতে হেমন্তের দিন এগিয়ে এল । কনিফার বা পাইন ছাড়া প্রত্যেকটি গাছের পাতায় সুন্দর হলদে এবং লাল রঙের ছোপ লেগেছে । অল্পদিন পরে সব পাতা ঝরে যাবে । বনের পথ অপূর্ব সুন্দর লাল রঙে ছেয়ে যাবে । ভারি মনোরম দৃশ্য । গাছগুলি নিষ্পত্র শীর্ণদেহে আগামী বছরের বসন্তের অপেক্ষায় ঝড় বরফ ঠান্ডা সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকবে ।

দিন ছোট হয়ে গেছে । একদিন তুষারপাত হল । মাঠ ঘাট বাড়ি সবার ওপর সাদা বরফের পলেস্তারা পড়ল । আমার মন খারাপ লাগল । পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে সাইকেল চালানো যাবে না । খুব সাবধানে থাকা সত্ত্বেও আমার পেটের ব্যথা সারছে না ।

ডেনমার্কে ক্রিয়োলাইটের (যা দিয়ে সব চেয়ে ভালো অ্যালুমিনিয়াম তৈরি হয়) কারখানা ও ব্যবসা আছে । আকসেলের বাবা এই কারবার প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রভূত লাভবান হন । এখন আকসেলরা তিনভাই ও এক বোন সেই সম্পত্তির মালিক । বোনের মৃত্যুর পর তাঁর আয় দুই মেয়ের মধ্যে সমান ভাগ হয়ে যায় ।

আকসেলের বাবা লোকহিতকর কাজে অনেক অর্থ ব্যয় করেন । তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড হাসপাতাল স্থাপন । হানসেন নামে এক ডাক্তার কৃত্রিম সূর্যরশ্মি দিয়ে কুষ্ঠরোগ সারাতে সক্ষম হয়েছে জেনে তিনি হানসেন লুইর্শ অর্থাৎ হানসেনের আলোকবর্তিকা, নাম দিয়ে কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল তৈরি করলেন । সমস্ত ইউরোপ থেকে বিশেষ করে আইসল্যান্ড থেকে কুষ্ঠরোগীরা এখানে এসে আরোগ্যলাভ করতে লাগল । ক্রমে ক্রমে ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণভাবে কুষ্ঠরোগ দূর হল ।

আকসেলের কাকা টিটগান একজন মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । তিনি অক্ষয়কীর্তি লাভ করেন ইংল্যান্ড থেকে জাপান পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করে । সুদূর সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে এই লাইন চলে গিয়েছে । টিটগান অনেক সম্পত্তি ও সম্মান লাভ করেন । স্ট্রয়েডাম তাদের মধ্যে একটি । উত্তরাধিকারসূত্রে আকসেল সেটি পায় । আকসেল সোফিনবর্গ ফার্ম কিনে স্ট্রয়েডামের সঙ্গে যোগ করেছে ।

স্ট্রয়েডামের নিজস্ব একটা ফার্ম ছিল । এখন সেটা পোল্ট্রি হয়েছে এবং সোফিনবর্গের যেসব গরুর দুধ দেবার বয়স হয়নি, তাদের রাখা হয় ।

ইউরোপে চিনি তৈরি হয় সাদা বীট থেকে । আমাদের দেশে হয় আখ থেকে । বীটের মস্ত কাজ হচ্ছে যে শীতের দিনে গরু ঘোড়াকে বাঁচিয়ে রাখে । শীতের ঠিক আগেই মাটি খুঁড়ে হাজার হাজার বীট (প্রত্যেকটার ওজন দেড় কেজি থেকে তিন কেজি) লম্বা স্তূপ করে রাখা হয় । এগুলি ঠান্ডায় নষ্ট হয় না । এই স্তূপকে ব্যাটারি বলা হয় । একাধিক ব্যাটারি রচনা করে তাদের ওপর মাটি ও ঝরা পাতা ছড়িয়ে দেয় । যথাসময়ে তার ওপর বরফ পড়ে যায় এবং বীটকে তাজা রাখতে সাহায্য করে ।

স্ট্রয়েডামের চারদিকে বিস্তীর্ণ জঙ্গল, মাঝে মাঝে পুকুর এবং বার্চ কিংবা পাইনের সার দাঁড়িয়ে আছে । অনেকদিন আমি জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করেছি । মাঝে মাঝে খেঁকশিয়াল, খরগোশ ও হরিণ দেখলাম । তারা তাঁবুর অর্থ না বুঝে

খুব কাছে আসত । ক্যামেরার শাটারের আওয়াজে চমকে থমকে দাঁড়াত । তারপর কিছু বুঝতে না পেরে হয় দৌড়ে পালাত, নয়তো নিজেদের মধ্যে খেলা ও কলহে মেতে যেত ।

শীতের সন্ধ্যায় বাড়িতে কোনও অতিথি না থাকলে, আকসেল তার অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের দরজা খুলে আমাকে ডাকত আলোচনার জন্য । আমাদের মধ্যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।

প্রায়ই ডিনারের পর আকসেল বই নিয়ে বিছানায় ঢুকত । তখন ইয়ুটা ও আমি দোতলার বসবার ঘরে বসে খোস গল্প করতাম । কখনও কখনও চয়নিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তর্জমা করে শোনাতাম ।

ইয়ুটার ভাই ও তাঁর স্ত্রী লেরকেনবর্গ নামে একটা বিরাট সম্পত্তির মালিক । বাড়িটা মস্ত রাজপ্রাসাদ । তার মধ্যে অফুরন্ত সাজানো ঘর, থিয়েটার, নাচবার ঘর ও তাস খেলবার ঘর ছিল ।

উইক-এন্ড কাটাতে আমরা তিনজনে নিমন্ত্রিত হয়ে ইয়ুটার ভাই লুন্ডের প্রাসাদে গেলাম । এখানেও সংলগ্ন একটি বড় ডেয়ারি ফার্ম আছে, সেইসঙ্গে ঘোড়া ও শুয়োরের মস্ত ব্যবসা চলে ।

লেরকেনবর্গ কাসল কোনও রাজা মহারাজার অধীনে এককালে ছিল । বড় বড় ঘর সেই রকমভাবে সুসজ্জিত । লুন্ডরা সেই প্রাসাদের একপ্রান্তে মাত্র কয়েকখানি ঘরের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল । গেস্টদের জন্য দরকারমতো আরও কয়েকটি ঘর খোলা হয় । বাকি ঘর (প্রায় নব্বইটি) আসবাবপত্রসুদ্ধ কাপড় চোপড় দিয়ে ঢাকাই থাকত । ফার্নিচারগুলি দেখবার মতো । বসবার ঘরের দেওয়ালে ‘গবেগাঁ’ (আগেই লিখেছি কার্পেটের চেয়ে সূক্ষ্ম কাজের ছবি) ও মাটিতে দামি দামি পারস্য দেশীয় কার্পেট পাতা থাকত ।

বিরাট বাগান চারদিকে । বাগান এতবড় রাখার খরচাই কত বলা যায় না । লুন্ড পরিবার আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন । আমার ব্রাউন রং দেখে আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হল ।

মিঃ লুন্ডের সঙ্গে আমি ডেয়ারি ফার্ম দেখতে গেলাম । এক হাজার গরু আছে । তাদের দোহন করা হয় যন্ত্র দ্বারা । আকসেলের ফার্মেও এমনই যন্ত্র দিয়ে চারশো গরু দুইবার ব্যবস্থা হয়েছে । কিন্তু যেদিন আকসেল বুঝলে যে মেশিনের চেয়ে হাতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে দোওয়ার সুফল অনেক, তখন থেকে পাইপ, যন্ত্র ও মেশিন বাতিল হয়ে গেল ।

ঘোড়াশালায় বড় বড় ঘোড়া দেখতে গেলাম । পঞ্চাশটি ঘোড়াই দেখতে অতিকায় এবং তাদের বেশিরভাগেরই সন্তান-সম্ভাবনা । ঘোড়ার ঘাড়ে, ল্যাজে ও পায়ে মস্ত মস্ত লোম ।

এগুলিকে বেলজিয়ান ড্রাফট হর্স বলা হয় । জমি লাঙ্গল দিতে, ফার্মের গাড়ি টানতে ঘোড়াগুলি খুব উপযুক্ত ।

ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই ঘোড়া দেখা যায় । শহরে বিয়ারের বড় বড় গাড়ি টানে দুটিতে কিংবা গ্রামাঞ্চলে জমিতে অক্লান্তভাবে লাঙ্গল দিতেও দেখেছি । খুব শান্ত স্বভাব, মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে এরা আধা মানুষ হয়েছে ।

লেরকেনবর্গের চাষের জমি দেখবার মতো । আঁচড় দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে । একটা জমিতে খুব সুন্দর ফেশান্ট পাখি দেখলাম । ইউরোপের সর্বত্র ফেশান্ট মারা হয় সুস্বাদু মাংসের জন্য ।

সেদিন রাত্রে শুনলাম যে লুন্ডের জন্মদিন উপলক্ষে ফার্মে এক পার্টি হবে । সন্ধ্যার পর লুন্ড পরিবার ও আমরা তিনজন ফার্মের বার্নহাউসে গেলাম । ফার্মের কর্মচারী ত্রিশজন স্ত্রী-পুরুষ ভালো বেশভূষা করে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল । মদ বিতরণ হল । একটু পরে ব্যান্ড বাজল । তখন লুন্ড একজনের পর আরেকজন মহিলার হাত ধরে নাচতে আরম্ভ করলেন । পুরুষ কর্মচারীরা একে একে মিসেস লুন্ডের সঙ্গে নাচল ।

আমি একপাশে বসে বসে আমোদ উপভোগ করছিলাম আর ভাবছিলাম একেই ডেমোক্রাসি বলে । প্রভু ও কর্মচারীর পার্থক্য ভুলে সমাজে এক হয়ে মিশতে পারার মধ্যে সৎশিক্ষা ও সৎচেষ্টা আছে । বেশি কথা ভাবতে সময় দিল না । তরুণীর দল আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাদের সঙ্গে নাচবার জন্য । নাচলাম অনেকের সঙ্গে ।

ইয়ুটা আমার ওপর ভীষণ খুশি হয়ে বলল, তুমি যে নাচতে পার এবং নাচতে এতো ভালোবাস, একথা কেন বলনি আমায়? এককালে আমিও নাচতে ভালোবাসতাম । এখন এত বুড়ি হয়ে গেছি যে নিজের দেহভার সামলাতে পারি না । এবার থেকে তোমার জন্য আমার বাড়িতে নাচের পার্টি দেব । ফলে সোনিয়া, বিটেন বিরগিটে, উরশুলা ও মেরিয়ান নিমন্ত্রিত হল টি পার্টিতে ।

পৃথিবী ভ্রমণ করতে করতে ঘুরপাক খেয়ে স্ট্রয়েডামে এসেছিলাম । এখানে ভ্রমণ ছাড়া আর সব কাজ ভালোই হচ্ছে । সোফিনবর্গ ফার্মে ডিউটি দিই, ইন্টারন্যাশানাল স্কুলে পড়াই, এরোপ্লেন থেকে এয়ার সার্ভে করি- এমনই নানা কাজে আমার দিন কেটে যায় ।

শীত এসে গেল বলে । মাঠ বরফে ঢাকা । কিছুদিনের মতো এরোপ্লেন চালানো বন্ধ ।

এই সময় মিউজিক, অপেরা, থিয়েটার ও অন্যান্য আর্টের খুব চর্চা হয় । কারখানাগুলোও জোর চলে ।

আমার পেটের ব্যথা অনেক কম, সেদ্ধ খাওয়া ও সময় মাফিক খাওয়ার ফলে । আমার বিশ্বাস যে ডেওডেনাল আলসার ক্রমে ক্রমে সেরে যাচ্ছে । মাঝে মাঝে ভয় হয় পাছে

আমি অপারগ হয়ে পড়ি এবং ভ্রমণে ইস্তফা দিতে হয় শেষ অবধি।

আকসেলের জীবনের পরিণতি এতই রোমাঞ্চকর যে এখানে তার কথা আরও লিখতে ইচ্ছা করছে। আমি স্ট্রয়েডাম ছেড়ে যাবার ছয় বছর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। আকসেলের ধারণা ছিল, জার্মানরা ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলি যেমন হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদিকে গ্রাস করবেই একদিন। হিটলার যখন প্রচণ্ড বিক্রমে ফ্রান্স জয় করে ইংলন্ডের দিকে এগোতে লাগল আকসেল তারই মধ্যে ইংরাজ ওয়ার-অফিসের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে গেল উত্তর নরওয়ের পথ ধরে। যথাসময়ে ডেনমার্কও জার্মানির কবলে এল।

তখন আকসেল যদিও বৃদ্ধ তবু অসীম উৎসাহে যুবকদের একটি গেরিলা দল তৈরি করে সে জার্মানদের সর্বত্র বাধা দিতে লাগল। গ্রিপস্কভ জঙ্গলে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ইংরেজরা এরোপ্লেন থেকে বন্দুক-গোলাগুলি ফেলত, ডেনিশ যুবকরা সেগুলির সাহায্যে জার্মানদের অশেষ ক্ষতি করতে লাগল।

অবশেষে একদিন প্লেন থেকে অস্ত্রশস্ত্র ফেলবার সময় জার্মানরা গ্রিপস্কভ জঙ্গল ঘেরাও করে। মাত্র একজন ডেনিশ যুবক ধরা দিয়ে অন্যদের বিপদমুক্ত করল। সেই যুবক, থরওয়াল্ডের ওপর অনেক অত্যাচার হল। তার বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল যদি অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। যখন খোঁজাখুঁজি চলছে থরওয়াল্ড কাচের জানলার ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে সব ভেঙে চুরে বাইরের গমের খেতে গিয়ে পড়ল এবং এদিক সেদিক করতে করতে সরে পড়ে আশ্রয় নিল আকসেলের ফার্মে।

ডেনিশ যুবকদের কাছে ইতিমধ্যে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ইংরেজরা পৌঁছে দিয়েছে। তারা অন্তর্ঘাতী কাজ চালিয়ে দেশে চরম অরাজকতা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি করতে লাগল।

কেমন করে জানা নেই জার্মানরা ঠিক করল আকসেল রয়েছে এই সব গণ্ডগোলের মূলে। থরওয়াল্ডকে আকসেল সরিয়ে ফেলল। ভোরে একদিন একটা জার্মান মিলিটারি ভ্যান হঠাৎ স্ট্রয়েডামে উপস্থিত হল এবং আচমকা আকসেলকে ধরে নিয়ে গেল। ইয়ুটা কাছেই ছিল তাকে কিছু বলল না।

জার্মানরা ভেবেছিল আকসেলকে ধরতে অনেক বাধা পাব। সেটা না পেয়ে ভ্যানটা ভীষণ জোরে চালিয়ে বাড়ির অ্যাভেনিউ পার হতে গেল। মোড়ের কাছে ভ্যানটা টাল সামলাতে না পেরে একটা গ্র্যানাইট পাথরের বুকে ধাক্কা মেরে উল্টে পড়ল। আকসেলের মালি ভিগো কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে ভ্যানের দরজা খুলে অজ্ঞান অচৈতন্য জার্মানদের টেনে বের করল। আকসেলের তেমন চোট লাগেনি।

অ্যাম্বুলেন্স এসে সবাইকে তুলে নিয়ে গেল হিলেরয়েড হাসপাতালে।

ডেনিশ ডাক্তাররা আকসেলকে দেখে অবাক । তার মতো বয়োবৃদ্ধ লোক কী করে জার্মানদের বিরুদ্ধাচরণ করছে । ডাক্তাররা ঠিক করল যেমন করে তারা পারে আকসেলকে নাৎসীদের হাত থেকে বাঁচাবে । এমন ভান করল যেন আকসেলের ভীষণ চোট লেগেছে মাথায়, তাকে নড়ানো যাবে না । নাৎসী বড় কর্তারা বলল আকসেলকে তাদের কাছে দিতে, বিচার হবে । বলা বাহুল্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মরবার জন্য পাঠাবে । ডাক্তাররা একবাক্যে মত দিল যে আকসেলের মাথায় কনকাসন হয়েছে, বিছানা ছাড়া তার বারণ ।

কয়েকদিন পরেই থরওয়াল্ডের দল হাসপাতাল থেকে আকসেলকে নিয়ে উধাও হল ।

বিদ্রোহীরা আকসেলকে এবং ইয়ুটাকে স্ট্রয়েডামে একটা ভীষণ দুর্গন্ধময় জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল । কেউ ভাবতেই পারেনি, যে সেখানে কোনও মানুষ থাকতে পারে ।

ইতিমধ্যে আকসেলের বাড়ি জার্মানরা দখল করেছিল । তারা আমার এরোপ্লেন ও যাবতীয় ক্যামেরার জিনিসপত্র এবং কাপড়চোপড় সরিয়ে ফেলল । একদিন গভীর শীতের রাত্রে গেরিলারা আকসেলকে চাষী সাজিয়ে ও ইয়ুটাকে তার সঙ্গে দিয়ে হেলসিঙ্কির বন্দরে একটা জাহাজে তুলল । তাদের পোরা হয়েছিল থলের মধ্যে এবং যেখানে থলে ভর্তি ময়দা রাখা ছিল তার পিছনের সারে সেই দুই বস্তায় অনেক ময়দা লাগিয়ে রাখা হয়েছিল । জাহাজ সুইডেনে যাবে । জার্মান সৈনিকরা সব থলে ইনস্পেকশন করে গেল । কয়েকটি থলের মধ্যে বেয়নেট ঢুকিয়ে দেখল ময়দা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা । ভাগ্যক্রমে আকসেলের থলে দূরে ছিল, কারও নজরে পড়েনি বা সন্দেহ হয়নি ।

আধ মাইল দূরে ওপারে সুইডেন, মাঝখানে জলপথ । হেলসিঁববর্গ (সুইডেনে) পৌঁছবার আগেই আকসেল ও ইয়ুটা থলের ভেতর থেকে মুক্তি পেয়েছিল । সুইডিশ বন্ধুরা তাদের সাদরে গ্রহণ করল । মুক্তিযোদ্ধারা আকসেলের উৎসাহে যুদ্ধকালে সংগ্রাম করে গেল নাৎসীদের বিরুদ্ধে । দুঃখের বিষয় আকসেল যখন দেশছাড়া হয়ে জার্মানদের কবল থেকে মুক্তি পেল, তখন সমস্ত আক্রোশ পড়ল মালি ভিগোর ওপর । তার ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল বেলসেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে । সে সব জানত তবুও মালিককে ধরিয়ে দেয়নি কেন, এই হল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ । যুদ্ধ শেষ হলে আকসেল ও ইয়ুটা দেশে ফিরল আর আমেরিকানরা উদ্ধার করল ভিগোকে ।

আকসেল লারসেন ডেনমার্কে প্রথম কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট স্থাপন করল এবং আকসেল ইয়ার্লকে প্রভূত সম্মানে ভূষিত করল । সম্মান লাভ হল ঠিক কিন্তু আকসেলের হৃদরোগ শুরু হল । ওদিকে মাতৃরূপিণী ইয়ুটার ক্যানসার হল এবং তিনি দেহত্যাগ করলেন কিছুদিনের মধ্যেই । এই বিদেশি মহিলা খুবই উচ্চশিক্ষিতা এবং এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের

মেয়ে। আমাকে তিনি আপনার বলে কাছে টেনেছিলাম। কতদিন দেখেছি আমার মুখের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে তিনি কী ভাবছেন। এমন অবস্থায় আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা, তুমি কী দেখো আমার মধ্যে? ইয়ুটা বলল, তুমি তো হিন্দু, জন্মান্তর বিশ্বাস কর। আমি স্বীকার করলাম। তখন বলল যে সে বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে জন্ম জন্ম তার নাড়ীর টান ছিল। আমাকে তার একটুও পর বা বিদেশি মনে হয় না। রঙের পার্থক্য আছে তবে সেটা নাকি তারই দুর্ভাগ্য যে তার রং আমার মতো খাঁটি ব্রাউন নয়। অনেক সময় ইয়ুটা আমাকে আদর করে ডাকত মাই চকোলেট সান। তার ধারণা ছিল আমি নাকি আকসেলের মতো সুপুরুষ, রঙের পার্থক্য ছাড়া। আকসেলের সঙ্গে আমার সাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট। সেও ছয় ফুট লম্বা, তারও দীর্ঘ ঋজু দেহ কেবল মাথায় চুল বয়সের জন্য সব সাদা। বহু বছর পরে আমার স্ত্রীও একই মন্তব্য করেছিলেন আকসেলকে দেখে।

আমার সঙ্গে ইয়ুটার আর দেখা হল না। আকসেলের সঙ্গে হয়েছিল। দীর্ঘ পনেরো বছর পরে ১৯৪৮ সালে জানলাম আকসেলের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এবং আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দেখতে চায়। স্ত্রী পুত্র নিয়ে আবার স্ট্রয়েডামে আমার নিজের ঘরে থাকতে গেলাম অল্পদিনের জন্য। এখন থাক সে কথা।

দেখতে দেখতে আরও এক বছর ডেনমার্কে কেটে গেল। আমি অনেক ভালো আছি। সামনে শীত ও বরফ কিন্তু আমি তার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে চাই। সাইকেল ও হ্যাভারস্যাক খুঁজে বের করেছি। সব ঠিকঠাক, একদিন হঠাৎ যেমন এসেছিলাম তেমনি হঠাৎ পাড়ি দেব।

কোপেনহাগেন শহরে প্রায় যাতায়াত করতে হত। আমার নতুন উদ্যমের কার্যকলাপ দেখে আকসেল ও ইয়ুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। একদিন ডিনার খাবার পর আমি স্ট্রয়েডাম ছেড়ে পৃথিবী ভ্রমণে যাবার কথা বললাম। তর্কবিতর্ক হল না। নীরবে বুড়োবুড়ি চোখের জল ফেলল। আমি মনে মনে ব্যথা অনুভব করলেও সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হলাম না।

রওনা হবার বারোদিন আগে থেকে এমন অদ্ভুত রকম মন খারাপ লাগছিল যে রাত্রে ঘুম হত না। যে পরিচারিকা আমার ঘর সাফ করত সে ইয়ুটার কাছে বলল যে রাত্রে আমি বিছানায় শুই না। ফলে ওদের মনের কষ্ট আরও বেড়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে সবাই যখন শুতে গিয়েছে আমি সাইকেল ও হ্যাভারস্যাক নিয়ে আমেরিকা যাবার জন্য রওনা হলাম। দুই ঘর ভর্তি কাপড়-জামা, ফটোগ্রাফির যন্ত্রপাতি পড়ে রইল, সেই সঙ্গে প্রিন্সও।

মনে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, অথচ যারা এত ভালোবাসে ও আমাকে এত করে চায় তাদের ফেলে যেতে খুবই কষ্ট। সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে আবার অনিশ্চিতের হাত ধরে চলেছি।

কলকাতায় আমার মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু ও বাড়ি ছেড়ে আসতে সাত বছর আগে যেমন কষ্ট হয়েছিল ঠিক তেমনই বোধ করলাম এবারেও ।

সারারাত সাইকেল চালিয়ে ভোরে কোপেনহাগেন শহরের বন্দরে গেলাম যদি জার্মানিতে যাবার জাহাজ পাওয়া যায় । ল্যুবেকগামী একটা মালবাহী জাহাজ বিকালে ছাড়বে । আমি সেটাতেই উঠলাম ।

১৬

পরদিন সকালে জার্মানিতে ল্যুবেক বন্দরে পৌঁছলাম। এখান থেকে হামবুর্গ আমার পরিচিত পথ। হামবুর্গে খবর পেলাম যে ইউ এস লাইনারে একদল লোক স্ট্রাইক করেছে। তাদের সবচেয়ে বড় জাহাজ ম্যানহ্যাটান ফ্রান্সের ল্য হ্যাভর বন্দর রওনা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি বিলম্ব না করে ব্রেমেন শহর দিয়ে হল্যান্ড অভিমুখে যাত্রা করলাম। তিনদিন পর ফ্রান্সের ল্য হ্যাভর বন্দরে পৌঁছে প্রথমে ইউ এস লাইনার অফিসে গিয়ে একটা কাজ জোগাড় করলাম পার্সারের। আমি ব্যাঙ্কে কাজ করেছি সার্টিফিকেট দেখাতেই চাকরি পেলাম ম্যানহাটন জাহাজে। জাহাজে প্রায় দুহাজার যাত্রী উঠেছে। খ্রিস্টমাসের আগে নিউইয়র্ক পৌঁছবার আশায়।

কয়েকশো ছাত্রও কাজ নিয়েছিল ওই জাহাজে। তারা সব কলেজের ছাত্র। অনেকে স্টুয়ার্ড হল, অনেকে ইঞ্জিন রুমে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি।

আমার কাজটা মোটেই শক্ত নয়। প্যাসেঞ্জারদের মূল্যবান সব জিনিস পার্সারের কাছে জমা দেয়। যাত্রা শেষে আবার ফেরত পায়। আমার আরেকটা কাজ হল গেম মাস্টার। এটাও আমার মনের মতো কাজ। যাত্রীদের নানারকম খেলাতে আকৃষ্ট করা এবং প্রতিযোগিতা শুরু করা। টেবিল টেনিস, সাফল বোর্ড, টেনিকয়েট ইত্যাদি খেলা সবার প্রিয়। গরমের দিনে সাঁতার ও সান বেদিংয়ের ভালো ব্যবস্থা আছে। রাত্রে সিনেমা দেখাতে অপারেটরের দায়িত্ব নিতাম।

প্রথম দুদিন সেই রাজপ্রাসাদের মতো জাহাজে সবাই হাসিখুশি। নাচ গান ভোজন ও মদ্যপান পুরোদমে চলেছে। তারপর হঠাৎ বড় বড় ঢেউ আছাড় খেয়ে ম্যানহ্যাটানের গায়ে পড়তে লাগল। জাহাজ কেঁপে কেঁপে উঠে কাত হচ্ছিল। ক্রমে ক্রমে আটলান্টিক মহাসাগর উত্তাল হয়ে সব তোলপাড় করা শুরু করল। জাহাজের দরজা জানলায় সব শক্ত দড়ি বাঁধা হল যাতে কোনও যাত্রী ছিটকে সমুদ্রে না পড়ে। জাহাজের অবস্থা বেশ সঙ্কটজনক। সারাদিনের পর একদিন মধ্যরাত্রে প্রায় আমরা যখন মহাসমুদ্রের মাঝামাঝি পৌঁছেছি, তখন জাহাজ থেকে বিপদ সিগন্যাল দিতে লাগল। জাহাজ কখনও বিরাট

ঢেউয়ের মাথায় উঁচুতে উঠছে আবার পর মুহূর্তে কাত হয়ে জলের গভীরে আছাড় খেয়ে পড়ছে।

যাত্রীদের বেশিরভাগ ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে বা বমি করছে। খাবার ঘরে ডিনার খাবার সময় মাত্র কয়েকজন যাত্রী খেতে যেত। আইসল্যান্ড ট্রলারে কাজ করে আমি উত্তাল সমুদ্রে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সী-সিকনেস আমাকে কাবু করতে পারত না। খুব খারাপ অবস্থায় অনেক নাবিকও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

জাহাজ থেকে অনবরত জলে তেল ঢালা চলছে সমুদ্রকে শান্ত করবার চেষ্টায়। বেশি দূর দেখা যায় না এমন কুয়াশা আমাদের ঘিরে ধরেছে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাতদুপুরে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা দেখছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল আরও দুখানা বড় জাহাজ অনতিদূরে অসহায়ভাবে ঘুরছে। তার একটার নাম বেরেঙ্গারিয়া অন্যটির নাম ইল দ্য ফ্রান্স। সবারই এক অবস্থা। ইঞ্জিন বন্ধ করে ভাসছে, ঘণ্টা বাজিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে অন্য জাহাজকে, পাছে ধাক্কা লাগে।

দুদিন আগে ম্যানহ্যাটন জাহাজ বীরদর্পে সমুদ্রের বুক চিরে পতাকা উড়িয়ে চলছিল, এখন তার কী দুর্দশা! পর্বতপ্রমাণ ঢেউ তাকে আছড়ে প্রায় উল্টে অস্থির করে তুলেছে। রাত কাটে কিনা সন্দেহ। তিনখানা জাহাজের একই অবস্থা।

এর মধ্যে সঙ্কেত হল যাত্রীদের লাইফ বেল্ট পরিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। ডিসেম্বর মাসের শীতে মাত্র কয়েকজন লোক ভেতরের ডেকে উপস্থিত হল। সকলের মুখে আতঙ্কের চিহ্ন। রাত তখন দুটো। যাত্রীদের ধরে ধরে লাইফ বেল্ট পরিয়ে দিলাম এবং লাইফ বোটে কেমন করে উঠতে হবে বুঝিয়ে দিলাম। রাত এমনভাবে শঙ্কার মধ্যে কাটল।

দিনের আলোয় ক্লান্ত যাত্রীদের কফি খেতে দেওয়া হল। বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পেরে তিনখানা জাহাজ আবার যাত্রা শুরু করল। বেরেঙ্গারিয়া ভাসতে ভাসতে একেবারে পাশে চলে এসেছিল।

ডাইনিং হলে যে নামমাত্র কটি লোক খেতে যেত আমি তাদের একজন। বেশ ভালো করেই খেতাম। সময় মতো ডেকের ওপর ছোটাছুটিও করতাম। যারা অসুস্থ তারা আমার উৎসাহপূর্ণ কর্মোদ্যম দেখে হিংসা করত। আমাকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করত ইয়ং ম্যান, হাউ ডু ইউ ডু ইট, আমি বলতাম খুব সোজা, পেট ভরে খাও আর খেলাধুলা কর। কিন্তু বেচারিরা খেতেও পারত না, নড়াচড়া করা তো দূরের কথা।

ষষ্ঠদিনে নোটিস দেখলাম, সে রাত্রেই বা রাত্রি শেষে নিউইয়র্ক পৌঁছবার কথা। যারা স্কাইলাইন দেখতে চায় তাদের জন্য কফি স্যান্ডউইচের ব্যবস্থা থাকবে। অন্যদের কথায়

বুঝলাম স্কাইলাইন মানে সমুদ্র থেকে নিউইয়র্ক শহরের সামনের দৃশ্য। রাত্রে সেটা খুবই মনোরম হয়। সমুদ্রের ধারের বাড়িগুলিতে সারারাত আলো জ্বলে দেওয়ালির মতো। সত্যি সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আকাশচুম্বী বাড়িগুলির ঘরে ঘরে আলো দূর থেকে তারার মতো দেখায়।

নিউইয়র্ক বন্দরের দিকে এগোচ্ছি। হঠাৎ আলো অন্ধকারের মধ্যে এক বিরাট মূর্তি সমুদ্র থেকে উঠেছে মনে হল। নিচে একটা ছোট্ট দ্বীপ, যার ওপরে সুবিশাল লিবার্টি মূর্তি দাঁড়িয়ে।

জাহাজসুদ্ধ লোক স্কাইলাইন দেখবার জন্য একদিকে ঝুঁকেছে। তখন ভোর রাত, চারদিকে অন্ধকার। তার মধ্যে আমাদের বিপুলায়তন ম্যানহাটান জাহাজ (৫০,০০০ টন) হেলে দুলে চলেছে আস্তে আস্তে।

হঠাৎ কানে এল কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে সেই ছোট্ট দ্বীপ থেকে। ক্ষীণ বামাকণ্ঠ। আমি সবাইকে ঠেলে ঠুলে জায়গা করে নিতে দেখলাম একটা পরিচিত মুখ হেলেন প্রাইগের। একে আমি সাহায্য করেছিলাম লন্ডনে থাকবার সময়, বাড়ি অর্থাৎ আমেরিকায় ফিরতে, সে কথা তো আগেই লিখেছি। গরম কাপড়চোপড় মুড়ি দিয়ে অপেক্ষা করছিল আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য। জাহাজের ডেক থেকে জলের ধার অনেক অনেক নিচে। মানুষকে ছোট পিঁপড়ের মতো দেখায়।

ফ্রান্সে ল্য হ্যাভর বন্দর থেকে হেলেনকে জানিয়েছিলাম যে ম্যানহ্যাটান জাহাজে রওনা হচ্ছি। তাই হেলেন অনেক কষ্ট করে দ্বীপে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আমাকে সেখান থেকে ডেকে চমকে দেবার জন্য। সে আসতে আমার খুব উপকার হল। হাতে পাঁচশো ডলার না থাকলে যাত্রীকে এলিস দ্বীপে আটক রাখা হয়। হেলেন আমার টাকার জন্য জিম্মাদার হয়ে আমাকে রেহাই পাইয়ে দিল। তার ফ্ল্যাটে থাকবার নেমন্তন্ন অস্বীকার করে আমি ধন্যবাদ জানালাম। আমার গন্তব্য ছিল রিভর সাইড ড্রাইভ ধরে হাডসন নদীর ধারে ইন্টারন্যাশনাল হাউসে।

এটি একটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিরাট বাড়ি। পাঁচশো ছাত্রছাত্রী এখানে থাকে। একটি নরওয়েজিয়ান ছাত্রী ইন্টারন্যাশনাল হাউসের অফিসে কাজ করে। তার নাম নরমা আরলিকসেন। নরমা আমার সঙ্গে এক জাহাজে এসেছিল। আমার সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছিল। নরমাকে খুঁজে বের করে বললাম যে আমার ঘর চাই। ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত নরমার কাছে শুনে আগ্রহ দেখালেন এবং একদিন লেকচার দেবার কথা বললেন।

আঠারো তলায় বাড়ির সামনের দিকে একটা ভালো ঘর পেলাম । জানলাটা খুলতেই এক বিরাট ট্রাফিকের শব্দ শুনতে পেলাম । একটু পরেই রাস্তার ওপারে মিলিয়ন ডলার চার্চে ঘণ্টা বেজে উঠল ।

ডানদিকে হাডসন নদীর খুব চওড়া নীল জলরাশি বয়ে চলেছে । অদূরে হাডসন ব্রিজ । ওপারে নিউজার্সির রেলওয়ে ইয়ার্ড অস্পষ্ট দেখা যায় ।

হাডসন নদীর নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে ওপারে যাতায়াত করে অসংখ্য গাড়ি । ছেলেবেলায় পড়েছিলাম ওপরে জাহাজ চলে নিচে চলে নর- সেটা আজ চাক্ষুস দেখলাম ।

ইন্টারন্যাশনাল হাউসে আসবার সময় পথে সব গাড়ি প্রায় একই গতিতে প্রাণপণ ছুটছে । রিকশা নেই, ঠেলাগাড়ি নেই, গরুর গাড়ি নেই । সেজন্য মোটর বা বাস জোরে যেতে পারে । একজন লোককেও সাইকেল চালাতে দেখিনি । বরং আমাকে দেখতে রাস্তায় ভিড় জমে যেত গাড়ি ও মানুষের । তাদের মুখ দেখলে মনে হয় ওরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে জানতে চায়, এমন আজগুবি জীব, কোথা থেকে এল । আজকালকার দিনে কে পিঠে এবং সাইকেলে বোঝা চাপিয়ে চলে?

আরেকটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সারবন্দী উঁচু বাড়ি । তাদের মধ্যে সেরা যেটি, সেটি ১২০ তলা উঁচু । নাম এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং । যেদিন শহর দেখতে বেরলাম সেদিন এই বাড়ির ছাদের ওপর থেকে চারদিকের দৃশ্য দেখলাম অবাক হয়ে । নিচে রাস্তায় গাড়িগুলি পিঁপড়ের মতো ছোট দেখা যাচ্ছে । এইরকম উঁচু ১,০০০ ফুটের ওপর, সেজন্য এখানে অপেক্ষকৃত ঠান্ডা । এই রকম উঁচু বাড়ির ছাদের ওপরে খুব সুন্দর কাচ দিয়ে ঘেরা ফ্ল্যাট আছে । খুব বড়লোকেরা থাকে । পেন্ট হাউস বলা হয় । মেঘের মধ্যে বাস করার মতো ।

অসংখ্য লিফট আছে এইসব উঁচু বাড়িতে । এক্সপ্রেস লিফটে চড়লে তারা দশ, বিশ, ত্রিশ তলায় থামে এবং ভীষণ জোরে যায় ।

রকেফেলার সেন্টার সবে তৈরি হয়েছে । দুটো বাড়ি জুড়ে এই সংস্থা । এত বড় যে বাড়ির মধ্যে প্রকাণ্ড থিয়েটার, একটা সিনেমা, যাবতীয় দোকান, পোস্ট অফিস, থাকার ফ্ল্যাট ও অফিস ঘর ইত্যাদি রয়েছে । এই সেন্টারে দিনে এক লক্ষ লোক বাস করতে পারে । উঁচু বাড়িগুলিকে স্কাইস্ক্রেপার বলা হয় । বন্দরের কাছের জায়গাটায় অফিসপাড়াকে ব্যাটারি বা ডাউন টাউন বলে ।

নিউইয়র্ক শহর অল্প জায়গার মধ্যে গড়ে উঠেছে । যখন বাড়তে লাগল তখন উঁচু বাড়ি ছাড়া আর গতি ছিল না । আমেরিকানদের কাছে স্কাইস্ক্রেপার এক গর্বের জিনিস ।

আমেরিকান সভ্যতা মাত্র দুশো বছরের একটু বেশি দিনের ।

আমেরিকা এক আশ্চর্য দেশ, যেমন বিরাট তেমনই খনিজ ধন-সম্পদে ভরপুর। চাষবাষের পক্ষেও খুবই ভালো। কর্মঠ ইউরোপিয়ানরা মাঠে, খনিতে, কলকারখানায় অদ্ভুত অগ্রগতি ঘটাল। অল্পদিনের মধ্যে আমেরিকা শ্রেষ্ঠ ধনী দেশ বলে স্বীকৃত হল সারা পৃথিবীতে। এখন তার রাজনৈতিক ক্ষমতাও সবার চেয়ে বেশি।

আমেরিকানদের সভ্যতা পুরনো নয় বলে বোধ হয় এদের খুব মনখোলা ব্যবহার, সবাই পরিশ্রম করে চটপট নিজের উন্নতির পথ দেখে।

এখন শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চায় আমেরিকা ভীষণ উন্নতি করেছে। পৃথিবীর সব দেশ থেকে স্ত্রী-পুরুষ যায় আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়তে। আমেরিকায় চাকরি করতে যাওয়া মানে অল্পদিনে বড়লোক হওয়া।

খ্রিস্টমাসের আর সাতদিন বাকি। চারদিকে খুব আলোকসজ্জা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল হাউসে একদিন সন্ধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমার ভ্রমণকাহিনী বললাম। তখন পাঁচশো তরুণ-তরুণীর কাছে আমার খুব কদর বেড়ে গেল। আবার একদিন বলবার আমন্ত্রণ পেলাম। ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে আন্দোলন চলেছে সে বিষয় অনেকে জানতে চাইত আমরা কীরকমভাবে স্বাধীনতা অর্জন করব। আমেরিকানদের মতো ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, না শান্তিপূর্ণ উপায়ে। তখন গান্ধীজির ডাকে দেশ সাড়া দিয়েছে তাই মনে হত এঁর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন হব তবে কেমন করে তা জানতাম না। সবার খুব উৎসাহ দেখেছি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে জানবার, বেশিরভাগ শ্রোতাদের বিশ্বাস এই রকম আন্দোলন একটা ইউটোপিয়া বা কল্পনার জগতের জিনিস।

একদিন রেডিও সিটিতে একটা কিউবান নাচ দেখতে গেলাম। ফেরবার সময় দেখলাম নোটিস রয়েছে এক জায়গায় যে উদয়শঙ্করের নাচের দল শীঘ্রই নিউইয়র্কে আসছে। ব্যবস্থাপক ছিলেন শ্যাম হুরক।

আমি হুরকের সঙ্গে পরদিন দেখা করে বললাম যে আমার কাছে উদয়শঙ্করের নাচের দুই হাজার ছবি বা নেগেটিভ আছে যা তার বিজ্ঞাপনে সাহায্য করবে। ছবি দেখে হুরকের খুব আনন্দ হল। তিনি চারশো ডলার দিয়ে কুড়ি খানা নেগেটিভ খরিদ করলেন। আমার হাতে কিছু টাকা এল।

দুদিন পরে রকেফেলার সেন্টারে এক বিজ্ঞাপন দেখলাম। উদয়শঙ্করের বড় বড় ছবি তৈরি করে তাদের যন্ত্রচালিত করেছে। খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। আমি হুরকের অফিসে গিয়ে তাদের কাজের তারিফ জানালাম। হুরক জানালেন যে তিনি আমাকে কাজে লাগাতে পারেন। তাতে আমারও সুবিধা ও সাহায্য হবে।

দেখতে দেখতে খ্রিস্টমাস এসে গেল। ইন্টারন্যাশনাল হাউসে পাঁচশো ছাত্রছাত্রীদের এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল। ম্যানেজার খ্রিস্টমাসের তাৎপর্য বুঝিয়ে একটা খুব সুন্দর বক্তৃতা দিলেন।

ম্যানেজার আমাকে অনুরোধ করলেন যে হাউসে আমার একশো ছবির প্রদর্শনী করতে। একটি আমেরিকান যুবক ব্যাঙ্কস ও তার বান্ধবী সিন্থিয়া এগিয়ে এল আমাকে সাহায্য করতে। আমি হেলেনকেও ডাকলাম। এরা তিনজন সব ছবির ঠিকমতো ক্যাটালগ তৈরি করল এবং আলোর ব্যবস্থা হল।

প্রদর্শনী চলল এক সপ্তাহ ধরে। বহুলোক দেখল এবং খুব প্রশংসা পেলাম ক্যামেরা আর্টিস্ট নামে।

হেলেনের মা আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেদিন হেলেনের ছোট বোনের সঙ্গে আলাপ হল। তার খুব ইচ্ছা আমার সঙ্গে ভাব করবার। ছবির প্রদর্শনী দেখে তার খুব ভালো লেগেছে।।

হেলেনের মা বয়োবৃদ্ধা খুব শান্ত প্রকৃতির। ডিনার টেবিলে সমাগত নিমন্ত্রিতদের কাছে তিনি আমার পরিচয় দিয়ে বললেন যে পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, আমার মেয়ে হেলেনের বিপদের দিনে যে বিনা শর্তে টাকা দিয়ে হেলেনকে বাড়ি ফিরে আসতে সাহায্য করেছিল। আজ আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিন। আমি বিমলের মায়ের বয়সী। সর্বান্তকরণে তার শুভকামনা করি। পৃথিবী ভ্রমণ সম্পূর্ণ করে সে যেন জীবনে সার্থকতা লাভ করতে পারে। আমি তার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

সামান্য দুচার কথায় আমিও ধন্যবাদ জানালাম।

হুরকের সঙ্গে দেখা করে একটা ভালো কাজ জোগাড় করলাম। সর্বসমেত কুড়িটা কলেজে আমার ল্যান্টার্ন স্লাইড দিয়ে ছবি দেখাব এবং লেকচার দেব। আমার অফুরন্ত ছবি থেকে ফিলভম স্লাইড করেছিলাম তাদের মধ্যে বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে চল্লিশটা ল্যান্টার্ন লেকচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। এর জন্য প্রত্যেক কলেজ থেকে পাঁচশো ডলার পাব। যেদিন পৌঁছব তার দুদিন আগে খবর দিতে হবে।

সব কলেজে খবর দিয়ে টাকাকড়ির ব্যবস্থা সব ঠিক করবার জন্য হুরক এক সপ্তাহ সময় চাইল।

ইতিমধ্যে উদয়শঙ্করের দল নিউইয়র্ক পৌঁছল, নাচের প্রোগ্রামও শুরু হল। দলের সবাই আমাকে এত চাইত এবং ভালোবাসত যে মনে হত আমি যেন দলের একজন। সবাই দামি দামি ক্যামেরা কিনেছিল। তারা ছবি তোলার তালিম নিত আমার কাছে। নিউইয়র্কে উদয়শঙ্করের খুব নাম হল, এমন নাচ এখানে কেউ দেখেনি।

কিছুদিন পর আমি নিউইয়র্ক ছেড়ে বোস্টন শহরে গেলাম । সেখানে উঠলাম মিউজিয়ামের কিউরেটর, আনন্দ কুমারস্বামীর বাড়িতে । এঁর মতো প্রগাঢ় পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোক আমি কম দেখেছি । ভারতীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতি তাঁর নখদর্পণে । কুমারস্বামীর পরিচালনাধীন মিউজিয়াম একটি অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার ।

বোস্টন ছেড়ে গেলাম বাফেলো শহরে । ফোর্ড কোম্পানির বিরাট কারখানা দেখতে গেলাম । বাফেলো থেকে উত্তর দিকে কাছেই বিশ্ববিশ্রুত নায়গ্রা ফলস দেখে মুগ্ধ হলাম । ফলসের নিচে সুড়ঙ্গপথে ঢুকলাম, অয়েল ক্লথ ঢাকা থাকা সত্ত্বেও ভিজে গেলাম । ছবি তোলার উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যর্থ হল ।

ফলসের ওপর রোপওয়ে । চেয়ারে বসে ওপারে কানাডায় পৌঁছলাম । এই দিকটা বেশি সুন্দর । নায়গ্রা থেকে কানাডার টরোন্টো শহরে গেলাম । খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারদিক । চওড়া রাস্তা ও বড় বড় বাড়ি । টরোন্টোয় দুদিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে পৌঁছলাম । নিউইয়র্কের পরেই বড় শহর হচ্ছে শিকাগো । এখানে স্কাইস্ক্রেপারের ছড়াছড়ি ।

রাস্তায় অনেক নিগ্রো স্ত্রী-পুরুষ দেখলাম যারা এদেশেই জন্মেছে এবং বড় হয়েছে । সাধারণত শ্বেতকায় আমেরিকানরা নিগ্রোদের স্নেহের চোখে দেখে না । দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে তো নিগ্রোদের রীতিমতো ঘৃণা করে । যত দেশের উত্তর যাওয়া যায় ততই মনে হয় নিগ্রোদের অবস্থা কিছুটা ক্রমোন্নতির দিকে । আইনের চোখে আমেরিকায় নিগ্রোর পূর্ণ নাগরিকত্ব স্বীকৃত ।

এখানেও উদয়শঙ্করের দল এল নাচ দেখাতে । দেখা করার সঙ্গেই তাদের কাছে থাকবার নেমন্তন্ন জানাল । দুদিন উদয়ের কাছে থেকে আমি দক্ষিণে পাড়ি দিলাম । দুটো কলেজে ল্যান্টার্ন লেকচার দিতে গিয়েছিলাম । খুব লোকের ভিড় সেখানে ।

শিকাগো ছেড়ে কলোম্বাস, ফিলাডেলফিয়া, বল্টিমোর হয়ে অবশেষে ওয়াশিংটন পৌঁছলাম । এখানে অনেক কিছু দ্রষ্টব্য আছে । রুসভেল্ট প্রহিবিশন উঠিয়ে দিয়েছেন, তাই যেন আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে দেশে । চোরাই মদের কারবার বন্ধ । লোকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল । প্রহিবিশন দেশে কত বড় ক্ষতি করেছে বলা যায় না । অল্পদিনে রুসভেল্ট খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়লেন ।

চলতে চলতে দক্ষিণে ফ্লোরিডার মায়ামী শহরে পৌঁছলাম । এখানে মনে হয় খুব বড়লোকেরা বাস করে । অফুরন্ত হোটেল রয়েছে । ভালো হোটেলে এক সপ্তাহ থাকার খরচে আমি অর্ধেক পৃথিবী ঘুরতে পারতাম ।

এখানে শীতকালেও যথেষ্ট গরম । সমুদ্রসৈকতে হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ রৌদ্রস্নান করছে, নিউইয়র্কে হয়তো এই সময় বরফ পড়ছে ।

মায়ামীর মায়া কাটিয়ে জাহাজ ধরলাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিউবা দ্বীপে যাবার জন্য । জাহাজে একটি তরুণী আমার সঙ্গে কথা বলল । তার নাম লোলিতা । নাম শুনে মনে হল কোথায় যেন দেখেছি । নিউইয়র্কে রেডিও সিটিতে কিউবান নাচ দেখতে গিয়েছিলাম! এই সেই লোলিতা । দলের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল । নাচ আমার ভালো লেগেছে শুনে সকলে খুব খুশি ।

ডেকের ওপরেই নাচ গান আরম্ভ করে দিল । খুব আমুদে সবাই । আমার মতো ওরা সকলেই হাভানা যাচ্ছে । তারপর কিউবা দ্বীপের নানা জায়গায় ঘুরে বাড়িতে চলে যাবে । আমার অনেক নেমন্তন্ন হল ।

হাভানা মস্ত শহর । বড় শহরের আনুষঙ্গিক সব কিছুই আছে, যেমন অপেরা হাউস, বড় বড় হোটেল, গাড়ি, বাড়ি, দোকান । খুব কড়া রোদ । ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম । রাস্তার ধারে একজন লোক কী একটা পানীয় তৈরি করে বিক্রি করছে । খুব ভিড়, কাছে গিয়ে দেখলাম রামের মধ্যে বরফ গুঁড়িয়ে একটু সিরাপ দিয়ে বেচছে । পানীয়র নাম ডায়কুড়ি । আমি এক গ্লাস কিনলাম । খেতে খুব মুখরোচক, বেশি খেলে নিশ্চয় নেশা হয় ।

কিউবার প্রধান রপ্তানি পণ্য হল চিনি । আখের চাষ প্রচুর । গুড় থেকে রাম হয় । ওয়েস্ট ইন্ডিজের রাম জগদ্বিখ্যাত । আমাদের দেশের রামের সমকক্ষ ।

আরেকটি জিনিসের যথেষ্ট চাষ ও রপ্তানি হয়- টোবাকো । হাভানা সিগার পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

এ দেশে স্প্যানিশ সভ্যতার স্পষ্ট ছাপ সর্বত্র । অনেক লোক নিগ্রো ক্রীতদাসের বংশধর ।

কিউবা দেশটা ভারি সুন্দর । গ্রামের পথে সাইকেলে চলেছি । যত দূর দেখা যায় বুগেনভিলিয়া গাছ ও ফুল । বুগেনভিলিয়া নামে এক ফরাসি নাকি এই গাছ তুলে নিয়ে দক্ষিণ ইউরোপে রোপণ করে । অবশেষে ফুলের পরিচয় আজ সেই ফরাসির নামে । পৃথিবীর সর্বত্র এ ফুল এখন ছড়িয়ে পড়েছে ।

লোলিতার গ্রাম সামনে । পৌঁছে একটা টেলিফোন করলাম । লোলিতা টেলিফোন ধরেই আমার গলা শুনে বলল তার বাড়িতে যেতে । ইতিমধ্যে পাড়ার ছেলেদের খবর দিয়েছে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য । তরুণ-তরুণীরা দলে দলে লোলিতার বাড়ির সামনে হাজির । আমাকে দেখে হই হই করে উঠল । সবাই মিলে গান ধরল গিটারের সঙ্গে ।

একজন একটা বিস্কুটের টিন এনে নিখুঁতভাবে বাজাতে আরম্ভ করল যেন তবলা বাজাচ্ছে । গানটা স্প্যানিস ভাষায় । ওই ভাষায়ই সবাই কথা বলে । কয়েকজন ভালো ইংরিজিও বলতে পারে ।

লোলিতাদের অবস্থা ভালো । রাম তৈরি করে পৃথিবীর নানান জায়গায় চালান দেয় । সে বাবা মার একমাত্র মেয়ে । লোলিতা হুকুম দিল সবাইকে রাম দেওয়া হোক । আমাকেও দিল । তারপর টোস্ট করে আবার গান ধরল । সবার মনে খুব স্ফূর্তি । আমেরিকা সফর করে তারা প্রায় ত্রিশ হাজার ডলার লাভ করেছে ।

অনেক লোকের মধ্যে সেখানে আমিই একমাত্র, যে রেডিও সিটি স্টেজে লোলিতা ও তার দলকে কিউবান ড্যান্স করতে দেখেছি । সবাই আমার মুখে শুনতে চায় কিউবান নাচ গান কেমন লাগল । আমি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম । তখন সবাই মিলে গান ধরল । ওয়েলকাম টু বিউটিফুল কিউবা ।

কিউবা দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রের খুব কাছে । ব্যবসা-বাণিজ্য, আদান-প্রদান দুই দেশের মধ্যে রীতিমতো জোর । অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর কিউবার নির্ভরতা খুব বেশি । ফলে সে তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় না । মনে হয় যেন কিউবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীন এক দেশ । কিউবান বিত্তশালী যারা, তারা চায় আমেরিকার সঙ্গে মিশে যেতে । এই রকম স্বার্থান্বেষী লোক পৃথিবীর সব দেশেই দেখা যায় ।

তিনদিন পরে লোলিতা, তার মা বাবা ও বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে হাভানার দিকে রওনা হলাম ।

হাভানা বন্দরে পৌঁছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিয়ান্স শহরে যাত্রীবাহী একটা জাহাজে উঠলাম । আমার হলিউড দেখার খুবই শখ ছিল । সেজন্য পথ ধরলাম লস অ্যাঞ্জেলেসের । এই পথ খুব কঠিন । মরুভূমি পার হতে ও পাহাড় পেরোতে হবে ।

শহরে পৌঁছে একটা রেস্তোরাঁতে খেতে গেলাম । খুব খিদে পেয়েছিল । আমেরিকায় এক ধরনের রেস্তোরাঁ সব শহরেই দেখা যায় । খাবার প্লেট সঙ্গে নিয়ে কাউন্টারে দাঁড়ালে যা খেতে চাই আমার প্লেটে তুলে দেবে । খাওয়া শেষ হলে প্লেটটা যথাস্থানে রাখা এবং দাম দিয়ে যাওয়া । এই ধরনের রেস্তোরাঁতে সস্তায় ভালো খাবার পাওয়া যায় । এর নাম হেলপ ইওরসেলফ সার্ভিস বা কাফেটেরিয়া । সব স্কুল ও কলেজে যেখানে অনেক ছাত্রছাত্রীরা খায় সেখানে সব কাফেটেরিয়ার নিয়মে চলে । আরেক উপায়ে ভালো খাবার পাওয়া যায় । স্লট সিস্টেম বলে । পয়সা ফেলে স্লট টানলেই এক প্লেট পছন্দমতো খাবার বেরিয়ে আসে । কাচের জানলা দিয়ে দেখা যায় নানা রকম খাবারের ব্যবস্থা ।

স্লট সিস্টেমে এদেশে অনেক জিনিস পাওয়া যায় যেমন, চকলেট, স্ট্যাম্প, দেশলাই ইত্যাদি। এখানে বেশ গরম, যদিও উত্তর যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র বরফ পড়ছে।

ইউরোপে থাকতে বিশেষ করে স্ট্রয়েডামে প্রায়ই রাত্রে ডিনারের আগে এক ডিস অয়স্টার খেতে দিত। প্রথম দিকে আমার ভালো লাগত না, কাঁচা ডিম খাওয়ার মতো। ঝিনুক খুলে একটু লেবু দিয়ে অয়স্টার খায়। সেইসঙ্গে মদ বা বিয়ার। পরে খুব ভালো লাগত, চেয়ে খেতাম।

নিউ অরলিয়ান্স শহর মিসিসিপি নদীর মোহনায় অবস্থিত। সামনেই গালফ অব মেক্সিকো। গালফে অনেক অয়স্টার পাওয়া যায়।

নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। এখানে মিসিসিপি ও মিশরি নদীর যুক্ত মোহনা। এত চওড়া যে সমুদ্র মনে হয়।

হুরকের সঙ্গে শর্তানুযায়ী আমি কলেজে ল্যান্টার্ন লেকচার দিলাম। আরও দুটো শহরে লেকচার দিলে আমার শর্ত পূরণ হবে। লস অ্যাঞ্জেলস শহরে পৌঁছলে আমি আমার পারিশ্রমিক পুরো পাব।

নিউ অরলিয়ান্স ছেড়ে হুস্টন শহরে গেলাম। এই দেশে গ্রাম যাকে বলে তা খুঁজে পেলাম না। হয় ছোট শহর, আরও ছোট শহর, নয় বড় শহর, আরও বড় শহর। শহরের সব সুবিধা সর্বত্র। যেখানে মানুষ থাকে সেখানেই সিনেমা, ড্রাগস্টোর, দোকান, ডাক্তার ও নাচঘর আছে।

হুস্টন পৌঁছতে চারদিন লাগল। অনেকটা ঘুরে যেতে হয় বলে লুইসিয়ানো শহরে যাওয়া হল না। হুস্টনে দুদিন বিশ্রাম করে গ্যালভেস্টন শহরে গেলাম। দক্ষিণ আমেরিকার যাবতীয় আমদানি ও রপ্তানি হয় দক্ষিণের এই দুটি বন্দরে, নিউ অরলিয়ান্স ও গ্যালভেস্টন। শেষোক্ত শহরটি কলোরাডো নদীর মোহনায়।

আমেরিকায় এত বড় বড় নদী আছে যে স্টিমারে দূর দূর জায়গায় যাওয়া যায়।

গ্যালভেস্টন ছেড়ে পশ্চিম টেকসাসে চলেছি। এটা একটা মস্ত বড় স্টেট। এই স্টেটে অপর্যাপ্ত পেট্রোলের খনি আছে। আমেরিকায় পেট্রোল খুব সস্তা। সবাই বড় বড় গাড়ি চালায়। ক্রমে পথ মরুভূমির ভেতর চলে গেল। নিজেকে তখন খুব একা মনে হয়। চারদিকে বিরাট শূন্যতা। রাস্তা দিগন্তে মিশেছে, ক্যাকটাস গাছ বড় বড় মানুষের মতো এখান সেখানে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে দেখতাম সেই ক্যাকটাসে অপরূপ ফুল ধরেছে।

সান এনটোনিওতে পৌঁছলাম রাতে। ভীষণ গরম। ভারতবর্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে দুদিন থাকতে হল। তারপর লুজন দিয়ে এগোবার সময় সামনে পাহাড় পেলাম। এল পাশোতে কাটালাম একরাত। সিয়েরাবিয়েঙ্কা পৌঁছতে তিনদিন কাটল।

সামনে নিউ মেক্সিকোর পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে এরিজোনা স্টেটের টাকশান শহরে পৌঁছলাম । এরিজোনার বেশিরভাগ মরুভূমির নাম গিলা । এরিজোনার গায়ে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট । সামনে বেশ উঁচু পাহাড় । এক হাজার থেকে তিন হাজার ফুট উঁচু পথে সাইকেল ও বোঝা নিয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল । আনন্দের মধ্যে এই যে লস অ্যাঞ্জেলেস বা হলিউড সন্নিকট । পাহাড়ি পথে বেশ শীত । রাস্তা ঘুরে ঘুরে ওপারে প্যাসিফিক মহাসাগরের দিকে চলেছে । চারদিন পর হঠাৎ নিচে এক প্রকাণ্ড শহর, লোকজন ও গাড়ির প্রাচুর্য দেখলাম ।

শ্যাম হুরকের সঙ্গে কথা ছিল বিল্টমোর হোটেলে তার চিঠি পাব । বিল্টমোর এক বিরাট, দামি হোটেল । হোটেল ভর্তি ফিল্মস্টার । রিসেপশনে গিয়ে কয়েকটা চিঠি পেলাম, তার মধ্যে হুরকেরটা উল্লেখযোগ্য ।

আমি হ্যাভারস্যাক নিয়ে লিফটে উঠতে যাব, একজন স্টুয়ার্ড এগিয়ে এসে আমার কাঁধ থেকে সেটি নিয়ে নিল এবং বিশতলা উঁচুতে আমার ঘরে পৌঁছে দিল ।

আমি ঠিক করেছিলাম তিনদিন বিল্টমোরে থেকে আরাম করে নেব, তারপর আবার চলব । ড্রাফট ভাঙাবার জন্য পাসপোর্ট ও একটা ভালো ঠিকানার হোটেলের প্রয়োজন ছিল ।

পরদিন প্রাতরাশ খেয়ে বেরোলাম ব্যাঙ্কের সন্ধানে ।

প্রথমেই গেলাম হলিউডে । ইউনিভার্সালের স্টুডিওতে ফিল্ম তোলা দেখা গেল । একটা ফোর্টের দৃশ্য দেখলাম যেটা রোনাল্ড কোলম্যান অভিনীত এ টেল অব টু সিটিস-এ ব্যবহৃত হয় । প্রকাণ্ড দুর্গটা যে একেবারে ফাঁকি তা ফিল্ম দেখবার সময় ভাবতে পারিনি । ফোর্টটি, কাঠ, কাগজ, চট ইত্যাদি রং-করা ভুয়ো সাজানো তাসের ঘর ।

গুড আর্থ তৈরি হয়েছে অল্পদিন আগে । একটা পার্কের একাংশ কার্ডবোর্ড দিয়ে চিনে পাড়ায় পরিণত হয়েছে ।

ঘুরতে ঘুরতে অনেক বেলা হয়ে গেল । লাঞ্চ খেতে গেলাম স্টুডিওর মধ্যে ডাইনিং রুমে । শিল্পীরা মেক আপ ও আজগুবি বেশভূষা করে সেট থেকে খেতে এসেছে । তখন কত হিরো হিরোইনকে একত্রে দেখলাম তার ঠিক নেই । কেবলমাত্র ক্লার্ক গেবলকে চিনতে পারলাম । বিল্টমোর হোটেলের লিফটে দুবার দেখেছি তাকে ।

লস অ্যাঞ্জেলেস চির বসন্তের দেশ । ইচ্ছা করলে সুতির কাপড়, নয়তো পশম পরলেও আরাম পাওয়া যায় । শহরের বড় লোকেরা অদূরে পাহাড়ের সব জায়গায় থাকে । যেমন বেভারলি হিলস ও সানসেট বুলেভার্ড ইত্যাদি ।

শাকসজ্জি ও ফলের বাজার সম্পূর্ণ জাপানিদের হাতে । তারা এত সুন্দর করে সব সাজিয়ে রাখে যে দেখলে আনন্দ হয় । অনেক জাপানি ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করছে । আমেরিকার প্রায় সব স্টেটের বড় শহরে লন্ড্রির কাজ করে চিনারা । চওড়া রাস্তা ও দামি ল্যাম্পপোস্ট দেখবার মতো ।

ক্যালিফোর্নিয়াতে আভোকাডো নামে এক রকম পেয়ারার মতো ফল হয় যা ওরা সব্জি হিসাবে ব্যবহার করে । অনেক জায়গায় ফ্রুট সালাডের সঙ্গেও খায় । আভোকাডো সুস্বাদু নয়, তবে খাদ্যের দ্রব্যগুণ হিসাব করলে খুবই উঁচু দরের । লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে জাহাজ নিয়ে পানামা যাব ঠিক করেছিলাম কিন্তু এক আমেরিকান বন্ধু বলল, সানফ্রান্সিস্কো গোল্ডেন গেট ব্রিজ না দেখে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ঠিক হবে না । অগত্যা তাই ঠিক করলাম । ছবির মতো ক্যালিফোর্নিয়া দেশের উত্তর দিকে রওনা হলাম । আমাকে ছেলেবেলায় পৃথিবী ভ্রমণে অনুপ্রাণিত করেছিল হেনরি মার্টিনেট, তার বাড়ি ছিল ক্যালিফোর্নিয়া কিন্তু ঠিকানা জানি না বলে কিছু করতে পারলাম না ।

ছেলেবেলায় আমি যখন হেনরি মার্টিনেটের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ছিলাম, তখন একবারও মনে হয়নি তার ঠিকানাটা জেনে নেওয়ার কথা । আমেরিকা একদিন আমার নিজের চেষ্টায় ঘুরতে ও দেখতে পাব, সেকথা তখন কল্পনার বাইরে ছিল ।

যা হোক সানফ্রান্সিস্কোতে যাওয়া সার্থক হল । প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ওপর পাহাড়ি জায়গায় শহরটা । সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠলে জলে ঝিকিমিকি করে এবং অপূর্ব সুন্দর দেখায় । একটা দ্বীপের ওপর ওকল্যান্ড শহর । তাকে যুক্তরাষ্ট্রের মেনল্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত করবার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের ওপর এক বিরাট সেতু তৈরি হচ্ছিল । এরই নাম গোল্ডেন গেট ।

সানফ্রান্সিস্কো শহরে খুব ভালো চিনা খাবারের রেস্তোরাঁ আছে । চিনাপাড়ায় একটা রেস্তোরাঁতে খেলাম খুব তৃপ্তি করে । পৃথিবীর সব বড় শহরে যে চিনা খাবারের প্রচলন শুরু হল, তা বোধহয় সানফ্রান্সিস্কো শহরে আমেরিকান চাইনিজ উদাহরণ থেকে ।

মস্ত বড় বন্দরে অনেক জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে । আমি ঠিক করলাম তিনদিন পরে একটা জাহাজে পানামা দেশের বালবোয়া শহরে যাব । পথে মেক্সিকোর আকাপুলকো বন্দরে থামবে সাত দিনের মতো মালপত্র দিতে নিতে । ভালোই হল । আমি আকাপুলকো বন্দরে নেমে পড়লাম এবং পাঁচদিন দেশ ভ্রমণে যাব ঠিক করলাম । বন্দর থেকে সাইকেল ঠেলে ওপরে শহরে পৌঁছতে রীতিমতো কঠিন পরিশ্রম করতে হল ।

প্রথমে দেখতে গেলাম এক গির্জা । এটি স্প্যানিশদের যুগে তৈরি হয়েছিল অনেক আড়ম্বর করে । বহু রেড ইন্ডিয়ান দেখলাম, গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে কাঁধের ওপর কম্বল

ভাঁজ করে রেখে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে । লোকগুলির বেশভূষা দেখলে মনে হয় খুব সামান্যই রোজগার করে ।

স্পেন এককালে দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত রাজত্ব করেছে । আজও তার নিদর্শন দেশময় বিস্তৃত । এমনকী দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িগুলি স্প্যানিশ ধাঁচে তৈরি । তারও আগে এই দেশগুলির বাসিন্দা ছিল রেড ইন্ডিয়ানরা । স্পেনের লোকেদের সঙ্গে এদের সংমিশ্রণ হয় ব্যাপকভাবে । যার ফলে অনেক স্প্যানিশ ইন্ডিয়ান দেখা যায়, আমাদের দেশে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মতো ।

আকাপুলকো শহর ছেড়ে মেক্সিকো শহরের পথ ধরলাম । কিন্তু সিয়েরা মাদ্রে পর্বতশ্রেণী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে । প্রায় ছয় হাজার ফুট অতিক্রম করার পর পাহাড়ের ওপর সমতল রাস্তা পেলাম । অল্প পরিশ্রমে মনে হয় শ্বাসরোধ হয়ে আসছে । একদিন পরে বুঝলাম উচ্চতার জন্য এই অবস্থা, দুদিন পরে ক্লান্ত ভাব কেটে গেল ।

মেক্সিকোর রাজধানী । মস্ত বড় পাহাড়ি দেশটা এখান থেকেই সরকারি নির্দেশনায় চলে । গভর্নমেন্ট বামপন্থী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে বিশেষ ইচ্ছুক নয় । খেলাধুলার বেশ চর্চা আছে দেখলাম । অল্প স্প্যানিশ ভাষা শিখেছিলাম ইউরোপে থাকতে । সেটা এখানে খুব সাহায্য করছে ।

ঠিক সাত দিন পরে আমি আকাপুলকো শহরের বন্দরে ফিরে এলাম । জাহাজ ছাড়তে আরও তিন দিন দেরি । অনেক দূর থেকে পশম আসছে । সেগুলি নিয়ে যেতে হবে উত্তর আমেরিকায় । পাহাড় থেকে নেমে এখানে বেশ গরম পাচ্ছি । ট্রপিক অব ক্যানসার বেশি দূরে নয় । জায়গাটি মনোরম । পরে শুনেছি আমেরিকানরা কোটি কোটি ডলার খরচ করে আকাপুলকোকে ট্যুরিস্টের স্বর্গ বানিয়েছে ।

জাহাজ নোঙর তুলে দক্ষিণে রওনা হল । পথে গোয়েটমালা, সান সালভাডর নিকারাগুয়া ও কোস্টারিকা পার হয়ে পানামায় বালবোয়া শহরে পৌঁছলাম । এখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় যাবার কথা । ক্যাপ্টেন অনুরোধ করল পানামা ক্যানেল সবটা জাহাজে পার হয়ে কোলোন শহর পর্যন্ত যেতে । বলল যে প্যাসিফিক থেকে আটলান্টিক ক্যানালের ভেতর দিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা অসাধারণ ।

ক্যানেলের মুখে বালবোয়া শহরে জাহাজ থামল । অপেক্ষা করছিল কখন তার পালা হবে ক্যানেলে ঢুকতে । এই অঞ্চলে আমার খুব গরম লাগছিল । ঘাম হচ্ছিল প্রচুর । জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটা খুব সুন্দর গার্ডেন রেস্তোরাঁয় বিয়ার খেতে গেলাম । প্রায় সব লোকই আমেরিকান ।

পানামা ক্যানেল যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ।

ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপ্স সুয়েজ ক্যানেল করবার পর পানামা ক্যানেলে হাত দেন। তখন ম্যালেরিয়ায় ভীষণ লোকক্ষয় হওয়ায় তিনি কাজ বন্ধ রাখেন। তখন যুক্তরাষ্ট্র ক্যানেলের গুরুত্ব বুঝে সমস্ত দায়িত্ব নিজেরাই নেয় এবং সেই অবধি ক্যানেল যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে। দেশ দখল করে রাখার জন্য পানামাকে খেসারৎ দিতে হয় প্রতি বছর।

ভোর রাতে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ডেকে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরেই আমাদের জাহাজ ক্যানেলে প্রবেশ করবে। অনেকদিন বড় পাখি আকাশে উড়তে দেখিনি। চিলের মতো বড় কালো পাখি বাতাসে ভেসে আসছে দেখে আমার মনে হল সুদূর কলকাতার কথা।

অদ্ভুত কৌশলে ক্যানেলের মধ্য দিয়ে জাহাজ আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। সামনে আরও তিনখানা জাহাজ আছে। জাহাজ ক্যানেলে ঢোকবার পর পিছনে বড় গেট বন্ধ হয়ে গেল। সামনে আরেকটা গেট, আস্তে আস্তে খুলে যেতে জল ঢুকতে আরম্ভ করল প্রথম খোপে। তারপর যখন জলের লেভেল এক হয়ে গেল, জাহাজ দ্বিতীয় পদক্ষেপ করল। এমনইভাবে আঠাশবার জল উঁচু এবং জল নিচুর মধ্য দিয়ে জাহাজ সমস্ত ক্যানেল পার হল।

সমুদ্রের জলের লেভেল বা সমতা পৃথিবীর সব জায়গায় সমান কিন্তু এই ক্যানেলের দুই মুখে দুই রকম উচ্চতা। আটলান্টিক প্যাসিফিকের চেয়ে শুনেছি চার ফুট উঁচু। সেই জন্য ক্যানেলের মধ্যে জলের সমতা বজায় রেখে জাহাজ চলে। দুপুরবেলার একটু আগে আমার জাহাজ আটলান্টিকের ধারে কোলোন শহরে পৌঁছল। আমি ক্যাপ্টেনকে বিদায় দিয়ে ডাঙায় নামলাম। এক রাত কোলোন শহরে থেকে পরদিন শহর দেখতে গেলাম। অনেক বড় বড় দোকান আছে। ডিউটি বা শুল্ক না দিয়ে জিনিস বিক্রি হয়। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একজন দোকানের মালিক সোজা বাংলায় আমাকে বলল, তার দোকান দেখবার জন্য। আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কেমন করে জানলে আমি বাঙালি। সে বলল, তার নাম মোক্তার এবং চাটগাঁতে তার বাড়ি। কেমন করে জানি না মোক্তারের মনে হয়েছিল আমি বাঙালি। সে একটা সুযোগ নিয়ে বাংলায় কথা বলে দেখল কী ফল হয়। যদি আমি সাড়া দিই তবে বাঙালি না হলেই নয়। আমি মোক্তারের সঙ্গে করমর্দন করে আমার নাম বললাম। আমি কে, কী করছি শুনে মোক্তারের উৎসাহ খুব বেড়ে গেল। আমাকে নিয়ে তার দোকান দেখাল। ক্যামেরা পারফিউম ইত্যাদি জিনিসে ঠাসা। আমাকে একটা আফটার শেভ লোশন উপহার দিল। তারপর বলল, আমার স্ত্রী কতদিন দেশের লোক দেখেনি তার ঠিক নেই। চলেন আমার বাড়িতে খানাপিনা করবেন।

একরকম আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। আমিও অবিশ্যি অনিচ্ছুক ছিলাম না। থানায় আমার সাইকেল জমা রেখে শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। সেখান থেকে সাইকেল নিয়ে দুজনে চলতে চলতে একটা দোতলা বাড়ির সামনে থামলাম। দোতলায় মোক্তাররা থাকে। তাদের একটি ছেলে আছে। মোক্তার লাফাতে লাফাতে দোতলায় গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এল। গৃহিণী বেশ সপ্রতিভ, বিদেশে একা থাকার ফলে বোরখা ত্যাগ করেছেন। সলজ্জভাবে আমাকে সালাম জানালেন।

মোক্তার কেমন করে চাটগাঁ ছেড়ে সুদূর পানামার বাসিন্দা হল জানতে ইচ্ছা হল। সে বলল, একটা জাহাজে খালাসির কাজ করতাম, জাহাজের কাজে ইস্তফা দিয়ে বারো বছর আগে এইখানে নেমে পড়লাম। জাহাজ চলে গেল। আমার জমানো সব টাকা দিয়ে এই দোকানটা কিনলাম। আগে ছোট ছিল। পরে ব্যবসা ভালো চলতে বড় ও আধুনিক করলাম। একবার চাটগাঁয় যাই এবং বিবি নিয়ে ফিরি।

ওদিকে গৃহিণী মোক্তারকে ডেকে বললেন, ঘরে কিছু নেই যে মেহমানের সম্মান রাখি। মোক্তার হাসিমুখে বলল, আরে বাঙালির ছেলে ভাত ডাল পেয়ে খুশি হবে না! তার সঙ্গে আবার মাছ। বিবিজান তুমি তোমার রান্নার কেরামতি রাত্রের খানায় দেখিও। আমি মুখার্জিবাবুকে আজ ছাড়ছি না। বিবি খুশি হয়ে বললেন, তুমি ভালো মাংস এনে দাও আমি বিরিয়ানি পাকাব।

যথাসময়ে ভাত ডাল একটা তরকারি এবং মাছের ঝোল রান্না খেলাম। আমার বেশ ঝাল লাগল। খেয়ে উঠেই রওনা হবার কথা বললাম। মোক্তার সস্ত্রীক একসঙ্গে বললেন যে তা হবে না। একদিন অন্তত থাকতেই হবে, তার আগে বালবোয়া ফেরবার কোনও জাহাজও নেই। তখন আমি খুশি মনে রাজি হলাম। খেয়ে-দেয়ে ফরাসের ওপর নিদ্রা দিলাম। বহুকাল পরে ভাত খেয়েছি তার ফল পেতেই হবে।

বিকালে দেখি ঘরের ভেতর একটি ছোট ছেলে কী একটা করছে আমার হ্যাভারস্যাকের সামনে এবং আড় চোখে আমার দিকে দেখছে।

মোক্তার দোকানের ভার আরেকজন কর্মচারীর হাতে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। ছেলেটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এরই নাম তো মনুয়া, একমাত্র ছেলে! মোক্তার হ্যাঁ বলে ছেলেকে আমার সামনে ডাকল এবং আমার পৃথিবী ভ্রমণ সম্বন্ধে বলতে লাগল। আমাদের পরিচয় হল। মোক্তার গৃহিণীকে চা দিতে বলল। অনেকদিন পরে ভালো চা খেয়ে খুব ভালো লাগল।

মনুয়া এবার অসংখ্য প্রশ্ন করে গেল। তার বয়স আট। সব জিনিস অস্পষ্ট বোঝে। তাকে সাইকেলটা দেখাতে অবাক হয়ে গেল। কোলোনে সাইকেল বোধহয় এই প্রথম।

মনুয়াকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরোলাম। ক্যানেলের ধারে একটা সুন্দর বাগান আছে। সেখানে বেঞ্চে বসে গল্প শুরু করলাম।

সন্ধ্যার সময় গরম লাগছিল। মনুয়াকে সঙ্গে নিয়ে একটা আমেরিকান জাহাজ এম ভি ক্যালিফোর্নিয়া খুঁজে বের করলাম। আগামীকাল বেলা বারোটার সময় জাহাজ ক্যানেলে প্রবেশ করবে। তার আগে জাহাজে উঠতে হবে।

এখানে সব বাড়ির টিনের চাল। সেজন্য বোধহয় গরম একটু বেশি।

সন্ধ্যার পর মনুয়াদের বাড়ি ফিরলাম। গৃহিণী রান্না নিয়ে ব্যস্ত। মোক্তারের দোকানে অনেক খরিদ্দার এসেছে। ক্যালিফোর্নিয়া জাহাজের যাত্রীরা কোলোন শহর ভরে ফেলেছে। তারা সস্তায় নানা রকম ব্যবহারের জিনিস কিনছে। রাত নটায় দোকান বন্ধ করে মোক্তার বাড়ি ফিরল। তার প্রথম কথা যে আমি তার জন্য সৌভাগ্য এনেছি সেদিন। অনেক মাল বিক্রি হয়েছে। একটা বোতল বিয়ার খুলে দুভাগ করে দিল।

অল্পক্ষণ পরে দেখি ঘরের মাঝখানে ফরাসের ওপর গৃহিণী সাদা চাদর পেতে দিয়ে আমাদের খেতে ডাকলেন। রান্না খুবই মুখরোচক হয়েছিল। আমার জন্য ঝাল দেননি। বিরিয়ানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে মিসেস মোক্তার বললেন, আপনি অনেকদিন ঘরছাড়া, তাই বেশি ভালো লাগছে। আরও দু-চারদিন যদি থেকে যাই তো নানা রকম রেঁধে খাওয়াবেন।

দুঃখের বিষয় পরদিন সকালে আমাকে জাহাজ ধরতে হবে। বেলা দশটার সময় মোক্তারদের কাছে বিদায় নিয়ে আমি এম ভি ক্যালিফোর্নিয়া জাহাজে উঠতে গেলাম। আমি একমাত্র প্যাসেঞ্জার তাই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আরোহীদের মধ্যে আমিই পানামা ক্যানেল আগে দেখেছি।

১৭

নিউইয়র্ক থেকে ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়া জাহাজ দক্ষিণে পানামা ক্যানেলের ভেতর দিয়ে উত্তরে সানফ্রান্সিস্কো যাচ্ছে। যাত্রীরা সবাই আনন্দে মেতে আছে। এদের হলিডে ট্রিপার্স বলে। বেলা চারটের সময় বালবোয়া পৌঁছলাম। এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল।

বালবোয়া ছেড়ে পানামা দেশের মধ্যে সাইকেল চালাতে আরম্ভ করলাম। রাস্তা ভালো নয়। দুদিনে আশি মাইল পার হলাম।

এরপর দক্ষিণে আমেরিকার কলম্বিয়া দেশে প্রবেশ করলাম। যতই দক্ষিণে যাই ততই পাহাড় মাথা আরও উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাঁচ হাজার ফুট পাহাড়ে উঠেছি। রাস্তা নেই বললেই হয়। লোকজন অতি বিরল। অতি কষ্টে চলতে হচ্ছে। তেমনই ঠান্ডা। একজন লোক বলল, বগোটা শহরে যেতে হলে আট হাজার ফুট পাহাড় আন্ডিজ পর্বতমালার উত্তরাংশ পেরতে হবে।

হঠাৎ রাস্তা নিচে নামতে আরম্ভ করল। নামতে নামতে চোকা নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। এখানে মানুষের বসবাস নেই। কিন্তু চারদিকের দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর। নদী পার হয়েই আবার উঠতে আরম্ভ করলাম। পাহাড়ি পথে ওঠা-নামার ঘুরপাক খেতে খেতে চলেছি। মনে হচ্ছে আমি ভুল পথে চলেছি। এদিকে আসাই আমার ভুল হয়েছে। আগে কল্পনা করেছিলাম দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশ ধরে অরিনেকো, গুয়ানা ইত্যাদি হয়ে ব্রাজিলে প্রবেশ করব। খবর নিয়ে জানলাম ওদিকে কোনও পথ নেই, যেটা আমাকে রিও দি জানেরো শহরে নিয়ে যেতে পারে, মধ্যে হাজার হাজার মাইল দুর্ভেদ্য জঙ্গল। তারপর সেখান থেকে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ারেস শহরে যাবার কথা। অরিজিনাল প্ল্যান ছিল চিলির ভ্যালপ্যারিশো বন্দরে পৌঁছে সাউথ সি আইল্যান্ডস দ্বীপপুঞ্জের দিকে এগোব। সেটা তো হল না। এখন দেখছি এ পথে বেশি দূর এগোতে পারব না। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম দিকটায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত আন্ডিজ পাহাড় প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাহাড় হয়তো পার হতে পারব এই আশা ছিল। রাস্তার অভাবে আন্ডিজ এখানে দুর্লঙ্ঘ। ভারি সাইকেল ও আমার পিঠের বোঝা নিয়ে মনে হচ্ছে নিচে কোথায় পড়ে যাব ঠিক নেই। মশার অত্যাচারও খুব। সাধারণত এত উঁচুতে ঠান্ডায় মশা থাকে না। ভাগ্যিস জন্তু-

জানোয়ার দেখা যাচ্ছে না। কোলোন থেকে অনেক টিনের খাবার নিয়েছিলাম। সেগুলো এখন আমার খুব কাজে লাগছে।

চারদিকে ভীষণ পাহাড়, মাঝে আমি একা। মনে হত পাহাড় আমাকে গিলে খাবে। চারদিন পরে মডলেনা নদীর ধারে এলাম। টৌলিমা শহর নদীর ধারে। এতদিন লোকজনের মুখ দেখিনি। শহরটা ছোট, পাহাড়ের গায়ে, অনেক দূর থেকে দেখা যায়। টৌলিমায় একটা মশারি কিনলাম। বোঝা বেড়েই চলেছে।

টৌলিমায় একদিন থেকে আবার পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করলাম রাজধানী বগোটা পৌঁছবার জন্য। বগোটা নয় হাজার ফুট উঁচু। পাহাড়ের রাস্তা আছে। উঠতে নামতে তিনদিন কেটে গেল তারপর বগোটা পৌঁছলাম। বেশিরভাগ লোক রেড ইন্ডিয়ান, সাইকেল দেখে সবাই অবাক। মোটর গাড়ির অভিজ্ঞতা কলম্বিয়াবাসীর হয়েছে।

উইলিয়াম বেলস বলে এক পাদ্রীর নামে একটা চিঠি ছিল। তাঁকে খুঁজে বের করলাম এবং দুয়েক রাতের মতো থাকবার আশ্রয় চাইলাম। বেলসের স্ত্রী মার্থা। আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। একবার পরিচয় হবার পর বেলসরা আমার পাসপোর্ট দেখতে চাইল। পরে সবাই মিলে পুলিশ থানায় গেলাম। উইলিয়াম ওরফে বিল বলল যে আমি তার পরিচিত, আর ঝঞ্ঝাট রইল না। বেলস আধা ইংরেজ ও আধা আমেরিকান। মেথডিস্ট চার্চের লোক। সবাই খুব শ্রদ্ধা করে।

থানা থেকে বাড়ি ফেরবার পথে মস্ত এক ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগোলাম। সবাই চুপ করে আমার মতো আজব লোকটাকে দেখছিল। কেউ কেউ প্রশ্ন করছিল আমি কোন দেশের লোক, কোথায় যাচ্ছি ইত্যাদি। বগোটা থেকে ইকোয়াডরে কিটো শহরে যাব শুনে বলে, না সাইকেল নিয়ে তা সম্ভব নয়, খুব উঁচু পাহাড়।

একটি ছোট মেয়ে আমাদের তিনজনের জন্য কফি নিয়ে এল। অনেক গল্প হল। পরদিন হাট বার। আমি হাটে যাব মনস্থ করলাম। বেলসরা সাদাসিধে, ধর্মভীরু ও অতিথিপরায়ণ লোক। আমার খুব যত্ন করলেন। আমার বিছানাপত্তর বের করতে দিলেন না। তাঁরা ফায়ার প্লেসের সামনে খাবার পর বসে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনলেন। ইকোয়াডর হয়ে পেরুতে যাব শুনে বললেন খুবই কঠিন কাজ। ভীষণ উঁচু আন্ডিজ পাহাড় জোড়া সারা পথ। আমি শুনে আশ্বস্ত হলাম যে গাড়ি যাবার পথ আছে। তার মানে ঠেলতে ঠেলতে সাইকেল নিয়ে চলতে হবে।

হাটে গিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে সব পণ্যদ্রব্য বেচাকেনা দেখছি, একজন রেড ইন্ডিয়ান ইশারায় আড়ালে আমাকে ডাকল। জামার ভেতর থেকে একটা মানুষের মাথা বের করে দেখিয়ে বলল, পাঁচ ডলার। আমি শুনেছিলাম এদিকের লোকেদের অদ্ভুত

ক্ষমতা আছে মানুষের চুলসুদ্ধ মাথা (ব্রেন চোখ ইত্যাদি ফেলে দিয়ে) যাবজ্জীবন রেখে দিতে পারে। শোনা যায়, রেড ইন্ডিয়ানরা বিজাতীয় লোক ধরে তার গলা কেটে ফেলে সব ভেতরের জিনিস ফেলে দেয়। তারপর গলা দিয়ে মাথার ভেতর গরম পাথর ঢুকিয়ে সমস্ত মুখটাকে সজীব রাখে। কেবলমাত্র দুই চোখ সুতো দিয়ে বাঁধা। কারণ জিজ্ঞাসা করতে জানলাম যে ইভিল স্পিরিট চোখের মধ্যে থাকে। বন্ধ করে দিলে ভূতপ্রেতের ভয় নেই। গরম পাথর বা অন্য কোনও উপায়ে এই কাজ হয় বলে মাথাটা অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে যায়। সেজন্য মাথার চুল আরও ঘন দেখায়।

আমি পাঁচ ডলার দিয়ে মাথাটা কিনলাম। সব জিনিসটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পেপার মাসে দিয়ে তৈরি মুখোশের মতো।

বাড়ি এসে বেলসদের কাছে মাথা কেনার গল্প বললাম। দুজনেই গম্ভীর। মার্থার তো মাথা ধরে গেল।

বিল বলল, যেমন করে পার তুমি ওই মাথা বিদায় কর। তুমি হয়তো জানো না যে কারও কাছে শ্রাঙ্কেন হেড পাওয়া গেলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আমি তৎক্ষণাৎ মাথাটা নিয়ে বাড়ির বাইরে গেলাম এবং পাহাড়ের গায়ে একটা নির্জন জায়গায় সেটা রেখে দিলাম।

বাড়ি আসতে মিল ও মার্থা দুজনেই জিজ্ঞাসা করল আমি ফেলে দিয়েছি তো? আমি কোথায় রেখেছি বললাম। তারা আশ্বস্ত হল এবং আমার প্রতি পূর্বের সহৃদয় ব্যবহার শুরু করল। আমি নিজের ভুল স্বীকার করে বারবার ভেরি সরি বললাম। আমার ক্যামেরার নেগেটিভে মাথাটার ছবি আমার হাতের ওপর তোলা রয়ে গেল।

পরদিন বগোটা ছেড়ে চললাম। দশদিন জনমানবহীন পাহাড়ি পথে চলেছি। কখনও কখনও দশ-বারো হাজার ফুট উঠতে হয়েছে। রাজধানী কিটো নয় হাজার ফুট। আমাদের দেশে গ্যাংটকের কথা মনে করিয়ে দিল। ছোট্ট শহর। লোকেরা পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত। তাদের সঙ্গে রেড ইন্ডিয়ানদের সংমিশ্রণ হয়েছে।

দেশটার নাম ইকোয়াডর কারণ বিষুবরেখা দেশের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। মারানন বা আমাজন নদীর অনেকগুলি উৎপত্তিস্থল আছে তাদের মধ্যে একটি পেলাম কিটোর আগে। কিটো শহর অত উঁচুতে অবস্থিত বলে বেশ ঠান্ডা। পাহাড় থেকে নামলে ভীষণ গরম লাগে। বেশিরভাগ পথ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে নেমে চলেছে।

এ দিকের সব পাহাড় রুক্ষ। দূরের পাহাড়ের মাথায় বরফ সারা বছর থাকে। পুবদিকে গেলে ব্রাজিলের ঘন জঙ্গল। বুনো শুয়োরের প্রাদুর্ভাব সেখানে। পূর্বে কোনও পথ নেই পায়ে চলা সরু পাহাড়ি পথ ছাড়া। খুব সাহসী লোকেরা নিচে জঙ্গলে যায় বুনো

শুয়োর মারবার জন্য। এই অঞ্চলের লোকেরা বুনো শুয়োর খেতে খুব ভালোবাসে। ঠান্ডার দেশ বলে রেখে খেতে পারে।

বন্যজন্তুর মধ্যে একদিন একটা পুমা দেখলাম। অনেকটা সিংহের মতো দেখতে। মানুষ দেখলেই তেড়ে আসে না, বরং ভয়ে ভয়ে দূরে থাকে। আরেকটি বুনোজন্তু মাঝে মাঝে দেখেছি। খুব সুন্দর ছোট উটের মতো। সাদা পশমে ভরা। তার নাম লামা।

মাত্র একদিন কিটোতে থাকবার পর রওনা হলাম, রিওবাসবা ও কুয়েনচা যাবার জন্য। ইকোয়াডর ছোট দেশ। শেষ ছোট শহর লরা। তারপরই পেরু।

পেরুর সীমান্তে আমাকে আটকাল। আমার বংশে কেউ পাগল নেই, এই সার্টিফিকেট চাই। আমার মনে হল পেরুতে বোধহয় অনেক বেশি সংখ্যায় আছে তাই আরও একজন পাগল বাড়ছি তারা স্বভাবতই চায় না। সৌভাগ্য যে সীমান্তরক্ষীকে যখন বললাম যে আমি একটি কাগজে লিখে দিচ্ছি আমার বংশে কেউ পাগল নেই, তখন সে তা মানতে রাজি হল।

রক্ষী বোধহয় ভেবেছিল পাগল না হলে কেউ সাইকেল নিয়ে সাংঘাতিক পাহাড়ি দেশে বেড়াতে যায়! ওঠবার সময় সব জায়গায় আমি সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে চলেছি। নামবার সময় মহা আরামে ব্রেক টিপে ভীষণ জোরে চলেছি।

আমার খুশিমাফিক একটা রাস্তা পছন্দ না হলে অন্য পথ ধরবার উপায় নেই। পথ যেদিকে চলেছে সেই দিকেই যেতে হবে।

পেরুতে প্রথম শহর পিউবা খুব ছোট। পিউবা সমুদ্রের বেশ কাছে একটা ব্যাক ওয়াটারের ওপর। পিউবাতে ভালো করে স্নান করলাম অনেকদিন পরে। আমি আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে ইচ্ছুক নই। যতদূর সম্ভব সমুদ্রের ধারের রাস্তা ধরে চলব।

আমার গন্তব্যস্থল দক্ষিণে ট্রুকসিলো শহরে। এটা একটা বড় গ্রাম বললে ভালো হয়। জেলেরা সারাদিন ধরে মাছ ধরে। অনেক মাছের নাম জানি না, যা এখানে খায়। আর্কটিক ওয়াটারে ট্রলার চালাবার সময় আমি ভাবছিলাম অনেক মাছ চিনি। কিন্তু প্যাসিফিকে তাদের দেখা পাইনি। টুনা এদের দেশে খুব প্রিয় মাছ। বড় মাছ, জালে ধরা পড়ে না। মোটা সুতো বা বঁড়শি যদি গাঁথতে সক্ষম হয় তো সোজা পাড়ের দিকে নৌকো চালায়। ডাঙায় লোকেদের কাছে মাছ জমা দিয়ে আবার সমুদ্রে নৌকো বেয়ে চলে যায়।

একদিন জালে একটা বীভৎস দেখতে মাছ দেখলাম। তার নাম বারাকুড়া, খেতে যদিও খুব সুস্বাদু।

একটা ছোট নদীর ওপর অবস্থিত উয়ারাজ শহরের দিকে চলেছি। উয়ারাজে আমি ইনকা সভ্যতার কথা শুনলাম। পাহাড়ের ওপর মাঝে মাঝে বাড়ির সার দেখেছি।

পাথরের তৈরি সেজন্য পুরনো হলেও আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা বাড়িরও মাথায় চাল নেই। আমার যাদের সঙ্গে পথে দেখা হল তারা ইনকা সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু জানে না। পরে বিদেশিদের লেখা বই পড়ে বরং কিছু জেনেছি।

উয়ারাজ থেকে আমি চললাম ৪৫০ মাইল দূরে লিমা শহরের উদ্দেশে। আমি যত দূর সম্ভব সমুদ্রের ধার ধরে চলেছি। তাও এ পথে পাহাড় কম নয়। বিষুবরেখা থেকে দশ ডিগ্রি দক্ষিণে চলেছি।

দশদিন প্রাণপণ চেষ্টার ফলে লিমার পাশে কালাও বন্দরে পৌঁছলাম। পরদিন পৌঁছলাম লিমা শহরে। একটি পরিচিত লোকের নামে চিঠি ছিল, তার নাম সান্ত্রো, সান্ত্রোর একটা স্টিভেডোর অফিস আছে। ভালোই হল। দক্ষিণে আন্ডিজ পাহাড়ের যেমন ঘনঘটা দেখছি, আশা নেই পার হতে পারব। চিলিতে ভ্যালপারাইসো যাবার ইচ্ছা তাই ত্যাগ করলাম। পাহাড়ি পথে ঘুরতে ঘুরতে, উঠতে নামতে চিত্ত যেন হয়েছে বিকল। এই দিক দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় সফরের পরিকল্পনা ভুল হয়েছে।

সান্ত্রো আমার জন্য একটা হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করল। হোটেল ছোট হলেও, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খাবার মুখরোচক। দুদিন লিমায় কাটাবার পরে সান্ত্রো খবর দিল আর দুদিনের মধ্যে একটা ফরাসি জাহাজ ছাড়বে তাহিতি দ্বীপ যাবার জন্য। মাল লোডিং হয়ে গিয়েছে, শুধু ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছে। আমি তৎক্ষণাৎ জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম এবং সব ঠিক করে ফেললাম। জাহাজটার নাম সেন্ট জোন। সে তাহিতির পর হনলুলু যাবে।

হোটেলে ফিরে এসে হিসাবপত্র মিটিয়ে দিয়ে সেন্ট জোনে গিয়ে উঠলাম। এবার প্রশান্ত মহাসাগর পার হতে হবে।

সুন্দর দিনটা, এদিকে বৃষ্টিবিহীন বছর কাটে। জাহাজ ছাড়ল, পশ্চিমের দিকে এগোতে শুরু করলাম। আমার প্রথম কথা মনে হল যে এতদিন পরে আজ আমি দেশমুখো হয়েছি, এবার দেখতে দেখতে বাড়ি পৌঁছে যাব। আসলে বাড়ি কিন্তু এখনও বহুদূর।

ভূগোলের পাতা খুলে যখনই দেখেছি আমার জাহাজ পশ্চিম মুখে পেরুভিয়ান কারেন্টে ভর করে চলেছে, ততবার মনে হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের ওই পারেই তো আমার দেশ, ভারতবর্ষ। হঠাৎ কেন জানি না বাড়ির টান মনটাকে চঞ্চল করে দিল। বহু বছর বাড়ি ছাড়া। সব জিনিসের যেমন সীমা রাখা দরকার তেমনই পৃথিবী ভ্রমণে কত বছর লাগবে তারও একটা হিসেব জানা দরকার।

সেন্ট জোন চলেছে পাউলাটু দ্বীপপুঞ্জের হাউ দ্বীপের দিকে। সমুদ্র শান্ত। মনে হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর একটা হ্রদের মতো স্থির। আট হাজার টন মাল বইছে সেন্ট জোন।

আমি ছাড়া অন্য কোনও যাত্রী নেই এই জাহাজে। ফরাসি জাহাজ বলে খুব মুখরোচক রান্না। অনেকদিন পর ভালো ভালো ফরাসি রান্না খেলাম। ক্যাপ্টেন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও তিনজন অফিসারের সঙ্গে আমার জায়গা হত। সবাই খুব ভালো লোক। নাবিকদের মধ্যে একজন ভারতবর্ষের ক্যানানোরের পাশে মাহে গ্রাম থেকে এসেছে। তার সঙ্গে আলাপ করলাম।

হাউ দ্বীপ থেকে অনেক দূরে জাহাজ থামল। চারদিকে কোরাল আছে এবং জলের গভীরতা কম, সেজন্য লাগুনের বাইরে থাকাই শ্রেয়। অনেক ছোট ছোট বোট জাহাজের চারপাশে পিঁপড়ের মতো ভিড় করল। হাউ দেখা হল না।

পরদিন সকালে তাহিতির দিকে বারোশো মাইল দূরের পথে রওনা হলাম। আমার অনেক দিনের সাধ সাউথ সী আইল্যান্ডে যাবার। সেটা পূর্ণ হতে চলেছে, ভেবে মনে মনে আনন্দ অনুভব করছিলাম। ফরাসি চিত্রকর গগ্যাঁর জীবনের অনেক বছর এই দ্বীপে কেটেছে। তাঁর জীবনী থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর লেখা পড়েছি যাতে মনে হয় তাহিতি একটি ভূস্বর্গ আর সেখানের লোকেরা মানুষের আকারে দেবদেবী। কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

তাহিতি পৌঁছতে আরও আটদিন কাটল। মানুষরা তো ভালো বটেই। সরল মন। পৃথিবীর বাইরে যেন তারা বাস করে। জীবনযাত্রার জন্য যেন কোনও তাড়া নেই। হাত বাড়ালে ফল ফুল পাওয়া যায়। বর্শা হাতে পুরুষেরা মাছ শিকার করে। মেয়েরা বেশিরভাগ সময় ফুলের মালা গাঁথে, গান গায়, তার ফাঁকে ফাঁকে রান্না-বাড়া ও সন্তানাদির পরিচর্যা। শেষের কাজগুলি যেন গৌণ কর্ম।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দ্বীপে নামলাম। মেয়েরা ফুলের মালা আমাদের গলায় দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। ক্যাপ্টেন খুশি, সবাইকে চুম্বন বিতরণ করল। সে যেন কৃষ্ণ আর ওরা গোপিনীর দল। ক্যাপ্টেন খুব গর্বের সঙ্গে আমার দিকে চাইল। আমি হেসে সমর্থন জানালাম।

অনেকদিন পরে আমার পরিচিত ফল, ফুল ও গাছ দেখলাম সুদূর তাহিতি দ্বীপে, যেমন পেঁপে, কলা, আনারস, জবা ফুল ইত্যাদি। বহুকাল পরে ময়না পাখির ডাক শুনলাম।

লোকেদের পলিনেশিয়ান বলা হয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বড় বড় চোখ, সবার স্বাস্থ্য ভালো মনে হয়। পুরুষরা অপেক্ষাকৃত লম্বা ও পেশী সম্বলিত বলে সুশ্রী দেখায়। আকাশের নিচে খোলামেলা জায়গায় জীবনের বেশিরভাগ কাটে বলে, মন খুব সরল। হিংসা, দ্বেষ শুনেছি এদের মধ্যে নেই। গান বাজনা খুব ভালোবাসে।

আবহাওয়া এত ভালো যে সমুদ্রের ধারে বালির ওপর শুয়ে রাত কাটাতে খুব ভালো লাগে। বাড়ি বানাবার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে মানুষ বাড়ির গণ্ডি দিয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে ভালোবাসে। প্রায়ই এই দ্বীপের লোকেরা একত্র হয়ে খাওয়াদাওয়া ও

আনন্দ উৎসব করে। শুনেছি পলিনেশিয়ানেরা শত শত মাইল দূরে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দ্বীপে থাকলেও সবার ভাষা এক, যদিও কদাচিৎ তারা মেলবার সুযোগ পায়। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে পলিনেশিয়ানেরা এক জাতি, একই জায়গা থেকে উদ্ভূত। আজ দূরত্ব সত্ত্বেও তাদের ভাষা একই রয়ে গেছে।

সেন্ট জোন নোঙর তুলে রওনা হল সাতদিন পরে হনলুলুর দিকে। এই দ্বীপটি এ দিকের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বৃহত্তম এবং সবচেয়ে উর্বর। তেরোশো মাইল পথ সেন্ট জোন অতিক্রম করল ছয় দিনে। প্রশান্ত মহাসাগরের রূপ প্রশান্ত ও সুন্দর।

হাওয়াই দ্বীপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অংশবিশেষ। হনলুলু এই দ্বীপের রাজধানী। মস্ত মস্ত বাড়ি, গাড়ি, বন্দর ইত্যাদি একত্র হয়ে হনলুলুকে একটি বৃহদাকার শহরের রূপ দিয়েছে। আমি সেন্ট জোন জাহাজকে বিদায় দিয়ে হনলুলুতে নামলাম। সে তাহিতিতে ফিরে যাবে।

পার্ল হার্বার থেকে আমার এক আমেরিকান বান্ধবী, মেরী ক্লাউ (ডাক নাম বেবি), এসে এদেশি প্রথামতো গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। স্টেশন ওয়াগনে আমাকে নিয়ে গাড়ি চলল পার্ল হার্বারের ওপর পাহাড়ে। বেবির বাবার খুব সুন্দর বাড়ি আছে। সেখান থেকে দৃশ্য অপূর্ব।

পথে দেখলাম অসংখ্য মোটর গাড়ির ভিড়। ছেলেমেয়েরা টেনিস খেলছে, যেন ছুটি উপভোগে সবাই ব্যস্ত। পরদিন আনারস প্ল্যান্টেশন দেখতে গেলাম। বিস্তীর্ণ মাঠে ট্র্যাক্টর দিয়ে আনারস চাষ হয়। ফসল তোলার পর মাঠে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে যাতে সব জীবাণু মরে যায়।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলি দ্বীপে আগ্নেয়গিরি আছে। হনলুলুর একাংশে আজও ধোঁয়া ও লাভা উদিগরণ হচ্ছে। সেজন্যে দ্বীপের কোনও কোনও জায়গায় যাওয়া নিষিদ্ধ। হাওয়াই অদ্ভুত সুন্দর দেশ। প্রকৃতির সব কটি অবদান আছে পাশাপাশি, যেমন পাহাড়, জল, গাছ, ফল ও ফুল। কেবল মনে হয় মানুষের ভিড় ও ঘরবাড়ি বেশি। কয়েক বছর পরে হনলুলুর মতো জায়গা নিউইয়র্ক, শিকাগোর মতো বড় বড় আকাশছোঁয়া বাড়িতে ভরে যাবে। পলিনেশিয়ার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ডুবে যাচ্ছে সভ্যতার চাপে।

হাওয়াইয়ে লোকেরা সাউথ সী আইল্যান্ডের অন্য ছেলেমেয়ের মতোই হাসিখুশি, তাদেরই জীবনের সুরে বাঁধা।

সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছি। দশজন স্ত্রী-পুরুষ হাতে গিটার নিয়ে হাঁটু জলে গিয়ে দাঁড়াল এবং ডাঙার দিকে মুখ ফিরিয়ে গান শুরু করল। দেখতে দেখতে শত

শত লোকের ভিড় জমে গেল । প্রায় এক ঘণ্টা অনেক গান গাইল । ভাষা বুঝি না বলে মনে হচ্ছিল সব গানের সুর এক, তবু শ্রুতিমধুর ।

রাত্রে ডিনার খেয়ে হনলুলুর মেয়েদের নাচ দেখতে গেলাম । আমার ভালোই লাগল ।

একটা মস্ত বড় চিনির কারখানা আছে এখানে, সেটা দেখলাম । সাতদিন এমনিভাবে দ্বীপের চারদিকে ঘুরে কাটল । এখানে সর্বত্র আধুনিক সভ্যতার ছাপ ।

একটা বড় জাপানি জাহাজে আমি একটা বার্থ পেলাম । জাহাজের নাম তাইয়ো মারু । লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে হনলুলু এবং তারপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে জাপানে ইওকোহামা বন্দরে পৌঁছবে ।

পলিনেশিয়া দেশের অলিখিত নিয়ম হচ্ছে যে মেয়েরা দ্বীপে আগত অতিথিদের গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানায় । দেশ ভ্রমণ শেষ হলে, জাহাজে ওঠবার সময় মালা জলে ফেলে দিতে হবে । তখন ডাঙা থেকে বিদায়ের গান গায় করুণ সুরে । জাহাজে উঠে মালা জলে ফেললাম এবং বান্ধবীর কাছে বিদায় নিলাম ।

হনলুলু থেকে আমি একমাত্র যাত্রী ইওকোহামার পথে । সবার কৌতূহল হল এই ব্রীচেস পরা, রোদে পোড়া, তামাটে ছয় ফুট লম্বা মানুষটি কাঁধে, পিঠে ও সাইকেলের ওপর মাল নিয়ে কোথায় চলেছে ।

জাহাজের যেখানে খেলাধুলা হচ্ছে সেই দিকে গেলাম । একদল ইয়ং আমেরিকান ছেলে একটি মেয়েকে নিয়ে সাফল বোর্ড খেলছিল । মেয়েটির স্পোর্টস উত্তম্যানের মতো চেহারা । ছেলেদের মধ্যে সে যেন মধ্যমণি । খেলার মধ্যে একটি শক্ত জায়গায় সবাই আটকে গেল । আমি দ্রষ্টা ছিলাম । হঠাৎ বলে ফেললাম যে ইট শুড নট বি সো ডিফিকাল্ট । তখনই সবাই আমাকে একটা সাফলার দিয়ে বলল, তুমি চেষ্টা করে দেখলে বুঝবে ।

খেলবার সুযোগ পেয়ে মনে মনে খুশি । তাহলে দীর্ঘ একমাস সময় জাহাজে ভালোই কাটবে ।

এর আগে দুয়েকবার সাফল বোর্ড খেলেছি, তবু চেষ্টা করে দেখি বলে শক্ত মারটা সহজেই হাসিল করলাম । ওরা বেশ একরকম আশ্চর্য হয়ে গেল । আমি নিজেও অবাক হয়েছিলাম । জন, বিল, জেমস, ল্যারি, চার্লস এগিয়ে এসে আমার করমর্দন করে নিজেদের পরিচয় দিল । এরা পরে সবাই অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েছিল । তরুণী আমার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললে তার নাম এলিজাবেথ রে, আমি লিজবেথ বলে ডাকতে পারি । আমি সবাইকে জানালাম আমার পুরো নামটা, তারপর স্থানীয় রীতি অনুসারে বললাম বিমল বলে ডাকতে ।

খেলা আবার শুরু হল। অতি সহজেই আমি সবার ওপরে হলাম। তারপর আরও নানা রকম খেলায় যোগ দিলাম। টেনিকয়েট আমি অনেকবার খেলেছি। মনে মনে জানতাম যে এই একটা খেলায় আমি সবাইকে হারাতে পারি। জাহাজের ডেকের ওপর এত উত্তেজনাপূর্ণ খেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত। সব খেলাতেই লিজবেথ আমার পার্টনার। প্রত্যহ সব খেলা জিতে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে প্রতিযোগিতা হলে আমরা সবাইকে হারিয়ে দেব।

একদিন সত্যি সত্যি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। আমরা ফাইনালে উঠলাম। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম জিম ও পার্টনার তার স্ত্রী। তাদের খেলা দেখবার মতো। দুজনের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল পরিষ্কার। দুজনেরই স্বাস্থ্য খুব ভালো। জিমের কথা পরে লিখব। সেও মনে করত কেউ তাদের দুজনকে হারাতে পারবে না।

খুব ঘটা করে ফাইনাল আরম্ভ হল। জিম, লিজবেথের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করতে লাগল যে আমি কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। তখন আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে লিজবেথকে বাঁচিয়ে খেলতে লাগলাম। আমি রিংটা জিমকে দিলে সে তৎক্ষণাৎ লিজবেথের দিকে ছুড়ছিল। দ্বিগুণ পরিশ্রমে আমি লিজবেথ জয়ী হলাম। অনেক পুরস্কার এবং অনেক অভিনন্দন পেলাম। সবাই স্বীকার করল এ রকম চিত্তাকর্ষক খেলা কখনও দেখেনি।

জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাদের দুজনের সম্মানে একটা ভোজ দিলেন।

সাফল বোর্ড খেলতেও আমরা জিতলাম। আরও চার রকম প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। প্রত্যেকটার ফাইনালে আমি ও এলিজাবেথ এবং শেষপর্যন্ত আমরা জয়ী। এরকম সৌভাগ্য আমার বোধহয় আর কখনও হবে না।

এবার জিমের কথা বলি। পেশাগতভাবে সে একজন লায়ন-ট্রেনার। জাহাজের রিয়ার ডেকে খাঁচার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সিংহ ছিল জিমের তত্ত্বাবধানে। ওই সিংহের মালিক হলিউডের মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার কোম্পানি। তারা জাপানি ছেলেমেয়েদের সিংহ দেখাবার জন্য একমাস টোকিও ও অন্যান্য জুতে যাচ্ছে।

সিংহ যখন মাত্র ছয় সপ্তাহের তখন থেকে জিম দেখাশোনা করে। জিমের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে স্বাভাবিক। খুব ভাব। সিংহের মুখের হাঁর মধ্যে জিম মাথাটা ভরে দিতে দ্বিধা করে না। এখন পাঁচ বছর বয়স সিংহের। প্রকাণ্ড দেহ, মাথাটা কেশরসুদ্ধ ততোধিক বড়। থাবা দুটোর অসীম জোর। যে কোনও জানোয়ারের ঘাড় ভেঙে দিতে পারে অনায়াসে।

আমি প্রায়ই ডেকের একধারে রাখা খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সিংহের দিকে চেয়ে দেখতাম। মনে পড়ত সুদানে সিংহ দেখেছি ডজন হিসাবে। ভয়ে ভয়ে তাদের খুব

কাছে যাবার চেষ্টা করিনি। সিংহের অত্যাচারে আমার আফ্রিকা ভ্রমণ সার্থক হয়নি।

ক্যামেরা হাতে প্রায়ই খাঁচার পাশে আমাকে দেখে জিম একদিন বলল যে আমাকে খাঁচার ভেতর নিয়ে যাবে যদি আমি আরও কাছ থেকে ছবি তুলতে চাই। জিমের ওপর আস্থা ছিল। সে খাঁচা খুলে আমাকে ঢোকাল ভেতরে, কিন্তু আমার ঠিক সামনে জিম দাঁড়িয়ে রইল।

ক্যামেরা ঠিক করে অপেক্ষা করতে লাগলাম সিংহ কখন হাই তুলবে তখন দাঁত ও জিভের ভালো ছবি তুলব।

আমাকে প্রায়ই খাঁচার বাইরে দেখে সিংহ খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খাঁচার ভেতরে যাওয়ায় তার ঘোর আপত্তি মনে হল। আমার ক্যামেরার দিকে কট্মট করে চেয়ে রয়েছে। আমার সাধ্য নেই আই লেভেলে অর্থাৎ চোখের কাছে ক্যামেরা তুলে দেখি।

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সিংহ বিরক্ত হয়ে মুখব্যাদান করল, আমি তৎক্ষণাৎ সিংহের প্রকাণ্ড জিভসুদ্ধ একটি ছবি তুললাম। ছবি তোলবার ক্লিক শব্দ সিংহের কাছে এত সন্দেহজনক মনে হয়েছিল যে মুহূর্তের মধ্যে ক্যামেরার ওপর প্রচণ্ড থাবা মারল। আমি ঘটনাটা ভালো করে বোঝবার আগেই দেখি জিম আমাকে ঠেলে দরজার বাইরে ফেলে দিয়েছে এবং দরজা বন্ধ করে ফেলেছে। সিংহ জিমের পিঠে থাবা মারল।

জিম দরজা বন্ধ করে আমাকে ফিরে যেতে বলল এবং ছুটে গেল জাহাজের ডাক্তারের কাছে। তার পিঠে ছটা সেলাই পড়ল। স্টিচ করবার পরই ফিরে গেল আবার খাঁচায়। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। সিংহ ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে যে সে অন্যায় করেছে, সেজন্য সে অনুতপ্ত। খাঁচার ভেতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সিংহ মাথাটা দিয়ে জিমের মুখে ও কাঁধে ঘষতে লাগল। আমি বুঝলাম দুজনের মধ্যে শান্তি ফিরে এসেছে। আমার যাওয়াটা সে অপছন্দ করেছিল। তার ওপর মস্ত বড় পোর্ট্রেট লেন্স লাগানো ক্যামেরা যত নষ্টের গোড়া।

সিংহটা এতই পোষ্য ছিল যে জিম তার গায়ের নিচে সুড়সুড়ি দিলে সে নীরবে সহ্য করত। বশ্যতা স্বীকারের এটা নাকি চরম নিদর্শন। মুখের ভেতর মানুষের মাথা ঢোকানোয় তেমন বাহাদুরি নাকি নেই। সে যাই হোক, সিংহ মহাশয় যে সিংহকুলে একটি আশ্চর্য রকম বিশাল ও সুদর্শন জীব ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জিম সিংহকে নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে মেট্রোর টাকায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সে সিংহের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে পরিচিত। মেজাজের সামান্যতম পরিবর্তন জিমের চোখে ধরা পড়ে। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে পিঠের ওপর সিংহের থাবার আঁচড় খেল। আজও আমার কাছে সেদিনের তোলা সিংহের মুখব্যাদান করা ছবি রয়েছে।

জিমের স্ত্রীরও একটি পরিচয় আছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি মেয়েদের কলেজে সে ফিজিক্যাল ট্রেনিং দেয়। সেজন্য তার দেহ সুঠাম এবং কর্মকুশল। মনে হয় জিমের বিবাহ একেবারে যাকে বলে রাজযোটক।

আমার হাতে সারাক্ষণ লাইকা ক্যামেরা থাকত বলে সবাই আমার তোলা ছবি দেখতে চাইল। দু-চারখানা দেখাবার পর যখন বুঝলাম লোকেদের আগ্রহ আছে আরও ছবি দেখবার তখন আমি একটি প্রদর্শনী করতে রাজি হলাম। জাহাজের জাপানি অফিসাররা ভীষণ খুশি হয়ে সব রকম ব্যবস্থা করে দিল যাতে তিন দিন হলঘরে প্রদর্শনী হতে পারে। আমি মোট একশোখানা এনলার্জমেন্ট দেখাব ঠিক করলাম।

ক্যাটালগ ছাপানো সম্ভব নয় বলে লিজবেথ এগিয়ে এল সব ছবির টাইটেল লিখে দেবার জন্য। জাহাজের তরফ থেকে বড় বড় ইলেকট্রিক আলো ছবির ওপর ফেলবার বন্দোবস্ত করল।

প্রদর্শনীর চতুর্থ দিনে আমি আমার ভ্রমণকাহিনী বললাম। তারপর হঠাৎ আমার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল। সবাই ড্রিঙ্ক দিতে চায় কিংবা ইচ্ছা করে তাদের টেবিলে বসে খাই। ডিনারের পর নাচে সব তরুণীরা চাইত আমি তাদের সঙ্গে নাচি। ওদিকে লিজবেথের সঙ্গে ভাব আমার সবচেয়ে বেশি, একসঙ্গে খেলাধুলা করি বলে।

আমি যে দলের সঙ্গে সারাক্ষণ থাকি তারা সবাই আমেরিকান। জেমস একজন লেখক। কোলের ওপর টাইপরাইটার নিয়ে সারাদিন ঠকঠক করে টাইপ করত। যা শুনত, যা দেখত সব জিনিসের টাইপে রেকর্ড রাখত। পরে জেমস সারা জাপান ও চিনদেশের একাংশ আমার সঙ্গে ঘুরেছে। পৃথিবী পর্যটক হবার খুব শখ কিন্তু চিন দেশে পথের অভাবে রাজনীতিক গণ্ডগোলে পড়ে শখটা ছাড়ল। জেমসের মনটা ভালো। আমাকে মনেপ্রাণে নেতা বলে মেনে নিয়েছিল। সে থাকত কাছে কাছেই, সব সময় নানা রকম গল্প-গুজবের মধ্যে আমাদের ভালোই কাটত।

অন্য ছেলেরা কেউ ছাত্র ও কেউ ব্যবসা করবার ইচ্ছায় জাপানে ঘুরতে যাচ্ছে। ল্যারি ইলেকট্রনিক্স শিখতে আমেরিকা ছেড়েছে। জেমস ছাড়া আর কেউ চিন দেশে যাবে না।

জাহাজে বহু দেশের স্ত্রী-পুরুষ ছিল যাত্রী হিসাবে। মোটামুটি সবার সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল। একজন আমেরিকান, নাম জনসন, জাপানিদের নিয়ন আলো তৈরি করানো শেখাতে যাচ্ছে। মতলব হচ্ছে সেখানে সুবিধা পেলে ব্যবসা ফেঁদে বসবে। আমাকে বলেছিল যে সে ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে নিয়ন আলোর প্রচলন করবে।

প্রশান্ত মহাসাগর একেবারে শান্তশিষ্ট হ্রদের মতো। সন্ধ্যার পর তাইয়ো মারু আলোকসজ্জায় মণ্ডিত হয়ে তার বুকে চার হাজার মাইল দূরে জাপানের দিকে চলেছে।

সব জিনিসের যেমন শেষ আছে তেমনই প্রশান্ত মহাসাগরেও আছে । তার পশ্চিম প্রান্তে এসে ইয়োলো সির মধ্যে পড়েছি । জাপান আর তিন দিনের পাড়ি । এমন সময় ঝড় উঠল, ক্রমশ তার বেগ এত বাড়তে লাগল যে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি ও উত্তাল সমুদ্র । যত দিন সুন্দর দিন ছিল, তাইয়ো মারু হেসে খেলে প্রশান্ত মহাসাগরের বুক চিরে চলেছে গন্তব্য পথে । আজ প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ । মানুষের সাধ্য নেই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার । জাহাজ সত্যিই তোলপাড় ।

ডিনার হলে কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ খেতে এসেছে । বেশিরভাগ যাত্রী সী সিক, ঘরের ভেতরে রয়েছে । সেই ভীষণ ঝড়ের দিনে, লিজবেথ আমার সঙ্গে ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বিভীষিকা দেখছিল । প্রকাণ্ড জাহাজটা এক হাজার যাত্রী নিয়ে উঠছিল পড়ছিল, যেন একটা মোচার খোলা ।

জাহাজের যন্ত্রপাতি সব বন্ধ । ঢেউ যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে তাইয়ো মারু সেদিকেই চলেছে । লক্ষ করবার বিষয় দেখলাম জাপানি নাবিকদের দক্ষতা । অমন দুঃসময়ে তারা স্থিরচিত্তে কাজ করে চলেছে ।

কাল সকালে জাহাজ ইওকোহামা বন্দরে পৌঁছবে । অনেক রাত পর্যন্ত লিজবেথ ও আমি গল্প করলাম ।

১৮

পরদিন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। জাহাজ বন্দরে লাগল। লিজবেথের মা, বাবা ও দাদা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

আমি ও জেমস দুজনে একসঙ্গে ইওকোহামা বন্দরে নামলাম। জেমস সোজা একটা সাইকেল হ্যাভারস্যাক কিনতে গেল। আমরা একটা ছোট পরিষ্কার হোটেলে উঠলাম। আমার সঙ্গে যথেষ্ট টাকা আছে তাই রোজগারের দিকে মন নেই। খুব আশা যে খরচ করতে করতে সব টাকা ফুরোবার আগেই মা বাবার কাছে বাড়িতে পৌঁছে যাব।

জাপানি হোটেলে যেখানে বিদেশিরা থাকতে যায় এমন সব জায়গায় দুই রকম খাবার পাওয়া যায়। একটা জাপানি অন্যটাকে আমেরিকান বলা যায়।

তাইয়ো মারু জাহাজে একদিন জাপানি ডিনার হয়েছিল। সুকিয়াকি রান্নার নাম। চারজন মিলে একেকটি দল হল। প্রত্যেক দলের সামনে একটি কাঠকয়লা চুলা, মাংস ও সব্জি পরিপাটি করে কাটা। জাপানে খুব কাঠকয়লা ব্যবহার হয় রান্নার জন্য অথবা ঘর গরম করবার জন্য। আমাদের সয়াবিন সস দিল। একটি ফ্রক পরা জাপানি মেয়ে আমাদের কাছে এসে বুঝিয়ে দিল রান্নার প্রণালী। এত সোজা যে বলা যায় না।

উনুন ধরিয়ে সসপ্যানে সয়াবিন সস ঢেলে দিলাম। গরম হবার পর পাতলা করে কাটা মাংস ও সব্জি ছেড়ে দিলাম। ব্যস, আধঘণ্টার মধ্যে খানা তৈরি।

একটি জাপানি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার নাম ওনো। আমি ডাকতাম ও ইয়েস বলে। শুনে মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসত। যেদিন সুকিয়াকি ডিনার হল সেদিন ওনো একটা চমৎকার কিমোনো পরে, চুলের প্রসাধন অন্য রকম করে আমাদের সামনে উপস্থিত। তার চলা বদলে গিয়েছে। তাকে দেখলে কে বলবে যে আধঘণ্টা আগে সেই কর্মপটু ফ্রক পরা মেয়েটি আর কিমোনো পরা মেয়েটি একই।

কলে কারখানায় অফিসে লক্ষ লক্ষ মেয়ে কাজ করে, তারা মনে করে কিমোনো পরে তৎপর হওয়া যায় না। তাছাড়া কিমোনোর দাম এত বেশি হয়েছে যে ভাড়া করে কখনও সখনও ব্যবহার করা অনেক সুবিধা ও কম খরচের।

ইওকোহামা শহরে স্ত্রী-পুরুষের বেশভূষা একেবারে ইউরোপীয় বা আমেরিকান ধরনের ।

জাপানে এমন কয়েকটি জিনিস লক্ষ করেছি যা অন্য দেশে নেই । জাপানিরা ভীষণ দেশপ্রেমিক হয়, ভদ্রতায় জাপানিকে কোনও জাত হারাতে পারবে না, ভাত দিয়ে কাঁচা মাছ খাওয়া, কর্মকুশলতা তাদের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ।

শেষোক্ত গুণটির জন্য জাপানিরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিদের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করেছে ।

আমাদের হোটেলের সব জানলায় কাচের বদলে সাদা পার্চমেন্ট কাগজ দিয়ে ঢাকা । জাপানে খুব ভূমিকম্প হয় । সেজন্য কাচের জায়গায় কাগজের ব্যবহার বেশি । কাগজের ভেতর দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু বৃষ্টির জল আটকায় ।

তিনদিন ইওকোহামায় সব দ্রষ্টব্য দেখে রওনা হলাম ফুজিয়ামার দিকে । জেমসের খুব ভালো লাগছে । এরকমভাবে দেশ দেখার উপকারিতা অনেক বেশি । নানা অবস্থার লোকের সঙ্গে একত্র থেকে যে জ্ঞান আহরণ করা যায় তার তুলনা হয় না ।

খুব সকালে উঠে জানলা খুলে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম । ফুজিয়ামার চূড়ার একধারে কে যেন এক লরি আবির ঢেলে দিয়েছে । জেমসকে বললাম, তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে এবং জানলার কাছে আসতে । প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করবার জন্য ভোরে উঠতে হবে এটা জেমসের মনঃপূত নয় । সে সমস্ত বিছানা কম্বল মুড়ি দিয়ে জানলার কাছে এক মিনিট দাঁড়িয়ে ভেরি নাইস বলে আবার বিছানায় আশ্রয় নিল ।

বরফের ওপর প্রভাতের প্রথম সূর্যরশ্মি পড়ে কত রকম রঙের বিচিত্র শোভা দেখাল । সকালে যেখানে হলুদ, লাল রং দেখেছি, রাত্রে চাঁদের আলোয় দেখলাম নীল, সাদা । এ আরেক রূপ, জাপানিরা ফুজিয়ামাকে পবিত্র মনে করে । কত গান, কবিতা, গল্প এই ফুজিকে অবলম্বন করে লেখা তার ইয়ত্তা নেই ।

জাপান শীতপ্রধান দেশ । এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে তার অবস্থান । চারদিকে সমুদ্র বলে শীত অপেক্ষাকৃত সহনীয় । ভৌগোলিক অবস্থা ইংল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করা চলে । দেশটার আশি ভাগ পাহাড়ে ভর্তি । বড় ছোট ৩,০০০ দ্বীপ মিলে জাপান দেশ । মাথাপিছু জায়গা খুব কম । সেজন্য সর্বত্রই মানুষের ভিড় । ১১২ মিলিয়ন লোকের বাস অথচ দেশটা গ্রেট ব্রিটেনের চেয়ে বড় নয় । চারদিকে বোঝা যায় স্থানাভাব । লোকেরা প্রাণপণ পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে । তবে সবাই পরিপাটিভাবে ছোট ঘর, ছোট বাড়িতে থাকতে ভালোবাসে । জাপানিদের সৌন্দর্যবোধ দেখবার মতো । ঘরের কোথাও একটি ফুল, নয়তো আর্টের জিনিস রাখা আছে । সর্বোপরি নিয়মানুবর্তিতা জাপানির সহজাত, ট্রেন ছাড়বার বা

আসবার সময়ের ব্যতিক্রম হতে পারবে না এতটুকু । সময়ের মূল্যবোধ যাতে বজায় থাকে তার জন্য সবাই ব্যস্ত ।

জাপানের আরেক বৈশিষ্ট্য সৌজন্য প্রদর্শন । এতেও জাপানি অদ্বিতীয় । একজন আরেকজনকে সামনে হেঁট হয়ে অভিবাদন জানাল, পরমুহূর্তে অন্যজন হেঁট হয়ে তা স্বীকার করল । তারপর স্বীকারের পর স্বীকার এমনই চলতে থাকে । আমার মতো একজন যুবককে যখন বৃদ্ধরা বারবার হেঁট হয়ে সামনে নুয়ে নমস্কার জানাত আমি তখন প্রতি নমস্কার জানিয়ে মনে মনে বলতাম থামলে বাঁচি ।

জাপানে সর্বত্র জাহাজ তৈরি করছে পুরোদমে । যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চলছে । লোকেদের সঙ্গে যখন আলোচনা করছি যে জাপানিরা তো বৌদ্ধ, তবে যুদ্ধ ও হিংসার মনোবৃত্তি কেন । বেশিরভাগ লোক উত্তর দিত যে তারা যুদ্ধ বিগ্রহ চায় না, শান্তিতে থাকাই তাদের উদ্দেশ্য । একথাও স্বীকার করত যে আর্মি এখন গভর্নমেন্টের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাদের খুশিমতো অনেক কিছু হচ্ছে সাধারণ মানুষের সমর্থন থাক, আর নাই থাক ।

জায়গাটার নাম অমিয়ামাচি । কাওয়াগুচি হ্রদের ওপারে একটা জাপানিদের বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন ছিল । জেমস ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বলে আমার সঙ্গে গেল না, হোটেলে বসে তার অভিজ্ঞতা টাইপ করতে লাগল । যাদের বাড়ি যাচ্ছি তাদের বাড়ির মেয়ে আমাদের সঙ্গে এক জাহাজে তাইয়ো মারুতে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়েছিল । আগেই বলেছি তার নাম ওনো । আমাকে খুব আদরে গ্রহণ করলেন ওনোর বাবা এবং সেইসঙ্গে ওনো নিজে । তার মা নেই ।

একদিন থাকব ঠিক করেছিলাম কিন্তু ওনো নাছোড়বান্দা । সে আমেরিকায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শিখে এসেছে । শীঘ্রই টোকিওতে একটা কাজে যোগ দেবে । ওনোর সঙ্গে সাধারণ ইংরিজিতেই কথাবার্তা বলেছি । এত ভালো বিদেশি ভাষা বলতে পারে শুনে ওনোর বাবা খুব গর্বিত বোধ করছিলেন ।

দুদিন ওনোর বাড়িতে থাকলাম । রোজ কয়েক মাইল দুজনে হেঁটেছি ফুজিয়ামার ছায়ায় । ওনো খুব ধর্মভাবাপন্ন । ভারতবর্ষ বুদ্ধের দেশ বলতে সে পঞ্চমুখ । খুব ইচ্ছা একদিন বুদ্ধের দেশে গিয়ে লুম্বিনি, গয়া, সারনাথ, সাঁচি দেখবার । আমি বলতে পারব না সে কখনও আমাদের দেশে এসেছিল কিনা । সে চিঠি লিখলেও আমি কখনও পাইনি ।

পরদিন বিদায় নেবার সময় ওনোর বাবা বারবার হেঁট হয়ে আমাকে বিদায় জানালেন । আমিও তেমনই করলাম ।

পাহাড়ের দেশ থেকে নিচে নামলাম। আমাদের গন্তব্যস্থল টোকিও, পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। এগারো মিলিয়ন লোকের বাস। যে হারে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে মনে হয় অল্পদিনের মধ্যে বারো মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে।

জেমস দুদিনে অনেক টাইপ করেছে বলল। বোধহয় একটা লেখবার মতো রসদ তার জোগাড় হয়ে গেছে।

টোকিও শহরে সিনজিকু-কু পাড়ার ছোট হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন মিকাডোর অর্থাৎ জাপানি সম্রাটের বাড়ি ও বাগান দেখতে গেলাম। সেখান থেকে গেলাম জাপানের বিখ্যাত জু দেখতে। তবু আমার কাছে কলকাতার জু অতুলনীয় মনে হয়। একজন বিখ্যাত ভারতীয়, রাসবিহারী বোসের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি খুব খুশি হয়ে আমাকে গ্রহণ করলেন এবং মধ্যাহ্নভোজের নেমন্তন্ন করলেন।

শ্রীবোসের কেক, পেস্ট্রি ইত্যাদি তৈরি করবার একটা উচ্চাঙ্গের কারখানা আছে। আমাদের দেশে ফ্লুরি ও ত্রিনকার মতো। সেই সঙ্গে তিনি একটা চা পানের রেস্তোরাঁ চালান। সুদূর টোকিওর একটা রেস্তোরাঁতে রবীন্দ্রনাথের বড় একটা অয়েল পেন্টিং দেখলাম। শ্রীবোস যদিও জাপানের বাসিন্দা এবং তাঁর স্ত্রী একজন বড় ঘরের জাপানি মহিলা, তিনি মনেপ্রাণে ভারতীয়। গান্ধীজির কথা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা এই মুক্তিযোদ্ধা বারবার জিজ্ঞাসা করলেন।

পরদিন কামাকুরাতে দাইবুতু অর্থাৎ ভাইবুদ্ধের বিরাট ব্রোঞ্জমূর্তি দেখতে গেলাম। সকলের মতো আমিও খালি পায়ে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মূর্তির সামনে মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

এবার রওনা হলাম দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। জাপানের দ্বিতীয় বড় শহর, ওসাকাতে পৌঁছলাম। পথে মোটর গাড়ি ছাড়া অন্য যানবাহন নেই, আমেরিকার মতো। তবে সেখানে বাড়ি বড়, এখানে সব ছোট ছোট। ছোট বাড়ি, ছোট গাড়ি, ছোট ফার্নিচার এদেশের সাইজ অনুপাতেই স্টাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওসাকায় বহু টেক্সটাইল কারখানা আছে। সমস্ত পৃথিবী জোড়া কাপড়ের কারবার। ভারতবর্ষ, চিন, আফ্রিকা ও সুদূর আমেরিকায় জাপানি কাপড় রপ্তানি হয়। একটা কারখানা দেখতে গেলাম। বেশিরভাগ মেয়েরা কাজ করছে। মেয়েদের মাইনে কম অথচ প্রাণপণ পরিশ্রম করতে পারে। কাজে সবারই আগ্রহ। খাবার জন্য আধঘণ্টা ছুটি। কারখানা কিন্তু চলতে থাকে। মেয়েরা পালা করে খেতে যায়। খাবার খুব সাধাসিধে। ভাত ও কাঁচা মাছ কিংবা কাঁচা সব্জি, ভাত খেয়ে মানুষের ভালো স্বাস্থ্য হতে পারে এবং সে কর্মঠ জীবন গড়তে পারে, এ ধারণা আমাদের দেশের লোকের নেই। যারা পরিশ্রমী

তাদের কাছে ভাত পুষ্টিকর খাদ্য। কায়িক কাজকর্ম না করে লোকে যখন স্তূপাকারে ভাত খায় তখন উপকারের চেয়ে তার অপকার বেশি হয়।

রাতে থিয়েটার দেখতে গেলাম। তখন কোনও প্লে হবে না, কেননা চেরি ডান্সের বা মিইয়াকো ও দোরির সময় আরম্ভ। সেদিন প্রথম নাচ হবে। আমার অনেক কালের ইচ্ছা চেরি ডান্সে যাবার ও দেখবার, সেটা এবার অপ্রত্যাশিত ভাবে পূর্ণ হতে চলেছে।

জাপানি স্টেজ একটু অন্য ধরনের। স্টেজের দুপাশ দিয়ে সরু রাস্তা শ্রোতাদের মধ্যে অনেক দূর চলে গেছে। থিয়েটারে চেয়ার বেঞ্চ নেই। ফরাশ পাতা আছে, তার ওপর আমরা বসলাম।

চোখের সামনে দৃশ্য দেখলাম, কখনও ভুলতে পারব না। সমস্ত স্টেজভর্তি চেরি ফুল। অতি সুন্দর গোলাপি রং। আরও ফুল মাথায় ও সর্বাঙ্গে লাগিয়ে মেয়েরা নাচল। আমি যেন চেরি ব্লসমের রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি।

মধ্যপথে আধঘণ্টা বিরতি। আমরা জাপানি প্রথায় চা খাবার নিমন্ত্রণ পেলাম। একটা হল ঘরে নিচু ছোট ছোট টেবিল পাতা আছে। তার এক পাশে বসলাম। একজন গে-সা মহিলা সুশ্রী, কিমোনো-পরা আমাদের সামনে এসে অভিবাদন জানালেন। মুখে যথেষ্ট ক্রিম ও পাউডার মাখা এবং কেশ প্রসাধন সনাতন প্রথায় ফুল দিয়ে সজ্জা, হাঁটু মুড়ে আমাদের সামনে বসলেন। তারপর চা তৈরি করতে প্রবৃত্ত হলেন। চা করার ধরন একেবারে চিরাচরিত, আমাদের হাতে ছোট ছোট কাপে দিলেন। দুধ নেই, চিনি নেই। তারপর গে-সা মহিলা উঠে গেলেন এবং শীঘ্রই দুই বাটি জাপানি হালুয়া নিয়ে ফিরলেন। হালুয়া খেতে ভালো। চা হালকা বলে ভালোই লাগল, যদিও চিনি দুধ ছাড়া।

গে-সা অল্প ইংরিজি বলতে পারেন। সেজন্য আমাদের টেবিলে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। যুবতী ও সুন্দরী সে বিষয় সন্দেহ নেই। তবে অত মেকআপ মুখের ওপর নিষ্প্রয়োজন মনে হল। চায়ের সঙ্গে খুব হাসিও বিতরণ করলেন। কথায় কথায় থ্যাঙ্ক ইউ।

হালুয়া চা খাবার পর, গে-সা কাপ দুটি পরিপাটি করে ধুয়ে মুছে একটি কাপড়ে বেঁধে আমাদের হাতে দিলেন। এই সন্ধ্যার মিয়িয়াকো ও দোরি নাচ এবং চা অনুষ্ঠানের কথা মনে করিয়ে দেবে বলে। এই জাপানি প্রথাটি আমার বেশ ভালো লাগল।

ওসাকা থেকে নারাতে গেলাম। কোবে ও ওসাকা দুই ব্যস্ত শিল্প প্রধান শহরের মাঝখানে নারা। একেবারে কোলাহল শূন্য সুপ্ত পরিবেশে এই ধর্মস্থানটি অবস্থিত। যথেচ্ছ হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোট ছোট মন্দিরের মতো পাথরের খোদাই করা স্তূপ পথের দুধারে রয়েছে। ভক্তরা তার মধ্যে বাতি বা প্রদীপ দেয়। জায়গাটার প্রতি মনে শ্রদ্ধা জাগে।

দুদিন নারাতে থেকে কোবে শহরে গেলাম । জাপানের প্রাচীনতম রাজধানী কিয়োটা শহর দেখে মুগ্ধ হলাম । এখানেও চেরি ডান্স আরম্ভ হয়েছে । কিয়োটোর মিনামিজ থিয়েটারে নো প্লে দেখতে পেলাম । নো প্লে শেষ হবার সময় সব নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যায় । অভিনেতা, অভিনেত্রী ধীর পদক্ষেপ স্টেজের বাইরে চলে যায় । তখন মনে হয় যে গভীর ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তা ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল ।

একটা চিত্রশালায় জাপানি পেন্টিং ইয়ামাটো-এ দেখতে গেলাম । জাপানিরা রঙের রাজা, এত সুন্দর রঙের এত সূক্ষ্ম ব্যবহার খুব কম দেখা যায় । পুরাকাল থেকে রঙের চাতুর্য জাপানি পেন্টিংয়ে দেখা গেছে । আজ কমার্শিয়াল আর্টের মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায় । একজন জাপানি যতই রং ব্যবহার করুক না কেন তার পেন্টিং কখনও বিসদৃশ দেখতে হয় না ।

হিরোসিমায় পৌঁছে লিজবেথকে টেলিফোন করলাম । তারপর শেষবারের মতো বিদায় নিয়ে হিরোসিমা শহর দেখতে বেরোলাম । জেমসের খুব ভালো লেগেছে । দুদিন পরে কিউইসু দ্বীপের দিকে এগোলাম । এই দ্বীপটি বিশেষভাবেই সৌন্দর্যমণ্ডিত । পথে মোজি বন্দরে খোঁজ করে জানলাম যে চারদিন পর একটা জাপানি জাহাজ চিনদেশে টিনসিন বন্দরের দিকে যাবে । জেমস ও আমি টিকিট কিনে অপেক্ষা করলাম । জাহাজের নাম হাকোনে মানু, বিশ হাজার টন ভারবাহী জাহাজ । এখানেও আমরা দুজন মাত্র যাত্রী ।

সমুদ্রের উত্তাল অবস্থা । আমার কিছু আসে যায় না । সহজে সী সিকনেস আমাকে ধরে না । বস্তুত আমাকে কোনও দিনই ধরেনি । জেমস বিছানা নিয়েছে । অফিসারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমি খাই । আমার জন্য আমেরিকান প্ল্যানে খাবার তৈরি হত । যখন সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত হল, জেমস শুকনো মুখে আমাদের সঙ্গে ডাইনিং হলে খেতে এল তিনদিন পরে ।

আরও তিনদিন পর মহাচিনের বন্দরে টিনসিনে পৌঁছলাম । টিনসিন বড় শহর । পিকিং শহরের যাবতীয় আমদানি ও রপ্তানি হয় এখান থেকে ।

প্রথমেই চোখে পড়ল লোকেদের দৈন্য দশা । মানুষেরা গাড়ি ঠেলছে । নোংরামি খুব । মনে হল শহরে ঝাঁটপাট কেউ দেয় না । একটা দুর্গন্ধ বাতাসে সব সময় ঘুরছে ।

টিনসিনে দুদিন থেকে হাকোনে মানুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম । দুদিন পর পৌঁছলাম পিকিং । খুব বড় শহর । এই উত্তর দেশের চিনারা বেশ লম্বা । লোকেদের দারিদ্র্য সহজেই নজরে পড়ে । ওয়াই এম সি এ হস্টেলে উঠলাম । এখানে মস্ত আমেরিকান ইউনিভার্সিটি আছে । জেমস এক বন্ধুকে খুঁজে বের করল । তিনি ইংরিজির প্রফেসর । নাম মিস্টার বীভার ।

ওয়াই এম সি এর হস্টেলে একজন ইংরেজ যুবকের সঙ্গে ভাব হল। নাম রজার্স। সে মনেপ্রাণে চিন দেশকে ভালোবাসে। একটি চিনা মেয়েকে সে বিয়ে করতে চায়। রজার্স আমাদের পথপ্রদর্শক হতে চাইল। আমরা দুজনে খুশি মনে রাজি হলাম। পিকিংয়ে এত দেখবার জিনিস আছে যা দেখতে অনেক দিন সময় লাগে। প্রথমে শহরটা প্রদক্ষিণ করলাম। গরিব লোকেদের শীতের দিনেও মাথার ওপর আচ্ছাদন নেই। পার্কে সারারাত বেঞ্চে বসে কাটায়। গরম রাখবার জন্য খবরের কাগজ বুকে পিঠে বেঁধেছে এবং মাথার টুপি করেছে। কী অসহ্য কষ্টকর জীবন ভাবলেও কষ্ট হয়।

টেম্পল অব হেভেন শহরের বাইরে বারো মাইল দূরে। গালার কাজ ও মার্বেল দিয়ে এই আশ্চর্য মন্দিরটি তৈরি হয়েছে। আগেকার দিনে চিন সম্রাট সপরিবারে অথবা একা মাঝে মাঝে এই মন্দিরে আসতেন। পাল্কি বা ঝাঁপানের মতো ব্যবস্থা ছিল। অনেক লোকে মিলে বহন করে এই সুদীর্ঘ পথ আসত এবং যেত। রাস্তার দুধারের বাড়ির লোকেদের ওপর আগে থেকে কড়া হুকুম জারি হত, যাতে তারা পথে বার না হয়, এমনকী সম্রাটের দিকে চেয়ে দেখাও বারণ।

মন্দিরের কাছেই একটা সরোবর আছে, তার একদিকে মার্বেলের তৈরি এক দোতলা প্রকাণ্ড নৌকো। রাজ পরিবারের লোকেরা গরমের দিনে পুরাকালে নৌকোর ওপর বিহার করতেন- চায়ের আড্ডা বা পান ভোজনের ব্যবস্থা হত। মিং যুগের টুম্ব দুটো দেখবার মতো। এই সব দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন আগ্রা কিংবা ফতেপুর সিক্রি দেখতে গিয়েছি। এত সুন্দর কারুকার্য মার্বেলের ওপর কম দেখা যায়। নৌকো মার্বেলের হলেও ভাসমান।

চিনারা চারুকলায় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। তার নিদর্শন চারদিকে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিত্তশালী লোকেদের বাড়ি ঠাসা চিনা কারুশিল্পের তৈরি অসংখ্য কাঠের, জেডের, অন্যান্য পাথরের কাজে যা, দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। বড় বড় চিনা মাটির কাজের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও বর্ণবৈচিত্র্য সত্যিই আশ্চর্য।

১৯১১ সালে যখন ইংরেজ ভারতবর্ষে দরবার করে পঞ্চম জর্জ সাম্রাজ্য বিস্তার সুদৃঢ় করেছেন ঠিক সেই সময় চিনের চার হাজার বছরের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল। সম্রাট সম্রাজ্ঞীদের পালা শেষ করে সুন ইয়াতসেন দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করলেন।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সুন ইয়াতসেনের মেয়াদ ফুরাল, তার জায়গায় এলেন চিয়াং কাইসেক। ইনি সুন ইয়াতসেনের ভায়রাভাই। দেশসুদ্ধ লোক আশা করেছিল চিয়াং কাইসেকের রাজত্বকালে দুস্থ পদদলিত চিনা জাতি আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু, সে আশা পূর্ণ হয়নি বরং দুঃখ দুর্দশা অবমাননা বেড়েই চলল। চিয়াং আর্মির লোক। আর্মি ও

পুলিশ বাহিনী দিয়ে দেশ শাসন করতে লাগল । সর্বত্র অসন্তোষ ও অরাজকতা দেখা দিল । বিদেশি, ক্ষমতাপন্ন দেশগুলির আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রইল সারা দেশে ।

পাছে চিনদেশও কমিউনিস্ট হয়ে যায় সেই ভয়ে আমেরিকা চিয়াংয়ের দমন নীতি অনুমোদন করতে লাগল এবং বিরাট অর্থ সাহায্য দিল । অল্পকালের মধ্যে চিয়াং আমেরিকার ক্রীড়নকে পরিণত হল । উত্তরাঞ্চলে পিকিংয়ে রাজধানী বাতিল করে দক্ষিণে স্থানান্তরিত করা হল ।

চিনা সম্রাট সম্রাজ্ঞীরা পিকিং শহরের যে অংশে বাস করতেন তাকে ফরবিডন সিটি বলা হয়- অর্থাৎ সেখানে সাধারণ লোকের প্রবেশ নিষেধ । এখন আমার মতো সাধারণ লোক নিষিদ্ধ শহরের ভেতর প্রবেশ করতে পারে এবং অসংখ্য মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখতে পারে ।

রাজবাড়িগুলির চেহারা দেখলে মনে হয় সেখানে লুঠতরাজ হয়ে গিয়েছে । যার যা খুশি চারুকলার অমূল্য সব জিনিস তুলে নিয়ে গিয়েছে এবং বিদেশিদের কাছে বিক্রয় করেছে ।

লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও এলবার্ট মিউজিয়ামে একটা সতেরো শতাব্দীর তৈরি চিনা সিংহাসন (গালার) শোভা পাচ্ছে । এত সুন্দর নিখুঁত কাজ চিনারাই করতে পারে । সে সব কাজ আজ দেশ ছাড়া ।

মাও-সে-তুং নামে একজন চিনা, চরম অবস্থার দিনে, রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে দল সংগঠন করতে লাগলেন । মাঝে মাঝে চিয়াংয়ের ফৌজের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ লাগত, ফলে দেখা গেল ফৌজের লোকেরা মাওয়ের দলে যোগ দিচ্ছে ।

পিকিংয়ের উত্তরে রওনা হলাম । সেদিকের চাষীরা দিনেরবেলায় চাষবাস করে, রাতে তারা মাওয়ের অনুগামী । যত উত্তরে যাই ততই ঠান্ডা বাড়তে লাগল । পথের ধারে পান্থশালা বা হোটেল খুঁজে পেতাম না । চাষীরা গরিব হলেও সদাশয় এবং অতিথিপরায়ণ । ঘরের মাঝখানে ফায়ার প্লেস আছে । আমি ও জেমস সেটা ঘেঁসে মাটিতে কম্বল পাততাম এবং শুয়ে বসে রাত কাটাতাম । কষ্ট হলেও আগুন যতক্ষণ জ্বলত, আরাম পেতাম । আল্পসের ওপর সারাদিন স্বল্প গরম কাপড় পরে প্রচণ্ড শীতে বরফের ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তারপর ভুঁটিখানার মেঝেয় বসে রাত কাটানোর চেয়ে এখানে অপেক্ষাকৃত কম কষ্টে আছি ।

জেমস এরকম ভাবে অন্যের কৃপার ভিখারি হয়ে রাত কাটাতে রাজি নয় । কিন্তু হোটেল কোথায় পাব?

চাষীরা তাদের সামান্য খাবারের অংশ দিত আমাদের । তারা স্যুপ, নুডল, শাক ইত্যাদি দিয়ে রাত্রের ভোজন সারে । আমরা টাকা দিলে কোনওদিন তা নিত না । রেস্তোরাঁ নেই

যে খাবার কিনে খাব । এমনিভাবে আমরা চারশো মাইল এগিয়েছি ।

পাহাড়ি দেশ । সাইকেল ঠেলতে কষ্ট হচ্ছিল । প্রায়ই বিখ্যাত চাইনিজ ওয়াল বা চিনের প্রাচীর দেখতাম । এ এক অদ্ভুত কীর্তি । প্রাচীরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শত্রুর যাতায়াত লক্ষ করবার জন্য, কত যে বড় বড় সুন্দর বাড়ি আছে তার লেখা-জোখা নেই । এক কালে চিনারা দেশকে বহিরাগতদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য এই বিরাট প্রাচীর তৈরি করেছিল । আজকাল এরোপ্লেনের যুগে প্রাচীরের মূল্য খুবই কম । নানকো পাস পার হলে ওপারে মঙ্গোলিয়া । অল্পদূরে মাঞ্চুরিয়া দেশ । আমাদের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য । মোগলরা এইখান থেকে দক্ষিণে রাজ্য জয় করতে করতে ইউরোপে ছেয়ে গিয়েছিল কিন্তু পরে অন্তরে গ্রহণ করেছিল ভারতবর্ষের বুদ্ধকে ।

চিনের চার হাজার বছরের গৌরবময় ইতিহাস । মঙ্গোল মাঞ্চুরা পালাক্রমে পিকিং জয় করে চিন দেশে আধিপত্য বিস্তার করেছে । কিন্তু দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই চৈনিক হয়ে গেছে ।

আঠারো শতাব্দী থেকে চিনের অবনতি শুরু হল । সেই সুযোগে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, রুশ ও জাপান দেশের অংশ বিশেষ অধিকার করে ব্যবসা বাণিজ্য পুরোদমে চালাতে লাগল । তারাই চিনের আসল মালিক হয়ে শোষণ নীতি শুরু করে দিল । চিনাদের দুর্দশা উঠল চরমে । পদে পদে অপমান ও লাঞ্ছনা ।

আমার খুব ইচ্ছা হল মঙ্গোলিয়ার ভেতর দিয়ে গোবি মরুভূমি, তিব্বত পার হয়ে উত্তর পশ্চিম কোণ দিয়ে হিন্দুকুশ পর্বতমালার ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছব । কিন্তু চারদিকে বরফ ও শীতের প্রকোপ দেখে সে পথ ছাড়তে হল । জেমস বলল, অসম্ভবের পথে গিয়ে আটকে পড়ে থাকতে হবে, তখন না পারব এগোতে, না পারব পেছোতে । সেই সম্ভাবনাই খুব বেশি । ঘোড়া বা উটের ওপর গেলে আলাদা কথা ।

মোড় ঘুরে দক্ষিণে এগোতে লাগলাম । যেদিকে যাই সেদিকে চাষীদের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি লক্ষ করলাম । রাত হলে দল বেঁধে বন্দুক নিয়ে পুলিশের কিংবা আর্মির ঘাঁটি আক্রমণ করে । দিনেরবেলা একমনে চাষবাস করে ।

চেংটো একটা ছোট শহর । বড় গ্রাম বললে ভালো হয় । এখানে নানা এলাকার মানুষ মিলিত হয় ব্যবসার জন্য । লোমসুদ্ধ পশুর চামড়ার তৈরি জামা খুব ক্রয় বিক্রয় হয় । এত সস্তা যে বলা যায় না । লেপার্ডের চামড়ার কোট আশি টাকা দাম । পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কেনবার খরিদ্দার পাওয়া যায় না । ঘরের মেঝেয় পাতবার জন্য বড় বড় উশুরি বাঘের চামড়া অল্পদামে বিক্রি হচ্ছে ।

একজন চিনা ভদ্রলোকের সঙ্গে বাজারে আলাপ হল । নাম হোপিং । অনেক প্রশ্ন করছিল জানবার জন্য আমরা কে, কোথায় যাচ্ছি । দেশ বিদেশের কথা জানবার আগ্রহ খুব । অবশেষে আমাদের নিমন্ত্রণ করল তার বাড়িতে খাবার ও থাকবার জন্য । হোপিংয়ের বৃদ্ধ পিতা আছেন । তিনি ব্যাঙ্কার হয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেছেন । এখন হোপিং ব্যাঙ্কের কাজ দেখাশুনা করে ।

হোপিংয়ের মস্ত বড় দুমহল বাড়ি । অতিথি রাখবার ভালো ব্যবস্থা আছে । আমরা দুজনে একটা ঘর পেলাম । গরম চা এল । বৃদ্ধ আমাদের ঘরে আলাপ করতে এলেন । সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ করে কী লাভ হবে তা সঠিক বুঝতে পারলেন না । আমরাও বোঝাতে পারলাম না যতক্ষণ না হোপিং এল । সে ইংরিজি থেকে তর্জমা করে বাবাকে আমাদের কথা বলল । তখন বুড়ো খুশি হয়ে তুলোর জামার ভেতর থেকে হাত বার করে আমাদের হাত ধরলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করলেন । তখনই গরম তোয়ালে এল আমাদের জন্য । চিন দেশে অতিথির জন্য একটি ফুটন্ত জলে ভেজা ছোট তোয়ালে নিয়ে আসে । তা দিয়ে খুব আরামে মুখ হাত মুছে পরিষ্কার করে ফেলা যায় । চা এল এবং সেই সঙ্গে হালুয়ার মতো মিষ্টিও এল । চিনা চা দুধ চিনি ছাড়া, তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি । খুব ভালো লাগল । আমাদের দেশে দার্জিলিং চা যেমন সুগন্ধী, তেমনই চিনদেশে সুচং লপচং ।

বাড়ির অদূরে আমাদের দেশে যেমন গোয়াল থাকে এখানে শুয়োর রাখবার ব্যবস্থা আছে । বলা বাহুল্য, তারা নোংরা খাবার ও রোগে আক্রান্ত হবার সুযোগ পায় না । একপাল পিকিং ডাক পুষছে তার পাশেই । পিকিং ডাক বড় হাঁস বিশেষ । তাদের একটি বিশিষ্ট উপায়ে বড় করানো হয়, যার ফলে মাংস নরম ও আশ্চর্য রকম সুস্বাদু হয় । সেদিন আমাদের সম্মানে যে ভোজের আয়োজন হয়েছিল তাতে পিকিং ডাক খেলাম । এত অপূর্ব খেতে যে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় ।

শুয়োরের মাংসের রান্না কত রকম হয়েছিল তা গুনতে ভুলে গিয়েছিলাম । শেষে মিষ্টি-টক একটা প্লেট-ভর্তি মাংস দিল । সামান্য মাত্র খাবার মতো অবস্থা ছিল আমাদের । জেমস আমার সঙ্গে খাবারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় যোগ দিল । সে স্বীকার করল যে রন্ধন শাস্ত্রে চিনাদের তুলনায় আমরা মধ্যযুগে বাস করছি ।

হোপিং আমাদের কাছে ভূয়সী প্রশংসা শুনে বলল এ তো কিছুই নয় । সত্যিকারের বড় বড় ডিনারে কম করে একশো ধরনের মাংস রান্না হয় । স্বীকার করি যে দেশের যা রীতি ।

বৃদ্ধ হোপিং বলল যে কয়েক বছরের মধ্যে তার ধনরত্ন সর্বস্ব চলে যাবে কমিউনিস্টদের কাছে । চিয়াং কাইসেকের রাজত্বকালে এই সুদূর উত্তর চিনের লোকেরা

কমিউনিস্ট গেরিলাদের হাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ট্যাক্স দেয় । আমরা এখন দুই নৌকোয় দুই পা দিয়ে আছি বলে বৃদ্ধ হোপিং দীর্ঘশ্বাস ফেলল ।

আমরা অসংখ্য রকম রান্না খেয়ে যত না খুশি হয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি চিনা মাটির অর্থাৎ পোর্সেলেনের কারুকার্য করা বাসনপত্রের ব্যবহার করতে দেখে । এত পাতলা চিনা মাটির ওপর সূক্ষ্ম কাজ দেখে অবাক হয়েছি । যে চেয়ার ও টেবিল আমাদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি রোজ উড কাঠের ওপর মাদার পার্লের ফুল ফল বসানো । তেমনই কাঠের ওপর খোদাই করা কাজ । পৃথিবীতে অন্য কোনও জাত এত সুন্দর কাঠের কাজ করতে পারে, বিশ্বাস হয় না ।

ঘুরতে ঘুরতে আবার পিকিংয়ে ফিরে এলাম । ফিরেই রজার্সকে ডাকলাম আমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য । পিকিং ডাক খাওয়ালাম একটা রেস্তোরাঁতে । অনেকক্ষণ ধরে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বললাম । রজার্স বলল যে সে আমাদের মঙ্গোলিয়া বা মাঞ্চুরিয়ার পথে যেতে বারণ করবে ভেবেছিল কিন্তু পরে মনে হয়েছিল আমি ভারতবাসী বলে হয়তো ততটা খারাপ কিছু হবে না । জেমস আমার মতোই শত প্রশংসা করল চিনাদের । রজার্স বলল, চিনে অনেকদিন অরাজকতা চলছে । জাপানিদের শোষণনীতি থেকে পার পাবার জন্য চিনারা দক্ষিণে পালিয়ে যাচ্ছে । চিয়াং কাইসেকের ছন্নছাড়া রাজত্বে তারা কোথাও শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না । অবশেষে মাও-সে-তুং সৈন্যদলে যোগ দিয়ে লুঠতরাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে লেগেছে ।

আমরা একদিন পরেই বিরাট পিকিং শহর ছেড়ে দক্ষিণে সাংহাই বন্দরের দিকে রওনা হলাম । রজার্স আমাদের দলে যোগ দেবে বলেছিল কিন্তু ব্রিটিশ লিগেসন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি পেল না । চিনা ভাষা থেকে ইংরিজিতে তর্জমা করতে রজার্স সিদ্ধহস্ত । তাকে ছাড়া লিগেসনের কাজ একদিন চলে না । যদিও আরও পাঁচজন দোভাষীর কাজ করে সেখানে ।

চিনাদের সুদিনে এককালে বড় বড় বাঁধ, খাল, প্রাসাদ ইত্যাদি তৈরি হয়েছিল । দেশের সমস্ত শহরগুলিকে যুক্ত করবার মতো রাস্তা কিন্তু তৈরি হয়নি । যেটুকু রাস্তা আছে তা পুবদিক থেকে পশ্চিম দিকে গিয়েছে । ব্যবসা বাণিজ্য চলে বড় বড় নদীপথে যেমন হোয়াংহো, সিকিয়াং এবং দক্ষিণে সী নদী পুব পশ্চিমে বিস্তারিত ।

বিরাট চিন দেশে গাড়ি চলাচলের কাঁচাপাকা রাস্তা মাত্র এক লক্ষ মাইল । তুলনায় আমাদের দেশে রাস্তা এর বিশ গুণ বেশি, যদিও ভারতবর্ষের আকার তার চাইতে অনেক ছোট ।

পিকিং ছাড়বার পর পঞ্চাশ মাইল ভালো বাঁধানো রাস্তা পেলাম যেটা টিনসিনের দিকে চলে গিয়েছে। তারপর কাঁচা রাস্তা কখনও কখনও মাঠের ওপর দিয়ে চলেছে। আমাদের লক্ষ চেংচাও শহর। এই অঞ্চলে সাইকেলের ব্যবহার খুব দেখা গেল।

চিন অত্যন্ত গরিব নিপীড়িত দেশ। গাড়ি দূরের কথা, লোকেরা সাইকেল চালাতে পারলে খুশি হয়। সাইকেল যে কোনও রাস্তা ধরে চলতে পারে। শতকরা আশি জন লোক চাষবাস দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন করে। আমাদের দেশে গরু দিয়ে লাঙল টানানো হয়। চিন দেশে গরুর কাজ মোষে করে। চিনারা ভাত খায়, ধান চাষ তাই ব্যাপক।

চিনা পুরুষরা আগে বড় চুল রাখত। মেয়েরা কাঠের জুতো পরে পা ছোট করে ফেলত। যে জন্য চলতে ফিরতে খুব অসুবিধা হত। আজকাল খুব কম মেয়েরই ওই অবস্থা দেখা যায়। আমি পিকিংয়ে এক রমণীর বাঁধা-পা দেখে শিউরে উঠেছিলাম।

অনেক বিষয় ভারতবর্ষ ও চিন দেশের মধ্যে মিল দেখা যায়। দুইই গরিব, অশিক্ষিত ও স্বল্পায়ুর দেশ। অথচ দুই দেশেই হাজার হাজার বছর পর্যন্ত সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল যখন ইউরোপ অজ্ঞতায় অন্ধকারাচ্ছন্ন।

চিনদেশে আমাদের দেশের মতো জয়েন্ট ফ্যামিলি অর্থাৎ একান্নবর্তী পরিবার নিয়ম ছিল। এই নিয়মে সব চেয়ে বড় যিনি সেই পুরুষ সর্বেসর্বা। তার হুকুম সবাই মেনে চলবে। বড় ছেলের ওপর সব দায়িত্ব একদিন পড়বে বলে তাকে পরিবারের অন্যরা খাতির করে। সমাজে বা পরিবারে স্ত্রীলোকের কোনও স্থান নেই। সবাই বোঝে যে বিংশ শতাব্দীতে এই অবস্থা অশোভন, অন্যায় এবং অচল কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন ঘটাবার মতো তেমন বড় কোনও চেষ্টা হয়নি। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। যে সব মেয়েরা স্কুলে কলেজে পড়ছে তারাই দাবি করছে স্ত্রী স্বাধীনতা।

চাষ আবাদ প্রথম ও প্রধান কাজ বলে চিন দেশে কাঁচামাল জন্মায় এবং বিদেশিরা সেই সব জিনিস তুলে নিয়ে যায়। শিল্পের সংখ্যা এত কম যে মুষ্টিমেয় বললে ভালো হয়। বিদেশিরা তাদের কলকারখানায় কাঁচামাল দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করে এবং চড়া দামে সে সব চিনাদের কাছে বেচে।

সাতশো মিলিয়ন লোককে দুবেলা খাওয়াতে হলে যত ফসল উৎপন্ন হওয়া দরকার সে রকম হয় না। তবু খাবার জিনিসের দাম ভীষণ সস্তা। অনেকে বলে যে এবার থেকে একটার জায়গায় দুবার ধান বুনে দুটো ফসল তোলবার চেষ্টা করা যাক। কিন্তু সেটা সংকল্পই রয়ে গেছে, এখনও কাজে পরিণত হয়নি। আমাদের ভারতবর্ষেও সে চেষ্টা নিশ্চয় সুফলপ্রসূ হতে পারে।

ইউরোপে কাঁটা চামচ দিয়ে যেমন খাওয়ার রীতি, জাপান ও চিনে তেমনই কাঠি দিয়ে খাওয়ার চল ।

তেরোদিন পরে সাংহাই পৌঁছলাম । সাংহাই প্রকাণ্ড শহর । জলের ধারে বেশিরভাগ বড় বড় বাড়ি ইংরেজদের অফিস, হোটেল কিংবা থাকবার জায়গা ।

পাঁচটা জাত- ইংরেজ, জার্মান, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জাপান একসঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল চিনদেশ গ্রাস করতে । তাই কেউই দেশটাকে পুরোপুরি হাত করতে সক্ষম হয়নি । সাংহাই শহরটাকে পাঁচভাগে ভাগ করে উঁচু পাঁচিল দিয়ে নিজের নিজের এলাকা সুদৃঢ় করা হয়েছিল । চিনের সাংহাই হয়ে গেছে বিদেশিদের সাংহাই । শিখ পাঞ্জাবি পুলিশ শহর পাহারা দেয়, যানবাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে ।

মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বড় লোক এ দেশে আছে যাদের মান্দারীন বলা হয় । এরা পাল্কিতে বসে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আরামে যাতায়াত করে । অবশ্যি পাল্কি বাহকেরা চিনা ।

মান্দারিনদের ভাষা চিনদেশে সর্বত্র চলে কিছুটা মার্জিত ভাষা বলে ।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কনফুসিয়াসের চৈত্য, তাও-ই-জন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় একই সময়ে এ দেশে বিস্তার লাভ করে । অনেক পরে কিছু সংখ্যক লোক মুসলমান ধর্মও গ্রহণ করে । এদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ নেই ।

কনফুসিয়াসপন্থীরা বিশ্বাস করে সেই দেশ সকল দেশের সেরা যেখানে মানুষে মানুষে বিরোধ নেই । দেশের রাজা রাজত্ব চালাবেন, তাকে পণ্ডিত ও প্রধান লোকেরা সাহায্য করবেন সব সময় প্রজাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে ।

তাও-ই-জন বিশ্বাসী লোকেরা মনে করে মানুষের জীবন ধারা যেমন ভাবে চলছে সেটা পরিবর্তন করা ঠিক নয় । মানুষ যদি স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করে তো কুফল দেখা দেয়, যেমন মড়ক, বন্যা ইত্যাদি । এ কারণে চিনারা রক্ষণশীল হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যেমন পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা দেখা গেল তেমন এদেশে হল না ।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি । বুদ্ধ পৃথিবীতে শান্তি ও সত্যের পথ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । এই কারণে চিনা ও জাপানিরা ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ।

বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা কিন্তু নিজ নিজ গৃহদেবতাদের নিয়মিত পূজা করে, ভূত, প্রেত, ড্রাগন ইত্যাদি মেনে চলে, তা সে যে ধর্মেই তার আসল বিশ্বাস থাকুক । এমনকী মুসলমানরা পর্যন্ত চিনদেশে গৃহদেবতাদের পূজা করে ।

চিনের মতো ভারতবর্ষে বিশেষ করে দক্ষিণে, অনাবৃষ্টির সময় কোটি কোটি লোক প্রার্থনা করে । অনেক সময় গৃহস্বামী খাবার হাতে নিয়ে পাহাড়ের ওপর কিংবা মন্দিরে যায় এবং প্রার্থনার পর খাবার রেখে চলে আসে । পাখিরা সেই সব খায় ।

অনেক সময় আবার তারা দুর্দিনে পূর্বপুরুষদের কবরে খাবার নিয়ে যায় এবং প্রার্থনা জানায় 'বৃষ্টি দাও, ফসল বাঁচাও, দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা কর' । তারপর কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরে যায় । তারপর ফিরে এসে সেই খাবার নিয়ে বাড়ি চলে যায় এবং সবাই ভাগ করে খায় ।

চিনারাই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে কাগজ, কালি, প্রিন্টিং, কম্পাস, গান পাউডার ইত্যাদি । তারা সিল্ক ও পটারির ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত । এক সময় বড় বড় জাহাজও তারা বানাত ।

ইউরোপিয়ানরা গান পাউডারের জোরে চিন ও ভারতের মতো দেশে রাজত্ব বিস্তার করে এবং অশেষ দুর্দশা ঘটায় ।

এই দুই দেশের লোকসংখ্যা পৃথিবীর অর্ধেক । সবাই দেখতে চায় চিন ও ভারতবর্ষ আবার স্বাধীন ও উন্নতির পথে অগ্রসর হোক । দুই দেশেই অপর্যাপ্ত কাঁচামাল আছে । যেদিন শিল্প প্রতিষ্ঠা হবে সেদিন ইউরোপিয়ান, জাপানি ও আমেরিকানদের শোষণ নীতি রোধ করা যাবে ।

চিনারা ভাত ও মাছ যথেষ্ট খায় । সমুদ্র ও নদী থেকে অপর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায় । সীমের বীচি এবং নানা রকম বীনের ব্যবহার খুব দেখা যায় । তেলের বদলে বীনের নির্যাস দিয়ে অনেক রান্না হয় । সয়াবীন সস তো আজ যথেষ্ট চালু ।

সাংহাইয়ের এককে অংশে জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান রেস্তোরাঁতে খেয়ে খেয়ে বেড়ালাম সময় মতো পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়ার শোধ তুলে নেবার মতো । পূর্বেই লিখেছি যে চিনা রান্না পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ । তবে সব সময় ঠিক স্বাদ যেন পাইনি ।

আমাদের দেশেও বিদেশিদের কি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সব রান্না ভালো লাগে? আমাদের অভিজ্ঞতায় এর ব্যতিক্রম দেখেছি কিন্তু সেটা ব্যতিক্রমই বলব । একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা প্রায় তিরিশ বছর আমার কলকাতার বাড়িতে প্রতি রবিবার দুপুরে খেতেন । তিনি চচ্চড়ি, সুক্ত, ঘণ্ট ইত্যাদি খেয়ে ততখানি আনন্দ প্রকাশ করেছেন যতখানি করেছেন মোগলাই খাবারে । তিনি আবার জিজ্ঞেস করতেন, কিসে কী ফোড়ন ব্যবহার করা হয় । যখন ব্যাখ্যা করা হত, আমি হাসি চাপতে পারতাম না ।

সাংহাই শহরে পশ্চিমদেশের নাচের চল আছে কিছুটা । চিনা মেয়েরা এই অঞ্চলে বেশ লম্বা ও সুশ্রী দেখতে । তাদের বেশিরভাগের বিদেশি বাবা ও চিনা মা । অনেকেই ভালো নাচতে পারে । আমি তাদের সঙ্গে নাচতাম ।

জেমস বেসুরো গান ধরেছে। সে চায় মোটর সাইকেল নিয়ে ভ্রমণ করতে, শারীরিক পরিশ্রম কমাবার জন্য, তা ছাড়া সময় বাঁচাতে পারা যাবে বলে। পাছে খরচের আপত্তি করি সেজন্য সে প্রথমেই বলেছে যে সে নিজেই দুটো মোটর সাইকেল কিনবে। একটা অবশ্য আমার জন্য। অনেক ওজর আপত্তি জানালাম। চিন দেশে রাস্তা নেই সে কথা মনে করিয়ে দিলাম। পেট্রোলও মেলে না কয়েকটি জায়গা ছাড়া।

কলকাতা ছাড়বার আগেই এই প্রশ্ন উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল যে নিজেদের কায়িক পরিশ্রম দিয়ে ভ্রমণ করতে হবে। অ্যাডভেঞ্চার ও সাহসের ঠিক পরিচয় তবেই পাওয়া যাবে। কঠিন পথে চলতে হবে এ সঙ্কল্প ছিল আমাদের।

জেমসের উদ্দেশ্য দেশ দেখা; যে দেশে রাস্তা আছে, যেটা সহজে ভ্রমণ করা যাবে সেই সব দেশে সে যেতে চায়। যেখানে পথ নেই, সেখানে নাই বা গেলাম। আমাদের মতানৈক্য মেটবার নয়।

আমি যখন সাইকেলে বা পদব্রজে ছাড়া পৃথিবী পর্যটন করব না তখন আমাদের মধ্যে একমত হওয়া সম্ভব নয়। জেমস সাংহাই থেকে আমেরিকা ফেরৎ গেল। আমি যেমন একা ছিলাম, আবার তেমনই একা হলাম। জেমসের কাছে আমি অনেক জিনিস জেনেছি ও শিখেছি। সে ছিল আমেরিকান যুব সমাজের প্রতিনিধি। সব সময় মনে হত যে সে ছিল এমন একজন তরুণ যে সারাক্ষণ তার নিজের অস্থিরতা, চঞ্চলতা দিয়েই মূল্যায়ন করতে চাইত সব কিছুর।

জেমস তার টাইপরাইটার দিয়ে সমস্ত অবসর সময় খটখট লিখত। অনেক পাতা লিখেছিল। আমার খুব ইচ্ছা ছিল পুস্তকাকারে তার লেখা দেখব একদিন। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি।

এবার আমি ন্যানকিং শহরের দিকে চলতে আরম্ভ করলাম। ন্যানকিং মানে দক্ষিণের রাজধানীতে, এদিকে মোটামুটি রাস্তা আছে। কখনও পাকা কখনও কাঁচা পথ। আমার উচিত ছিল প্রথমে ন্যানকিং শহরে যাওয়া এবং তারপর সাংহাই। কিন্তু জেমস জিদ করেছিল প্রথমেই সাংহাই যাবার জন্য। এখন বুঝি তার উদ্দেশ্য কী ছিল। আমাকে একটা মোটর সাইকেল কিনে দেবার ও নিজের জন্য একটা কেনবার।

ন্যানকিংয়ে প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে আধুনিক যুগের তৈরি সুনয়াত-সেনের সমাধি সৌধ। শ্বেত মর্মর দিয়ে তৈরি। দেখতে সুন্দর এবং সুরুচিপূর্ণ।

ন্যানকিংয়ে মাত্র একদিন থেকে ফুচোর পথ ধরলাম। সামনেই ইয়াং-সি-কিয়াং নদী। বোটে নদী পার হলাম। তারপর উহান ও চাংশার পথ ধরলাম, বা ধরবার চেষ্টা করলাম,

কেননা প্রায়ই ধান জমির ওপর দিয়ে মেঠো রাস্তা দিয়ে অতি কষ্টে এগিয়েছি । মোটর সাইকেল থাকলে এ জায়গায় চলাফেরা অসম্ভব হত ।

আমার লক্ষ্য ছিল মস্ত শহর, ক্যান্টন । উত্তর দিক অপেক্ষাকৃত কম লোক দেখা যেত । যত দক্ষিণে যাচ্ছি ততই মনে হচ্ছে জনারণ্য বেড়েই চলেছে । ক্যান্টন শহর খুব পুরনো । সরু রাস্তা এবং চারদিকে লোকের ভিড়, অসংখ্য ছোট ছোট দোকান । কলকাতায় যে চিনাদের আমরা দেখি, তারা বেশিরভাগ ক্যান্টন অঞ্চলের লোক । সাধারণত এরা বেঁটে এবং খুব কর্মতৎপর । তবে এরা প্রধানত পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করে । মোটর গাড়ির প্রচলন হয়নি ভালো রকম । তবে রিকশা প্রচুর । বেশিরভাগ কাঠের বাড়ি । সাইকেল ব্যবহারও চালু হয়েছে ।

ক্যান্টনে দুদিন থেকে হংকংয়ের পথ ধরলাম । এই দুই শহরের মধ্যে লোক চলাচল ও খাবার জিনিস আমদানি রপ্তানি খুব হয় । অফুরন্ত লোক দুদিকে চলেছে । কেউ কেউ ঠেলাগাড়ি নিয়ে যাচ্ছে ।

হংকং শহর একটা ছোট্ট দ্বীপের ওপর । ইংরেজদের ঘাঁটি, তাদের অধীনে এই শহর গড়ে উঠেছে । চিনে অনেকখানি ইংরেজের হাতে গড়া আরেকটি শহর সাংহাই ।

পৃথিবীতে সুন্দর দেখতে যত বড় শহর আছে তাদের মধ্যে হংকং অন্যতম । সান-ফ্রান্সিস্কোর সঙ্গে অনেকটা মিল আছে । দুই শহরই পাহাড়ের ওপর এবং সমুদ্রের ধারে । সন্ধ্যায় যখন লক্ষ বাতি জ্বলে ওঠে জলে তার ছায়া পড়ে, মনে হয় স্বপ্নপুরী । ইংরেজরা বড় বড় হোটেল করেছে জলের ধারে । সারাক্ষণ ‘মেনল্যান্ড’ বা চিনদেশ থেকে স্টিমারে লোকজন, জিনিসপত্র হংকং দ্বীপে যাচ্ছে আসছে । মেনল্যান্ডের দিকটাকে ‘কোউলুন’ বলা হয় । জলপথে পার হতে অল্প কয়েক মিনিট লাগে ।

ক্যান্টনের মতো হংকংয়ের চারদিকে অসংখ্য ছোট নৌকো জলে ভাসছে । লোকেরা পরিবার নিয়ে নৌকোর ওপর ঘর সংসার করে । অনেক সময় দেখা যায় ডাক পিয়ন চিঠি নিয়ে নৌকোর পর নৌকোর ওপর দিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট বোটে চিঠি বিতরণ করতে ।

একজন চিনা যুবকের সঙ্গে ওয়াই এম সি এ-তে আলাপ হল । তার নাম সিন ফু । সবাই ফু বলে ডাকে, ফুর খুব ফটোগ্রাফির শখ । সহজেই আমার চেলা হয়ে গেল । তার বাড়িতে ডিনার খাবার নেমন্তন্ন পেলাম । ফুর স্ত্রী মনে হয় কলেজের ছাত্রী । সুন্দর ও সুশ্রী দেখতে । আমাকে ফু বলল যে আমার ছবির এগজিবিশন তার স্ত্রী দেখেছে এবং খুব প্রশংসা করেছে । প্রদর্শনীটি দশদিন হংকংয়ে থাকবে, তারপর ছবি দেখানো হবে সিঙ্গাপুর শহরে ।

ফু পরিবারের সঙ্গে এত ভাব হল যে রোজই দেখা হত এবং নতুন কোনও না কোনও জায়গা আমাকে দেখাতে নিয়ে যেত ।

ইতিমধ্যে একটা চিনা জাহাজে নেমন্তন্ন পেলাম হাইনান দ্বীপে বেড়াবার । আমি রওনা হলাম । জাহাজটা শুয়োর নিয়ে আসা-যাওয়া করত । জাহাজে একদিন চলবার পরই মনে হল গন্ধে ভরপুর হয়ে গেছি ।

হাইনান জনসমাকীর্ণ একটি দ্বীপ । দুদিন দ্বীপে ঘোরার পর আবার জাহাজে হংকং-এ ফিরে গেলাম ।

অনেকদিন পর রেডিওতে আমার ভ্রমণকাহিনী বলবার আমন্ত্রণ পেলাম ।

হংকং থেকে দক্ষিণ দিকে ম্যাকাওর দিকে চলতে আরম্ভ করলাম । ম্যাকাও শহর পর্তুগিজদের অধীনে একটি দ্বীপের ওপর অবস্থিত । চিনে অনেক জায়গায় দেখেছি আফিং খানা । ম্যাকাও মনে হল জুয়া খেলবার জায়গা ও আফিং-খানার দেশ জোড়া কারবার । কিছু সংখ্যক পর্তুগিজ এখানে বাস করে । বাজারে বিদেশি মাল বলতে একমাত্র পর্তুগালের জিনিস ।

আমাদের দেশে পর্তুগিজদের অধীনে এখনও তিনটে জায়গা গোয়া, দমন ও দিউ ।

১৯

চিন ভ্রমণ শেষ হয়ে এসেছে। এবার ইন্দোচিন যাচ্ছি। হাইফং আমার লক্ষ্য। চারদিন পথে অনেক কষ্ট সহ্য করে ইন্দোচিন সীমান্তে পৌঁছলাম। ইন্দোচিন ফরাসিদেশের অধীনে। সীমান্তে ফরাসিরা কোনও রকম বেগ দিল না। ফ্রান্সে গিয়েছি সে কথা পাসপোর্ট উল্টোপাল্টে বের করে দেখল। সিরিয়ায় থাকতে ফরাসি ভাষা জানতাম না বলে অনেক অসুবিধা ভোগ করেছিলাম। এখন ভাষা শিখেছি বলে ইন্দোচিন দেশ দেখতে উৎসাহিত বোধ করলাম।

পরে ইন্দোচিনের নাম ভিয়েতনাম হয়েছে। লাউস ও কাম্বোজ দেশ স্বাধীন ও পৃথক হয়ে গেছে।

সীমান্তরক্ষীরা আমাকে অভিবাদন জানাল ও এক গ্লাস বিয়ার খেতে দিল।

হাইফং মস্ত বড় বন্দর ও শহর। একটা চিনা হোটেলে উঠলাম। এখানে একদিন থেকে ইন্দোচিনের উত্তরে বড় শহর হ্যানয় দেখতে যাব।

দেশটা তৈরি হয়েছে তিনটি খণ্ড দেশ নিয়ে যেমন উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাউস ও কাম্বোডিয়া। কাম্বোজ দেশের লোকেরা একটু ভিন্ন রকমের দেখতে যদিও চিনা ছাপ স্পষ্ট।

ছয় শতাব্দীতে ভারতীয়রা এই দেশে রাজত্ব বিস্তার করে। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। অসংখ্য মন্দির, পথ, ঘাট, প্রাসাদ, দুর্গ সে দিনকার সাক্ষ্য দেয়। কাম্বোজে ওঙ্কার মন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওঙ্কার মন্দির ভারতবর্ষের বাইরে সব চেয়ে বড় হিন্দু মন্দির এবং মানুষের তৈরি যতগুলি বিরাট ও আশ্চর্য সৃষ্টি আছে, তাদের মধ্যে অন্যতম। কত মন্দির প্রাসাদ, বট ও অশ্বত্থ গাছের আবেষ্টনীতে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। যা আছে তাই আমাদের বিস্মিত করে।

রামায়ণের চরিত্র নিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য এখানে পাথরে খোদাই করা আছে। খুব নিখুঁত সব কাজ।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের করমণ্ডল অঞ্চলের লোকেরা বঙ্গোপসাগর পার হয়ে বর্মায় গিয়েছিল। তারপর শ্যাম, ইন্দোচিন, দক্ষিণ চিন, কাম্বোজ ও মালয় দেশ জয় করে নিজেদের প্রভাব

বিস্তার করে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসার লাভ করতে করতে সুমাত্রা ও জাভা দেশ ছেয়ে ফেলে।

ঐতিহাসিকরা বলেন, হিন্দুরা দেশ জয় করে বিজিতদের সঙ্গে সমান সমান সম্পর্ক স্থাপন করত। এমনিভাবে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা ভালোবেসে সেই সভ্যতা গ্রহণ করে।

চিনদেশে থেকে হান সম্রাটের বাহিনী ইন্দোচিন, লাউস ও কাম্বোজ অঞ্চল জয় করে হাজার বছর পরে। তারপর ভারতবাসীদের সব চিহ্ন লোপ পেয়ে গেল। অন্যদিকে চিনারা বিজিতদের দেশের মেয়ে বিয়ে করতে লাগল এবং তার নিজস্ব কৃষ্টি বিস্তার করল। যার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোকেদের ওপর চৈনিক ছাপ পড়ল।

হ্যানয় শহর থেকে দক্ষিণে চলতে শুরু করেছি। পাহাড়ি দেশ। রাস্তা খারাপ। যেখানে রবার বাগিচা আছে, ফরাসিরা তার ভেতর দিয়ে ভালো রাস্তা তৈরি করেছে। সেজন্য বড় বড় রবার গাছ জোড়া বনানীর মধ্য দিয়ে চলেছি।

একদিন বনের মধ্যে ময়াল সাপের সামনে পড়েছিলাম। সাপটা ২১ ফুট লম্বা। চামড়া দিয়ে বাক্স ও জুতো তৈরি করব ভেবে পিস্তল দিয়ে সাপটাকে মারলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে কোথা থেকে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ সাপটার কাছে উপস্থিত হল। তারা বন্দুকের শব্দে এগিয়ে এসেছে। সবাই কিছু মাংস চায়। আমি খুশি হয়ে বললাম যত পারো মাংস নাও এবং আমাকে চামড়াটা দাও। সাপের মাথাটা এক হাত লম্বা। ওজন অন্তত পনেরো সের। সেটা সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়। চামড়াটার ওজন প্রায় দেড় মন, সেটারও মায়া ছাড়লাম। যারা মাংস কেটেছিল তাদেরই সব দিয়ে দিলাম। সবাই খুব খুশি।

রবার বিক্রি করে ফ্রান্স বহু টাকা রোজগার করে। এদেশের উদ্বৃত্ত চাল বিদেশে রপ্তানি হয়।

ইন্দোচিন, শ্যাম, কাম্বোজ ইত্যাদি দেশগুলির এককালে পরিচয় ছিল অন্য নামে। সুমাত্রার নাম ছিল সুবর্ণ দ্বীপ।

সাইকেল চালাতে চালাতে হয়ে অর্থাৎ 'উয়ে' নামে পুরাকালের রাজধানীতে পৌঁছলাম। এখানে গরম খুব, অসহ্য লাগছিল। একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঠান্ডা এক গ্লাস বিয়ার খেলাম। বিকালে শহরের মধ্যে একটা মিউজিয়াম দেখে তার সামনে থামলাম। বাড়িটায় যাবার পথে দুধারে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তি দেখলাম। আমি আগ্রহ দেখিয়ে মূর্তিগুলি পরীক্ষা করতে বসলাম।

আমাকে দেখে মিউজিয়ামের ভেতর থেকে একজন ফরাসি ভদ্রলোক বেরিয়ে আমার কাছে এলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি ভারতবর্ষের লোক? আমি হ্যাঁ বলাতে,

তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন যে যদি আমি মূর্তিগুলির পরিচয় জানি তো তাকে বুঝিয়ে দিতে।

যেগুলি স্পষ্ট বোঝা যায়, আমি সেগুলির পরিচয় দিলাম। বেশিরভাগ, রামায়ণের চরিত্র ধরে খোদাই করা। কিউরেটর নামগুলি লিখে নিলাম। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে খাবার ও থাকবার নিমন্ত্রণ জানালেন।

অনেকদিন পরে ফরাসি রান্না খেয়ে তৃপ্ত হলাম। গৃহকর্ত্রী অ্যান ফরাসি ছাড়া অন্যভাষা জানেন না। আমার সঙ্গে সহজেই ভাব হয়ে গেল। অ্যান রুয়াঁ শহরের মেয়ে। রুয়াঁ শহর জগদ্বিখ্যাত আরেক তরুণীর পরিচয়ে- তার নাম 'জোন অব আর্ক'। একটি ছোট গেস্টরুমে আমার শোবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। ডিনার খেয়ে পরিষ্কার সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা বিছানায় পরিতৃপ্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন অ্যান ও তার স্বামীকে বিদায় দিয়ে রওনা হলাম। এই দেশও জনাকীর্ণ। একদিন বাজারে গেলাম। মেয়েরা সবাই খড়ের টুপি পরে। হাজার হাজার মেয়ে কেনাবেচার জন্য হাটে উপস্থিত হলে এত টুপির সমাবেশ দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

চিনারা উপত্যকার আদিবাসী লোকদের হারিয়ে দিয়ে তাদের ওপরের পাহাড়ি অঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়। হাটের দিন নানা উপজাতির স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত হয়। এদের গলায় পুঁতির মালা দেখে বলা যায় কে কোন জাতির লোক। চাল, ডাল ও নানা রকম মশলা, দড়ি, ঝাঁপি, ঝুড়ি ইত্যাদি হাটে বিক্রি হচ্ছে। বুনো হরিণের মাংস দুজায়গায় বেচছিল। হাঁস ও মুরগি অপর্যাপ্ত এবং ভীষণ সস্তা। এক টাকায় একটা হাঁস কিংবা বড় মুরগি পাওয়া যেত। শুয়োরের মাংস ইন্দোচিনের লোকেদের খুব প্রিয়। বলা বাহুল্য সে দেশে শুয়োর সযত্নে পালন করা হয় এবং তারা ঘৃণার পাত্র নয়।

কুড়িদিন পরে দক্ষিণ ইন্দোচিনের রাজধানী সায়গন শহরে পৌঁছলাম।

সায়গন শহর দেখে আমি মুগ্ধ। বড় বড় চওড়া রাস্তা যেমন প্যারিসে দেখেছি আর সুন্দর সুন্দর বাড়ি দুধারে। মনে হয় আরেক প্যারিস। বাড়িগুলির বিশেষত্ব, স্থানীয় স্থাপত্য বজায় রেখে আধুনিক বাড়ি তৈরি হয়েছে। হিন্দুরাজা খেমারদের আমলে যেমন স্থাপত্য শিল্প প্রসার লাভ করেছিল ঠিক সেই রূপটি সর্বত্র বজায় রাখা আছে।

সায়গন বন্দরে বেড়াতে গিয়েছি। আমাদের দেশের একটা জাহাজ দেখে আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে গেলাম। জাহাজটির নাম আরকট, বি আই কোম্পানি মালিক। কাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলাম কোনও বাঙালি নাবিক জাহাজে আছে কিনা। কাপ্টেন হেসে বলল, সবাই তো বাঙালি। আরও জিজ্ঞেস করল কী চাই এবং কেন বাঙালি খুঁজছি।

আমি বললাম, সে অনেক কথা, আমি বহু বছর দেশ ছাড়া। আমি কলকাতার লোক। কারও সঙ্গে বাংলা ভাষায় কতদিন কথা বলিনি তার ঠিক নেই। কাপ্টেন মহম্মদ বলে একজন একটু উচ্চপদস্থ নাবিককে ডাকল। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মহম্মদ খুশি হয়ে বলল যে দেশবাসী আরও বিশজন আছে যারা আমার সঙ্গে পরিচয় করতে চাইবে।

কাপ্টেনের হুকুম নিয়ে আমাকে জাহাজে উঠতে দিল। তারপর কুড়িজন বাঙালির মধ্যে যে বাংলা শুনলাম তা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো। আমার কাছে অনেক কথা দুর্বোধ্য রয়ে গেল। তবু কিছু না শোনার চেয়ে তো ভালো। লোকেরা সব চাটগাঁয়ের মুসলমান। এই সাধাসিদে লোকগুলিকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার হোটেলে ফিরলাম।

রাত্রে শোবার আগে ভাবছিলাম যে আসল বাংলা শুনতে পেলে কী ভালো লাগবে। কতদিন রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিনি, তার ঠিক নেই। মনে হল আমার জীবন বৃথাই কাটছে। কবিগুরুর দেওয়া চয়নিকা খুলে অনেকগুলি কবিতা পড়লাম। তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন, তার ঠিক নেই।

সায়গন শহরের ভেতর দিয়ে মেকং নদী চলে গিয়েছে। আমাদের দেশে গঙ্গা যেমন পবিত্র ও অশেষ কল্যাণের আধার, ইন্দোচিনে তেমনই মেকং। গঙ্গার মতো মেকংয়ের জলও মাটি-গোলা ঘোলাটে। অসংখ্য ছোট ছোট নৌকো ফল ফসল যাবতীয় পণ্য নিয়ে জলপথে সারাক্ষণ ফেরি করে বেড়ায়।

এই শহরের একটি বিশেষ শোভা হল নদীর ধারে সার বাঁধা গাছ- যেমন অন্য দেশের বড় বড় শহরে দেখা যায়। ফরাসিরা সায়গনকে মনের মতো করে সাজিয়েছে। এখানেও প্যারিসের মতো সর্বত্র ফুটপাথে রেস্তোরাঁ। লোকেরা পানভোজন গল্পগুজব করছে। দেখতে সুন্দর লাগে। আমি একটা রেস্তোরাঁয় বসে কফির অর্ডার দিলাম।

একদিন সকালে ওরিয়েন্টাল মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। বিশেষ দ্রষ্টব্য হল প্রস্তরে খোদাই করা অফুরন্ত হিন্দুদের দেবীর মূর্তি। দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, যারা তাদের তৈরি করেছে তারা দক্ষিণ ভারতবর্ষের লোক। তিনদিন পরে কাম্বোজের রাজধানী নমপেন আমার লক্ষ্য। নমপেনের কাছেই জগদ্বিখ্যাত হিন্দু মন্দির আঙ্কোরভাট আছে। ইউরোপে থাকতে একটা বই পড়েছিলাম। তার নাম ফোর ফেসেস অব শিব। ১৯৩০ সালে প্যারিসে কলোনিয়াল এগজিবিশনে আঙ্কোরভাট মন্দিরের অনুকরণে গড়া মন্দির দেখার পর থেকে আমার খুব ইচ্ছা হয়েছিল কাম্বোজ দেশে গিয়ে আসল ও অতুলনীয় ওঙ্কার মন্দির দেখবার।

সাত শতাব্দীতে এই মন্দিরটি হিন্দু খেমার রাজারা তৈরি করে। আশপাশে অনেক পথ, ঘাট, দুর্গ আর মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদি তৈরি হয়। নয় শতাব্দীর পর এই অঞ্চলের লোকেরা কোনও অজানা কারণে লোপ পেয়ে যায়। তারপর শত শত বছর কেটে গেছে গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে। কেউ তাদের কথা জানত না বা ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এক ফরাসি সৈনিক ওঙ্কার মন্দির ও বায়ানের দেশ আবিষ্কার করে, যেমন হঠাৎ ওই একই সময়ে এক ইংরেজ সৈনিক অজন্তা গুহার মতো সৌন্দর্যের সোনার খনি আবিষ্কার করে। ওঙ্কার মন্দির যেমন বিশাল তেমনই সুন্দর। পৃথক কোনও দেবদেবীর মূর্তি দেখলাম না। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বড় বড় গাছ কী পরিমাণ শিবমন্দির, বাড়ি ও সৌধচূড়া গ্রাস করেছে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সমস্ত বাড়ি শ্বেত পাথরের ছিল। কিন্তু বিরাট সব গাছ আষ্টেপৃষ্ঠে শেকড় দিয়ে বেঁধে সেসব ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। কোনও অনির্দিষ্টকারণে এই অঞ্চলের লোকেরা দেশ ছেড়ে চলে যায়- কোথায় গেল বা কেন গেল তার হদিশ কেউ জানে না। যখন এটা নতুন করে দৃষ্টিগোচর হল তখন দুর্ভেদ্য জঙ্গল সর্বত্র জাল বিস্তার করেছে।

জঙ্গল এখনও সাফ করা যায়নি, হয়তো কখনও করা যাবে না। মন্দিরের গায়ে সর্বত্র লেখা আছে সূর্যাস্তের পর এদিকে কেউ থাকবে না। আরও লেখা আছে সাবধান, বুনোজন্তু বাঘ, ভালুক আছে, তাই একা চলাফেরা বিপজ্জনক।

ওঙ্কার মন্দির মাদুরা ও ত্রিচিনপল্লির মন্দিরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একই ধরনের গোপুরম এবং গর্ভমন্দির।

কাম্বোজের লোকেরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত বলে মনে হয়। কাম্বোজ দেশটা ছোট। এখানে রাজতন্ত্র এখনও বিদ্যমান, লোকেরা ভাত ও মাছ খায়। এককালে এই দেশে নাগপঞ্চমী পুজো হত।

নমপেনে দুদিন থেকে আমি থাইল্যান্ড রওনা হলাম।

খুব খারাপ রাস্তা এদিকে, দুই দেশের মধ্যে চলাচল নেই। দেড়শো মাইল পার হতে সাত দিন লেগে গেল। পুবদিক থেকে কোনও লোক থাইল্যান্ডে প্রবেশ করেনি বলে সীমান্তরক্ষীরা আমাকে নিয়ে কী করবে ঠিক করতে পারছিল না। আমি কোনও রকমে বোঝালাম যে ব্যাঙ্কক শহরে যেতে চাই। তখন তারা আশ্বস্ত হয়ে ছাড়পত্র দিল। শুল্ক বিভাগের কোনও লোক ছিল না। তারা অনর্থক বড় জ্বালাতন করে। সব জিনিসের কত দাম, কোথায় কিনেছি ইত্যাদি। থাইল্যান্ডে কিছু বেচব কিনা জিজ্ঞেস করবার লোকই ছিল না।

থাইল্যান্ড দেশটা বেশ বড় । পথে যেতে যেতে রাস্তার ধারে কয়েকটি পাথরে খোদাই করা হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখলাম । তাদের মধ্যে সহজেই চেনা যায় গণেশকে ।

থাইল্যান্ডের ভেতরে রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভালো । খুব সাইকেল ব্যবহার হয় ।

থাইরা ভিয়েটদের মতো দক্ষিণ চিনদেশ থেকে উদ্ভূত । কয়েক হাজার বছর আগে তারা দক্ষিণে ইন্দোচিন, থাইল্যান্ড, লাউস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, আরও দক্ষিণে মালয় ও জাভা দেশে যায় । ইতিমধ্যে নানা জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণ হয়েছে । তারা ধান চাষ করতে শিখেছিল- এমনকী পাহাড়ি জায়গায় গিয়ে জলপথ বেঁধে ধানের খেত করে নিত । তারা শুয়োর, মোষ ও মুরগি পালন করতে শিখেছিল । এর ফল হল যুগান্তকারী । যাযাবর জীবন ছেড়ে তারা এক জায়গায় বসবাস করতে আরম্ভ করল এবং এমনিভাবে সূত্রপাত হল অনেক গ্রামের ।

গ্রাম গড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক নিয়মাবলী তাদের সুদৃঢ় করল । দেখা যায় থাইদের মধ্যে চারুকলার চর্চা খুব বেশি । বিত্তবান লোকেরা শিল্পকলার পরিপোষক ছিলেন । রাজা (প্রথম) রাম, যাঁর বংশধর এখানের শাসক, রাজ পরিবারে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী রামায়ণ অবলম্বনে আঠারো শতাব্দীতে রামকীয়া প্রবর্তন করেন এবং তাদের নাচ সেই রচনার অঙ্গ । রাজা রাম ছিলেন বৌদ্ধ, সেজন্য তিনি রামায়ণের দেবদেবীকে বাদ দিয়ে বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের উপযুক্ত করে রামায়ণ রচনা করেন । আজও সর্বত্র সেই নাচ আদৃত ।

ওঙ্কার মন্দিরের গায়ে পাথরে খোদাই করা নৃত্যরত অপ্সরীদের দেখেছি ।

ব্যাঙ্কক মস্ত বড় শহর । এতকাল ঠান্ডা ও শীতের দেশে কাটিয়েছি । ব্যাঙ্ককে এসে মনে পড়ল ভারতবর্ষের গরমের দিনগুলির কথা । দিনেরবেলা রোদের তেজ খুব । রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বলে ঘুম হয় ভালো ।

থাইল্যান্ডের সর্বত্র ভালো ভালো বাড়ি, প্রাসাদ ও মন্দির দেখা যায় । সবচেয়ে বড় মন্দিরের নাম প্রভাত অরুণ । নদীর জলে নৌকোয় বসে সুন্দর দেখায় । আমেরিকান স্কাইস্ক্রেপার জন্মাবার বহু আগে এই আকাশচুম্বী মন্দির তৈরি হয় । শহরে তিনশো মন্দির আছে ।

রাজপ্রাসাদ দেখে এলাম । থাইদের বিশেষ এক ধরনের স্থাপত্য আছে ।

ভারতবর্ষের সঙ্গে থাইল্যান্ডের এককালে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা বোঝা যায় লোকেদের নাম থেকে । বেশিরভাগ নাম সংস্কৃত থেকে নেওয়া ।

ডেনমার্কে থাকতে দেখেছি থাইল্যান্ডের লোকেরা ওই দেশটাকে খুব আপনার মনে করে । থাইদের নৌবহর ডেনমার্কে তৈরি হয় এবং দলে দলে থাইরা নানা বিষয় শিক্ষানবিশি করতে যায় ডেনমার্কে । এমনিভাবে দুদেশের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ।

যেমন আমাদের ও ইংল্যান্ডের মধ্যে গত দুই শতকে এক রকম যোগ ঘটেছে, শিক্ষা-দীক্ষার ভেতর দিয়ে। তবে আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যেমন শোষক ও শোষিতদের সম্পর্ক ছিল, ডেনমার্ক ও থাইল্যান্ডের মধ্যে তেমন নয়। দুই দেশের সব বিষয়ে সমান অধিকার।

এক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হল। এদের নাম নন্দী। দুই পুরুষ ব্যাঙ্ককে আছেন। তাঁদের ওখানে পেট ভরে যেমন খেলাম দেশি খাবার তেমনই বাংলা কথা বলে আনন্দ পেলাম।

থাইরা ভাত শাক সব্জি মাছ খায়। চিন দেশ ছাড়বার পর যেকটি দেশ দেখলাম সব জায়গার বাসিন্দারা ভাত খায়। থাইদের ওপর অনেক অংশে চৈনিক ছাপ পড়েছে। উত্তরে বিরাট চিন দেশকে সবাই ভয়ের চোখে দেখে। থাইরা চিনাদের থেকে ভিন্ন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। অনেকরকম ফল যেমন আম, কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, কলা থাইল্যান্ডে পাওয়া যায়।

থাই জাতের লোকেরা, বিশেষ করে মেয়েরা খুব বেঁটে। আধুনিকা হবার ইচ্ছায় তারা হাইহিল জুতো ও ফ্রক পরে ঘুরে বেড়ায়।

থাইরা আসলে শান্তিকামী যদিও সৈন্যাধ্যক্ষের নাম বিপুল সংগ্রাম।

দুই শতাব্দীতে থাইদের কয়েকটি দল মিলে নান চাও রাজ্য স্থাপন করেছিল দক্ষিণ চিন দেশে। তারা রাজ্য বিস্তার করতে করতে ইন্দোচিন লাউস কাম্বোডিয়া পর্যন্ত দখল করেছিল। ভিয়েতরাও দক্ষিণ চিন থেকে এসে ইন্দোচিন, লাউস কাম্বোডিয়াতে বসবাস করতে লাগল। তখন থাইরা আরও পশ্চিমে সরে গিয়ে শ্যামদেশ গড়ে তুলল। থাই মানে স্বাধীন। শ্যামদেশের বা থাইল্যান্ডের লোকেরা কখনও বিজিত হয়নি।

এই সময়ের পর থেকে ভারতীয় নৌবহর বে অব বেঙ্গল পার হয়ে বর্মা ও মালয় দেশে উপস্থিত হল।

তারপর সিঙ্গাপুর ঘুরে সুমাত্রা, জাভা ও বালি দ্বীপে যায়। একদল ভারতীয় উত্তরে দেশ জয় করতে করতে মালয়, কাম্বোজ, লাউস, ভিয়েতনাম এখন যেখানে অবস্থিত এই সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক স্থানীয় শাসক ও দলপতির কন্যাকে বিবাহ করে এবং তাদের মাধ্যমে ধর্ম ও দেশাচার প্রচার করে।

পরিব্রাজক মার্কো পোলো তের শতাব্দীতে সুমাত্রায় উপস্থিত হয়ে বিজয় রাজ্যের ঐশ্বর্য দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনি তবু জানতেন না যে বিজয় রাজ্য তখন বিনষ্টের পথে। ছোট ছোট খণ্ড রাজ্য গড়ে উঠেছিল সারা দেশে।

থাইল্যান্ডে পাশ্চাত্যদেশের আধুনিক হাওয়া জোরে বইলেও থাইরা মনেপ্রাণে স্বদেশপ্রেমিক। বৌদ্ধধর্ম থাইদের সদাসর্বদা নিত্য-অনিত্যের মূল্যের প্রভেদ স্মরণ করিয়ে

দেয় ।

এক ছাত্র সম্মেলনে আমি অতিথি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম । সেখানে এক বৌদ্ধ ভারতীয় ভিক্ষুকের সঙ্গে আলাপ হল । তাঁর নাম স্বামী সত্যানন্দ ।

পরদিন স্বামী সত্যানন্দর বাড়ি গেলাম । বাড়ি মানে একটা বড় ঘর । আসবাবপত্র কিছু নেই । ঘরের একপাশে একটা কঠিন কম্বলের বিছানা । এক জায়গায় জলের কলসি বিড়ের ওপর বসানো । আমি যাবার পর একটি দশ বারো বছরের মেয়ে দুটো গ্লাস ও এক কেটলি চা নিয়ে উপস্থিত হল ।

ব্যাঙ্ককের ভারতীয়রা মনে করেন স্বামী সত্যানন্দ এক অদ্ভুত জ্ঞানী লোক, লেখাপড়া নিয়েই থাকেন । তিনি থাই ভাষায় বিশেষভাবে পাণ্ডিত্য লাভ করেছেন । বেদ পুরাণ উপনিষদ থাইভাষায় তর্জমা করেছেন এবং তার জন্য সম্মানিতও হয়েছেন । বয়স ৪৫-৪৬ হবে ।

শুনেছি প্রথম যৌবনে তিনি কলকাতায় বিপ্লববাদী ছিলেন । পুলিশ যখন নিপীড়ন আরম্ভ করল, তখন সত্যানন্দ রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নেন । কবিগুরু গভর্নমেন্ট অনুমতি নিয়ে দেশপ্রেমিককে থাইল্যান্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন ।

থাইল্যান্ড ছেড়ে দক্ষিণে মালয় দেশের দিকে রওনা হলাম । মালয় দেশের উত্তরাংশের অনেকখানি থাইল্যান্ডের অধীন । যত দক্ষিণে চলেছি ততই মনে হয়েছে দেশটা যেন ভূস্বর্গ । চারদিকে সবুজের সমারোহ । সারি সারি ধানখেতের শ্যামশ্রী সুদূর প্রসারিত । দিনের মধ্যে প্রায়ই এক পশলা বা তার চেয়ে বেশি বৃষ্টি সমস্ত দেশটাকে ধুয়ে মুছে দেয় । প্রখর রৌদ্রের তাপ ও বৃষ্টি মিলে এই অঞ্চলটা সব সময় সজীব করে রাখে ।

চারদিন কাঁচা রাস্তার ওপর দিয়ে চলে থাইল্যান্ডের দক্ষিণ সীমান্তে পৌঁছলাম ।

মালয় দেশ ইংরেজের অধীন । লোকেরা বেশিরভাগ মুসলমান কিন্তু উগ্র মুসলমান নয় । মালয় ছাড়া চিনা ও ভারতীয়রা প্রায় সমান সংখ্যায় এই দেশে বাস করে । এই তিন জাতির সমষ্টি নিয়ে আধুনিক মালয় ।

অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য আছে একেক সুলতানের অধীনে । পাম তেল, টিন, রবার ও কোপ্রা (নারকোলের ছোবড়া) প্রচুর রপ্তানি হয় । চাল জন্মায় নিয়মিত । ভারতবর্ষের মতো আকাশের মুখাপেক্ষী হতে হয় না, ধান লাগাবার জন্য বৃষ্টি নিয়মিতভাবে রোজই হয় ।

লোকেদের আর্থিক অবস্থা ভারতবাসীদের চেয়ে উন্নত মনে হল ।

মালয়ে এসে পর্যন্ত আমার খুব অসুবিধা হচ্ছিল, খাবারে ভীষণ লঙ্কার ঝাল। ডেনমার্কে থাকতে গ্যাস্ট্রিক আলসারের ব্যথা টের পেয়েছিলাম। অনেককাল পরে মনে পড়ল যে জীবন্ত বাড়িতে ফিরতে হলে খাওয়াদাওয়া খুব সাবধানে করতে হবে। ভাত, মাছসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ ও দই আমার নিত্যনৈমিত্তিক খাবার হয়ে দাঁড়াল।

মালয় দেশে রাস্তা অপেক্ষাকৃত ভালো, মোটামুটি পাকা। রবারের বড় বড় গাছ মাথা উঁচু করে পথের দুধারে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়ই ময়াল সাপ ও অন্যান্য সাপ ও জন্তু দেখেছি। দুইদিন পর পেনাং বন্দরে পৌঁছলাম। পেনাং বড় শহর। অফুরন্ত কাঁচামাল রপ্তানি হয় এখান থেকে। অনেক ঘর বাঙালি থাকেন এই শহরে। আমার সঙ্গে কারও দেখা হয়নি। বেশিরভাগ লোক রবারের কারবারে প্রচুর পয়সা করেছেন। বাঙালি উকিল ও ব্যারিস্টারের সুনাম আছে। মালয় দেশে কোনও শিল্পের অস্তিত্ব আছে কিনা জানতে পারিনি।

পেনাং শহরে দ্রষ্টব্য হচ্ছে নাগমন্দির। একটা পাহাড়ের ওপর ওই মন্দির। সাপ যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক বিষধর সাপও দেখলাম। তারা আপনমনে থাকে, মানুষ দেখলেই তেড়ে কামড়াতে আসে না। কারও সঙ্গে কারও বিরোধ নেই।

পেনাং ছেড়ে কুয়ালালামপুর শহরের দিকে রওনা হলাম।

সুলতানদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান তিনি কুয়ালালামপুর শহরে থাকেন। কুয়ালালামপুর শহরের বিশেষত্ব আছে। একদিকে জঙ্গল, অন্যদিকে গম্বুজওয়ালা বাড়ি ও আধুনিক বড় শহর। অনেক ইংরেজকে পথে দেখলাম। ভারতবর্ষে পরিচিত নামের অনেক বিলাতি কোম্পানির অফিসও রয়েছে। বিলাতি মালপত্র কাপড়-চোপড়ে সব দোকান ভর্তি।

এই অঞ্চলের নাম বাহারু। খুব সুন্দর দেশ কিন্তু এত গরম যে ঘেমে নেয়ে যেতাম। কাঠের বাড়িতে বড় বড় ঘর ও বারান্দা চিক দিয়ে সাজানো। জোহোর বাহারুর ভেতর দিয়ে তিনদিন পরে সিঙ্গাপুরে পৌঁছলাম। সিঙ্গাপুর মস্ত শহর, একটা দ্বীপের ওপর, তায় আবার বিরাট বন্দরও। সিঙ্গাপুর ইংরেজের খাস দখলের জায়গা। তার সবচেয়ে বড় এক নৌবাহিনীর ঘাঁটি এখানে। ঐশ্বর্যশালী ইংরেজ সমস্ত ধনরত্ন দিয়ে যুদ্ধ-জাহাজ তৈরি করেছে। এই কারণে ইংরেজের নৌবাহিনী পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ব্রিটিশ সেলাস ক্লাবে আমি নিমন্ত্রিত হয়ে উঠলাম। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশটা কিন্তু কী ভীষণ গরম। রাস্তায় যেখানে সেখানে ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ দেখলাম। মনে হচ্ছে মাদ্রাজ কিংবা কলকাতায় এসেছি। হাজার হাজার ভারতীয় মালয় দেশে এসেছিল রবারের আবাদে কাজ করবার জন্য। অনেকে টিনের খনিতেও কাজ করে। তারপর কয়েক যুগ কেটে গেছে। শ্রমিক সম্প্রদায় অনেক বড় হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা এই দেশেই

মানুষ হচ্ছে । এখন ভারতীয়রা তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি মালয় দেশে । চিনারা প্রথম, তারপর মালয়ী ।

অন্ধ্র দেশের চেট্টিয়াররা মালয় দেশে ও শ্যামদেশে গরিব চাষীদের বীজ কিনতে টাকা ধার দেয় উচ্চ হারে । ফসলের একাদশ ভাগ দিয়ে তা শোধ হয়, তেজারতি কারবার যাকে বলে । অন্য অনেক ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালি রবার ব্যবসায়ে লাভবান হয়েছেন । কিছু লোক ওকালতি ও ব্যারিস্টারি করেন । দশদিন পরে এখানে আমার ফটোগ্রাফের প্রদর্শনী হবে । ছবিগুলি হংকং থেকে জাহাজে এসেছে ট্মাস কুকের অফিসে । আমি প্রথমেই গেলাম তাদের সন্ধানে । মিঃ হ্যারিসন হচ্ছেন পি এন্ড ওর ম্যানেজার । শনিবার একটার পর তিনি একটা ক্লাবে সাঁতার কাটতে যান । ক্লাবটি শহরের বাইরে । আমি গেলাম ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে ছবিগুলির খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ।

অনেক কাল পরে সাদা কালোর পার্থক্য টের পেলাম । বহু বছর অন্য দেশের লোকেদের কাছে এত ভালো ব্যবহার পেয়েছি যে সব সময় মনে হত আমি যেন তাদেরই একজন । ব্যতিক্রম ঘটল সিঙ্গাপুরে । ক্লাবের গেটে নেপালি দরোয়ান আমার পথ আটকে দাঁড়াল এবং আমাকে জানাল যে ভেতরে আমার প্রবেশ বারণ । হিন্দিতে বলল যে সেটা সাহেবদের অর্থাৎ সাদা চামড়ার লোকেদের জন্য ।

গেট থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দিল । কিন্তু আমি এত অপমানিত বোধ করেছি যে কথা না বলে চলে এলাম ।

সোমবার হ্যারিসনের সাহায্য না নিয়ে সব ছবি উদ্ধার করলাম এবং প্রদর্শনীর কাজে লেগে গেলাম, একটি গুজরাটি ফটোগ্রাফার যুবক আমাকে সাহায্য করল, ভালো আলোর ব্যবস্থাও করল । তার নাম প্যাটেল । সে কাগজে প্রদর্শনীর কথা জানাল । আনন্দের কথা যে প্রদর্শনীর প্রচার যথেষ্ট হল কিন্তু এক পয়সা সেজন্য আমাকে দিতে হয়নি ।

যথাসময়ে প্রদর্শনীতে লোকের সমাগম হল । ইউরোপিয়ানরা বা ইংরেজরা বোধহয় সবাই এসেছিল । প্যাটেল আমার কাছে শুনেছিল হ্যারিসনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা । প্যাটেল সবাইকে চিনত । সে হঠাৎ হ্যারিসনকে সঙ্গে নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হল । আমি কী আর করি ‘হাউ ডু ইউ ডু’ করা ছাড়া । খুব খুশি হয়ে সে প্রদর্শনীর ছবি দেখেছে বলে আমাকে জানাল । ব্রিটিশ সেলার্স ক্লাবে আমি আছি জেনে সে একটু আশ্চর্য হল । আমাকে ডিনারে নেমন্তন্নও করল । আমিও জিদ ধরলাম, যাব না । ব্যস্ত আছি, একদিনও সময় হবে না ইত্যাদি বলে কাটিয়ে দিলাম । হ্যারিসন হয়তো ভাবল আমি কীরকম দুর্বিনীত লোক । নিমন্ত্রণ নিতে আমি অনিচ্ছুক সে কথা স্পষ্ট বুঝতে পারল ।

সিঙ্গাপুরে আসার পর থেকে খুব ইচ্ছা করছিল একটা জাহাজ নিয়ে কলকাতায় বা কলম্বোতে যেতে । দীর্ঘ এগারো বছর বিদেশে, বিদেশে কাটিয়েছি । এবার বাড়িমুখো হব । ঘরের স্মৃতি, মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধুদের কথা ভেবে সারাদিন মশগুল হয়ে কাটালাম । দুঃখও হল মনে করে যে আমি আগের চেয়ে অনেক বুড়ো হয়েছি । সাইকেল প্রতিযোগিতায় আর নামতে পারব না, পিঠের ওপর ও সাইকেলে ভারি মাল বয়ে বয়ে আমি নিজেই ভারি হয়ে গিয়েছি । প্রতিযোগিতায় সূক্ষ্ম তৎপরতা আমার আর নেই ।

প্রদর্শনী শেষ হবার পর ছবি জাহাজে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম । কলকাতায় আমার ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ।

সিঙ্গাপুরে থেকে জাহাজ নিয়ে সুমাত্রায় গেলাম । মালাক্কা সে কালের বিখ্যাত পুরনো বন্দর । হিন্দু রাজারা এক কালে এই দেশে রাজত্ব করেছে । হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আজও যেখানে সেখানে দেখা যায় ।

সুমাত্রায় এসে বুঝলাম যে সাইকেলে পরিভ্রমণ করবার দেশ নয় । ভীষণ জঙ্গল এবং রাস্তার একান্ত অভাব, সব রকম বন্যজন্তু, যেমন বাঘ ভালুক হাতি ইত্যাদি যথেষ্ট । সুন্দর সুন্দর পাখিও দেখলাম ।

সাতদিন ঘোরাঘুরির পর একটা জাহাজ ধরলাম । জাভার রাজধানী বাটেভিয়া যাবার জন্য । আজকের নাম জাকার্তা । জাভার নামও বদলে ইন্দোনেশিয়া হয়ে গিয়েছে ।

পৃথিবীতে যত সুন্দর দেশ আছে জাভা তাদের মধ্যে অন্যতম । আগেকার দিনে লোকে জাভা যেত সুগন্ধী মশলা জোগাড় করবার জন্য । সেই মশলা সুদূর দেশে, ইউরোপেও স্থলপথে যেত । মিশরি, গ্রিকরা, রোমানরা ব্যবহার করত এই মশলা । আজও যেমন গৃহকর্ত্রীরা করে থাকেন । ভারতবর্ষে চিরদিনই জাভা সুমাত্রা থেকে মশলা আমদানি করা হয় ।

জাভাতে জন্মায় না এমন জিনিস খুব কম । পাট থেকে চা পর্যন্ত যথেষ্ট হয় । জাভার জমি খুবই উর্বর- অনেক আগ্নেয়গিরি থাকার জন্য । চাল উৎপন্ন হয় যথেষ্ট পরিমাণ । জাভাবাসীরা ভাত খায় এবং তার সঙ্গে মাছ ও শাক দিয়ে উদর পূর্তি করে । লোকেরা পরিশ্রমী । যে দিকে চাই, যেখানে যাই, সব জায়গায় লোকে লোকারণ্য, একটা ছোট দ্বীপের পক্ষে জনসংখ্যা খুব বেশি মনে হয় ।

গ্রামের লোকেরা দলে দলে শহরের দিকে ছুটছে চাকরির সন্ধানে । কুলির কাজ করে, কারখানায় চাকরি করে । সাইকেল-রিকশা, পেডিক্যাব চালানো সোজা । পেডিক্যাব নিয়ে সারাদিন যাত্রীর পিছনে ছোটে ।

আমাদের দেশে হাত-রিকশাওয়ালাদের মতো একই অবস্থা, সারাদিন পরিশ্রম করে দু-চার টাকা রোজগার হয় । রাস্তার ধারে কোনও দোকানে খায় এবং ফুটপাথের ওপর রাত কাটায় ।

জাভা ডাচ কর্তৃত্বাধীনে । ডাচরা চিনির কারখানা বসিয়েছে । তাঁতশিল্প জোর চলে । পাহাড়ি জায়গায় চা জন্মায় এবং বিদেশে রপ্তানি হয় । জাভার কফি বিখ্যাত ।

সন্ধ্যাবেলায় একটা কনসার্ট শুনতে গেলাম । বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দেখলাম অনেক গং বা কাঁসর বাজিয়ে একসঙ্গে সুন্দর সুরসৃষ্টি করছিল । মোটা চাদরের কাঁসরের গুরুগম্ভীর শব্দ রণিয়ে রণিয়ে বাজে, শোনবার মতো ।

পরদিন সন্ধ্যায় রামায়ণ থেকে জটায়ু বধের পালা দেখতে গেলাম ।

নয় শতাব্দীর পর আটশো বছর জাভা দ্বীপে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে । তারপর বাংলাদেশ ও গুজরাট থেকে এল ইসলামের প্রবল বন্যা, সমস্ত দেশবাসী মুসলমান হল কিন্তু অন্য ধর্মকে পরিত্যাগ করল না । তাই আজও রামায়ণ মহাভারত জাভাবাসীদের অশেষ আনন্দ দেয় । জাভার লোকেরা মুসলমান বটে কিন্তু আরব দেশের কুলীনদের কাছে তারা কলকে পাবে না ।

মালয় দেশ থেকে জাভা দ্বীপে লোকেরা গিয়েছিল । কিছু সংখ্যক চিনা এই দেশে বসবাস আরম্ভ করেছে । তাদের সঙ্গে সংমিশ্রণও হয়েছে । যখনই চিন মহাদেশে যুদ্ধ অরাজকতা বা নিপীড়ন হয়েছে, দলে দলে লোকে দক্ষিণে ইন্দোচিন, মালয়, সিঙ্গাপুর ও সুমাত্রা এবং জাভা দ্বীপের দিকে ছুটেছে ।

ডাচরা কঠিন হস্তে জাভায় রাজত্ব চালায় । মুক্তিকামী যুবকরা দক্ষিণ-মধ্য জাভায় আন্দোলন চালাচ্ছে স্বাধীনতার জন্য । দরকার হলে ধরা পড়া এড়ায় পুবদিকের পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ।

বাটেভিয়া শহরে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় জাহাজ দেখে মনে হল, এই দ্বীপের লোকেরা অবস্থাপন্ন । আসলে সেসব ডাচ ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি । সাধারণ লোকেরা পাতার ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরে বাস করে । বেশিরভাগ বাড়ির মেঝে মাটি লেপা ।

জাভার বাটিক শিল্প জগদ্বিখ্যাত । কত অদ্ভুত চিত্র বিচিত্র এঁকে তবে বাটিক তৈরি হয় । রং খুব পাকা এবং অনেক লোক এই শিল্প আয়ত্ত করেছে । রবীন্দ্রনাথ জাভায় বাটিক তৈরি দেখে খুব উৎসাহ করে সেটি শান্তিনিকেতনে প্রবর্তন করেন । এখন ভারতবর্ষের সর্বত্র বাটিক চর্চা করা হয় । জাভায় বাটিকের লুঙ্গি স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে, যদিও যুবকদের মধ্যে পাৎলুন ব্যবহার করবার চেষ্টা চলছে ।

সাতদিন বাটেভিয়ায় কাটল । প্রায় রোজই বৃষ্টি হয় । বিষুবরেখার কাছে বলে দেশটা খুব গরম । বৃষ্টির পর মনে হয় চারদিকে বাষ্প বেরোচ্ছে । এই কারণে জাভায় গাছপালা, বড় বড় জঙ্গল দেখা যায় । চারদিকে অপূর্ব শ্যাম সমারোহ ।

বেশ কয়েকটি ভারতীয় পরিবার বাটেভিয়াতে বসবাস করে । তারা এক সন্ধ্যায় আমাকে ডাকল ভ্রমণকাহিনী শোনাবার জন্য । তারপর খুব উৎসাহ করে আমাকে ভারতীয় খানা খেতে আমন্ত্রণ জানাল । দুঃখের বিষয় খাবারে এত বেশি পরিমাণ লঙ্কা ব্যবহার করতে এ দেশের লোক অভ্যস্ত যে আমার খুবই কষ্ট হল । অনেক কষ্টে গ্যাস্ট্রিক আলসার সারিয়েছি । মনে হচ্ছে সেটা আবার ফিরে আসবে যদি এখনই সাবধান না হই ।

বাটেভিয়া ছেড়ে রওনা হলাম বসরের দিকে । রাস্তা মোটামুটি মন্দ নয় । একরাত্রি বসরে থেকে দক্ষিণে বানডুঙের দিকে যাত্রা শুরু করলাম । তিন দিন পর বানডুঙ পৌঁছলাম । এই শহরটি মধ্য জাভার পুরনো রাজধানী । এখনও প্রাসাদ, দুর্গ ও মন্দির দেখা যায় ।

আমার গন্তব্যস্থান আরও উত্তর-পূর্বে প্রম্বানন ও পরে বরোবুদুর অভিমুখে । বানডুঙ ছাড়বার পর রাস্তা ক্রমশই খারাপ হতে লাগল । অতিকষ্টে সাইকেল চালাচ্ছি, খোঁচা খোঁচা পাথরের মধ্যে টায়ার বারবার জখম হল । আমি সারিয়ে দুয়েক মাইল যাবার পর আবার সারাতে বসতাম । টায়ারের কোনও অপরাধ নেই । আমার ঘাড়ের ওপর প্রকাণ্ড বোঝা, তার ওপর সাইকেলে বিরাট বোঝা নিয়ে খারাপ রাস্তায় পাথর এড়াতে না পারার জন্য বারবার এই দুর্দশা ।

প্রম্বানন মন্দিরের জন্য বিখ্যাত । মন্দিরটি বেশ উঁচু । দেখলেই বোঝা যায় হিন্দুদের তৈরি মন্দির । ১৫৪ ফুট উঁচু । হিন্দুরা ১,২০০ বছর জাভাতে রাজত্ব করে । মন্দির তৈরি হয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি । এই মন্দির ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা শিবের নামে উৎসর্গীকৃত । আমি দক্ষিণ ভারতে বেলুড়ে ও হ্যালেবিদে যেমন মন্দির দেখেছি ঠিক সেই রকম পাথরের তৈরি ।

আরও পঞ্চাশ মাইল দূরে বৌদ্ধ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারুকীর্তি বরোবুদুর । মাঝখানের বৌদ্ধবিহারটি ১০৩ ফুট, চারপাশে অসংখ্য স্তূপ দিয়ে ঘেরা । ক্রমশই মাঝের দিকে পিরামিডের মতো উঠে গেছে । লোকেরা বলে সবচেয়ে উঁচু বিহারে বুদ্ধমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যদি মূর্তিকে ছোঁয়া যায় তা হলে সৌভাগ্য আসে ।

বরোবুদুর তৈরি হয়েছিল বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি এবং তিরোধানকে কেন্দ্র করে । পৃথিবীসুদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্মনেতাগণ মনে করেন যে বরোবুদুরে একবার যাওয়ার ফলে অনেক

পুণ্য সঞ্চয় হয় । তারা দলে দলে সারা বছর এই পুণ্যতীর্থে যান । কাছেই যোগজাকর্তা শহরটি । বরোবুদুরের সঙ্গে প্রায় সমান বয়স । বরোবুদুর নির্মিত হয় নবম শতাব্দীতে ।

এই অঞ্চলে রবারের চাষ হয় খুব । বড় বড় রবার গাছের জঙ্গল । তাছাড়া পাহাড় রাস্তা আট দশ হাজার ফুট উঠেছে নেমেছে । আমার মুশকিল হল এই কথা ভেবে যে কেমন করে দুরূহ পথের শেষে পৌঁছব । যোগজাকর্তা ছেড়ে সমুদ্রের দিকে চললাম । একটা ছোট বন্দরে পৌঁছলাম, সেখান থেকে অনেক মাছ ধরার বড় নৌকো বালি দ্বীপের কাছে যায় মাছ ধরতে । আমি একটায় উঠে পড়লাম । দুদিন তিন রাত পার হবার পর সেলাট বালি অর্থাৎ দুটি দ্বীপের মাঝখানে যে জলপথ আছে সেখানে পৌঁছলাম ।

সকালবেলায় বালিদ্বীপে নামলাম । লোকেরা দেখলাম খুব অতিথিপরায়ণ । একটা চালা ঘরওয়ালা বাড়িতে উঠলাম । বাড়ির মালিক পর্যটকদের নিয়ে দ্বীপময় ঘুরে বেড়ান । ডাচ ভাষা ছাড়া একটু আধটু ইংরিজি ও ফরাসি বলতে পারেন । প্রথম জীবনে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন । এমন লোকের দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা । নামও ভাগ্যবান । জাতিতে হিন্দু । জাভার অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে বালি কেমন করে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় । সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীরা মুসলমান কিন্তু বালিদ্বীপের বাসিন্দারা হিন্দু । এখনও এখানে দেবদেবীর পূজা, স্ত্রীআচার ইত্যাদি পুরোদমে চলে । আজও দলে দলে পূজারিণী মেয়েরা থালায় ফল ফুল খাবার সাজিয়ে দেবতাকে দেখায় এবং তারপর খাবার বাড়ি নিয়ে যায় খাবার জন্য ।

পরদিন ভাগ্যবান আমাকে একটি শিবমন্দিরে নিয়ে গেল । মেয়েরা দুদল মিলে সার করে, হাতে পূজার থালা নিয়ে চলেছে, চলার মধ্যে যেন ছন্দ বাজছে । এমন সুন্দর নিয়মবদ্ধভাবে সবাই চলেছে দেখলে চোখ জুড়োয় । আমাদের দেশের মন্দিরের কথা মনে পড়ল । সবাই ঠেলাঠেলি, মারামারি করে আগে যাবার জন্য । তার ব্যতিক্রম দেখে খুব ভালো লাগল ।

বালিদ্বীপের আরেকটি বিশেষত্ব আছে । মেয়েরা যুবতী বা বৃদ্ধা কেউই উত্তমাঙ্গে কোনও আবরণ রাখে না । তারা নিঃসঙ্কোচে নিরাবরণ দেহে সব কাজ করে বেড়ায় । ভারতবর্ষের কত ছবি কিংবা ভাস্কর্য দেখেছি পুরনো কালের রাম সীতা অথবা শকুন্তলা- সেখানে অনাবৃতা মেয়ে দেখেছি । তবে সেটা কাল্পনিক, এটা বাস্তব । প্যাসিফিকের অন্যান্য দ্বীপেও মেয়েরা ওপরের দিকে কিছু পরে না ।

একটা জংলী জায়গায় দেখলাম পাথরে খোদাই করা সারবন্দী গণেশের মূর্তি । মেয়েরা তাদের ফুল দিয়ে পুজো করে । বেশিরভাগই শিবমন্দির । মাঝে মাঝে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মন্দির আছে ।

ভাগ্যবানের সঙ্গে একটা বাজার দেখতে গেলাম। চাল, ডাল, লঙ্কা ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। পেঁপে পাকা তো খায়ই, কাঁচাও রান্না করে খায়। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা কর্মঠ। তারা নানা রঙের সারং পরে। তাদের রং বেশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং সুন্দর স্ত্রীসুলভ শ্রীসম্পন্ন চেহারা।

তিনদিন বালিদ্বীপে থাকার পর একটা ছোট স্টিমার ধরলাম সুরাবায়া বন্দর যাবার জন্য। ভাগ্যবানই সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। সে যখন শুনেছিল যে আমি একজন হিন্দু, তারপর থেকে আমার প্রতি তার ব্যবহার খুব শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে গেল। তার স্ত্রীর কাছে আমার যা পরিচয় দিল তা শোনবার মতো। আমি যেন দেবাদিদেব ইন্দ্রের রাজসভার একজন অনুচর, কোথায় বসতে দেবে, কী খেতে দেবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। দুজনের খুব ইচ্ছা পুরীর মন্দির দেখতে ভারতবর্ষে আসার। গৃহিণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের কপালে কি আর তা হবে!

বলা বাহুল্য ভাগ্যবান আমার কাছে একটা পয়সা নেয়নি।

জাভার পুবদিকে সব চেয়ে বড় বন্দর হল সুরাবায়া।

স্টিমার ছেড়ে এখানে একটি জাহাজ ধরলাম সিঙ্গাপুরের জন্য। ওরিয়েন্ট লাইনের জাহাজে একটা বার্থ পেলাম। বেশিরভাগ যাত্রী অস্ট্রেলিয়াবাসী, কাজকর্ম বা চাকরি করে তারা পয়সা করেছে এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে যাচ্ছে ইংল্যান্ডে। মনে হল যাত্রীরা লেখাপড়ার বিশেষ ধার পাশ দিয়ে যায়নি। লোকেরা ভালো এবং আমাকে সাইকেল নিয়ে জাহাজে উঠতে দেখে, সবার খুব উৎসাহ দেখলাম আমাকে জানবার ও চেনবার। তাদের সবার মুখে এক কথা, পৃথিবী ভ্রমণ থেকে আমি কেন অস্ট্রেলিয়া বাদ দিলাম। সেই দেশ খুব সুন্দর এবং সেখানে টাকা রোজগার করা যায় সহজে। আমার উত্তর ছিল একটি। অন্যান্য দেশে যা দেখেছি অস্ট্রেলিয়া সেই পশ্চিমি ছাঁচেই তৈরি। নতুন কিছু দেখবার নেই, জানবার নেই বা শেখবার নেই।

তখনকার দিনে অস্ট্রেলিয়াতে আমার যে প্রবেশ নিষেধ, সে কথা আর উল্লেখ করিনি। কালা আদমিকে অস্ট্রেলিয়াতে বসবাস বা চাকরি করতে দেওয়া হয় না। একদিন এই মনোভাবের যখন পরিবর্তন হবে তখন হয়তো অস্ট্রেলিয়ায়, বিশেষ করে নিউজিল্যান্ডে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা রইল।

আমার ভাই, নির্মল মুখার্জি বিখ্যাত হকি খেলোয়াড়, ধ্যানচাঁদের দলের সঙ্গে প্রথম ভারতীয় দলে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল। তার চিঠিতে পড়েছি যে দুই দেশের লোকেরা বিপুল সংবর্ধনা জানায় ভারতীয় দলকে। ভারতবর্ষ তখন হকি খেলার জগতে রাজা, সর্বত্র তার জয়।

২০

চারদিন পর কলম্বো পৌঁছলাম। আমি ভারতবাসী বলে পুলিশ প্রথমেই আমার কাছ থেকে বন্দুক ও রিভলবার একরকম কেড়ে নিয়ে বলল যে সে সব জমা থাকবে এবং পরে কলকাতায় পুলিশের কাছে পাঠানো হবে। এটা সবৈব মিথ্যা। আমি অনেক তদ্বির করেও বন্দুক ও রিভলবার ফেরৎ পাইনি। তারিখটা ২৩ মার্চ ১৯৩৭ সাল। কলম্বোতে রীতিমতো গরম। বেশ কষ্ট হচ্ছিল। সিংহলের দক্ষিণে কালুতারা গ্রাম আছে। এক সিংহলি লেখক বন্ধু ও তার ইংরেজ স্ত্রী আমাকে বহু বছর আগে নিমন্ত্রণ করেছিল তাদের কাছে থাকবার জন্য, যদি কখনও সিংহলে যাই। বন্ধুর নাম ডি সিলভা।

বন্ধুর বাড়িতে তালাচাবি দেওয়া, কলম্বোতে চাকরি করে। জায়গাটা মনে হয় নারকোল গাছের দেশ। এত সুন্দর যে চোখ জুড়ায়। সেখান থেকে কলম্বোতে ফিরে গেলাম। একদিন বিশ্রাম করে কান্ডিতে বৌদ্ধ মন্দির দেখতে গেলাম। কথিত আছে, এই মন্দিরে তথাগত বুদ্ধের একটি দাঁত সযত্নে রাখা আছে। বৌদ্ধরা দলে দলে কান্ডির মন্দিরে যায় এবং ভক্তি সহকারে প্রণাম জানায়।

কান্ডি পাহাড়ের দেশ। চা-বাগান পথে দেখলাম। অনুরাধাপুরে জগৎপ্রসিদ্ধ স্তূপ দেখতে যাবার ইচ্ছায় উত্তর দিকে রওনা হলাম।

অনুরাধাপুর পুরনো দিনের রাজধানী। বৌদ্ধবিহার ও পৃথিবীর বৃহত্তম স্তূপ দেখে আমি মুগ্ধ। সিংহল দ্বীপ সত্যিই সুন্দর। এমন গাছের শোভা কমই দেখা যায়।

উত্তর দিকে সাইকেল চালাতে চালাতে তিনদিন পরে তালাইমানদের পর পাক পয়ঃপ্রণালী আর তার ওপারেই দেশ ভারতবর্ষ। দেশে পৌঁছে যাব সুস্থ দেহে ভেবেও আনন্দ হচ্ছিল। এক যুগ পরে দেশে ফিরছি। কত কথা মনে পড়ছে, বিশেষ করে তিন বন্ধুর কথা।

জাহাজ নিয়ে ওপারে ধনুষ্কোটি যাচ্ছি। কিন্তু রওনা হবার আগে যথেষ্ট নাস্তানাবুদ হলাম। সব লোককে ছেড়ে পুলিশ আমাকে নিয়ে পড়ল। প্রথম প্রশ্ন, আর ইউ এ বেঙ্গলি? দ্বিতীয় প্রশ্ন, হোয়াই ডিড ইউ ক্যারি এ সার্ভিস পিস্তল? যদিও বন্দুক জমা নিয়েছে বললেই ভালো হয়।

এইসব প্রশ্নের অর্থ হল যে আমি বাঙালি এবং সেজন্য পুলিশ আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে । জাহাজ ছাড়বার নাম নেই । আমার সাইকেল, হ্যাভারস্যাক, ক্যামেরা ফিল্ভম তন্ন তন্ন করে পুলিশ সার্চ করল । কিছুই না পেয়ে আড়াই ঘণ্টা পরে আমাকে ভারতগামী জাহাজে উঠতে দিল, যত দেরি হচ্ছিল ততই আমার কাছে অসহ্য লাগছিল । কেবল দেশে ফেরার আনন্দ আমার উৎসাহ জাগিয়ে রেখেছিল, মনে মনে রাগ হচ্ছিল যদিও ।

ধনুষ্কোটিতে জাহাজ থামবার পরেই ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলাম । কী অদ্ভুত আনন্দ অনুভূতি । ভাবিনি এই দিনটা সত্যিই আমার জীবনে একদিন দেখা দেবে । প্রথমেই হাঁটু গেড়ে বসে ভারতমাতাকে চুমু খেলাম, তার পর গাইলাম ‘সার্থক জনম আমার .....’ ।

পরে রামেশ্বরম মন্দির দেখতে গেলাম । একটা চৌলট্রি অর্থাৎ ছোট ধর্মশালায় উঠলাম । জাহাজে একটি যুবকের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, সে সব বন্দোবস্ত করে দিল ।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের অপূর্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে মণ্ডিত সব মন্দির দেখতে দেখতে উত্তর দিকে চলেছি । মাদুরার মন্দিরের ভেতর পার্বতীর পাথরে খোদাই করা মূর্তি দেখে জীবন্ত মনে হচ্ছিল, এমনই নৈপুণ্যে সেটি তৈরি । ত্রিচিনাপল্লি, মহাবলীপুরম পার হয়ে মাদ্রাজ পৌঁছলাম । সেখানে ওয়াই এম সি এতে উঠলাম । ম্যানেজার, নারায়ণম মাকে কলকাতায় চিনতেন । তিনি এমনই হৈ হল্লা শুরু করে দিলেন যে আমি অপ্রস্তুত । সত্যমূর্তি তখন মাদ্রাজের মেয়র । তিনি খবর পেয়ে সেইদিনই বিকালে ওয়াই এম সি এর হলে এক বিপুল সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করলেন ।

সত্যমূর্তি তখনকার দিনে একজন মস্ত বক্তা ছিলেন । বললেন, আমি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে (বহরমপুর-গঞ্জাম) জন্মেছি, সেজন্য আমার কৃতিত্বে মাদ্রাজবাসীরা গর্বিত । তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন যে আমিই প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক ।

তিনদিন মাদ্রাজে বাস করবার পর আমি যে আমার অগোচরে সাহেবিপনা আয়ত্ত করেছিলাম তা জলাঞ্জলি দিলাম । সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কেবলই নিমন্ত্রণ খাচ্ছি । কয়েক ঘর বাঙালি বাসিন্দার বাড়িতে তো রীতিমতো ভূরিভোজ খেলাম । অনেকদিন মুখরোচক রান্না খাইনি ।

পরদিন আমার ভ্রমণকাহিনী বললাম ।

মাদ্রাজ ছেড়ে উত্তরে রাজামুন্দ্রি শহরের দিকে রওনা হলাম । এখানে একজন ইংরেজের সঙ্গে দেখা করবার কথা । সে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার । মাদ্রাজে সেই খবর পেয়েছিলাম । রাজামুন্দ্রির ব্যাঙ্কে পৌঁছে আমি সোজা এজেন্টের ঘরে গেলাম । আমার ধড়াচূড়া হ্যাভারস্যাক পিঠে দেখে এফ জি হোয়াইট প্রথমটা চমকে উঠেছিল । ভালো করে মুখের দিকে চেয়ে দেখল, আমিও টুপি খুললাম, তারপর সে কী আনন্দ! হোয়াইট আমার

নাম ধরে চিৎকার করে ডাকল এবং চকিতের মধ্যে উধাও হল মিসেস হোয়াইটকে খবরটা দিতে ।

লন্ডনে থাকতে একদিন এপসমে ঘোড়ার ডার্বি রেস দেখতে গিয়েছিলাম । সেখানে হোয়াইটের সঙ্গে দেখা হয়, সেই সময়ই ভবিষ্যতের মিসেস হোয়াইটের সঙ্গেও আলাপ হয় । কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোডে আমি যখন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে কাজ করতাম হোয়াইট তখন ছিল আমার ঊর্ধ্বতন অফিসার । কিন্তু লোকটার মন ছিল উদার । আমাকে কতদিন ট্রেনিং দিয়েছে তার ফোর্ড গাড়ির পিছন পিছন অনুসরণ করতে দিয়ে ।

উইম্বলডনে হোয়াইটের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল এবং আমরা তিনজনে অনেক গল্প ও আনন্দ করেছি তিনদিন ।

তখন বিদায় নেবার দিন হোয়াইট বলেছিল, দেশে ফিরলে তার খোঁজ করতে । তারপর প্রায় একযুগ কেটে গেছে । আমি ঘুরতে ঘুরতে কত দেশ দেখলাম, হোয়াইটরা বিয়ে করে প্রথমে মাদ্রাজে, তারপর বেজওয়াদা এবং শেষকালে রাজামুন্দ্রি ব্রাঞ্চে এজেন্টের কাজে বহাল আছে । ইতিমধ্যে দুটি সন্তান জন্মেছে । তারা বড় হচ্ছে বিলেতে ।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রাজামুন্দ্রি ব্রাঞ্চে সেদিন এক অভাবনীয় ঘটনা সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল । এজেন্ট একজন ভারতীয়ের হাতের ভেতর হাত গলিয়ে তার হ্যাভারস্যাক কাঁধে উঠিয়ে মহা উৎসাহে আগন্তুককে টানতে টানতে দোতলায় নিয়ে গেল । গৃহিণী আমাকে ভোলেননি । হাসি মুখে আদর অভ্যর্থনা জানালেন । তাড়াতাড়ি এক বোতল বিয়ার ফ্রিজিডিয়ার থেকে বের করে তিনটি গ্লাসে ঢাললেন এবং চিয়ার্স বলে আমার দিকে তার গ্লাস তুলে ধরলেন । হোয়াইট এক নিশ্বাসে বিয়ার শেষ করে বলল যে আধঘণ্টা পরে সে ব্যাঙ্কের কাজ গুছিয়ে নিয়ে ফিরবে ।

আমি আরাম করে স্নান করলাম ।

বিকালে হোয়াইট পরিবারের সঙ্গে টেনিস খেলতে গেলাম । ওরা দুজনেই বলতে লাগল যে অন্তত এক সপ্তাহ ওদের কাছে থেকে আমার দেশবিদেশের অভিজ্ঞতা বলতে হবে । আমি অনেক কষ্টে বোঝালাম যে বহুকাল বাড়িছাড়া, এত কাছে এসেছি যে আর দেরি সয় না । অবশেষে ঠিক হল যে তিনদিন থাকব ।

ইংরেজ সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সব রকম ছবি আমার পরিচিত, ভালো মন্দ দুইই দেখেছি । এই কারণে বোধহয় হোয়াইটরা আমাকে তাদের আপনার লোক বলে মনে করেছিল ।

আরও উত্তর-পূর্বে সাইকেল চালাতে আরম্ভ করলাম । বেজওয়াদা পার হয়ে ওয়ালটেয়ারে পৌঁছলাম । ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রের ধারে একটা হোটেলে উঠলাম । আমাদের

দেশের লোকেদের এমনই বদ অভ্যাস যে তীরে বেড়ানো যায় না দুর্গন্ধের চোটে । মেজাজ খারাপ করে বসবার ঘরে গেলাম । দেখা হল পঙ্কজ গুপ্ত ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে । তাঁরা নির্জনে দুজনে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন । এখন পুরীতে ফিরে যেতে চান । সেখানে সমুদ্রের ধারটা ভদ্র ধরনের ।

আমি যখন ১৯২৬ সালে ভ্রমণ শুরু করি তখন বিদায় শুভেচ্ছা যাঁরা জানাতে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে পঙ্কজবাবু অন্যতম । সেজন্য দেখা হওয়াতে খুব আনন্দিত হলাম । সেদিনের স্বল্প পরিচিত পঙ্কজ গুপ্তের আজ ভারতবর্ষ জোড়া সুনাম । আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি সাহসী ও কৃতী লোক ।

সন্ধেবেলায় ডিনার খাবার পর আমাকে নিয়ে পড়লেন, কলকাতায় ফেরার পর একটা মস্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে চান । সেজন্য কবে, কখন কলকাতায় পৌঁছব তার প্রোগ্রাম কষতে শুরু করলেন । একমাত্র অনুরোধ যে বালি, উত্তরপাড়া হয়ে জি টি রোড ধরে কলকাতায় পৌঁছতে হবে, তারপর সব ব্যবস্থা পঙ্কজবাবুর । তাঁর স্ত্রী নেমন্তন্ন করলেন কলকাতায় গুপ্তদের বাড়িতে ডিনার খাবার ।

পথে গঞ্জাম বহরমপুরে পৌঁছলাম । এই শহরে আমার দাদামহাশয়রা ছিলেন খুব প্রতিপত্তিশীল বাঙালি । অর্থাৎ এককথায় বহরমপুরে আমার মামার বাড়ি এবং সেখানেই ১৯০৩ সালে আমার জন্ম । এখানে ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি, বিশেষ করে আমার চেয়ে চোদ্দ দিনের বড়, মামাতো ভাই শোভন চ্যাটার্জিকে ঘিরে । পরে বড় হবার পর আমার সঙ্গী সাথী হয়ে সাইকেলে সে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে পাড়ি দিয়েছে । সেটা ছিল পৃথিবী ভ্রমণের গোড়াপত্তন । ছেলেবেলার সেই আন্তরিক টান আজও অটুট ।

বহরমপুরের নবনির্মিত মেয়েদের কলেজে ডাক এল । নানা বিষয় আলোচনা, প্রশ্নোত্তর হল । মেয়েদের উৎসাহ প্রচুর ।

গরমে বেশ কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু সেদিকে আমার আর তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই ।

রাস্তা মোরামের, বৃষ্টির পর কোথাও জল জমেছে । কটক পৌঁছতে তিনদিন লেগে গেল । কটকে ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি জমে আছে । স্কুলের লম্বা ছুটি এলেই আমার মন উতলা হত কাটজুড়ি নদীর বালির ওপর খেলাধুলোর কথা ভেবে । মামার বাড়ি ছিল ওড়িয়া বাজারের ব্রাহ্ম সমাজের খুব কাছে । বাড়িটা মস্ত বড়, মালিক ছিলেন জানকীনাথ বসু- সুভাষচন্দ্র বসুর পিতা । রাস্তার ওপারে বিখ্যাত প্রফেসর গোপাল গাঙ্গুলির বাড়ি । তাঁর ছেলেরা আমার সমবয়সী ছিল । আমাদের মধ্যে কয়েকঘর বাঙালিদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশ ভাব ছিল । প্রত্যেক দিন বিকালে কাটজুড়ি নদীর বালির ওপর খুব ছোটাছুটি খেলা হত । মাথার চুলে বালি ভরে যেত । তখন কটকে ইলেকট্রিক আলো আসেনি । বড়

বড় কেরোসিন তেলের আলোর নিচে বই নিয়ে পড়তে বসতাম, পড়ার চেয়ে মুখ্য কর্ম তখন ছিল মাথা আঁচড়ে বালি বের করা।

এবার তেলেঙ্গাবাজারের বাসিন্দা শরৎ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠেছিলাম। ইনি আমার মেসোমহাশয়। তাঁর একমাত্র পুত্র, সুধাংশু আমার সমবয়সী ছিল। তার উৎসাহের সীমা ছিল না। একদিন সন্ধ্যায় কটক ক্লাবে ও আরেকদিন দুপুরে ভিক্টোরিয়া স্কুলে আমার অভিজ্ঞতা বলবার আহ্বান পেলাম, র্যাভেনস কলেজও সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

ছেলেবেলার বন্ধু অনেক ছিল। কে যে কোথায় গেছে তার ঠিক নেই। সংসারের নিয়মই এই।

খুব গরমের মধ্যে বৃষ্টি হল খুব। পৃথিবীটা যেন ঠান্ডা হল। বৃষ্টি দেখে ভীষণ ভালো লাগল। ভিজে মাটির গন্ধ মনটাকে খুশিতে ভরল।

কটক ছেড়ে কেওনঝাড়ের দারুণ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছি। রাস্তা বিশেষ ভালো নয়। কিন্তু চারদিকের দৃশ্য খুব মনোরম। বুনো জন্তু অপর্যাপ্ত পাওয়া যায়।

তিনদিন পর বালাসোরে পৌঁছলাম। এখানে অনেক বাঙালির বাস। সবাই মিলে হৈ চৈ করল অনেক। খড়্গপুরে পৌঁছবার আগেই বাঁদিকে রাস্তা ধরলাম জি টি রোড ধরে আসানসোল যাবার জন্য। এই ট্যুরে আমার দুদিন বেশি লাগল। জুন মাস, বৃষ্টি না হলে খুবই গরম। আমার সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। আমার অবস্থা তখন 'এলেম নতুন দেশে'র মতো। সব চমৎকার, সব ভালো লাগছে।

রাজবাঁধে রাত কাটালাম ডাকবাংলোয়। পরদিন ভোরে রওনা হলাম বর্ধমানের দিকে। দিনের শেষে বর্ধমান পৌঁছলাম। একদল মেডিক্যাল ছাত্র আমার অপেক্ষায় বিকাল থেকে কার্জন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা আমাকে ফ্রেশার হাসপাতাল প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল। সেখানে চিফ মেডিক্যাল অফিসার, গণেশ সরকারের সঙ্গে দেখা হল। আমার এক বন্ধুর দাদা বলে তিনি আমারও দাদার মতো। গণেশদা খুব ঘটা করে অভ্যর্থনা জানালেন। আমি ধন্যবাদ জানালাম। তারপর শুরু হল ভূরিভোজের পালা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খাবার পর গণেশদা নানা রকম প্রশ্ন করে গল্প জুড়ে দিলেন। সকাল দশটার সময় বর্ধমান ছাড়লাম। সোজা জি টি রোড ধরে চন্দননগরে পৌঁছলাম এবং ডাঃ কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠলাম। ডাক্তারের দাদা শৈলেনবাবু আমার ভ্রমণের কথা সবাইকে জানালেন। ভদ্রলোকের দেখলাম খুব উৎসাহ।

তিনি আমাকে খবর দিলেন যে পরশু ১১ জুন আমাকে কলকাতায় পৌঁছতে হবে এবং মেয়র সনৎ রায়চৌধুরী আমাকে নাগরিক সংবর্ধনা জানাবেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট

হলেও লোক জমায়েত হবে। আরও খবর পেলাম যে আমার সঙ্গে পথে অন্তত একদিন আগে দেখা করবার জন্য মা, বাবা, ভায়েরা এবং বোন বালিতে বাড়ি ভাড়া করে আছেন।

শৈলেনবাবুর বাড়ি ছেড়ে জি টি রোডে পৌঁছলাম। কলকাতা থেকে মোটর গাড়িতে আমার দুই ভাই ও তাদের বন্ধুরা আমার খোঁজ করতে করতে হঠাৎ আমার দেখা পেল। তারপর সে কী হৈ চৈ হুল্লোড়। সেই দলে একটি সুদর্শন যুবক আমাকে দেখে বিশেষ করে আমার ধড়াচূড়া দেখে মুচকে মুচকে লাজুকের মতো হাসছিল। আমার ভাই নির্মল মুখার্জি আলাপ করিয়ে দিল আমার বন্ধু কল্যাণরঞ্জন দাস, বেণু বলে ডাকি। তার সঙ্গে হাত মেলালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেণুর সব লজ্জা চলে গেল। অন্যদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম গাড়ি নিয়ে রাস্তা ফাঁক করতে করতে চলল।

পথে অভূতপূর্ব ব্যাপার। রাস্তার দুধারে ছোট ছোট শহরে বাড়ি বাড়ি থেকে ডাক এল তাদের অভ্যর্থনায় যোগ দেবার জন্য। শাঁখ বাজিয়ে বরণ করে, গান গেয়ে সবাই যেন উৎসব করছিল। সব জায়গায় আমি দুকথায় ধন্যবাদ জানালাম। এতবার এত জায়গায় গেলাম যে দিন ফুরিয়ে এল। দিনের আলোয় মা-বাবার কাছে পৌঁছতে পারলাম না। তাঁরা বালির বাড়িটা নিয়েছিলেন একেবারে রাস্তার ওপর। সেখানেও অনেক লোক জমা হয়েছিল।

সন্ধ্যা সাতটার পর দীর্ঘ একযুগ পরে অবশেষে মা, বাবার সঙ্গে দেখা। আমার হৃদযন্ত্রটা মনে হচ্ছিল দ্বিগুণ জোরে চলেছে। সবাইকে যেন হঠাৎ অনেক বড় এবং বুড়ো দেখাচ্ছিল। সে হিসাবে আমিই যেন ইয়ং ম্যান। ছ ফুট লম্বা একটা রোদে পোড়া কাঠের মতো। মনে ভীষণ আনন্দ। এতদিনে যে ভূত আমার মাথায় এগারো বছর জুড়ে বসেছিল আজ সে নামল। পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করবই এমন প্রতিজ্ঞা কতবার করেছি। কতদিন মনে হয়েছে আশা নেই, কত সন্দেহ জেগেছে, তবু বিশ্বাস হারাইনি শেষ অবধি।

আর মাত্র কয়েকঘণ্টার পথ কলকাতা পৌঁছতে। আসছে কাল সকালেই যাত্রা শুরু করব। লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা আলোচনার পর খেতে বসলাম। আমার বাবা ভোজনবিলাসী ছিলেন। ভূরিভোজে আয়োজনের ত্রুটি করেননি।

আমি যখন ১৯২৬ সালে রওনা হই, মা তখন অচৈতন্য। আজ মার হাসি ধরে না। আমার জন্য কী করবেন ঠাউরে উঠতে পাচ্ছিলেন না। অতিথি আগন্তুকরা বিদায় নেবার পর দীর্ঘরাত্রি মার সঙ্গে গল্প করে কাটালাম। এই দিনটির কথা ভেবে নিজেকে কতদিন কত উৎসাহ দিয়েছি। আর আজ সেই চিন্তা বাস্তবের রূপ নিয়েছে।

১১ জুন ভোরে উঠে শেষবারের মতো ধড়াচূড়া পরলাম। সকালবেলায় ১১টার সময় কলকাতার মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরীর অফিস, পৌর প্রতিষ্ঠানে যাবার কথা। ইতিমধ্যে

মা এক রেকাব ফল ও মিষ্টি নিয়ে আমার পিছন পিছন ঘুরছেন আর বলছেন, ওকে আজ ছুটি দাও । কিন্তু কেউ সে কথায় কান দিচ্ছে না । প্রাতরাশ সেরে সবাই কলকাতার বাস ধরল । আমিও বেরিয়ে পড়লাম । প্রথমেই দৃষ্টি পড়ল কালকের সেই ছেলেটি, বেণুর ওপর । সে গাড়ি নিয়ে উপস্থিত । এসকর্ট করে কলকাতায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব সে নিজেই নিয়েছিল ।

কলকাতার যত কাছে আসছি, মনে হচ্ছে আমার রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছে । হাওড়ার কাঠের পুল পার হবার সময় মনে হল এবার সত্যিই আমার ডার্টি, ডিয়ার ওল্ড ক্যালকাটায় পৌঁছে গিয়েছি ।

এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি পৌর প্রতিষ্ঠানে পৌঁছলাম । অল্প লোকের ভিড় । একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠান হল ।

পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুসারে বেলা বারোটার মধ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পৌঁছলাম । এখানে অনেক লোকের ভিড় । পঙ্কজ গুপ্তর সংগঠন শক্তি ছিল অদ্ভুত । অল্প সময়ের মধ্যে খেলাধুলার জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবার সহজ পথ তিনি জানতেন ।

এখানেও মেয়র পৌরোহিত্য করলেন । তিনি বললেন যে আমিই প্রথম ভারতীয় পদব্রজে ও দ্বিচক্রে সমস্ত পৃথিবী এক যুগ ধরে ভ্রমণ করেছি । লেডি অবলা বসু বললেন যে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে লোক এমন করেছে বলে আমরা শুনিনি বা পড়িনি, তিনি আনন্দে ও গর্বে উচ্ছ্বসিত বোধ করছিলেন । সবার বলা যখন শেষ হল লেডি বসু দাঁড়িয়ে উঠে সবাইকে বললেন বল 'জয়, বিমল মুখার্জির জয়' । আমার লজ্জা লাগছিল ভীষণ ।

পরে লেডি বসু দুবার আমাকে ভ্রমণকাহিনী বলাবার জন্য ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ডাকেন । সেখানেও আমার বলা শেষ হলে লেডি বসু চেঁচিয়ে 'জয়, বিমল মুখার্জির জয়' বলে ছাত্রী ও শিক্ষিকা ও আমাকে বিব্রত করেন । তিনি কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেননি তিলমাত্রও ।

মেয়র খুব উৎসাহিত হয়ে বলেছিলেন যে বাঙালি যে ঘরমুখো, কুনো ও ভীতু নয়, তা প্রমাণ মিলেছে । যে কাজ পৃথিবীর অন্য যে কোনও লোক করতে পারে, সুযোগ ও সুবিধা পেলে বাঙালিও তা করতে সক্ষম । এই রকম ধরনের কথা অন্যরাও বললেন ।

মিটিং শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের বাড়ি ভ্রমণকাহিনী বলবার ও খাবার নেমন্তন্ন পেলাম । এরকম ম্যারাথন নেমন্তন্ন খুব কম লোকের ভাগ্যে জুটেছে । প্রথম রাত্রি আরম্ভ করলাম ১২ নম্বর গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্টের শ্রীচণ্ডীচরণ নন্দী মহাশয়ের বাড়িতে । চণ্ডীবাবুর সঙ্গে বার্লিনে এক শীতের রাত্রে বরফের ঝড়ের মধ্যে আলাপ ও পরে বন্ধুত্ব হয় ।

ইনস্টিটিউটের কাছেই আমার পুরনো পৈত্রিক বাড়ি । সেখানে অর্থাৎ পটলডাঙা স্ট্রীটের ইয়ংমেনরা এই পাড়া ছেড়ে বেশিরভাগ দক্ষিণ কলকাতায় চলে গিয়েছে । আমার ভায়েরাও

বালিগঞ্জ প্লেসে উঠে গিয়েছে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত মহিলা প্রেস বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তবে আমি কেন আর পটলডাঙার মায়া করি। চললাম সাইকেলের মোড় ঘুরিয়ে বালিগঞ্জের খোলামেলা দক্ষিণে।

বালিগঞ্জ প্লেসের যুবকরা একটা অভিনন্দনের ব্যবস্থা করেছিল। কে সি নাগ মহাশয় পৌরোহিত্য করলেন। তাঁর বাড়ির পাশেই বেণুদের বাড়ি। সে টেনে নিয়ে গেল অতি পরিচিতের মতো তাদের বাড়িতে। স্লাইড দিয়ে নানা দেশের নানা বিষয় বলবার জন্য সেখানে আহ্বান পেলাম। আমার ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না। সেই বাড়িতে অচিরে আমার জীবনসঙ্গিনীর দেখা পেলাম। আমার ভবঘুরে জীবনের ধারা বদলে গেল। এবার শুরু হল নতুন অধ্যায়।